# ভারত প্রেমকথা

সুবোধ ঘোষ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার সরকার
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯, এণ্টনি বাগান লেন
কলিকাতা-৯

বেঁধেছেন : জি. রায় এণ্ড কোং
২২. বৃন্দাবন ওস্তাগর লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট অংকন : শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়
নামলিপি অংকন : শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত

অষ্টম সংস্করণ মাঘ, ১৩৬৭

মূল্য : ছয় টাকা

# "বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিকাল রস"

## [ ভূ মি কা ]

ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে, 'Man does not live by classics alone'। কথাটি খুব সত্য। প্রাচীন সাহিত্য অশেষ গুণের আধার হওয়া সত্ত্বেও তাহাতে এমন কিছুর অভাব আছে যাহাতে আধুনিক মন সম্পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। আধুনিক মন সাহিত্যে আধুনিক রস সন্ধান করে। এই সন্ধানের সূত্রেই প্রত্যেক যুগ নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করে। এ সবই সত্য। কিন্তু ক্লাসিক বা প্রাচীন সাহিত্য বা সাহিত্যের ধ্রুবপদ অংশে এমন কিছু সার্বজনীনতা আছে যাহাতে প্রত্যেক যুগ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সার্থকতাও লাভ করে। দুই ভাবে ইহা ঘটে। পুরাতনের নূতন ভাষ্য রচনা করিয়া মানুষের মন তৃপ্তি পাইতে পারে। হোমারের অডিসি কাব্যের নায়ক সমুদ্রবক্ষে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। টেনিসন তাঁহার ইউলিসিস কবিতাটিতে ইউলিসিসের অভিজ্ঞতাকে নূতন ভাষ্যে সঞ্জীবিত করিয়া আধুনিক হাতে 'মন্ময় জগৎ' হইয়া উঠিয়াছে। হোমারের অডিসিতে মহত্ত্ব, টেনিসনের হাতে 'মন্ময় জগৎ' হইয়া উঠিয়াছে। হোমারের অডিসিতে মহত্ত্ব টেনিসনের ইউলিসিসে নৈকট্য; হোমারের পাত্রে সার্বজনীন সুধা, টেনিসনের পাত্রে আধুনিক মনের সুধা; হোমারের কাব্য ভাবী কালকে আনন্দ দান করিবে টেনিসনের কবিতাটি পরবর্তী কালের হৃদ্য মনে না হইতেও পারে।

আর এক রকমে প্রাচীন সাহিত্য আধুনিক তৃষ্ণার পানীয় জোগাইতে পারে। নূতন ভাষ্য রচনা করিয়া নয়, নূতন যুগের উপযোগী পরিবর্তন সাধন করিয়া। পৃথিবীর সাহিত্যে সর্বকালেই এমন ঘটিয়াছে, এখনো ঘটিতেছে। ইহাকে বলা যাইতে পারে, প্রাচীনের নবীকরণ। টেনিসন কাহিনীকে অবিকৃত রাখিয়া নূতন ভাষ্যের দ্বারা আধুনিক মনের আসন রচনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেক লেখক প্রাচীন সাহিত্যের উপরে হস্তক্ষেপ করেন। কাহিনী অংশের অদল বদল করেন, নূতন তথ্য সংযোজিত করেন এবং নূতন ভাষ্য ও নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাকে নূতন যুগের নাগরিক অধিকার প্রদান করিয়া দূরবর্তী মহত্ত্বকে আধুনিক মনের নিকটে আনিয়া দেন।

বাংলা সাহিত্যে এমন উদাহরণ অবিরল।

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনী সর্বাংশে আর্ষ রামায়ণকে অনুসরণ করে নাই। তাঁহার রাম, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ নামে মাত্র বাল্মীকির রাম, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ। বাল্মীকির নায়কদের চেয়ে ইহাদের বেশি মিল ও আন্তরিক মিল মধুসূদনের সমকালীন ইয়ং বেঙ্গলের সহিত। মধুসূদন পুরাতন পাত্রে নূতন নূতন রস সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্র ঠিক এই কাজটি পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার বৃত্রসংহার কাব্য পাঠ্যপুস্তকের জগতের বাহিরে জীবন লাভ করিতে পারিল না।

এবারে রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে দুইটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতার মূল মহাভারতে। মূলে 'প্রথম রমণী দরশমুগ্ধ' ঋষ্যশৃঙ্গই প্রধান পাত্র। তাহার বিস্ময়, তাহার উল্লাস, তাহার অননুভূতপূর্ব অভিজ্ঞতাই কবিতাটির প্রাণ। যে নারী তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল সে সামান্য বারযোষিৎ মাত্র। রবীন্দ্রনাথে ইহার সাকুল্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মহাভারতের বারযোষিৎ আধুনিক কবি কর্তৃক দেবীপদে অভিষিক্ত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের দ্বারা কবিতাটিকে কবি আধুনিক মনের পক্ষে সুপেয় করিয়া তুলিয়াছেন। আধুনিক 'সোফিস্টিকেটেড' মন ঋষ্যশৃঙ্গের অভিজ্ঞতাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, নতুবা প্রহসনে পরিণত করিবে, কিন্তু নারীহৃদয়ের বেদনাকে অনায়াসে মর্যাদা দান করিয়া স্বীকার করিয়া লইবে। এখানে কাহিনীর পরিবর্তন তেমন হয় নাই যেমন হইয়াছে ভাষ্যের সংযোজনা।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নাটকের মূলও মহাভারতে। রবীন্দ্রনাথ মূলের কাহিনী ও ভাষ্য দুয়েরই পরিবর্তন করিয়াছেন। মূলের খনি হইতে তিনি ধাতু সংগ্রহ করিয়া নূতন যুগের ছাঁচে পাত্র গড়িয়া লইয়াছেন আর তাহাতে আধুনিক মনের আধেয় রক্ষা করিয়াছেন। প্রাচীন ছাঁচে ঢালা চিত্রাঙ্গদা-কাহিনী যতই মনোরম হোক না কেন আধুনিক মনকে সম্পূর্ণ তৃপ্তিদান করিতে সক্ষম হইবে না।

প্রাচীনের নবীকরণ প্রচেষ্টার ফলেই যুগে যুগে নূতন পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত যাবতীয় পুরাণই এইরূপ প্রক্রিয়ার ফল। মহাভারতোক্ত 'শকুন্তলা' পুরাণের 'শকুন্তলা' নয়, আবার কালিদাসের 'শকুন্তলা' এ দুই হইতেই ভিন্ন। আবার গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ 'শকুন্তলা'র যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, খুব সম্ভব 'মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তার ছবি।'

যাবতীয় ক্লাসিক সাহিত্য আরব্য-রূপকথার ফিনিক্স পাখীর মতো আপন দেহ হইতে যুগে যুগে নবতর সৃষ্টি করিয়া মানুষের মনকে তৃষ্ণার বারি জোগাইয়া আসিতেছে। ক্লাসিক সাহিত্যে এমন কিছু সার্বজনীনতা,

স্থিতিস্থাপকতা আছে যাহা নূতন ভাষা, নূতন সংযোজনা ও নূতন পরিবর্তন বহনক্ষম। এখানেই তাহার বৈশিষ্ট্য ও অর্বাচীন সাহিত্য হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য। কাজেই 'Man does not live by classics alone'--সর্বাংশে সত্য নয়, অনেক সত্যের মতোই অর্ধসত্য মাত্র।

২

মনীষী সাহিত্যিক শ্রীসুবোধ ঘোষ কিছুকাল আগে মহাভারত হইতে প্রেমকাহিনী অবলম্বনে গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। এগুলি যখন 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে তখনি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমারও করিয়াছিল। তারপরে এখন গল্পগুলি 'ভারত প্রেমকথা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। অনেক দিন হইতে নিজের বইয়ের ভূমিকা লিখিয়া হাত পাকাইতেছি, পরের বইয়ের ভূমিকা লিখিবার সুযোগ পাইব ভরসা ছিল না। কিন্তু সুবোধবাবু এমনি দুঃসাহসী যে প্রস্তাব করিবামাত্র রাজি হইলেন। রামায়ণ মহাভারত না জানিলে ভারতবর্ষকে জানা যায় না। সুবোধবাবুর ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও শ্রদ্ধা বাংলা সাহিত্যের একটি আশার বিষয়। আর সেই জ্ঞান ও শ্রদ্ধার দ্বারা চালিত হইয়া তিনি মহাভারতের কাহিনীকে নিজের শিল্পসৃষ্টির বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, শিল্পদৃষ্টির বলে সুবোধবাবু বুঝিয়াছেন যে, প্রাচীনের অনুকরণ করিলে চলিবে না, প্রাচীনকে নবীন করিয়া তুলিতে হইবে। মনে রাখা উচিত যে, ঐতিহ্যবিরহিত হইলেই সার্থকসৃষ্টি হয় না। সার্থক শিল্পসৃষ্টির মূলে দুটি স্বতোবিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া আবশ্যক, ট্রাডিশন ও ফ্রীডম, সংস্কার ও স্বাধীনতা। ভারত প্রেমকথার গল্পগুলিতে স্বাধীনতা ও সংস্কারের অতি অপূর্ব মিলন হইয়াছে, আর সেই জন্যই এই প্রেমকথাগুলি অতি উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে।

এই প্রেমকথাগুলির মধ্যে ট্রাডিশন বা সংস্কারের উপাদান খুব স্পষ্ট, ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীনতার বা নূতনত্বের দিকটা অভাবিত, তাই তাহার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

সংবরণ ও তপতীর কাহিনীটি গ্রহণ করা যাক।

মূল কাহিনীতে সমদর্শিতার ভাবটি নিতান্ত বীজাকারে বর্তমান। ভগবান্ আদিত্য সমদর্শী। তাঁহার কন্যা তপতীও সমদর্শী—আর তাঁহার শিষ্যও সমদর্শী। এই পর্যন্ত। কিন্তু তপতী ও সংবরণের সমদর্শিতা সংসারের ও প্রণয়াবেগের দ্বন্দ্বে নিক্ষিপ্ত হইলে কি রূপ ধারণ করে মূলে

তাহার পরিচয় অল্পবর্ণনায় ব্যক্ত হইয়াছে। সুবোধবাবু পূর্ণতর রূপণার দ্বারা তাহাই আমাদের দেখাইয়াছেন। বস্তুত তপতী ও সংবরণের সমদর্শিতার মূলে সত্য অভিজ্ঞতার, সাংসারিক পরীক্ষার বাস্তব ভিত্তি ছিল না, তাই তাহাদের দাম্পত্য জীবনের প্রথম সংঘাতেই সমদর্শিতার ভাব বিলোপ পাইল। প্রথম প্রেমের মোহে সমদর্শী সংবরণ আত্মসুখদর্শী হইয়া সমস্ত রাজকর্তব্য বিস্মৃত হইয়া রাজ্যে অরাজকতা ডাকিয়া আনিবার হেতু হইল। তারপরে ধীরে ধীরে অনেক আঘাতে, অনেক তপস্যায়, অনেক দুঃখ বরণের দ্বারা তাহাদের মোহ ভাঙিয়াছে, আর তখনই তাহারা সমদর্শিতার যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারিয়াছে। তপতী ক্ষণকালের মোহে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, সে কেবল সংবরণের মহিষী নয়, তাহার রাজ্যের রাণী। ভুলিয়াছিল যে, সে কেবল পত্নী নয়, লোকমাতা। অবশ্য সংবরণও সমকালেই ইহা স্বীকার করিয়াছে। তাই প্রেম কথাটির সুখাবসান। অন্যথা ইহা রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' বা 'তপতী'র মতো ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। সংবরণ ও তপতী কাহিনীটি খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল, তাঁহার কাব্যে একবার অন্তত তপতী-সংবরণের প্রেম-তপস্যার উল্লেখ আছে। আর রাজা ও রাণীর আমূল পরিবর্তিত রূপের তপতী নামকরণ নিশ্চয়ই বিশেষ অর্থ বহন করে।

নারীর পত্নী ও লোকমাতা-রূপ দ্বৈতমূর্তির ভাবটি সেকালেও ছিল, কিন্তু বীজাকারেই ছিল, কারণ সেকালে নারীর বিচরণক্ষেত্র স্বভাবতই স্বল্প-পরিসর ছিল। কিন্তু একালে পুরুষ ও নারীর সঞ্চরণক্ষেত্র সমব্যাপক, অন্তত তাহাই হইতে চলিয়াছে। একালে নারীকে, প্রত্যেক নারীকে, কেবল মহীয়সী-দের মাত্র নয়, যুগপৎ পত্নী ও লোকমাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হয়, পদে পদে তাহার পরীক্ষা। কাজেই সেকালে যাহা বীজ মাত্র ছিল একালে তাহা বনস্পতি হইতে চলিয়াছে। ইহা মডার্ণ আইডিয়া ও মডার্ণ সমস্যা। সুবোধবাবুর মনীষার প্রমাণ এই যে, মূল কাহিনীতে আরও পাঁচটা সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যুগোপযোগী সম্ভাবনাটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, আর তাঁহার শিল্পদক্ষতার প্রমাণ এই যে (এখনও যদি প্রমাণের আবশ্যক করে), সেই সম্ভাবনাটিকে হৃদয়স্পর্শী কাহিনীতে পরিণত করিয়াছেন। কথাটি যুগপৎ যুগস্পর্শী ও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে।

এইভাবে প্রত্যেকটি কাহিনী বিশ্লেষণ করিয়া সুবোধবাবুর মনীষার ও শিল্পকৌশলের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। কাহিনীগুলি কেবল ভাবের বাহন মাত্র নয়, নিজ মূর্তিতে সমুজ্জ্বল, ও নিজ প্রাণে সঞ্জীবিত। প্রাচীন কাহিনীর আধারে সুবোধবাবু চিরকালীন সুখ-দুঃখের ও হাসি-অশ্রুর অমৃত পরিবেষণ করিয়াছেন। এগুলি জ্ঞানের বস্তু নয়, জীবনের সামগ্রী।

'পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা' কাহিনীর সুশোভনার চেয়ে অধিকতর মডার্ণ উয়োম্যান তো বাংলা সাহিত্যে দেখি নাই। শেষের কবিতার কেটি সিসি লিসির দল ও শেষ প্রশ্নের কমল তাহার কাছে নিষ্প্রভ। মডার্ণ উয়োম্যানের চরিত্রে 'প্যাশন' বস্তুটির অভাব; তাহাদের হৃদয়ে প্যাশন নাই, হাবভাবে তাহার ছলনাটুকু মাত্র আছে। সেইজন্য তাহারা অসহ্য; আর প্যাশন-এর তড়িৎপুঞ্জ-চালিত সুশোভনা উল্কাপিণ্ডের ন্যায়, মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায়, জ্বলন্ত বর্তিকার ন্যায় দুঃসহ। স্বাধীন, দুর্ধর্ষ, দুর্বার, সহজ জীবনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়াবেগের প্রবল উত্থানপতনও বোধ করি লোপ পাইয়াছে!

অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রার তপস্বিনী মূর্তিতেই আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু তাহার চরিত্রেরও যে আরও একটা দিক আছে সুবোধবাবু তাহা দেখাইয়াছেন। সে চিরন্তনী নারী। অলংকার-পরিত্যাগে সে কী দুঃখ। আবার অলংকার-লোভেই বা কী আগ্রহ। কিন্তু স্বামী যখন বহুবাঞ্ছিত অলংকাররাশি তাহার পায়ের কাছে আনিয়া স্তূপীকৃত করিল, তখন সেইগুলির দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। চিরন্তনী ছলনাময়ীর এ কেমন চিরন্তন ছলনা। ঐ লীলাটুকু নারী-চরিত্রে আছে বলিয়াই বোধ করি মানুষের সংসারে নারীর প্রেম সুন্দর ও সুসহ এক রহস্য।

আর, অগ্নির বহুনারী ও পরনারী স্বাদ পূরণের জন্য প্রেমিকা স্বাহার ছদ্মবেশে সে কী কপটাভিনয়! এ কাহিনীটি যেমন করুণ তেমনি মনোরম, তেমনি নাট্যরসে গম্ভীর।

আর, সেই যে সুলভা একবার আসিয়া জনকের আত্মজ্ঞানের পরীক্ষা করিয়া গেল! শান্ত সমুদ্রকে উদ্বেল করিয়া চন্দ্রমা যেমন নির্বিকারভাবে অস্তমিত হয়, তেমনি করিয়া সুলভা প্রস্থান করিল। জনক তাহাকে ভুলিতে পারে নাই, পাঠকও তাহাকে ভুলিবে এমন সম্ভাবনা দেখি না।

এমন করিয়া দৃষ্টান্ত দিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে, কাজেই প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও, অন্য দু'একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ভাষাপ্রবাহ নদীপ্রবাহের মতো—একথা অনেকেই বলিয়াছেন। কিন্তু দু'য়ে প্রভেদ এই যে, নদীপ্রবাহের বিস্তার কেবল দেশে আর ভাষাপ্রবাহ বিস্তৃত দেশে ও কালে। সুবোধবাবু বিষয় ভেদে ভিন্ন ভাষারীতি ব্যবহার করেন। তাঁহার আধুনিক জীবনের গল্পগুলিতে, ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে এবং অন্যান্য প্রবন্ধে যে ভাষারীতি তিনি ব্যবহার করিয়াছেন এখানে সে ভাষারীতি নয়। এখানে তাঁহার ভাষাপ্রবাহ মহাভারতের দেশে কালে বিস্তারিত, তাই তাহার জল গভীর, ধ্বনি গম্ভীর এবং কললাবণ্যে উচ্ছ্রিত শীকরকণায় ইন্দ্রধনুর লীলা। এখানে তাঁহার ভাষাপ্রবাহের নির্মল দর্পণে কোথাও বা হিমালয়ের

ধবলিমার শুভ্র প্রতিবিম্ব, কোথাও বা প্রাচীন অরণ্যানীর শাখাজটিল অন্ধকারের গূঢ় প্রতিচ্ছায়া, আর কোথাও বা ঐশ্বর্যসুখী রাজরাজন্যগণের বিচিত্রবর্ণ রত্নসৌধচূড়ার প্রতিচ্ছবি। যে কোন স্থান হইতে উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে।

"সেই নিদাঘের মধ্যদিনের আকাশ সেদিন তপ্ত তাম্রের মতো রক্তাভ হয়ে উঠেছিল, বলাকামালার চিহ্ন কোথাও ছিল না। জ্বালা-বিগলিত স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ সেই সরোবরসলিলে মীনপংক্তির চাঞ্চল্যও ছিল না। খর সৌরকরে তাপিত এক শৈবালবর্ণ শিলানিকেতন বহিস্পৃষ্ট মরকতস্তূপের মতো সরোবরপ্রান্তে যেন শীতল স্পর্শসুখের তৃষ্ণা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মণ্ডুকরাজ আয়ুর প্রাসাদ।"

কিংবা—

"আলোকে আপ্লুত হয়ে উঠেছে পূর্ব গগনের ললাট। সূক্ষ্ম অংশুক নীশারের মতো ধীরে ধীরে অপসৃত হয় খিন্ন কুহেলিকা, আর বিগলিত-দুকূলা কামিনীর মতোই শরীরশোভা প্রকট ক'রে ফুটে ওঠে কূলমালিনী এক তটিনীর রূপ।"

কিংবা—

"পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে কুটীরের বাইরে এসে দাঁড়ায় সুকন্যা। দেখতে পায়, যৌবনাঢ্য দুই পুরুষের দুই মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে প্রাঙ্গণের বক্ষের উপর। উভয়েই সমান সুন্দর, একই তরুর দুই পুষ্পের মধ্যে যতটুকু রূপের ভিন্নতা থাকে, তাও নেই। কান্তিমান, দ্যুতিমান ও বিশাল বক্ষঃপট, নবীন শাল্মলী সদৃশ যৌবনান্বিত দুই দেহী।"

ভাষায় মৃদঙ্গ বাজিতেছে। এমন বর্ণাঢ্য, রূপাঢ্য, ধ্বনিসুন্দর ভাষা বাংলা ভাষারই এক নূতন পরিচয় এবং বিপুল উৎকর্ষের সম্ভাবনাময় পথটি দেখাইয়া দিতেছে। মহাভারতীয় পরিবেশ রচনা এ ভাষারীতি ছাড়া অসম্ভব। বাংলা সাহিত্যে যখনি যিনি ক্লাসিকাল রস সৃষ্টি করিয়াছেন তখনই এই ভাষারীতিকে গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। ইদানীং কালে অধিকাংশ লেখক সে প্রয়োজন অনুভব করে না, তাই অব্যবহারে, অপরিচয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞানে এ হেন ভাষা-রীতি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। ভাষার নিজস্ব একটি মহিমা আছে, ভাষা কেবল ভাবের বাহন নয়।

বস্তুত প্রকৃত গুণ-সাহিত্যের উপাদান সঞ্চিত আছে ওই রামায়ণ, মহাভারতে। 'ভারত প্রেমকথা' বঙ্গ-সরস্বতীর চিরকালীন অঙ্গভূষণ।

**প্রমথনাথ বিশী**

# 'মহাভারতের মাধুর্যকণা'

[ একটি পত্র ]

স্নেহভাজনেষু

আশীর্বাদ লও। ...তোমার সর্ববিধ কল্যাণ কামনা করি।

আশীর্বাদ কি আজই জানাইলাম। বহুদিন পূর্ব হইতে প্রতিদিনই তোমাকে আশীর্বাদ জানাই। আগে আমাদের গুরুজনেরা আশীর্বাদ করিতেন "তোমার সোনার দোয়াত কলম হউক।" তোমার তো সোনার দোয়াত কলমই হইয়াছে। নহিলে মহাভারতের কথানকের এমন মধুরোজ্জ্বল মর্মানুবাদ বাহির হইবে কেন? এ তো লেখা নয়! জীবনালেখ্য লিখনের এমন শুচিস্মিত রম্যতা, চিত্রণের এমন ইন্দ্রধনুর বিচিত্রতা, সঙ্কলনের এমন শালীনতা, এত লালিত্য এত মাধুর্য কোথা হইতে আহরণ করিলে?

যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে। মহাভারতে অরণ্যানী আছে, উপবন আছে। ফলোদ্যানও আছে। আবার সাগরের তরঙ্গরঙ্গ, তটিনীর নটনভঙ্গী এবং নির্ঝরিণীর কলগীতি আছে। মহাভারতে একদিকে আছে শান্তরসাস্পদ তপোবন, অন্যদিকে মৃত্যুসন্ধুক্ষিত রণভূমি। একদিকে দারিদ্র্যলাঞ্ছিত পর্ণকুটীর, অন্যদিকে ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ রাজপ্রাসাদ। একদিকে শ্যাম শষ্পক্ষেত্র, অন্যদিকে বর্ণাঢ্য রত্নভাণ্ডার। ত্যাগের সঙ্গে স্বার্থপরতার, মহত্ত্বের সঙ্গে নীচতার, স্বর্গের সঙ্গে নরকের এমন বিচিত্র সমাবেশ অন্যত্র দুর্লভ। তুমি একক এই ভারত পরিক্রমায় বাহির হইয়াছ। তোমার যাত্রা সার্থক হউক।

অচতুর্বদন ব্রহ্মা, দ্বিবাহু অপর হরি, অভাললোচন শম্ভু ভগবান বাদরায়ণ মহাভারতের মর্ত্য মৃত্তিকায় স্বর্গ-পাতাল একত্রিত করিয়াছেন। তিনি আদি-কবি ব্রহ্মার সর্জনাকে সম্পূর্ণতা দান করিতে গিয়া এক অভিনব জগৎ রচনা করিয়াছেন। তাই তো সৃজন পালন সংহারের এমন বিস্ময়জনক অথচ সুমিত সমাহার! মর্ত্যকে অমৃতদানের মহান্ ব্রতে সার্থক ব্রতী ব্যাসদেব দেবলোক এবং নাগলোক এই দুই লোক হইতেই অমৃত আনিয়া মরলোকে বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যে কান্তা-প্রেমকে তিনি জীব-জগতের সাধ্যসার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই সমস্ত কথানক তাহাঁরই অধিষ্ঠান ভূমি। এই পার্থিব প্রেমেরই দিব্যরূপ নিকষিত হেম গোপী-প্রেম। এই সার্থক প্রেমের

বৈচিত্র্য কত, রহস্যই বা কেমন! যেমন গভীর তেমনই কি বিশাল! সংসার ও সমাজের স্থিতিরূপা পালনকারিণী এবং বিলয়বিধাত্রী যে প্রেমাকাঙ্ক্ষা, মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এই কথানকমালায় সেই প্রেমাকাঙ্ক্ষারই কথা কহিয়াছেন। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সর্বত্রই ইহার অবাধ গতি, বিপুল প্রসার, প্রবল প্রভাব। মহর্ষির জীবনদর্শনের মহিমাময় দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণে তোমার একনিষ্ঠ প্রয়াস আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। জীবনে যেমন সমস্যা আছে তেমনই সমাধানও আছে। সেই সমস্যা নিরূপণে এবং সমাধান নির্ধারণে ত্রিকালদর্শী মহর্ষির চরণাঙ্কিত সরণি হইতে তুমি পদস্খলিত হও নাই, তোমার পতন ঘটে নাই, এই দুর্দিনে ইহাই সর্বাপেক্ষা আশা এবং আশ্বাসের ভরসা এবং আনন্দের কথা।

মহাকবি মধুসূদনের বীরাঙ্গনায় ও কবিকুলতিলক রবীন্দ্রনাথের কচ ও দেবযানীতে এবং চিত্রাঙ্গদায় মহাভারতের মাধুর্যকণার অভিনব আস্বাদ লাভ করিয়াছি। তাহাতে পিপাসা বাড়িয়াছে মাত্র। সে পিপাসা প্রশমনের প্রয়াস আর কেহ করেন নাই। মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের রচনা কবিতায়। তোমার রচনা কবিত্বপূর্ণ কিন্তু কবিতা নয়, ইহা গদ্য কবিতা ও একটি অপূর্ব রচনা।

ফুলমালা দেখিয়াছি, মণিমালিকা দেখিবারও সৌভাগ্য ঘটিয়াছে! কিন্তু এমন কুসুমে রতনে গাঁথা মালা ইতিপূর্বে বাঙ্গলা সাহিত্যের আর কোথাও দেখি নাই। তুমি সেই অসাধ্য সাধন করিয়াছ। তোমার মালায় দেবলোকের মন্দার এবং সন্তানক পুষ্প আছে। তাহার সঙ্গে নাগলোকের মহার্হসমুজ্জ্বল মণিরত্নের এমন সুসমঞ্জস সন্নিবেশ, এ এক বিস্ময়জনক সৃষ্টি! অমরোদ্যানের কুসুমসম্ভারের সঙ্গে ফণিফণার রত্ননিচয়কে কি কুশলতায় যে মিলাইয়া দিয়াছ, এ এক অদৃষ্টপূর্ব চমৎকৃতি! বর্ণে এবং আকারে একাকার হইয়া গিয়াছে। কুসুমের রূপ রং ও সুরভি এবং স্নিগ্ধতার সঙ্গে রত্নবিচ্ছুরিত দ্যুতিবিম্বের মিলন মাল্যখানিকে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে।

তুলনা করিতেছি না, তথাপি বলিতেছি তোমার রচিত মাল্যদাম শিল্পশ্রেষ্ঠ ময়-রচিত ইন্দ্রপ্রস্থসভার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তোমার রচিত এই মালা কিন্তু বিনি সূতায় গাঁথা মালা নহে। মাল্যগ্রন্থনে তুমি মর্ত্যের মানস-লোক হইতেই এই সূত্র সংগ্রহ করিয়াছ। মানবের অন্তরবেদনাবিমথিত অশ্রু-বিরচিত সেই সূত্র। এই জন্যই রচনা সার্থক ও সুন্দর হইয়াছে। মহর্ষি হইলেও ব্যাসদেব মানুষ ছিলেন। তাঁহার অনুভূতি মানবহৃদয়েরই দিব্যানুভূতি।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সাহিত্যরত্ন

# "নতুন ক'রে পাব ব'লে"

## [ মুখবন্ধ ]

আদিযুগ আর নবতম যুগ, রূপের দিক দিয়ে এই দুয়ের মধ্যে ভিন্নতা আছে, কিন্তু এই ভিন্নতা নিশ্চয়ই বিচ্ছেদ নয়। নবতমের মধ্যে হোক, আর পুরাতনের মধ্যে হোক, শিল্পীর মন সেই এক চিরন্তনেরই রূপের পরিচয় অন্বেষণ ক'রে থাকে। শিল্পীর সাধনা হলো নতুন ক'রে পাওয়ার সাধনা। শুধু পথ চাওয়াতেই আর পথ চলাতেই শিল্পীর আনন্দ নয়, নতুন ক'রে পাওয়ার আনন্দও শিল্পীর আনন্দ। আদিযুগের রূপকে এই জগতে আর একবার পাওয়া যাবে না ঠিকই, কিন্তু আদিযুগের রূপকে নতুন ক'রে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা শিল্পী ছাড়তে পারেন না। কারণ, সেই পুরাতনের রূপের সঙ্গে একটি অখণ্ড আত্মীয়তার ডোরে বাঁধা রয়েছে নবতম যুগের মানুষেরও জীবনের রূপ।

জীবনের রূপ সম্বন্ধে এই অখণ্ডতার বোধ হলো কবি শিল্পী ও সাধকের মহানুভূতি এবং এই মহানুভূতিই মানুষজাতির শিল্পে ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেখানে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট ও সুন্দর আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে, সেখানেই আমরা পেয়েছি ক্লাসিক গৌরবে মণ্ডিত সাহিত্য ও শিল্প। ক্লাসিক-এর রূপ ও ভাব খণ্ডকালের মধ্যে সীমিত নয়। কালোত্তর প্রেরণার শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে আছে কবি বাল্মীকির রামায়ণ এবং ব্যাসদেবের মহাভারত। বিশেষ কোন জাতির জীবনের রীতিনীতি ও ঘটনা অথবা বিশেষ কোন যুগের ইতিহাসের উত্থান-পতনের ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে রচিত হ'লেও বিশ্বের ক্লাসিক সাহিত্যকীর্তিগুলির মধ্যে মানবজীবনের চিরকালীন আনন্দ হর্ষ ও বেদনার ব্যাকুলতা বাঙ্ময় হয়ে রয়েছে। ভোরের সূর্যের মত এই মহাপ্রাণময় কাব্য ও শিল্পরীতিগুলি মানুষের মনের আকাশে নিত্য নতুন আলোকের প্রসন্নতা ছড়ায়। তাই প্রতি জাতির সাহিত্যে দেখা যায় যে নতুন কবি ও শিল্পীরা জাতির অতীতের রচিত মহাকাব্য গাথা সঙ্গীত ও শিল্পরীতি থেকে প্রেরণা আহরণ করেছেন।

কিন্তু ক্লাসিকের রূপ ও ভাবের ভাণ্ডার থেকে আহৃত উপাদান দিয়ে

রচিত এই নতুন সৃষ্টিগুলি সম্পূর্ণভাবে আধুনিকতম নতুন সৃষ্টিরূপে পরিণতি লাভ করে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হয় না। ইওরোপীয় সাহিত্য ও শিল্পে বিভিন্ন কয়েকটি রেনেসাঁর ইতিহাস লক্ষ্য করলেও এই বিস্ময়কর নিয়মের সত্যতা আবিষ্কৃত হয় যে, আধুনিক কবি ও শিল্পীর হৃদয় পুরাতনেরই মহাপ্রাণময় কাব্য ও শিল্পের রূপগরিমার সাযুজ্য লাভ ক'রে বিপুল নূতনত্ব সৃষ্টির অধিকার লাভ করেছিল। এই সাফল্যের অন্তর্নিহিত রহস্য বোধ হয় এই যে. ক্লাসিকের অনুশীলনে কবি ও শিল্পী সহজেই সেই দৃষ্টিসিদ্ধি লাভ ক'রে থাকেন, যার ফলে জীবনের রূপকে যুগ হতে যুগান্তরে প্রবাহিত এক অক্ষান্ত ও অখণ্ড রূপের ধারা ব'লে সহজে উপলব্ধি করা যায়।

বিশ্বের ক্লাসিক সাহিত্য এই উপলব্ধির বাণীময় রূপ। তাই ক্লাসিক এর অনুশীলন সহজে মানুষের চিত্তের ভাবনাকে প্রকৃত রূপসৃষ্টির রীতিনীতি ও পথ চিনিয়ে দেয়। এক কথায় বলতে পারা যায়, ক্লাসিক সাহিত্য ও শিল্পরীতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া জীবনের রূপকে নতুন ক'রে নিকটে পাওয়ার উপায়।

মহাভারতের মূলকাহিনী ছাড়া আরও এমন শত শত উপাখ্যানে এই গ্রন্থ আকীর্ণ যার মূল্য সহস্র বৎসরের প্রাচীনতার প্রকোপেও মিথ্যা হয়ে যায়নি। কারণ, ব্যক্তির ও সমাজের মন এবং সম্পর্কের যে-সব সমস্যা মহাভারতীয় উপাখ্যানগুলির মূল বিষয়, সে-সব সমস্যা বিংশ শতাব্দীর নর-নারীর জীবন থেকেও অন্তর্হিত হয়নি। নরনারীর প্রণয় ও অনুরাগ, দাম্পত্যের বন্ধন, বাৎসল্য ও সখ্য—শ্রদ্ধা ভক্তি ক্ষমা ও আত্মত্যাগ ইত্যাদি যে-সব সংস্কারের উপর সামাজিক কল্যাণ ও সৌষ্ঠব মূলত নির্ভর করে, তার এক-একটি আদর্শোচিত ব্যাখ্যা এইসব উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকার জীবনের সমস্যার ভিতর দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। শত শত ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের যে-সব কাহিনী মহাভারতে বিবৃত হয়েছে তার মধ্যে এই বিংশ শতাব্দীর যে-কোন মানুষ তাঁর নিজের জীবনেরও সমস্যার অথবা আগ্রহের রূপ দেখতে পাবেন। এই কারণে শতেক যুগের কবিদল মহাভারত থেকে তাঁদের রচনার আখ্যানবস্তু আহরণ করেছেন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ক্লাসিক সাহিত্যের তুলনায় ভারতের ক্লাসিক এই মহাভারত কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। এই মহাভারতই বস্তুত ভারতের সাধারণ লোকসাহিত্যে পরিণত হয়েছে। ভারতের কোটি কোটি নিরক্ষরের মনও মহাভারতীয় কাহিনীর রসে লালিত। ভারতীয় চিত্রকারের কাছে মহাভারত হলো রূপের আকাশপট, ভাস্করের কাছে মূর্তির ভাণ্ডার। গ্রাম-ভারতের কথক ভাট চারণ ও অভিনেতা, সকল শ্রেণীর শিল্পী মহাভারতীয়

কাহিনীকে তার নাটকে সংগীতে ও ছড়ায় প্রাণবান ক'রে রেখেছে। মহাভারতের কাহিনী এবং কাহিনীর নায়ক-নায়িকার চরিত্র ও রূপ ভারতীয় ভাস্কর স্থপতি চিত্রকার নট নর্তক ও গীতকারের কাছে তার শিল্পসৃষ্টির শত উপাদান, ভাব, রস, ভঙ্গী, কারুমিতি ও অলংকারের যোগান দিয়েছে। মহাভারত গ্রন্থ প্রতিশব্দ উপমা ও পরিভাষার অভিধান। ভারতের জ্যোতির্বিদ্ মহাভারতীয় নায়ক-নায়িকার নাম দিয়ে তাঁর আবিষ্কৃত ও পরিচিত গ্রহ-নক্ষত্র-উপগ্রহের নামকরণ করেছেন। আকাশলোকের ঐ কালপুরুষ অরুন্ধতী রোহিণী চন্দ্র বুধ ও কৃত্তিকা, কতগুলি জ্যোতিষ্কের নাম মাত্র নয়--ওরা সকলেই এক-একটি কাহিনীর, এক-একটি প্রীতি ভক্তি ও রোমান্সের নায়ক-নায়িকা। গঙ্গা নর্মদা যমুনা ও কৃষ্ণবেণা--কতগুলি নদীর নাম মাত্র নয়, ওরাও কাহিনী। ভারতের বট অশোক শাল্মলী করবী ও কর্ণিকার উদ্ভিদ্ মাত্র নয়, তারাও সবাই এক-একটি কাহিনীর নায়ক এবং নায়িকা। নৈসর্গিক রহস্য ঐ মেরু-জ্যোতির অভ্যন্তরে কাহিনী আছে, সামুদ্র বড়বানলের অন্তরালে কাহিনী আছে, সপ্তাশ্বযোজিত রথে আসীন সূর্যের উদয়াচল থেকে শুরু ক'রে অস্তাচল পর্যন্ত অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী আছে। মহাভারতীয় কাহিনীর নায়ক-নায়িকার নাম হলো ভারতের শত শত গিরি পর্বত নদ নদী ও হ্রদের নাম। ভারতীয় শিশুর নাম-পরিচয়ও মহাভারতীয় চরিত্রগুলির নামে নিষ্পন্ন হয়।

মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানগুলির বৈচিত্র্য আরও বিস্ময়কর। উপাখ্যান-গুলি যেন প্রণয়তত্ত্বেরই মনোবিশ্লেষণ। সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা ইত্যাদি লোকসমাজের অতিপরিচিত উপাখ্যানগুলি ছাড়াও এমন আরও বহু উপাখ্যান মহাভারতে আছে, যেগুলি লোকসমাজে তেমন কোন প্রচার লাভ করেনি। এইসব অল্প-প্রচারিত উপাখ্যানও প্রেমের রহস্য বৈচিত্র্য ও মহত্ত্বের এক একটি বিশেষ রূপের পরিচয়। ভারত প্রেমকথার বিশটি গল্প এই রকমই বিশটি মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের পুনর্গঠিত অথবা নবনির্মিত রূপ। উপাখ্যানের মূল বক্তব্য অক্ষুণ্ণ রেখে এবং মূল বক্তব্যকে স্পষ্টতর অভিব্যক্তি দান করার জন্যই মাঝে মাঝে নতুন ঘটনা কল্পিত হয়েছে।

# সূচীপত্র

ভা র ত
প্রে ম ক থা

# পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা

সেই নিদাঘের মধ্যদিনের আকাশ সেদিন তপ্ত তাম্রের মত রক্তাভ হয়ে উঠেছিল, বলাকামালার চিহ্ন কোথাও ছিল না। জ্বালাবিগলিত স্ফটিকের মত স্বচ্ছ সেই সরোবরসলিলে মীনপংক্তির চাঞ্চল্যও ছিল না। খর সৌরকরে তাপিত এক শৈবালবর্ণ শিলানিকেতন বহিস্পৃষ্ট মরকতস্তূপের মত সরোবরের প্রান্তে যেন শীতলস্পর্শসুখের তৃষ্ণা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মণ্ডুকরাজ আয়ুর প্রাসাদ।

সরোবরের আর এক প্রান্তে ছায়ানিবিড় লতাবাটিকার নিভৃতে কোমল পুষ্পদলপুঞ্জের আসনে সুস্নাত দেহের স্নিগ্ধ আলস্য সঁপে দিয়ে বসেছিল মণ্ডুকরাজ আয়ুর কন্যা সুশোভনা। সম্মুখেই নীলবর্ণ ও নিবিড় এক কানন, উত্তপ্ত আকাশের দুঃসহ আশ্রয় থেকে পালিয়ে নীলাঞ্জনের রাশি যেন ভূতলে এসে ঠাঁই নিয়েছে।

মণ্ডুকরাজ আয়ু বিষণ্ণ, তাঁর মনে শান্তি নেই। এই দুঃখ ভুলতে পারেন না মণ্ডুকরাজ, কন্যা তাঁর নারীধর্মদ্রোহিণী হয়েছে। সুশোভনাকে যোগ্যজনের পরিণয়োৎসুক জীবনে সমর্পণের আশায় কতবার স্বয়ংবরসভা আহ্বানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মণ্ডুকরাজ। কিন্তু বাধা দিয়েছে, আপত্তি করেছে এবং অবশেষে অবমর্দিতা ভুজঙ্গীর মত রুষ্ট হয়েছে সুশোভনা।—তোমার স্নেহপিঞ্জরের শারিকার জন্য নূতন বীতংস রচনা করো না পিতা, সহ্য করতে পারব না।

স্বয়ংবরসভা আহ্বানের আর কোন চেষ্টা করেন না নৃপতি আয়ু। ভয় পেয়ে চুপ ক'রে থাকেন।

ভয়, অপযশের ভয়। লোকাপবাদের আশঙ্কায় ম্রিয়মান হয়ে আছেন মণ্ডুকরাজ আয়ু। কিন্তু কৌতুকিনী কন্যার গোপন মূঢ়তার কাহিনী লোকসমাজে নিশ্চয়ই চিরকাল অবিদিত থাকবে না, এই দুশ্চিন্তার মধ্যেও বিস্মিত না হয়ে পারেন না নৃপতি আয়ু, আজও কেন এই অগৌরবের কাহিনী জনসমাজে অবিদিত হয়ে আছে এবং তিনি কেমন ক'রে লোকধিক্কারের আঘাত হতে এখনও রক্ষা পেয়ে চলেছেন?

সে রহস্য জানে শুধু কিংকরী সুবিনীতা। কৌতুকিনী রাজতনয়ার ছললীলার সকল রীতি-নীতি ও বৃত্তান্তের কোন কথা তার অজানা নেই।

অপযশ হতে আত্মরক্ষা করার এক ছলনাগূঢ় কৌশল আবিষ্কার করেছে সুশোভনা। প্রণয়াভিলাষী কোন পুরুষের কাছে নিজের পরিচয় দান করে না

সুশোভনা। কেউ জানে না, কে সেই বরবর্ণিনী নারী, কোথা হতে এল আর চিরকালের জন্য চলে গেল? সে কি সত্যই এই মর্ত্যলোকের কোন পিতার কন্যা? সে কি সত্যই মানবসংসারে লালিতা কোন নারী? সে কি কোন বন-স্থলীর সকল পুষ্পের আত্মমথিত সুরভি হতে উদ্ভূতা? অথবা কোন দিগঙ্গনার লীলাসঙ্গিনী, মুক্তা কুড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য ধূলিময় মর্ত্যে নেমে আসে দুদিনের জন্য? কিংবা এই ফুল্লারবিন্দের স্বপ্ন, অথবা ঐ নক্ষত্রনিকরের তৃষ্ণা?

আকাশচ্যুত চন্দ্রলেখার মত কে সেই ভাস্বরদেহিনী অপরিচিতা, প্রমত্ত অনুরাগের জ্যোৎস্নায় প্রণয়িজনের হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত ক'রে আবার কোন্ এক মেঘতিমিরের অন্তরালে সরে যায়? শালীননয়না সেই পরিচয়হীনা প্রেমিকার বিরহ সহ্য করতে না পেরে এক নৃপতি উন্মাদ হয়েছেন, একজন তাঁর রাজ্যভার অমাত্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে বনবাসী হয়েছেন। আনন্দহীন হয়েছে সবারই জীবন। প্রিয়াবিরহক্লিষ্ট সেই সব নরপতিদের সকল দুঃখের বৃত্তান্ত জানে সুশোভনা, আর জানে সুবিনীতা। কিন্তু তার জন্য রাজতনয়া সুশোভনার মনে কোন আক্ষেপ নেই, আর কিংকরী সুবিনীতা সকল সময় মনে মনে আক্ষেপ করে।

—কেন এই মায়াবিনী বৃত্তি আর এই অপসরী প্রবৃত্তি? ক্ষান্ত হও রাজকুমারী! কিংকরী সুবিনীতার এই আকুল আবেদনেও কোন ফল হয়নি। সুবিনীতা আরও বিষণ্ণ হয়েছে, মণ্ডুকরাজ আয়ু আরও ম্রিয়মান হয়েছেন এবং গৌরবর্ণ শিলাপ্রাসাদের চূড়ায় হৈমপ্রদীপ নীহারবাষ্পের আড়ালে মুখ লুকিয়ে আরও নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সুশোভনার কক্ষে আরও প্রখর হয়ে দীপ জ্বলেছে। অভিসারশেষে ঘরে ফিরে এসে যেন বিজয়োৎসবে প্রমত্তা হয়ে ওঠে সুশোভনা। মাধ্বীকী আসবের বিহ্বলতায়, সুতন্ত্রিবীণার স্বরঝংকারে, আর কেলিমঞ্জুল স্বর্ণমঞ্জীরের ধ্বনিতে সুশোভনার উৎসব আত্মহারা হয়। নৃত্যপরা সেই নিষ্ঠুরা নায়িকার জীবনের রূপ দেখে আতঙ্কে শিহরিত হয় সহচরী, তার করধৃত বীজনপত্র দুঃখে ও ত্রাসে শিহরিত হতে থাকে।

মুগ্ধ প্রেমিকের আলিঙ্গনের বন্ধন থেকে কি ক'রে এত সহজে মুক্ত হয়ে সরে আসতে পারে সুশোভনা? কোন্ মায়াবলে? কেউ কি বাধা দেয় না, বাধা দেবার কি শক্তি নেই কারও?

মায়াবলে নয়, ছলনার বলে। এবং সে-ছলনা বড় সুন্দর। বিভ্রমনিপুণা সুশোভনা পুরুষচিত্তবিজয়ের অভিযানের শেষে অদৃশ্য হয়ে যাবার এক কৌশলও আবিষ্কার ক'রে নিয়েছে।

প্রতি প্রণয়ীকে সঙ্গদানের পূর্বমুহূর্তে একটি প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা করে সুশোভনা। কপট ভয় আর অলীক ভাবনা দিয়ে রচিত করুণমধুর একটি

নিয়ম।—তোমার জীবনের চিরসঙ্গিনী হয়ে থাকতে কোন আপত্তি নেই আমার, হে প্রিয়দর্শন নরোত্তম। কিন্তু একটি অঙ্গীকার করুন।

—বল প্রিয়ভাষিণী।

—আমাকে কোন মেঘাচ্ছন্ন দিনে কখনও তমালতরু দেখাবেন না।

—তমালতরুতে তোমার এত ভয় কেন শুচিস্মিতা?

—ভয় নয়, অভিশাপ আছে প্রিয়।

—অভিশাপ?

—হ্যাঁ, মেঘমেদুর দিবসের যে মুহূর্তে তমালতরু আমার দৃষ্টিপথে পড়বে, সেই মুহূর্তে আমাকে আর খুঁজে পাবেন না। জানবেন, আপনার প্রণয়কৃতার্থা এই অপরিচিতার মৃত্যু হবে সেদিন।

প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন প্রণয়ী—মেঘমেদুর দিবসের সকল প্রহর এই বক্ষঃপটের অনুরাগশয্যায় সুখসুপ্তা হয়ে তুমি থাকবে বাঞ্ছিতা। তমালতরু দেখবার দুর্ভাগ্য তোমার হবে না।

আর দ্বিধা করে না সুশোভনা। প্রণয়ীর আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করে এবং পরমুহূর্ত হতে অন্তরের গোপনে শুধু একটি ঘটনার জন্য কৌতুকিনীর প্রাণ যেন অপেক্ষা করতে থাকে। এক প্রহর বা দুই প্রহর, একদিন বা দুই দিন, অথবা সপ্ত দিবানিশা, কিংবা মাসান্ত—আসঙ্গমুগ্ধ এই পুরুষচক্ষুর দৃষ্টি হতে খরকামনার বহ্নিচ্ছায়া সরে গিয়ে কবে অন্তরের ছায়া নিবিড় হয়ে ফুটে উঠবে?

এই প্রতীক্ষা সেদিন সমাপ্ত হয়, যেদিন সুশোভনার করপল্লব সাগ্রহ সমাদরে বুকের উপর তুলে নিয়ে প্রাতঃসূর্যের কিরণকিশলয়ে অরুণিত উদয়শৈলের দিকে তাকিয়ে প্রণয়ী বলে—এত আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে বড় ভয় করে প্রিয়া।

কিসের ভয়?

—যদি তোমাকে কখনও হারাতে হয়, সে দুর্ভাগ্য জীবনে সহ্য করতে পারব না বোধ হয়।

সুশোভনার করপল্লব শিহরিত হয়, আনন্দের শিহরণ। প্রণয়ীর ভাষায় অন্তরের বেদনা ধ্বনিত হয়েছে। এতদিনে ও এইবার আন্তরিক হয়ে উঠেছে এই মূঢ় পুরুষের প্রেম। অন্তরজয়ের অভিযান সফল হয়েছে সুশোভনার।

তারপর আর বেশি দিন নয়। নবাম্বুদের আড়ম্বরে আকাশ মেদুর হয়ে ওঠে যেদিন, সেদিন কৌতুকিনী সুশোভনা বর্ণায়িত দুকূলে কুসুমে আভরণে ও অঙ্গরাগে সজ্জিত হয়ে, উল্লাসলীল আবেগে প্রণয়ীর হাত ধ'রে বলে—উপবন-ভ্রমণে আমায় নিয়ে চল গুণাভিরাম। আজ মন চায়, দুই চরণের মঞ্জীর নৃত্যভঙ্গে শিঞ্জিত ক'রে তোমার শ্রবণপদবীর সকল আকুলতাকে রম্যানিনাদে নন্দিত করি।

উপবনে প্রবেশ করতেই শোনা যায়, তমালতরুর পত্রান্তরাল হতে কেকারব

ধ্বনিত হয়ে দিক চমকিত ক'রে তুলছে। প্রণয়ীর হাত ধ'রে সুশোভনা যেন সত্যই কেকোৎকণ্ঠা বর্ষাময়ূরীর মত আনন্দে চঞ্চল হয়ে তমালতরুর কাছে এসে দাঁড়ায়।

হঠাৎ প্রশ্ন করে সুশোভনা—শিখিবাঞ্ছিত এই পত্রালীসুন্দর তরুর নাম কি প্রিয়তম?

—তমাল।

—ভাল লক্ষণ দেখালেন নৃপতি!

দুই অধরের স্ফুরিত হাস্য লুকিয়ে কেলিকপটিনী সুশোভনা বেদনার্তভাবে প্রণয়ীর দিকে তাকায়।—অভিশাপ লাগল আমার জীবনে, এইবার আমাকে হারাবার জন্য প্রস্তুত থাকুন নৃপতি।

আর্তনাদ ক'রে ওঠেন প্রণয়ী। সুশোভনার অলক্তরঞ্জিত চরণদ্বয় দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরবার জন্য লুটিয়ে পড়েন। সরে যায় সুশোভনা।—আজ আমাকে একটু নির্জনে থাকতে দিন নৃপতি।

সন্ধ্যা হয়, তমালতলে অন্ধকার নিবিড়তর হয়ে ওঠে। একাকিনী বসে থাকে সুশোভনা। তার পর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রণয়ী জানেন, খুঁজে আর পাওয়া যাবে না। নীলবর্ণ বনস্থলীর সকল পুষ্পের আত্মামথিত সুরভি হতে উদ্ভূতা সেই পরিচয়হীনা বিস্ময়ের নারী এই মেঘাবৃত সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। মৃত্যু হয়েছে সেই সুন্দরাধরা আকস্মিকার, অনামিকা প্রেমিকার।

নীলবর্ণ কাননের দিকে তৃষ্ণার্তের মত তাকিয়ে বসে থাকে রাজনন্দিনী সুশোভনা। সম্মুখে বসে থাকে ব্যজনিকা সহচরী সুবিনীতা।

নবীন কিশলয়ের বৃন্ত কুঙ্কুমরসে অনুলিপ্ত ক'রে সুশোভনার বক্ষঃপটে পত্রলিখা এঁকে দেয় সহচরী। বীজনপত্র আন্দোলিত ক'রে সুশোভনার স্বেদাঙ্কুরব্যথিত কপোলে সমীর সঞ্চার করতে থাকে। নিপুণা কলাবতীর মত ধীরসঞ্চালিত করাঙ্গুলি দিয়ে রাজনন্দিনী সুশোভনার কপাললগ্ন চিকুরনিকুরম্বে বিলোল ভ্রমরক রচনা করে সহচরী। স্তবকিত মেঘভারের মত কবরীবদ্ধ কেশদামের উপর একখণ্ড সুপ্রভ চন্দ্রোপল গ্রথিত ক'রে দেয়। তারপর এক হাতে সুশোভনার চিবুক স্পর্শ ক'রে দুই চক্ষুর সাগ্রহ দৃষ্টি তুলে দেখতে থাকে সহচরী, রাজকুমারীর মুখশোভা সম্পাদনে প্রসাধনের আর কিছু বাকি থেকে গেল কিনা।

সহর্ষে দুই ভ্রূধনু ভঙ্গুরিত ক'রে রাজকুমারী সুশোভনা সহচরীর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—কি দেখছ সুবিনীতা?

—তোমার রূপ দেখছি রাজনন্দিনী।

—কেমন লাগছে দেখতে?

—সুন্দর।

—কি রকম সুন্দর?

—রত্নখচিত অসিফলকের মত উজ্জ্বল, কনকধুতুরার আসবের মত বর্ণ-মদির, পুষ্পাচ্ছাদিত কণ্টকতরুর মত কোমল। বস্তুহীনা প্রতিধ্বনির মত তুমি সুন্দরস্বরা। তুমি শ্রাবণী দামিনীর মত ক্ষণলাস্যনটী বহ্নি।

সুশোভনা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—তুমি ভাষাবিদগ্ধা চারণীর মত কথা বলছ সুবিনীতা, কিন্তু তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।

সহচরী সুবিনীতার কণ্ঠস্বরে যেন এক অভিযোগ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—রূপাতিশালিনী রাজতনয়া, তোমার রূপ বড় নিষ্ঠুর। এই রূপ মুগ্ধপুরুষের হৃদয় বিদ্ধ করে, বিবশ করে, আর বিক্ষত করে। তোমার কণ্ঠস্বরের আহ্বান প্রতিধ্বনির ছলনার মত শ্রবয়িতার হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। তুমি চকিতস্ফুরিত তড়িল্লেখার মত পথিকজননয়ন শুধু অন্ধ ক'রে দিয়ে সরে যাও। রূপের কৈতবিনী তুমি। সবই আছে তোমার শুধু হৃদয় নেই।

সহচরীর অভিযোগবাণী শ্রবণ ক'রে ক্ষুব্ধ হওয়া দূরে থাক, উল্লাসে হেসে ওঠে সুশোভনা—তুমি ঠিকই বলেছ সুবিনীতা। শুনে সুখী হলাম।

—কিংকরীর বাচালতা ক্ষমা কর রাজকুমারী, একটি সত্য কথা বলব?

—বল।

—আমি দুঃখিত।

—কেন?

—তোমার এই রূপরম্যা মূর্তিকে রত্নাভরণে সাজাতে আর আমার আনন্দ হয় না। মনে হয়, বৃথাই এতদিন ধ'রে তোমাকে এত যত্নে সাজিয়েছি।

—বৃথা?

—হ্যাঁ, বৃথা। একের পর এক, তোমার এক একটি প্রেমহীন অভিসারের লগ্নে তোমার পদতল বৃথাই লাক্ষাপঙ্কে রঞ্জিত করেছি। বৃথাই এত সমাদরে পরাগলিপ্ত করেছি তোমার বরতনু। বৃথাই সুচারু কজ্জলমসিরেখায় প্রসাধিত ক'রে তোমার এই নয়নদ্বয়ে মৃগলোচনদর্পহারিণী নিবিড়তা এনে দিয়েছি।

—তোমার কর্তব্য করেছ কিংকরী, কিন্তু বৃথা বলছ কোন্ দুঃসাহসে?

—দুঃসাহসে নয়, অনেক দুঃখে বলছি রাজনন্দিনী। তুমি আজও কারও প্রেমবশ হলে না, কোন প্রণয়িহৃদয়ের সম্মান রাখলে না। আমার দু'হাতের যত্নে সাজিয়ে-দেওয়া তোমার প্রেমিকামূর্তি শুধু প্রণয়ীর হৃদয় বিদ্ধ বিক্ষত ও ছিন্ন ক'রে ফিরে আসে। আমার বড় ভয় করে রাজনন্দিনী।

অবিচলিত স্বরে সুশোভনা প্রশ্ন করে—ভয় আবার কিসের কিংকরী?

—এক একটি ছলপ্রণয়ের লীলা সমাপ্ত ক'রে যখন তুমি ভবনে ফিরে আস কুমারী, তখন আমি তোমার ঐ পদতলের দিকে তাকিয়ে দেখি। মনে হয়, তোমার চরণাসক্ত অলক্ত যেন কোন্ এক হতভাগ্য প্রেমিকের আহত হৃৎপিণ্ডের রক্তে আরও শোণিম হয়ে ফিরে এসেছে।

প্রগল্‌ভ হাসির উচ্ছ্বাস তুলে, যৌবনমদয়িত তনু হিল্লোলিত ক'রে সুশোভনা বলে—তোমার মনে ভয় হয় মূঢ়া কিংকরী, আর আমার মনে হয়, নারীজীবন আমার ধন্য হলো। এক একজন মহাবল যশস্বী ও অতুল বৈভব-গর্বে উদ্ধত নরপতি এই পদতললীন অলক্তে কমলগন্ধবিধুর ভৃঙ্গের মত চুম্বন দানের জন্য লুটিয়ে পড়ে, পরমুহূর্তে সে উদ্‌ভ্রান্তের জন্য শুধু শূন্যতার কুহক পিছনে রেখে দিয়ে চিরকালের মত সরে আসি। বল দেখি সহচরী, নারীজীবনে এর চেয়ে বেশি সার্থক আনন্দ ও গর্ব কি আর কিছু আছে?

—ভুল বুঝেছ রাজতনয়া, এমন জীবন কোন নারীর কাম্য হতে পারে না।

—নারীজীবনের কাম্য কি?

—বধূ হওয়া।

আবার অট্টহাসির শব্দে মুখরা ব্যজনিকা কিংকরীর উপদেশ যেন বিদ্রূপে ছিন্ন ক'রে সুশোভনা বলে—বধূ হওয়ার অর্থ পুরুষের কিংকরী হওয়া, কিংকরী হয়েও কেন সেই ক্ষুদ্র জীবনের দুঃখ কল্পনা করতে পার না সুবিনীতা? আমাকে মরণের পথে যাবার উপদেশ দিও না কিংকরী।

—আমার অনুরোধ শোন কুমারী, পুরুষহৃদয় সংহারের এই নিষ্ঠুর ছল-প্রণয়বিলাস বর্জন কর। প্রেমিকের প্রিয়া হও, বধূ হও, গেহিণী হও।

বিদ্রূপকুটিল দৃষ্টি তুলে সুশোভনা আবার প্রশ্ন করে—কি ক'রে প্রিয়া-বধূ-গেহিণী হতে হয় কিংকরী? তার কি কোন নিয়ম আছে?

—আছে।

—কি?

—প্রেমিককে হৃদয় দান কর, প্রেমিকের কাছে সত্য হও।

হেসে ফেলে সুশোভনা—আমার জীবনে হৃদয় নামে কোন বোঝা নেই সুবিনীতা। যা নেই, তা কেমন ক'রে দান করব বল?

ব্যজনিকা কিংকরীর চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়। ব্যথিত স্বরে বলে—আর কিছু বলতে চাই না রাজনন্দিনী। শুধু প্রার্থনা করি, তোমার জীবনে হৃদয়ের আবির্ভাব হোক।

বিরক্ত দৃষ্টি তুলে সুশোভনা জিজ্ঞাসা করে—তাতে তোমার কি লাভ?

—কিংকরীর জীবনেরও একটি সাধ তাহ'লে পূর্ণ হবে।

—কিসের সাধ?

—তোমাকে বধূবেশে সাজাবার সাধ। ঐ সুন্দর হাতে বরমাল্য ধরিয়ে দিয়ে তোমাকে দয়িতভবনে পাঠাবার শুভলগ্নে এই মূর্খা ব্যজনিকার আনন্দ শঙ্খধ্বনি হয়ে একদিন বেজে উঠবে। এই আশা আছে বলেই আমি আজও এখানে রয়েছি রাজকুমারী, নইলে তোমার ভর্ৎসনা শুনবার আগেই চলে যেতাম।

সুশোভনা রুষ্ট হয়—তোমার এই অভিশপ্ত আশা অবশ্যই ব্যর্থ হবে কিংকরী, তাই তোমাকে শাস্তি দিলাম না। নইলে তোমার ঐ ভয়ংকর প্রার্থনার অপরাধে তোমাকে আজই চিরকালের মত বিদায় ক'রে দিতাম।

সুশোভনা গম্ভীর হয়। সহচরী সুবিনীতাও নিরুত্তর হয়। স্তব্ধ নিদাঘের মধ্যাহ্নে লতাবাটিকার ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে অঙ্গরাগসেবিত তনুশোভা নিয়ে বসে থাকে মণ্ডুকরাজপুত্রী সুশোভনা। সম্মুখের নীলবর্ণ কাননের উপান্তপথের দিকে অদ্ভুত তৃষ্ণাতুর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে। আর, ব্যজনিকা সুবিনীতা নিঃশব্দে বীজনপত্র আন্দোলিত ক'রে কিংকরীর কর্তব্য পালন করতে থাকে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে সুশোভনা। কাননপথের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি সুশোভনার দুই চক্ষু মৃগয়াজীবা ব্যাধিনীর চক্ষুর মত দেখায়। কি যেন দেখতে পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে সুশোভনার নিবিড় কৃষ্ণপক্ষ্মসেবিত দুই লোচনের তারকা। সহচরী সুবিনীতাও কৌতূহলী হয়ে কাননভূমির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিতভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়। শিহরিত হস্তের বীজনপত্র আতঙ্কে কেঁপে ওঠে।

অশ্বারূঢ় এক কান্তিমান যুবাপুরুষ কাননপথে চলেছেন। বোধ হয় পথভ্রান্ত হয়েছেন, কিংবা পিপাসার্ত হয়েছেন। তাই শীতল সরসীসলিলের সন্ধানে কাননের অভ্যন্তরের দিকে ধীরে ধীরে চলেছেন। তাঁর রত্নসমন্বিত কিরীট সূর্যকরনিকরের স্পর্শে দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। কে এই বলদৃপ্ততনু যুবা-পুরুষ? মনে হয়, কোন রাজ্যাধিপতি নরশ্রেষ্ঠ।

উঠে দাঁড়ায় সুশোভনা। ঐ কিরীটের বিচ্ছুরিত দ্যুতি যেন সুশোভনার নয়নে খর বিদ্যুতের প্রমত্ত লাস্য জাগিয়ে তুলেছে। কিংকরী সুবিনীতা সভয়ে জিজ্ঞাসা করে—ঐ আগন্তুকের পরিচয় তুমি জান কি রাজকুমারী?

—জানি না, অনুমান করতে পারি।

—কে?

—বোধ হয় ইক্ষ্বাকুগৌরব সেই মহাবল পরীক্ষিৎ। শুনেছি, আজ তিনি মৃগয়ায় বের হয়েছেন।

সুবিনীতা বিস্মিত হয়ে এবং শ্রদ্ধাপ্লুত স্বরে প্রশ্ন করে—ইক্ষ্বাকুগৌরব

পরীক্ষিৎ? অযোধ্যাপতি, পরম প্রজাবৎসল, মহাবদান্য, ভীতজনরক্ষক, আর্তজন-শরণ সেই ইক্ষ্বাকু?

সুশোভনা হাসে—হ্যাঁ কিংকরী, সুরেন্দ্রসম পরাক্রান্ত ইক্ষ্বাকুকুলতিলক পরীক্ষিৎ। ঐ দেখ, ধনুর্বাণ ও তূণীরে সজ্জিত, কটিদেশে বিলম্বিত দীর্ঘ অসি, দৃপ্ত তুরঙ্গের পৃষ্ঠাসীন বীরোত্তম পরীক্ষিৎ। কিন্তু... কিন্তু তোমাকে আর আশ্চর্য ক'রে দিতে চাই না সুবিনীতা। তুমি মূর্খা, তুমি কিংকরী মাত্র, কল্পনাও করতে পারবে না তুমি, ঐ ধনুর্বাণতূণীরে সজ্জিত পরাক্রান্তের পুরুষ-হৃদয় একটি কটাক্ষে চূর্ণ করতে কি আনন্দ আছে!

কিংকরী সুবিনীতা সন্ত্রস্ত হয়ে সুশোভনার হাত ধরে।—নিবৃত্ত হও রাজতনয়া। অনেক করেছ, তোমার মিথ্যাপ্রণয়কৈতবে বহু ভগ্নহৃদয় নৃপতির জীবনের সব সুখ মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু... প্রজাপ্রিয় ইক্ষ্বাকুর সর্বনাশ আর করো না।

মদহাস্যে আকুল হয়ে কিংকরীর হাত সরিয়ে দেয় সুশোভনা। মণিময় সপ্তকী কাঞ্চী ও মুক্তাবলী তুলে নিয়ে নিজের হাতেই নিজেকে সজ্জিত করে। তারপর হাতে তুলে নেয় একটি সপ্তস্বরা বীণা। প্রস্তুত হয়ে নিয়ে সুশোভনা বলে—আমি যাই সুবিনীতা। বৃথা মূর্খের মত বিষণ্ণ হয়ো না। কিংকরীর কর্তব্য সদাহাস্যমুখে পালন কর, তাহ'লেই সুখী হবে।

লতাবাটিকার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে সুশোভনা একবার থামে। কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে। তার পরেই সুবিনীতাকে আদেশ করে। —প্রতি সন্ধ্যায় ইক্ষ্বাকুর প্রাসাদলগ্ন উপবনের প্রান্তে চর ও শিবিকা অতি সঙ্গোপনে প্রেরণ করতে ভুলবে না কিংকরী।

লতাবাটিকার নিভৃত থেকে বের হয়ে পান্থবিটপীর ছায়ায় ছায়ায় কানন-ভূমির দিকে অগ্রসর হতে থাকে সুশোভনা। মাথা হেঁট ক'রে অশ্রুসিক্ত নেত্রে অনেকক্ষণ লতাবাটিকার নিভৃতে চুপ ক'রে বসে থাকে সুবিনীতা। আর একবার কাননপথের দিকে তাকায়, সুশোভনাকে আর দেখা যায় না। লতাবাটিকার নিভৃত হতে মণ্ডুকরাজের শৈবালবর্ণ প্রাসাদের কক্ষে একাকিনী ফিরে আসে সুবিনীতা।

সুন্দর কানন। বহুলবল্কল প্রিয়াল আর শিবদ্রুম বিল্বের ছায়ায় সমাকীর্ণ। লতাপরিবৃত শত শত নক্তমাল কোবিদার ও শোভাঞ্জন। চণ্ড নিদাঘের ভ্রূকুটি তুচ্ছ ক'রে এই নিবিড় বনভূভাগের প্রতি তৃণলতা ও পুষ্পের প্রাণ যেন বিহগ-স্বরলহরী হতে উৎসারিত নাদপীযূষ পান ক'রে সরসিত হয়ে রয়েছে। কমলকিঞ্জল্কে সমাচ্ছন্ন এক সরোবরের জল পান ক'রে পিপাসার্তি শান্ত

করলেন পরীক্ষিৎ। মৃণাল তুলে নিয়ে এসে ক্লান্ত অশ্বকে খেতে দিলেন। তারপর শ্রমক্লম অপনোদনের জন্য নবলবকুলপল্লবের ছায়াতলে তৃণাস্তীর্ণ ভূমির উপর শয়ন করলেন।

পরীক্ষিতের সুখতন্দ্রা অচিরে ভেঙে যায়। উৎকর্ণ হয়ে উঠে বসেন পরীক্ষিৎ। বীণার তন্ত্রিঝংকার, তার সঙ্গে রমণীকণ্ঠনিঃসৃত শ্রুতিরমণীয় সুস্বর, মন্থর বনবায়ু যেন সেই স্বরমাধুরীতে আপ্লুত হয়ে গিয়েছে।

উঠলেন রাজা পরীক্ষিৎ। বনস্থলীর প্রতি তরুতলে লক্ষ্য রেখে সন্ধান ক'রে ফিরতে থাকেন। অবশেষে দেখতে পান, সেই সরোবরের তটে শৈবালাসনে উপবিষ্টা চন্দ্রোপলপ্রভাসমন্বিতা এক নারী সলিলহিল্লোলিত রক্তকোকনদের মৃণালকে তার অলক্তলিপ্ত পদের মৃদুল আঘাতে আন্দোলিত ক'রে যেন উচ্ছল যৌবনের অভিমান লীলায়িত করছে। করধৃত বীণার তন্ত্রীকে চম্পককলিকাসদৃশ করাঙ্গুলির স্পর্শে সুস্বরিত ক'রে গান গাইছে নারী।

মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন রাজা পরীক্ষিৎ। ও কি কোন মানবনন্দিনীর মূর্তি? অথবা প্রমূর্তা বনশ্রী? কিংবা এই সরোবরের সলিলোত্থিতা দ্বিতীয়া এক সুধাধরা দেবিকা?

এগিয়ে যান রাজা পরীক্ষিৎ। অপরিচিতার সম্মুখবর্তী হন। গীত বন্ধ ক'রে অপরিচিতা নারী আগন্তুক পরীক্ষিতের দিকে অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করে। এতক্ষণে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পান পরীক্ষিৎ, নারীর কবরীগ্রথিত চন্দ্রোপলের রশ্মির চেয়েও বেশি সান্দ্র ও স্নিগ্ধ নারীর দুই এণলোচনের রশ্মি।

কথা বলেন পরীক্ষিৎ—পরিচয় দাও এণাক্ষী।

—আমার পরিচয় জানি না।

—তোমার পিতা? মাতা? দেশ?

—কিছুই জানি না।

—বিশ্বাস করতে পারছি না বিম্বোষ্ঠী। সপ্তকীমেখলা ঐ কৃশকটিতট, মুক্তাবলীশোভিত ঐ সুধাধবল কণ্ঠদেশ, কুঙ্কুমাঙ্কিত ঐ কোমল বক্ষঃপট; তোমার কবরীর ঐ চন্দ্রোপল আর এই সপ্তস্বরা বিপঞ্চী, এ কি পরিচয়হীনতার পরিচয়?

—আমার পরিচয় আমি। এছাড়া আর কোন পরিচয় জানি না।

নীরবে, অপলক নেত্রে শুধু তাকিয়ে থাকেন পরীক্ষিৎ।

নারী প্রশ্ন করে—কি দেখছেন গুণবান?

—দেখছি, তুমি বিস্ময় অথবা বিভ্রম।

—আপনি কে?

—আমি ইক্ষ্বাকু পরীক্ষিৎ।

—এইবার যেতে পারেন নৃপতি পরীক্ষিৎ। বনলালিতা এই পরিচয়হীনার কাছে আপনার কোন প্রয়োজন নেই।

—কর্তব্য আছে।

—কি কর্তব্য?

—নৃপতির সুখসুন্দর মণিময় ভবনে তোমাকে নিয়ে যেতে চাই, এই বনবাসিনীর জীবন তোমাকে শোভা দান করে না সুনয়না।

—বুঝলাম, রাজার কর্তব্য পালন করতে চাইছেন মহাবদান্য প্রজাবৎসল পরীক্ষিৎ। কিন্তু রাজকীয় উপকারে আমার কোন সাধ নেই নৃপতি।

ক্ষণিকের জন্য নিরুত্তর হয়ে থাকেন পরীক্ষিৎ। দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিবিড় হয়ে উঠতে থাকে। তারপরেই প্রেমবিধুর কণ্ঠস্বরে আহ্বান করেন—মণিময় ভবনে নয়, আমার মনোভব ভবনে এস সুতনুকা। প্রণয়দানে ধন্য কর আমার জীবন।

সপ্তস্বরা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় নারী।—একটি প্রতিশ্রুতি চাই নৃপতি পরীক্ষিৎ।

—বল।

—আপনি জীবনে কখনও আমাকে সরোবরসলিল দেখাবেন না।

—কেন?

—অভিশাপ আছে আমার জীবনে, যদি আর কোন দিন কোন সরোবরসলিলে প্রতিবিম্বিত আমার এই মূর্তিকে আমি দেখতে পাই, তবে আমার মৃত্যু হবে সেই দিন।

—অভিশাপের শঙ্কা দূর কর সুযৌবনা। তুমি আমার প্রমোদভবনের ক্লান্তিহীন উৎসবে চিরক্ষণের নায়িকা হয়ে থাকবে। কোন সরোবরের সান্নিধ্যে যাবার প্রয়োজন হবে না কোন দিন।

মণিদীপিত প্রমোদভবনের নিভৃতে পরীক্ষিতের প্রণয়াকুল জীবনের প্রতি দিন-যামিনীর মুহূর্তগুলি সুশোভনার নৃত্যে গীতে লাস্যে ও চুম্বনরভসে বিহ্বল হয়ে থাকে। এইভাবেই একদিন, সেদিন বৈশাখী সন্ধ্যার প্রথম প্রহরে পূর্ণেন্দুশোভিত আকাশ হতে কুন্দধবল কৌমুদীকণিকা এসে প্রমোদভবনের ভিতরে লুটিয়ে পড়ে। সেদিন মণিদীপ আর জ্বাললেন না রাজা পরীক্ষিৎ। শান্ত জ্যোৎস্নালোকে প্রমোদসঙ্গিনী সেই মেঘচিকুরা নারীর মুখের দিকে মমতামথিত সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন। অনুভব করেন পরীক্ষিৎ, আকাশের ঐ শশাঙ্কচ্ছবির মত এই মুখচ্ছবিও কম সুন্দর নয়। পূর্ণচন্দ্রের মাঝে মৃগ-

রেখার মত এই বরনারীর ললাটেও কৃষ্ণচিকুরের ভ্রমরক সুনিবিড় ছায়ালেখা অঙ্কিত ক'রে রেখেছে।

সযত্নে নারীর ললাটলগ্ন ভ্রমরক নিজ হাতে বিন্যস্ত করতে থাকেন পরীক্ষিৎ। সুশোভনার হাত ধরেন; মৃদুস্বন শঙ্খের অস্ফুট নিঃশ্বাসধ্বনির মত নারীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে আহ্বান করেন পরীক্ষিৎ—প্রিয়া!

প্রমদা নারীর চক্ষু মণিদীপের মত হঠাৎ প্রখর হয়ে ওঠে।—কি বলতে চাইছেন রাজা?

—তুমি আমার মনোভব ভবনের নায়িকা নও প্রিয়া, তুমি আমার জীবন-ভবনের অন্তরতমা। আমার কামনার আকুলতার মধ্যে এতদিনে এক প্রেমসুন্দর প্রদীপ জ্বলে উঠেছে, তাই মণিদীপ নিভিয়ে দিয়েও শুধু হৃদয় দিয়েই দেখতে পাই, তুমি কত সুন্দর।

কৌতুকিনীর অধর সুস্মিত হয়ে ওঠে। এতদিনে আন্তরিক হয়েছেন রাজা পরীক্ষিৎ। প্রমদাতনুবিলাসী নৃপতির আকাঙ্ক্ষা আন্তরিক প্রেমে পরিণাম লাভ করেছে। অপরিচিতা নারীকে হৃদয় দিয়ে চিরজীবনের আপন ক'রে নিতে চাইছেন পরীক্ষিৎ।

পরীক্ষিতের হাত ধ'রে প্রমদা নারী হঠাৎ আবেগাকুল হয়ে ওঠে—চন্দ্রিকা-বিহ্বল এমন বৈশাখী সন্ধ্যায় আজ আর ঘরে থাকতে মন চাইছে না প্রিয়। তোমার উপবনে চল।

নবকাশসন্নিভ সুশ্বেত ক্ষৌম পট্টবাসে সুতনু সজ্জিত ক'রে, শ্বেত স্ফটিকোপলকণিকায় খচিত শ্বেতাংশুকজালে কবরী আচ্ছন্ন ক'রে, শ্বেত পুষ্পের মালিকা কণ্ঠলগ্ন ক'রে, জ্যোৎস্নালিপ্ততনু সুধবলা কলহংসীর মত উৎফুল্লা হয়ে নৃপতি পরীক্ষিতের সঙ্গে উপবনে প্রবেশ করে সুশোভনা। পরীক্ষিতের মুখের দিকে তাকিয়ে আবেদন করে—আজ আমার মন চাইছে, রাজা, কলহংসীর মত জলকেলি ক'রে আপনার দুই চক্ষুর দৃষ্টি নন্দিত করি।

—তাই কর প্রিয়া।

উপবনের এক সরোবরের তটে এসে দাঁড়ালেন রাজা পরীক্ষিৎ, সঙ্গে সুশোভনা।

মৃণালভুক মরাল আর কলহংসের দল অবাধ আনন্দে সরোবরসলিলে সন্তরণ ক'রে ফিরছে। উৎফুল্লা কলহংসীর মত হর্ষভরে জলে নামে সুশোভনা। কয়েকটি মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পরেই হর্ষহীন বেদনাবিষণ্ণ মুখে পরীক্ষিতের দিকে তাকায়।—আমাকে এই সরোবরসলিলের সান্নিধ্যে কেন নিয়ে এলেন রাজা পরীক্ষিৎ?

—তোমারই ইচ্ছায় এসেছি প্রিয়া।

—আপনার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করুন রাজা।

প্রতিশ্রুতি? চমকে ওঠেন, এবং এতক্ষণে স্মরণ করতে পারেন পরীক্ষিৎ, প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে তিনি তাঁর জীবনপ্রিয়াকে সরোবরসলিলের সান্নিধ্যে নিয়ে এসেছেন।

সুশোভনা বলে—আপনি ভুল ক'রে আমাকে আমার জীবনের অভিশাপের সান্নিধ্যে নিয়ে এসেছেন রাজা। সলিলবক্ষে আমার প্রতিচ্ছবি দেখেছি। এখন আমাকে বিদায় দেবার জন্য প্রস্তুত হোন।

পরীক্ষিৎ বলেন—তোমাকে বিদায় দিতে পারব না প্রিয়া, এই জীবন থাকতে না।

ভগ্নহৃদয়ের আর্তনাদ নয়, অসহায়ের বিলাপ নয়, সংকল্পে কঠিন এক বলিষ্ঠের দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

চমকে ওঠে সুশোভনা। জীবনে এই প্রথম শঙ্কাতুর হয়ে ওঠে শঙ্কাহীনা কৌতুকিনীর মন।

সুশোভনা—আবার ভুল করবেন না রাজা। দৈব অভিশাপের কোপ মিথ্যা করবার শক্তি আপনার নেই।

পরীক্ষিৎ—সত্যই অভিশাপ, না অভিশাপের কৌতুক?

পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনে সুশোভনার বুকের ভিতর নিঃশ্বাসবায়ু হঠাৎ ভীরুতায় কেঁপে ওঠে।

পরীক্ষিৎ এগিয়ে যেয়ে সুশোভনার সম্মুখে দাঁড়ালেন।—এস প্রিয়া, বাহু-বন্ধনে তোমাকে বক্ষোলগ্ন ক'রে রাখি সর্বক্ষণ, দেখি কোন্ অভিশাপের প্রেত আমার কাছ থেকে কেমন ক'রে তোমার প্রাণ হরণ ক'রে নিয়ে যেতে পারে।

সভয়ে পিছিয়ে সরে দাঁড়ায় সুশোভনা।—অনুরোধ করি রাজা পরীক্ষিৎ, কাছে আসবেন না। আমাকে এই স্থানে একাকিনী থাকতে দিন।

পরীক্ষিৎ—কতক্ষণ?

সুশোভনা—কিছুক্ষণ।

পরীক্ষিৎ—কেন?

সুশোভনা—বুঝতে চাই, ঐ অভিশাপ সত্যই একটি মিথ্যার কৌতুক। বিশ্বাস করতে চাই, মিথ্যা হয়ে গিয়েছে অভিশাপ। সরোবরতটের নির্জন একান্তে দাঁড়িয়ে আমাকে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করবার সুযোগ দান করুন নৃপতি।

পরীক্ষিৎ—কিসের প্রার্থনা?

সুশোভনার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত এক আকুলতায় কাতর হয়ে ওঠে।—তোমারই প্রেমিকা মৃত্যুশঙ্কা পরিহার করবার জন্য প্রার্থনা করতে চায়, সুযোগ দাও প্রিয় পরীক্ষিৎ।

মিথ্যা ভয়ে বিহ্বলা নারী যেন এক ব্রত পালন ক'রে তার নিথ্যা বিশ্বাসের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে চাইছে। নারীর এই করুণ অনুরোধের অমর্যাদা করলেন না পরীক্ষিৎ। সরোবরতট থেকে সরে এসে উপবনের আম্রবীথিকার ছায়ায় বিচরণ ক'রে ফিরতে থাকেন।

আম্রমঞ্জরী হতে ক্ষরিত মধুবিন্দু ললাটচুম্বন করে যেন সান্ত্বনা দেয়; মত্ত কোকিলের কুহুকুজনে ধরণী সঙ্গীতময় হয়ে ওঠে, তবুও মনের উদ্বেগ ভুলতে পারছিলেন না পরীক্ষিৎ। সত্যই কি এক অভিশাপের কৌতুকে এই বৈশাখী যামিনীর চন্দ্রিকা তাঁর জীবনে প্রিয়াহীন শূন্যতা সৃষ্টির জন্যই দেখা দিয়েছে?

এই উদ্বেগ সহ্য হয় না, পরমুহূর্তে ত্বরিতপদে ফিরে গিয়ে আবার সরোবর-তটে এসে দাঁড়ান পরীক্ষিৎ।—প্রিয়া।

ডাকতে গিয়ে আর্তনাদ ক'রে ওঠেন পরীক্ষিৎ। শূন্য ও নির্জন সেই সরোবরতটে কোন প্রার্থনার মূর্তি নেই; শ্বেতাংশুকজালে কবরীর শোভা পুষ্পিত ক'রে কোন নারীর মূর্তি নেই।

পরীক্ষিতের দুই চক্ষুর দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম সায়কের মত চারিদিকের শূন্যতা ভেদ ক'রে ছুটতে থাকে। সরোবরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সন্দেহ করেন, সরোবরের খলসলিল বুঝি তাঁর প্রিয়াকে গ্রাস করেছে। পরক্ষণে দেখতে পেলেন, সরোবরের অপর প্রান্তে যেন এক মৃতা কলহংসীর জ্যোৎস্নানুলিপ্ত দেহপিণ্ড তটভূমি স্পর্শ ক'রে ভেসে রয়েছে। কতগুলি প্রেতচ্ছায়া এসে মুহূর্তের মধ্যে সেই সুশ্বেতা কলহংসীর মৃতদেহ তুলে নিয়ে চলে গেল।

বিশ্বাস করতে পারেন না। সমস্ত ঘটনা ও দৃশ্যগুলিকে সন্দেহ হয়! বুঝি তাঁর উদ্বিগ্ন চিত্তের একটা বিভ্রম, ব্যথিত দৃষ্টির প্রহেলিকা।

কিন্তু আর এক মুহূর্তও কালক্ষেপ করলেন না পরীক্ষিৎ। উপবনের প্রহরীদের ডাক দিলেন, সরোবরের বাঁধ ভেঙে দিয়ে সরোবর জলশূন্য করলেন। কিন্তু নিমজ্জিত কোন নারীদেহের সন্ধান পেলেন না।

ছুটে গিয়ে রাজভবনের মন্দুরায় প্রবেশ করেন এবং রণাশ্বের মুখে রজ্জু-যোজিত ক'রে প্রস্তুত হন পরীক্ষিৎ। পরমুহূর্তে অশ্বারূঢ় হয়ে সরোবরের প্রান্ত লক্ষ্য ক'রে ছুটে চলে যান।

কিন্তু প্রান্তর আর বনোপান্তের সর্বত্র সন্ধান ক'রেও সেই নারীমূর্তির সাক্ষাৎ কোথাও পেলেন না পরীক্ষিৎ। হতাশ হয়ে তাঁর শূন্য বিষণ্ণ ও দীপহীন মণি-ভবনের দিকে ফিরে যেতে থাকেন। যেমন ক্লান্ত অশ্বের অঙ্গ হতে স্বেদজলের ধারা, তেমনই পরাক্রান্ত পরীক্ষিতেরও দুই চক্ষু হতে অবিরল অশ্রুধারা ঝরে পড়ে।

আবার উপবনের পথে প্রবেশ করেন রাজা পরীক্ষিৎ। হঠাৎ দেখতে পান,

গোপনচর চরের মত এক ছায়ামূর্তি যেন বৃক্ষান্তরালে দাঁড়িয়ে আছে। কটিবন্ধ হতে খড়্গ হাতে তুলে নিয়ে গোপনচর ছায়ামূর্তির দিকে ছুটে যান পরীক্ষিৎ। কিন্তু ধরতে পারলেন না। সেই ছায়ামূর্তিও দৌড় দিয়ে এক সলিল-প্রবাহিকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু চরের মূর্তিটাকে স্পষ্ট দেখে ফেললেন পরীক্ষিৎ। এক মণ্ডুক।

মণ্ডুকরাজের শৈবালবর্ণ শিলানিকেতনের কক্ষে রাজপুত্রীর কিঙ্কিণীক্বণ-লাঞ্ছিত চরণ তেমন ক'রে আর নৃত্যায়িত হয়ে উঠল না। সফল অভিসারের আনন্দও মাধ্বীবারিতে তেমন ক'রে আর মত্ত হতে পারল না। কপটাভিসারিকা সুশোভনা যেন কণ্টকবিদ্ধ চরণ নিয়ে ফিরে এসেছে।

অপরাহ্ণ কাল। মণ্ডুক জনপদের বাতাস হঠাৎ আর্তনাদে আর হাহাকারে পীড়িত হয়ে উঠল। প্রাসাদকক্ষের বাতায়নপথে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত আর্তনাদের রহস্য বুঝতে চেষ্টা করে সুশোভনা, কিন্তু বুঝতে পারে না। মনে হয়, এক ধূলিলিপ্ত ঝঞ্ঝা যেন এই বৈশাখী অপরাহ্ণকে আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছে।

—এ কোন্ নতুন সর্বনাশ করেছ রাজপুত্রী?

বাইরে নয়, কক্ষের ভিতরেই আর্ত কণ্ঠস্বরের ধিক্কার শুনে চমকে ওঠে সুশোভনা। মুখ ফিরিয়ে দেখতে পায়, রূঢ়ভাষিণী কিংকরী সুবিনীতা এসে দাঁড়িয়েছে। ভ্রূভঙ্গী উদ্ধত ক'রে সুশোভনাও রুষ্টস্বরে প্রশ্ন করে।—কি হয়েছে কিংকরী?

—পরাক্রান্ত পরীক্ষিৎ মণ্ডুক-জনপদ আক্রমণ করেছেন। শত শত মণ্ডুকের প্রাণ সংহার ক'রে ফিরছেন। রাজ্যের প্রজা আর্তনাদ করছে, আর রাজা আয়ু অশ্রুপাত করছেন। শোণিতে ও দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠল মণ্ডুকজনসংসার। কোন্ নতুন কৌতুকসুখে রাজ্যের এই সর্বনাশ করলে নির্মমা? পরাক্রান্ত পরীক্ষিতের কাছে কেন তোমার পরিচয় প্রকট ক'রে দিয়ে এসেছ কপটিনী?

—মিথ্যা অভিযোগ করো না বিমূঢ়া। নিমেষের মনের ভুলেও নৃপতি পরীক্ষিতের কাছে আমি আমার পরিচয় প্রকট করিনি।

কিংকরী সুবিনীতা অপ্রস্তুত হয়।—আমার সংশয় মার্জনা কর রাজপুত্রী, কিন্তু...।

—কিন্তু কি?

—কিন্তু ভেবে পাই না, মহাচেতা পরীক্ষিৎ কেন অকারণে অবৈরী মণ্ডুক-জাতির বিনাশে হঠাৎ প্রমত্ত হয়ে উঠলেন?...আমি রাজসমীপে চললাম কুমারী।

যেন মণ্ডুকরাজ আয়ুকে এই সংবাদ প্রদানের জন্য ব্যস্তভাবে চলে যায় কিংকরী সুবিনীতা।

কক্ষের বাতায়নের সন্নিকটে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে সুশোভনা। নিষ্প্রভ হয়ে আসছে অপরাহ্ণমিহির। অদৃশ্য ও দুর্বোধ্য সেই বৈশাখী ঝঞ্ঝার ক্রুদ্ধ নিঃস্বন নিকটতর হয়ে আসছে। মনে হয় সুশোভনার, মণ্ডুকজনপদের উদ্দেশে নয়, এই প্রতিহিংসার ঝড় তারই জীবনের সকল গর্ব আক্রমণ করবার জন্য ছুটে আসছে।

হঠাৎ আপন মনেই হেসে ওঠে সুশোভনা। জীর্ণপত্রের আবর্জনার মত এই মিথ্যা দুশ্চিন্তার ভার মন থেকে দূরে নিক্ষেপ করে। দীপ জ্বালে, মাধ্বীকী-বারির পাত্রে ওষ্ঠ দান করে। কনকমুকুর সম্মুখে রেখে তিলপর্ণীর তিলক অঙ্কিত করে কপালে। জনপদের আর্তস্বর আর অদৃশ্য ঝঞ্ঝার ভ্রূকুটি আসব-মধুসিক্ত অধরের উপহাস্যে তুচ্ছ ক'রে সুতন্ত্রিবীণা কোলের উপর তুলে নেয়। কিন্তু ঝংকার দিতে গিয়ে প্রথম করক্ষেপের পূর্বেই বাধা পায় সুশোভনা।

— রাজকুমারী।

সুবিনীতা এসে দাঁড়িয়েছে। বিরক্তভাবে ভ্রূক্ষেপ করে সুশোভনা—আবার কোন্ দুর্বার্তা নিয়ে এসেছ সুমুখী?

—দুর্বার্তাই এনেছি সুব্রতা রাজকুমারী। তোমার ছলনায় ভুলেছেন রাজা পরীক্ষিৎ; কিন্তু মণ্ডুকজাতির দুর্ভাগ্য ভোলেনি। দৈবের ইঙ্গিতে তোমার অপরাধ আজ জাতির অপরাধ হয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে।

ভ্রূকুটি করে সুশোভনা—একথার অর্থ?

—নৃপতি পরীক্ষিৎ দূতমুখে জানিয়েছেন, দৈব অভিশাপে ভীতিগ্রস্তা তাঁর প্রিয়তমা যখন মূর্চ্ছিতা হয়ে সরোবরজলে ভেসে গিয়েছিলেন, সেই সময় দুরাত্মা মণ্ডুকেরা চন্দ্রোপলপ্রভাসমন্বিতা তাঁর জীবনবাঞ্ছিতা সেই নারীকে নিধন করেছে। তিনি স্বচক্ষে একজন মণ্ডূক চরকে পালিয়ে যেতে দেখেছেন।

সুতন্ত্রিবীণায় ঝংকার তুলে সুশোভনা বলে—তোমার সুবার্তা শুনে আশ্বস্ত হলাম কিংকরী।

— আশ্বস্ত?

—হ্যাঁ, আশ্বস্ত ও আনন্দিত। এই অক্ষিতারকার কটাক্ষে, এই স্ফুরিতাধরের হাস্যে, এই মধুমুখের চুম্বনের ছলনায় প্রখরবুদ্ধি ও পরাক্রান্ত পরীক্ষিৎও কত মূর্খ হয়ে গিয়েছে।

— তুমি কৃতার্থা হয়েছ কৌতুকের নারী, কিন্তু তোমার প্রেমিক আজ তোমারই বিচ্ছেদের দুঃখে কত নিষ্ঠুর হয়ে নিরীহের শোণিতে যে ভয়াল উৎসব আরম্ভ করেছে, তার জন্য একটুও দুঃখ হয় না তোমার? এই অগ্নিদেহা দীপশিখারও হৃদয় আছে, তোমার নেই রাজকুমারী।

কিংকরী সুবিনীতা কক্ষ ছেড়ে চলে যায়।

সন্ধ্যা নামে গাঢ়তরা হয়ে। অন্তরীক্ষে অন্ধকার। বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়ায় সুশোভনা এবং দেখতে পায়, জনপদপরিখার প্রান্তে শত্রুশিবিরে প্রদীপ জ্বলছে। শুনতে পায় সুশোভনা, শত্রুর খড়্গাঘাতে ছিন্নদেহ প্রজার মৃত্যুনাদ করুণ হয়ে সন্ধ্যার বাতাসে ছুটাছুটি করছে।

বাতায়নপথ থেকে সরে আসে সুশোভনা। কক্ষের দীপশিখা যেন আপন হৃদয় পুড়িয়ে অন্তরীক্ষের সেই ভয়াল অন্ধকারকে বাতায়নপথে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। কিন্তু আজ যেন অন্ধকারের মধ্যেই লুকিয়ে কিছুক্ষণের মত বধিরা হয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা করে সুশোভনার।

আবার আর্তনাদ শোনা যায়। চমকে ওঠে সুশোভনা, যেন তার বক্ষঃপঞ্জরে এসে আঘাত করছে কতগুলি মর্মভেদী ধ্বনি, কতগুলি নিরপরাধ বিপন্ন প্রাণের বিলাপ। সহ্য হয় না এই বিলাপ। ফুৎকারে দীপশিখা নিভিয়ে দিয়ে কক্ষের বহির্দ্বারে এসে চিৎকার ক'রে ডাক দেয় সুশোভনা—সুবিনীতা!

কক্ষান্তর হতে ছুটে আসে কিংকরী সুবিনীতা। সন্ত্রস্ত স্বরে বলে—আজ্ঞা কর কুমারী।

সুশোভনা—আজ্ঞা করছি কিংকরী, এই মুহূর্তে শত্রু পরীক্ষিতের শিবিরে দূত প্রেরণ কর। জানিয়ে দাও, কোন মণ্ডুক তাঁর আকাঙ্ক্ষার নারীকে নিধন করেনি। জানিয়ে দাও, সে নারী হলো মণ্ডুকরাজদুহিতা সুশোভনা, যে এই প্রাসাদের কক্ষে তার সকল সুখ নিয়ে বেঁচে আছে। ছলপ্রণয়ে মুগ্ধ মূর্খ ও উন্মাদ নৃপতিকে এই সংহারের উৎসব ক্ষান্ত ক'রে চলে যেতে বলে দাও।

সুবিনীতা—জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজকুমারী। স্বয়ং মণ্ডুকরাজ আয়ু ব্রাহ্মণবেশে পরীক্ষিতের শিবিরে গিয়ে এই কথা জানিয়ে দিয়ে এসেছেন।

সন্ত্রস্তের মত চমকে ওঠে সুশোভনা, তার পরেই দুই কজ্জলিত খরনয়নের দীপ্তি যেন হঠাৎ উদাস ও করুণ হয়ে যায়। সুশোভনা শান্তভাবে হাসে—শুনে সুখী হলাম। পিতা এতদিন পরে আমার উপর নির্মম হতে পেরেছেন। ভাবতে ভাল লাগছে কিংকরী, আমার অপরাধ প্রকাশ ক'রে দিয়ে পিতা আজ প্রজাকে উন্মত্ত পরীক্ষিতের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছেন। এক নির্বোধ প্রেমিক আজ ছলসর্বস্বা কপটিনীকে ঘৃণা ক'রে চলে যাবে, আমিও সেই মূঢ়ের প্রেমের গ্রাস থেকে বাঁচলাম সুবিনীতা।

কিংকরী সুবিনীতার দুই চক্ষু হঠাৎ বেদনায় বিচলিত হয়—প্রজা বেঁচেছে রাজকুমারী, কিন্তু তুমি ...।

সুশোভনা—কি?

সুবিনীতা—প্রেমিক পরীক্ষিৎ প্রতীক্ষার দীপ জেলে তোমারই আশায় রয়েছেন।

চিৎকার ক'রে ওঠে সুশোভনা—না, হতে পারে না। এমন ভয়ংকর আশার কথা উচ্চারণ করো না কিংকরী। সে নির্বোধকে জানিয়ে দাও, আয়ুনন্দিনী সুশোভনার হৃদয় নেই, তার হৃদয় দান ক'রে পুরুষের ভার্যা হতে সে জানে না। সুশোভনাকে ঘৃণা ক'রে এই মুহূর্তে তাঁকে চলে যেতে বল।

সুবিনীতা—যদি তিনি ঘৃণা করতে না পারেন? তবে?

দীপশিখার দিকে তাকিয়ে স্থিরস্ফুলিঙ্গের মত দুই চক্ষুতারকা নিশ্চল ক'রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে সুশোভনা। তারপর, নিজ দংশনে আহতা ফণিনীর মত যন্ত্রণাক্ত দৃষ্টি তুলে কিংকরী সুবিনীতার দিকে তাকিয়ে বলে—তবে সে নির্বোধের মনে ঘৃণা এনে দাও। নারীধর্মদ্রোহিণী কৌতুকিনী নারীর গোপন জীবনের সকল ইতিহাস তাকে শুনিয়ে দাও। সুশোভনার অপযশ রটিত হোক ত্রিভুবনে। জানুক পরীক্ষিৎ, মণ্ডুকরাজ আয়ুর চন্দ্রোপলপ্রভাসমন্বিতা তনয়া হলো এক বহুবল্লভা পরপূর্বা ও ভ্রষ্টা নারী।

অশ্রুসিক্ত নেত্রে কিংকরী সুবিনীতা বলে—এতক্ষণে বোধ হয় সেকথাও জানতে পেরেছেন রাজা পরীক্ষিৎ।

আর্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে সুশোভনা—কেমন ক'রে?

সুবিনীতা—পিতা আয়ু আজ তোমার উপর সত্যই নির্মম হয়েছেন কুমারী; তিনি স্বয়ং অমাত্যবর্গকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষিতের শিবিরে চলে গিয়েছেন, ইক্ষ্বাকুগৌরবের কাছে নিজমুখে নিজতনয়ার অপকীর্তিকথা জানিয়ে দিতে। এ ছাড়া মহাবল পরীক্ষিৎকে তোমার প্রণয়মোহ হতে মুক্ত করার আর কোন উপায় ছিল না দুর্ভাগিনী কুমারী।

করতলে চক্ষু আবৃত ক'রে সবেগে কক্ষ হতে ছুটে চলে যায় কিংকরী সুবিনীতা।

মাধ্বীবারিতে পরিপূর্ণ পাত্রে নীলগরলের বুদ্বুদ ভাসে। আজ এতদিন পরে সুশোভনার জীবনে শেষ অভিসারের লগ্ন দেখা দিয়েছে। বাতায়নপথে দেখা যায়, আকাশে ফুটে আছে অনেক তারা, সিদ্ধকন্যাদের সন্ধ্যাপূজার ফুলগুলি যেন এখনও ছড়িয়ে রয়েছে। এই তো ঘুমিয়ে পড়বার সময়।

অপযশ রটিত হয়ে গিয়েছে। জগতের কোন অন্ধও এই রঙ্গময়ী কপটিনীকে চিনতে আর ভুল করবে না। এত কালের সব গর্ব, সব উল্লাস আর সব সুযোগ হারিয়ে শূন্য হয়ে গেল জীবন। মৃত্যু তো হয়েই গিয়েছে। তবে আর কেন? একটা ঘৃণার কাহিনী মাত্র হয়ে এই পৃথিবীতে পড়ে থাকবার আর কোন অর্থ হয় না। ছলস্বর্গের অপ্সরীর মত ছদ্মচারিণী এক রূপের সর্পীকে, দেহহীনা প্রেতিনীর চেয়েও ভয়ংকরী এক হৃদয়হীনাকে এইবার ঘৃণা ক'রে ফিরে যেতে

পারবেন পরীক্ষিৎ। জগতের সকল চক্ষুর ঘৃণা সহ্য করার জন্য এবং বিনা হৃদয়ের এই জীবনটাকে শুধু শাস্তি দেবার জন্য আর ধ'রে রাখবার কোন প্রয়োজন নেই।

মাধুকীবারির পাত্রে গরলফেন টলমল করে, তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে সুশোভনার ওষ্ঠাধর। পাত্র হাতে তুলে নেয় সুশোভনা।

—রাজনন্দিনী!

কিংকরী সুবিনীতার আহ্বানে বাধা পেয়ে সুশোভনা মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

সুবিনীতা বলে—পরীক্ষিতের কাছ থেকে বার্তা এসেছে রাজকুমারী।

—কি?

—তিনি তোমার আশায় রয়েছেন।

—এ কি সম্ভব?

—এ সত্য।

—তিনি কি শোনেননি, আমি যে এক শুচিতাহীনা মসিলেখা মাত্র?

—সব শুনেছেন।

গরলপাত্র ভূতলে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুশোভনা। বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখতে পায়, শত্রুর শিবিরে একটি প্রদীপ জ্বলছে, ধীর স্থির শান্ত ও নিষ্কম্প তার শিখা।

অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে সুশোভনা। শত্রুশিবিরের সেই প্রদীপের বিচ্ছুরিত জ্যোতি যেন সুশোভনার হৃৎপিণ্ডের অন্ধকার স্পর্শ করছে। জাগছে হৃদয়, যেন মরু-অন্ধকারের গভীরে নির্বাসিত এক মল্লীকোরক ফুটছে। আর, যেন এই জাগরণের বিস্ময় আপন আবেগে সুশোভনার মৃদুকম্পিত অধরের ভীতি ভেদ ক'রে গুঞ্জরণ হয়ে ফুটে ওঠে।—কী সুন্দর শত্রু তুমি!

কিংকরী সুবিনীতা চমকে উঠে প্রশ্ন করে—কি বলছ রাজকুমারী?

সুবিনীতার কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে সুশোভনা।—আজ আমার জীবনে শেষ অভিসারের লগ্ন এসে গিয়েছে সুবিনীতা। সাজিয়ে দাও কিংকরী, আর সুযোগ পাবে না।

যেন এক নূতন আকাশের শ্রাবণী বেদনার ধারাবারিবিধৌত নবশেফালিকা, সুশোভনার অশ্রুপ্লুত সেই সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় কিংকরী সুবিনীতা। সভয়ে প্রশ্ন করে—কোথায় যেতে চাও রাজনন্দিনী?

সুশোভনা—ঐ সুন্দর শত্রুর কাছে।

সুবিনীতা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—কি বেশে সাজাব?

সুশোভনা—বধূবেশে।

# সুমুখ ও গুণকেশী

অবশেষে বাসুকিপরিপালিত ভোগবতী পুরীতে এসে আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল ইন্দ্রসারথি মাতলির ম্রিয়মান মন। এই সেই ভোগবতী পুরী, যে-স্থান শ্বেতাচলের মত কলেবর সেই মহাবল শেষ নাগের তপস্যায় পুণ্যময় হয়ে আছে। ঊর্ধ্বে মণিজালের দীপ্তি, আর নীচে শত শত প্রস্রবণের অবিরল ধারাসলিলে রত্ন-ধাতুরেণুর প্রবাহ, এই ভোগবতী পুরীও বাসবের অমরাবতীর মত নয়নাভিরাম।

অনেক রাজ্য ঘুরে এসেছেন মাতলি, কিন্তু কোথাও এমন কোন রূপমান তরুণের সাক্ষাৎ পেলেন না, যাকে তাঁর রূপমতী কন্যা গুণকেশীর পরিণেতা হবার জন্য আহ্বান করা যেতে পারে। কি আশ্চর্য, যে অমরপুরে বাস করেন ইন্দ্রসখা মাতলি, পারিজাতের দেশ সেই অমরপুরেও গুণকেশীর পাণিগ্রহণের যোগ্য পাত্র খুঁজে পেলেন না।

গিয়েছিলেন পাতালের বারুণপুরে, যেখানে জগতের হিতসাধনের জন্য মেঘের বক্ষে বারিনিষেক করছেন ঐরাবত। যে বারুণপুরের সলিলচারী মীনও চন্দ্রকিরণ পান ক'রে সুন্দর হয়ে আছে, সেই দেশেও কোন সুন্দর তরুণের সাক্ষাৎ পেলেন না মাতলি। পুণ্ডরীক কুমুদ ও অঞ্জন, সুপ্রতীককুলের সকল প্রধানের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মাতলি। কিন্তু কাউকেই গুণকেশীর পাণিগ্রহণের যোগ্য বলে মনে হয়নি। মাতলিতনয়া গুণকেশী, পারিজাতের মালা যার কণ্ঠের স্পর্শে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে, সেই গুণকেশীর বরমাল্য গ্রহণ করার যোগ্য কোন সুকণ্ঠ সেই বারুণপুরে নেই।

অবশেষে ভোগবতী পুরী। মণি স্বস্তিক চক্র ও কমণ্ডলুচিহ্নে খচিত বিবিধ রত্নময় আভরণ ধারণ ক'রে সভায় সমবেত হয়েছেন শত শত প্রবীণ নাগপ্রধান এবং তরুণ নাগকুমার। সভাস্থলের নিকটে এসে দেখতে পেলেন মাতলি, নাগপ্রধান আর্যকের সম্মুখে বসে আছে এক প্রিয়দর্শন কুমার। মনে হয়, দিব্যদেহ ঐ তরুণের মুখময়ুখের স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে নাগসভা-স্থলীর মণিজাল। গুণকেশীর জীবনের প্রতিক্ষণের নয়নানন্দ হতে পারে, ঐ তো সেই রমণীয়তনু তরুণের মূর্তি। কে এই কুমার?

প্রীতমনা মাতলি নাগপ্রধান আর্যকের কাছে এসে সাগ্রহে নিবেদন করেন—আপনার সম্মুখে উপবিষ্ট এই কুমারের পরিচয় জানতে ইচ্ছা করি নাগপ্রধান আর্যক।

আর্যক বলেন—আমার পৌত্র সুমুখ।

মাতলি বলেন—আমার কন্যা গুণকেশীর পাণিগ্রহণের যোগ্য কেউ যদি এই ত্রিভুবনে থাকে, তবে একমাত্র একজনই আছে। সে হলো আপনারই এই পৌত্র সুমুখ।

আর্যক—আপনার ভাষণ শুনে খুবই প্রীত হলাম ইন্দ্রসারথি মাতলি।

মাতলি অকস্মাৎ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন।—কিন্তু প্রীত হয়েও কেন হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গেলেন নাগপ্রধান আর্যক? দেখছি, আপনার পৌত্র সুমুখেরও সুন্দর আনন যেন হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

ব্যথিত স্বরে নিবেদন করেন আর্যক—আপনার উদ্দেশ্য অনুমান করতে পারছি ইন্দ্রসখা মাতলি, তাই বিষণ্ণ না হয়ে পারছি না।

মাতলি—কি অনুমান করছেন আর্যক?

আর্যক—আপনার ইচ্ছা, আপনার কন্যা গুণকেশীর পাণিগ্রহণ করুক আমার এই নয়নানন্দবর্ধন পৌত্র সুমুখ।

মাতলি—হ্যাঁ নাগপ্রধান আর্যক, সুরকামিনীর চেয়েও শতগুণ কমনীয় রূপা আমার কন্যা গুণকেশীর পতি হোক আপনার পৌত্র সুমুখ।

আর্যক—ইন্দ্রসখা মাতলির সঙ্গে সম্বন্ধবন্ধন কে না আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু...।

মাতলি—তবু দ্বিধা কেন আর্যক?

আর্যক—সুমুখের আয়ু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বেদনাহত মাতলি চমকে ওঠেন—আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, এই কথার অর্থ কি আর্যক?

অশ্রুসিক্ত চক্ষু তুলে আর্যক বলেন—আমার পুত্র চিকুরনাগকে সম্প্রতি হত্যা ক'রেও তৃপ্ত হতে পারেনি নাগবৈরী গরুড়। প্রতিজ্ঞা করেছে গরুড়, এক মাসের মধ্যে আমার পৌত্র সুমুখকেও হত্যা না ক'রে সে ক্ষান্ত হবে না। আপনি জানেন মাতলি, বিষ্ণুকৃপার আশ্রয়ে উৎসাহিত গরুড় কি নিষ্ঠুর সংহারামোদে মত্ত হয়ে নাগজাতিকে ধ্বংস ক'রে চলেছে। কি ভয়ংকর তার জাতিবৈর। মাতৃক্রোড়ে সুখসুপ্ত নাগশিশুর বক্ষ বিদীর্ণ করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না গরুড়। আমার জীবনে আর একটি দুঃসহ শোকের আঘাত আসন্ন হয়ে উঠেছে বাসবসুহৃদ্ মাতলি। নাগদ্বেষী গরুড়ের হিংসার নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হবে আমার জীবনের শেষ শান্তি এই প্রিয় পৌত্র সুমুখের জীবন। আপনার প্রস্তাব শুনে সুখী হয়েছি, কিন্তু প্রস্তাবে সম্মত হতে পারি না মাতলি। মৃত্যু যার আসন্ন, কি লাভ হবে তার জীবন ক্ষণচঞ্চল এক উৎসবের আনন্দ আহ্বান ক'রে? শুভরাত্রির দীপ নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যার জীবনের দীপও নিভে

যাবে, প্রিয়ার প্রেমান্বিত আননের শোভা দেখে মুগ্ধ হবার জন্য একটি দিনের মত সময়ও যে পাবে কি না সন্দেহ, তার কাছে আপনার কন্যাকে সম্প্রদান করতে আমি কখনই বলতে পারি না মাতলি। এই আমার দুঃখ।

কিছুক্ষণ বিমর্ষভাবে আর চিন্তান্বিত হয়ে বসে থাকেন মাতলি। তার পরেই আশাদীপ্ত স্বরে বলে ওঠেন—আপনি সম্মতি দান করুন আর্যক।

আর্যক বিস্মিতভাবে বলেন—আপনার এই নির্বন্ধাতিশয্যের অর্থ কি মাতলি? আপনি কি আপনার কন্যার অচিরবৈধব্য কামনা করেন?

মাতলি—না আর্যক, আমি নাগজাতিদ্বেষী গরুড়ের নিষ্ঠুর দর্পের বিনাশ কামনা করি।

আর্যক—কিন্তু...।

মাতলি—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন প্রবীণ আর্যক, আপনার পৌত্র সুমুখের আয়ু রক্ষার জন্য আমি কোন প্রযত্নের ত্রুটি করব না। আশা আছে, দেবরাজ ইন্দ্রের সহায়তায় আমার প্রযত্ন সফল হবে।

আর্যক—তবে তাই করুন মাতলি।

মাতলি—কিন্তু আপনার পৌত্র সুমুখকে সঙ্গে নিয়েই আমি সুরপুরে যেতে চাই আর্যক।

চকিত দুই চক্ষুর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন আর্যক—সুরপুরী অমরাবতীর কোথায় আর কার আশ্রয়ে থাকবে আমার সুমুখ?

মাতলি—আমার আশ্রয়ে।

আর্যক—কিন্তু ভয় হয় মাতলি, নাগবৈরী গরুড় তবু তার সংহারবাসনা চরিতার্থ করবার সুযোগ পেয়ে যাবে।

বাধা দিয়ে বলেন মাতলি—দুশ্চিন্তা করবেন না আর্যক। আমার আশা আছে, এমন সুযোগ কখনই পাবে না গরুড়।

আর্যক—আশার কথা বলবেন না মাতলি, প্রতিশ্রুতি দিন।

অকস্মাৎ উৎসাহিত স্বরে সুমুখই বলে ওঠে—দেবরাজসখা মাতলির কাছ থেকে বৃথা প্রতিশ্রুতি চাইছেন কেন পিতামহ? আপনার এই ভোগবতী পুরীতে এমন কেউ নেই যে, গরুড়ের আঘাত থেকে আমার প্রাণ রক্ষা করতে পারে। এখানে থাকলে আমার প্রাণরক্ষার কোনই আশা নেই পিতামহ। অমর-পুরীতে গিয়ে দেবরাজসখা মাতলির সহায়তায় তবু আয়ুলাভের আশা আছে। আশা আছে, দেবরাজ ইন্দ্র যদি তুষ্ট হন, তবে তিনিই অমৃত দান ক'রে আপনার পৌত্রকে অমর ক'রে তুলবেন। আমাকে সেই আশার রাজ্যে যেতে অনুমতি দিন পিতামহ।

আর্যক বলেন—এস।

অমরাবতীর পুরদ্বার পার হয়ে পারিজাতকাননের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে নাগকুমার সুমুখ। অম্লানকুসুম পারিজাত, সুরপুরের পুষ্পের রূপের মধ্যেও যেন অমরতার আনন্দ ফুটে রয়েছে। ঐ কল্পপাদপের পল্লব কখনও শীর্ণ হয় না। জরা নেই, জীর্ণতা নেই, স্বর্গনগরীর প্রাণে কোন বিরহ ও বিচ্ছেদের বেদনা নেই। এখানে সবই চিরজাগ্রত ও চিরপ্রস্ফুটিত। চিরমধুনিষ্যন্দ মন্দারের মতই যৌবন এখানে চিরসরসিত। অমরপুরীর সমীরে শুধু সুস্মিত অধরের হাস্যস্বরলহরী ভেসে বেড়ায়। অশ্রুবাষ্প নেই, ক্রন্দন নেই, বেদনাহীন অমর-পুরীর সুধাসিক্ত হৃদয় চিরহর্ষে তরঙ্গিত হয়ে রয়েছে।

অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে সুমুখ, যেন তার কল্পনা এই অমরতায় ধন্য সুরনগরীশোভা পান করার জন্য পিপাসিত হয়ে উঠেছে। লুব্ধ ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে ক্ষণায়ু জীবনের উদ্বেগে ব্যথিত ভোগবতী পুরীর একটি প্রাণ।

সুমুখ বলে আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দান করুন অমরেন্দ্রসারথি মাতলি।

মাতলি— বল, কিসের প্রতিশ্রুতি চাও।

সুমুখ— আমি অমৃত চাই।

চমকে ওঠেন মাতলি— আমি কেমন ক'রে তোমাকে অমৃত দানের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি সুমুখ?

সুমুখ— দেবরাজ ইচ্ছা করলেই তো আমাকে অমৃত দান করতে পারেন।

মাতলি— হ্যাঁ, দেবরাজ পারেন।

সুমুখ— আপনি অনুরোধে দেবরাজকে তুষ্ট ও প্রীত ক'রে আমার জন্য অমৃত সংগ্রহ ক'রে দিন দেবরাজসখা মাতলি।

মাতলি— কিন্তু দেবরাজ যদি আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন, তবে—

সুমুখ— তবে আমাকে বিদায় দান করবেন ইন্দ্রসারথি, আপনার কন্যার পাণিগ্রহণে আমার আর কোন আগ্রহ থাকবে না।

মাতলি বেদনাহত স্বরে বলেন— তোমার সংকল্পের কথা শুনে ব্যথিত হলাম সুমুখ।

সুমুখ— কেন?

মাতলি— গুণকেশীর পাণিগ্রহণে তোমার এই অনাগ্রহ দেখে দুঃখিত না হয়ে পারছি না সুমুখ।

হেসে ওঠে সুমুখ— আপনি কি চান ইন্দ্রসারথি?

মাতলি— আমি চাই, তুমি আয়ুষ্মান হও। আমি চাই তুমি গরুড়ের হিংস্র প্রতিজ্ঞার আঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে আমার কন্যা গুণকেশীর পতি হও।

সুমুখ— কে আমাকে আয়ু দান করবেন? গরুড়ের আঘাত হতে কে আমার প্রাণরক্ষা করবেন?

মাতলি—আশা আছে, আমার অনুরোধে দেবরাজ তোমাকে আয়ু দান করবেন।

সুমুখ—যদি না করেন? যদি আপনি বুঝতে পারেন যে, ভোগবতীর এই ক্ষণায়ু নাগকুমারের প্রাণ আর একটি দিনের মধ্যেই নাগবৈরী গরুড়ের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, তবে?

মাতলি—তবে কি?

সুমুখ—তবে কি আপনি আপনার কন্যাকে আমার কাছে সম্প্রদান করবেন? আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন ইন্দ্রসারথি মাতলি?

সহসা লজ্জিত হয়ে এবং কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দান করেন মাতলি না।

সুমুখ আবার হেসে ওঠে—আমার কাছে আপনার কন্যার পাণি সমর্পণে আপনার এই অনাগ্রহ কেন দেবরাজসখা?

মাতলি বলেন—জানি না অদৃষ্টে কি আছে। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম, তোমার জন্য দেবরাজের কাছে অমৃত প্রার্থনা করব আমি। যদি সুযোগ পাই, তবে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়েও বলব, আমার কন্যার জীবনসঙ্গী হবে যে প্রিয়দর্শন নাগকুমার, সেই সুমুখকে অমৃতদানে অমর করুন ভগবান।

তৃপ্তচিত্তে এবং আশাদীপ্ত নেত্রে সুমুখ বলে—আপনার এই চেষ্টার প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট। আমার বিশ্বাস, আপনার চেষ্টা সফল হবে ইন্দ্রসারথি মাতলি।

ভবনে প্রবেশ ক'রেই পত্নী সুধর্মার কাছে শুনলেন মাতলি ভগবান বিষ্ণু আজ অমরাবতীতে অবস্থান করছেন। শুনে প্রসন্ন হলেন মাতলি, কিন্তু পরক্ষণেই শঙ্কাপন্নের মত দুশ্চিন্তিত হয়ে ডাক দিলেন—গুণকেশী!

কন্যা গুণকেশী এসে সম্মুখে দাঁড়ায়—আজ্ঞা করুন পিতা।

মাতলি এখনি যে অভ্যাগত অপরিচিতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে মন্দারকুঞ্জের নিভৃতে ঐ লতাবাটিকায় পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছ, তার পরিচয় অনুমান করতে পার কন্যা?

গুণকেশী—না।

মাতলি—ভোগবতী পুরীর নাগ আর্যকের পৌত্র আর বিগতাসু চিকুরের পুত্র সুমুখ।

গুণকেশী—পাতাল দেশের কুমার সুরপুরে কেন এলেন?

মাতলি—তোমারই পাণি গ্রহণ ক'রে তোমার জীবনের সহচর হবে যে, সে হলো এই নাগকুমার সুমুখ। কিন্তু ।

গুণকেশীর লজ্জারাগে আরক্ত কপোলের দিকে তাকিয়ে স্নেহবিবশ স্বরে মাতলি বলেন—কিন্তু সুমুখের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে।

যেন হঠাৎ এক মরুঝটিকার জ্বালাবায়ু এসে গুণকেশীর দুই চক্ষু আঘাতে পীড়িত ক'রে তুলেছে, ব্যথাহত নেত্রে তাকিয়ে থাকে গুণকেশী। কপোলের রক্তাভ প্রসন্নতা এক মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যায়, আর নীরবে এই দুঃসহ বার্তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে।

মাতলি বলেন—নাগবৈরী গরুড়ের সংকল্প, এক মাসের মধ্যেই সে সুমুখের প্রাণ সংহার করবে। তাই দুশ্চিন্তিত হয়েছি কন্যা। ভগবান বিষ্ণুর কাছে কিংবা দেবরাজের কাছে গিয়ে সুমুখের জন্য অমৃত প্রার্থনা করতে হবে। এখনি যেতে হবে।

গুণকেশী—আপনার প্রার্থনা সফল হোক পিতা।

মাতলি—কিন্তু শুনতে পেয়েছি, ভগবান বিষ্ণু আজ সুরপুরীতে অবস্থান করছেন। তাই নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারছি না কন্যা।

গুণকেশী—কেন?

মাতলি—ভগবান বিষ্ণু যখন এসেছেন, তখন তাঁর বাহন গরুড়ও নিশ্চয় এসেছে। ভয় হয়, যে-কোন মুহূর্তে এসে আমার স্নেহাশ্রিত সুমুখের প্রাণ বিনাশ ক'রে চলে যাবে ভয়ংকর জাতিদ্বেষপ্রমত্ত গরুড়, বিষ্ণুকৃপায় আশ্রিত দর্পোন্মাদ গরুড়। তাই নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারছি না কন্যা।

গুণকেশী—আপনি বিলম্ব করবেন না পিতা। নিশ্চিন্ত মনে প্রস্থান করুন।

মাতলি—যতক্ষণ না ফিরে আসি ততক্ষণ সুমুখের প্রাণ রক্ষার ভার তোমার উপর রইল গুণকেশী।

গুণকেশী—হ্যাঁ, পিতা।

ইন্দ্রসন্নিধানে চলে গেলেন মাতলি, আর মন্দারকুঞ্জের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে বসে থাকে গুণকেশী।

এই তো কিছুক্ষণ আগে, যেন নিজেরই যৌবনান্বিত জীবনের এতদিনের সুস্বপ্ন দিয়ে রচিত একটি মূর্তিকে পথ দেখিয়ে ঐ মন্দারকুঞ্জের নিভৃতে রেখে এসেছে গুণকেশী। কিন্তু কল্পনা করতে পারেনি গুণকেশী, সত্যই ঐ সুন্দর-দর্শন তরুণ হলো ক্ষণভঙ্গুর সুস্বপ্নের মত সুন্দর এক ক্ষণায়ু মাত্র। বাহু প্রসারিত করেছে মৃত্যু, ঐ তরুণের প্রাণ লুণ্ঠন করার জন্য। তবু এসেছে প্রিয়া লাভের আশায়; সুরপুরনিবাসিনী গুণকেশীকে জীবনসহচরী ক'রে নিয়ে যাবার জন্য ভোগবতীর অতল হতে উঠে এসেছে এক সুন্দর বিশ্বাস।

অকস্মাৎ, যেন নিজের মনের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে গুণকেশী। হৃদয়ের গভীরে এক জলছলছল সুরসীর বুকে ফুটে উঠেছে নাগকুমার সুমুখের মুখ-কমলশোভা। আরও বুঝতে পারে গুণকেশী, তার দুই চক্ষু হতে বারিধারা ঝরে পড়ছে।

এরই নাম বোধ হয় অশ্রু, এই বস্তু অমরপুরীর জীবনে নেই। তবে কোথা হতে আর কেন আসে এই অশ্রু সুরপুরনিবাসিনী গুণকেশীর নয়নে? প্রেমের প্রথম উপহার কি এই অশ্রু?

—অমর হও অথবা আয়ুষ্মান হও, কিংবা ক্ষণায়ু হও, যা'ই হও তুমি, তুমিই মাতলিতনয়া গুণকেশীর প্রেমের পুরুষ। গুণকেশীর অন্তরে যেন এক সংকল্পের সঙ্গীত সুধ্বনিত হতে থাকে।—বিফল হবে না তোমার বিশ্বাস। যদি মৃত্যু তোমাকে কেড়ে নিয়ে যেতে আসে, যদি বরণমাল্য দান করবার সুযোগ নাই বা আসে, তবু গুণকেশী তার প্রেমাকুল এই দুই বাহুর মালিকা তোমার কণ্ঠে উপহার না দিয়ে তোমাকে বিদায় দেবে না। অমৃত নই আমি, প্রাণদায়িনী নই আমি, কিন্তু তোমার মৃত্যুকেই মধুর ক'রে দিতে পারি আমি। সুরপুর যদি তোমাকে বঞ্চিত করে, দেবরাজ যদি তোমাকে অমৃত দান না করেন, তবে দুঃখ করো না নাগকুমার। মাতলিতনয়া গুণকেশী তোমাকে বঞ্চিত করবে না। ভঙ্গুরপ্রাণ দীপশিখার মত সত্যই যদি নিভে যাও, তবে নিভে যাবার আগে তোমার বক্ষে বরণ ক'রে নিও তোমার প্রেমিকা মাতলিতনয়ার কামনাবিহ্বল নিঃশ্বাস।

গুণকেশীর মনের বেদনাময় ভাবনাগুলি যেন এই অদ্ভুত অশ্রুর স্পর্শে মধুর আর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিন্তু মন্দারকুঞ্জের নিভৃতেও কি এমনই কোন বেদনাময় ভাবনা অশ্রুর স্পর্শে মধুর ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে? জানতে ইচ্ছা করে, জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে যৌবনপ্রিয়ার মুখচ্ছবি অন্বেষণে ভোগবতী হতে অমরপুরে আগত ঐ পথিক।

ঘুমিয়ে পড়েছিল সুমুখ। যেন মন্দারকুসুমের সৌরভে অভিভূত স্বপ্ন দেখছিল সুমুখ। অমৃত দান করেছেন দেবরাজ, আর অমরত্ব লাভ করেছে চিকুরতনয় সুমুখ। শঙ্কা নেই, উদ্বেগ নেই, অশ্রুহীন চিরহর্ষের জীবন। বিদায়ে বেদনা নেই, বিরহে ব্যথা নেই, বক্ষে দীর্ঘশ্বাস নেই। জীর্ণ হয় না যৌবন, শ্রান্ত হয় না দেহ, মলিন হয় না কান্তি। কিন্তু হঠাৎ যেন কা'র কুন্তল-সুরভির স্পর্শে মন্দারসৌরভে অভিভূত এই স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে তাকায় সুমুখ।

সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে মাতলিতনয়া গুণকেশী। বিস্মিত সুমুখ বলে—তুমি? আজ এই অসময়ে এখানে কি উদ্দেশে এসেছ মাতলিতনয়া?

গুণকেশী—অসময় কেন বলছেন চিকুরতনয়? সন্ধ্যাতারকা যদি একটু আগে ফুটে ওঠে, তবে কি আকাশের হৃদয় ব্যথিত হয়? ঊষার অরুণাভা যদি একটু আগে জেগে ওঠে, তবে কি আপত্তি করে জলকমল? আপনি আমার

পাণি গ্রহণ করবেন, আপনাকেই পতিত্বে বরণ ক'রে ধন্য হবে আমার পারিজাতের মালা; শঙ্খধ্বনি ও মন্ত্রবের উৎসবের মধ্যে আমাকে চিরকালের প্রিয়া ক'রে গ্রহণ করবেন যিনি, আমি তাঁরই কাছে এসেছি।

সুমুখ—বল, কি উদ্দেশে এসেছ।

গুণকেশী—জানতে ইচ্ছা করে, এতক্ষণ কি স্বপ্ন দেখছিলেন নাগকুমার?

সুমুখ—দেখছিলাম, যে বিশ্বাস নিয়ে এই সুরপুরে এসেছি, আমার সেই বিশ্বাস সফল হয়েছে।

ফুল্ল প্রসূনের মত অকস্মাৎ গুণকেশীর দুই নয়নও যেন এক বিশ্বাসের স্পর্শে উৎসুক হয়ে ওঠে।—কি বিশ্বাস নিয়ে সুরপুরে এসেছেন চিকুরতনয়?

সুমুখ—এসেছি অমৃতলাভের জন্য।

আর্তনাদের মত বেদনাশিহরিত স্বরে প্রশ্ন করে গুণকেশী অমৃতলাভের জন্য?

সুমুখ—হ্যাঁ।

গুণকেশী—অমৃতই কি আপনার অভীষ্ট?

সুমুখ—হ্যাঁ, মাতলিতনয়া গুণকেশী। যদি অমৃত পাই, যদি সুরোপম অমরতা লাভ করি, তবেই তোমাকে আমার জীবনের সহচরী হতে আহ্বান করব গুণকেশী, আমার এই সংকল্পের কথা জানেন তোমার পিতা বাসবসুহৃদ্ মাতলি।

গুণকেশী—যদি অমৃত না পান, তবে?

অকস্মাৎ শঙ্কিতের মত বিষণ্ণ হয়ে ওঠে সুমুখ—এমন অশুভ বচন উচ্চারণও করো না গুণকেশী।

গুণকেশী—আমার প্রশ্নের উত্তর দিন চিকুরতনয়, যদি আপনার অমরত্ব লাভের স্বপ্ন বিফল হয়, তবে কি মাতলিতনয়া গুণকেশীর বরমাল্য প্রত্যাখ্যান ক'রে চলে যাবেন?

সুমুখ—তুমি বল পারিজাতসৌরভবিলাসিনী সুন্দরী; যদি বুঝতে পার যে, আর এক মুহূর্ত পরে চিকুরতনয় সুমুখের প্রাণ বিনাশ করবে হিংস্র ও ভয়ংকর নাগবৈরী গরুড়, তবে কি তুমি এই মুহূর্তে তার কণ্ঠে বরমালা দিতে পারবে?

গুণকেশী—পারব চিকুরতনয়।

বিস্ময়ে শিহরিত হয়ে সুমুখ বলে—এ কেমন প্রণয়রীতি কুমারী গুণকেশী?

গুণকেশী—এ অতি সহজ প্রণয়রীতি চিকুরতনয়। গুণকেশী ভালবেসেছে আপনাকে, আপনার অমরত্বকে নয়। গুণকেশী ভালবাসে আপনার প্রাণকে, আপনার প্রাণের অনন্ততাকে নয়। আপনার আয়ুর চেয়ে আপনার হৃদয় আমার কাছে শতগুণ বেশী লোভনীয় ও স্পৃহনীয় ও মূল্যবান, হে নাগকুমার। আমি

প্রেমিকা, আমার কাছে আপনার ঐ বক্ষের ক্ষণিক স্পর্শ অনন্ত হয়ে থাকবে চিকুরতনয়, যদি আমার জন্য আপনার হৃদয়ে এক বিন্দু প্রেম থাকে।

সুমুখ—আমাকে ক্ষমা কর মাতলিতনয়া; যদি অমরতা লাভ করতে না পারি, তবে আমার আহত স্বপ্নের বেদনারুধিরে রঞ্জিত হয়ে যাবে আমার হৃদয়। সেই হতাশাব্যথিত হৃদয়ে প্রেমের পুষ্প কোনদিন ফুটে উঠবে না গুণকেশী।

গুণকেশী—চিকুরতনয়!

সুমুখ—বল মাতলিতনয়া।

গুণকেশী—প্রেমহীন নয়নেই একবার শুধু তাকিয়ে দেখ তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী এই সুরপুরনিবাসিনীর যৌবনচ্ছবি।

সুমুখ—দেখেছি গুণকেশী।

গুণকেশী-বল, কি বলে তোমার ঐ দেহের শোণিতকণিকার কামনা? পিপাসা জাগে না কি অধরে? চঞ্চল হয় না কি বক্ষের নিঃশ্বাস? বল, ভোগবতীর সলিলে লালিততনু নাগকুমার, এই সুরপুরবললনার ললাটতিলকে অধর দান ক'রে মদামোদমধুর একটি মুহূর্তের বিহ্বলতা বরণ ক'রে নেবার জন্য তোমার শান্ত বক্ষঃপঞ্জরের অন্তরালে কোন স্পৃহা উন্মুখ হয়ে ওঠে না?

শান্ত রত্নশৈলের মত সুন্দর ও অচঞ্চল সুমুখ বলে—না গুণকেশী, অমরতাহীন জীবনে এই ক্ষণচঞ্চল ও অতিনশ্বর কামনার উৎসব নিতান্ত এক বিদ্রূপ। সে বিদ্রূপ দেখতে সুন্দর হলেও তার জন্য আমার মনে কোন মোহ নেই।

নীরবে আর অবনতশিরে দাঁড়িয়ে থাকে গুণকেশী। পূর্ব আকাশের ললাটে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া দেখা দিয়েছে। মন্দারকুঞ্জের সৌরভ স্নিগ্ধ সমীরে আরও মদির হয়ে ওঠে।

নিজেরই মনের কল্পনার আবেশে অন্যমনা হয়ে দূরান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকে সুমুখ। মনে হয়, এতক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর প্রিয়সখা মাতলির প্রার্থনায় প্রীত হয়ে অমৃত দান করেছেন। নাগকুমার সুমুখের অমরত্বলাভের স্বপ্ন সত্য করবার জন্য অমৃত নিয়ে আসছেন মাতলি। যেন পদধ্বনি শোনা যায়, বুঝি আসছেন মাতলি। উৎকর্ণ হয়ে আর অপলক নেত্রে মন্দারকুঞ্জের পথরেখার দিকে তাকিয়ে থাকে সুমুখ।

সেই মুহূর্তে শঙ্কিত শিশুর মত করুণকণ্ঠে আর্তনাদ ক'রে ওঠে সুমুখ। —রক্ষা কর।

কালানলের ঝটিকার মত যেন কা'র ক্রূরকরাল নিঃশ্বাস ছুটে এসে মন্দারকুঞ্জের নিকটে থেমেছে। লতাবাটিকার অভ্যন্তরে বাত্যাহত শীর্ণ বেতসপত্রের মত কেঁপে ওঠে সুমুখ। এসেছে, নাগবৈরী গরুড় তার ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা

চরিতার্থ করার জন্য এসেছে। অমরত্বপ্রয়াসী সুমুখের হৃৎপিণ্ডের সন্নিকটে মৃত্যুর নখর এসে পৌঁছে গিয়েছে।

গুণকেশী বলে—শান্ত হও নাগকুমার।

সুমুখ—শান্তি দাও মাতলিতনয়া।

গুণকেশী বলে—আমিই তো তোমার শান্তি।

সুমুখ—তুমি?

গুণকেশী—হ্যাঁ, আমি।

সুমুখ—তুমি আমাকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতে পারবে?

গুণকেশী বলে—আমি অমৃত নই চিকুরতনয়। আমি তোমার মৃত্যুপথে সহযাত্রিণী হতে পারি, আমি তোমার মৃত্যুর মুহূর্ত শুধু মধুর ক'রে দিতে পারি।

কালানলের ঝটিকার মত গরুড়ের নিঃশ্বাস যেন উদ্দাম আক্রোশে মন্দার-কুঞ্জের পথের উপর দাঁড়িয়ে ছটফট করছে। গুণকেশীর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করে সুমুখ—মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ মুহূর্ত মধুর ক'রে দিয়ে তুমি কোন্ আনন্দ লাভ করবে মাতলিতনয়া?

গুণকেশী—সেই মধুরতা অমর হয়ে থাকবে আমার জীবনে, আমার প্রাণের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

সুমুখ বলে—তুমি বিচিত্রহৃদয় এই জগতের এক অতি অদ্ভুত বিস্ময়।

গুণকেশী—আমি এই বিস্ময়ভরা জগতের এক অতি সাধারণ হৃদয়।

সুমুখ—তুমি সুন্দর।

গুণকেশী—তুমি যদি সুন্দর বল, তবেই আমি সুন্দর।

উদ্গত অশ্রুবাষ্প নিরোধ করতে চেষ্টা করে সুমুখ। ব্যথিতের আবেদনের মত বিহ্বল স্বরে বলে—আমার একটি অনুরোধ আছে মাতলিতনয়া।

গুণকেশী—আদেশ করুন চিকুরতনয়।

সুমুখ—গরুড়ের হিংসায় ছিন্নদেহ চিকুরতনয় যেন তার প্রাণের শেষ মুহূর্তে দেখতে পায়, সুরপুরবাসিনী গুণকেশীর নয়নে দু'টি অশ্রুবিম্ব ফুটে উঠেছে।

—চিকুরতনয়!

—বল সুন্দরহৃদয়া মাতলিতনয়া।

—অতিনশ্বর দু'টি অশ্রুকণিকার জন্য এই মোহ কেন চিকুরতনয়?

—বুঝতে পেরেছি, এই মৃত্যুর ছায়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পেরেছি গুণকেশী, অতিনশ্বর এই অশ্রুকণিকা অনন্ত হর্ষের চেয়েও কত বেশী মধুর। বুঝেছি, মৃত্যুর মুহূর্তকে মধুর ক'রে দিতে পারে যে-বস্তু, তাই তো অমৃত।

অস্থির হয়ে উঠেছে সংহারব্যাকুল গরুড়ের ছায়া। লতাবাটিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে আসছে অনলোদ্গারী দুটি চক্ষুর দৃষ্টি।

সুমুখের কণ্ঠে অসহায় আর্তস্বর ছলছল করে—অমরতার স্বপ্নে মুগ্ধ হয়ে ভুলে গিয়েছিলাম গুণকেশী, আজ গরুড়ের প্রতিজ্ঞার শেষ দিন। এই সন্ধ্যাই আমার জীবনের শেষ সন্ধ্যা।

আর্তস্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে গুণকেশী—কিন্তু তুমি মরণ বরণ করো না চিকুরতনয়।

মৃদু হাস্যে উত্তর দেয় সুমুখ—উপায় নেই গুণকেশী, বিষ্ণুর কৃপায় আশ্রিত ঐ ভয়ংকরের আঘাত হতে কেমন ক'রে আত্মরক্ষা করবে ভোগবতীর সলিলে লালিত নাগ?

—এ কেমন বিষ্ণু, আর এ কেমন তাঁর কৃপা? গুণকেশীর অন্তর মথিত ক'রে এক উদ্ধত বিদ্রোহ যেন কঠিন প্রশ্ন হয়ে জেগে ওঠে।

নিখিল সৃষ্টির রক্ষক ও পালয়িতা বিষ্ণুর কৃপা, সে কৃপায় লালিত হয় নিখিলের ক্রোড়ে আবির্ভূত সকল প্রাণ। অন্যমনার মত নিষ্পলক নেত্রে যেন ধ্যান সঞ্চারিত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে আর চিন্তা করে গুণকেশী। তারপর, ধীরে ধীরে যেন এক নিগূঢ় সংকল্পের ছায়া গুণকেশীর ওষ্ঠাধর শিহরিত ক'রে কাঁপতে থাকে। তার ভাবনামগ্ন মূর্তি যেন অন্তরের গভীরে এক স্তবের ভাষা এবং শোণিতের কল্লোলে এক প্রজায়িনী মহিমার সঙ্গীত উৎকর্ণ হয়ে শুনছে।

তোমার প্রাণপ্রিয় চিকুরতনয়ের প্রাণ হতে তোমার প্রাণের গভীরে নব প্রাণ আহ্বান কর মাতলিতনয়া। প্রাণের আবির্ভাব ধ্বংস করবে, বিষ্ণুর কৃপায় আশ্রিত কোন উদ্‌ভ্রান্ত ভয়ংকরের সে সাহস নেই, স্বয়ং বিষ্ণুরও সে অধিকার নেই।

হিংস্র গরুড়ের ছায়া একেবারে লতাবাটিকার দ্বারে এসে দাঁড়ায়। সেই মুহূর্তে উৎক্ষিপ্ত পারিজাতস্তবকের মত মাতলিতনয়া গুণকেশী তার যৌবনিত তনুশোভা অপাবৃত ক'রে সুমুখের বুকের উপর এসে লুটিয়ে পড়ে। —আমার স্বপ্ন সত্য ক'রে দিয়ে যাও প্রিয় নাগকুমার।

সুমুখ—নিজেকে এমন ক'রে শাস্তি দিও না কুমারী!

গুণকেশীর দুই চক্ষুর কোণে মুক্তাফলের মত দুটি মধুর ও উজ্জ্বল অশ্রুবিম্ব ফুটে ওঠে।—প্রশ্ন করো না, বিস্মিত হয়ো না, কুণ্ঠিত হয়ো না গুণকেশীর প্রেমের পুরুষ চিকুরতনয়। গুণকেশীর পিপাসিত শোণিতে তোমার সন্তানের প্রাণ অঙ্কুরিত ক'রে দিয়ে যাও।

—গুণকেশী! মধুরসান্দ্র প্রণয়ার্দ্র স্বরে আহ্বান করে সুমুখ। সুমুখের মৃত্যুর মুহূর্তগুলিকে যেন মধুরতায় ডুবিয়ে দেবার জন্য সুমুখের বাহুবন্ধনের

মধ্যে আত্মহারা হয়ে লুটিয়ে পড়ে এক অশ্রুবিধুর ও স্বপ্নমধুর পারিজাতের স্তবক।

নক্ষত্র জাগে আকাশে। নিশীথবায়ুর চুম্বনে তন্দ্রাভিভূত হয় মন্দারসৌরভ। গরুড়ের নির্মম প্রতিজ্ঞায় উদ্বিগ্ন একটি মাসের শেষ দিনের মুহূর্তগুলি বিলীন হতে থাকে। এগিয়ে আসে রাত্রির শেষ যাম। সুমুখের বাহুবন্ধন বরণ করে বিহ্বল হয়ে পড়ে থাকে কুমারী গুণকেশীর ফুল্ল যৌবনের উৎসর্গ।

ঊষাভাস জাগে আকাশপটে, জেগে ওঠে বিহগস্বর। সুমুখের বক্ষে নখরাঘাত করবার সুযোগ পেল না গরুড়। হতাশ হয়ে সরে যায় গরুড়ের ছায়া। মন্দারকুঞ্জের গন্ধমন্থর বাতাস দীর্ণ করে বিফলমনোরথ গরুড়ের ধিক্কার ধ্বনিত হয়—ব্যভিচারিণী মাতলিতনয়া!

চলে যায় গরুড়। সুপ্তোত্থিত বিহগের কণ্ঠকাকলীর মত হেসে ওঠে গুণকেশীর কণ্ঠস্বর। সুমুখের বাহুবন্ধন হঠাৎ ছিন্ন ক'রে উঠে দাঁড়ায় গুণকেশী।

হাস্যস্বরে চমকে ওঠে সুমুখ, কিন্তু দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়, গুণকেশীর দুই চক্ষুর প্রান্তে সেই দুটি অশ্রুবিম্ব ফুটে রয়েছে।—এ কি গুণকেশী?

গুণকেশী—তোমার প্রাণের বৈরী ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকেই ধিক্কার দিয়ে চলে গেল।

সুমুখ সে নির্মম তোমাকে ধিক্কার দিয়ে গেল কেন?

গুণকেশী—আমিই যে বিফল ক'রে দিলাম সে নির্মমের প্রতিহিংসার সব আশা। তুমি নিরাপদ, তুমি মুক্ত।

—গুণকেশী! প্রাণদায়িনী গুণকেশী! বিস্ময়ের আবেগ সহ্য করতে না পেরে চিৎকার ক'রে ওঠে সুমুখ।

গুণকেশী বলে—সুরপুরবাসিনী এক প্রগল্‌ভার এক রাত্রির মূঢ়তাকে ঘৃণা ক'রে এইবার পাতাললোকে চলে যাও নাগকুমার।

দুই হাতে মুখ ঢেকে, যেন ঐ সুন্দর মুখেরই এক দুঃসহ বেদনাচ্ছবি আচ্ছাদিত ক'রে দ্রুতপদে চলে যায় গুণকেশী। আকুল আগ্রহে আহ্বান করে সুমুখ—যেও না গুণকেশী।

ইন্দ্রসান্নিধান হতে ফিরে এসেছেন মাতলি। বিষণ্ণ হতাশ ও বেদনাভিভূত মাতলি। সুমুখের জন্য অমৃত দান করেননি দেবরাজ ইন্দ্র। শুধু অনুগ্রহ ক'রে এইমাত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, গরুড়ের কোপ হতে রক্ষা পাবে সুমুখ।

দেবরাজসখা মাতলির কন্যা গুণকেশীর পাণিপ্রার্থীকে শুধু আয়ু দান করেছেন দেবরাজ।

হেসে ফেলে সুমুখ—আমাকে অমৃত দিতে পারলেন না, তবে আমাকে বিদায় দেবার জন্য এইবার প্রস্তুত হোন দেবরাজসখা মাতলি।

শূন্যদৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন মাতলি। চলে যেতে চাইছে নাগকুমার সুমুখ। সুরপুরে এসে পারিজাতের চেয়েও সুন্দর মাতলিতনয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কোন মোহ জাগল না যার বক্ষে, কোন লোভ লাগল না যার চক্ষুতে, চলে যাচ্ছে সেই নিতান্তই এক অমৃতলোলুপ আকাঙ্ক্ষার জীব, অকৃতজ্ঞতা ও অমমতার আশীবিষ।

আবার হেসে ফেলে সুমুখ—আমি একাকী ফিরে যাব না বাসবসুহৃদ মাতলি।

হঠাৎ বিস্ময়ে অপ্রস্তুত হয়ে প্রশ্ন করেন মাতলি—কি বলছ সুমুখ?

সুমুখ—হ্যাঁ ইন্দ্রসারথি মাতলি, আপনাদের এই সুরপুরের সবই ছল-শোভার পারিজাত, হৃদয়ের পারিজাত শুধু একটি আছে, আমার সঙ্গে তাকে চলে যাবার অনুমতি দিন।

—কে সে?

আমার প্রাণদায়িনী সে। অমরপুরের অমৃত শুধু ছলনা করে ইন্দ্রসখা, কিন্তু মৃত্যুর মুহূর্তকেও মধুরতায় অমর করে দিতে পারে তারই দুই চক্ষুর অভিনন্দর দুটি অশ্রুবিন্দু।

—কার চক্ষুর অশ্রুবিন্দু?

আপনার কন্যা গুণকেশীর।

ইন্দ্রসারথি মাতলির এতক্ষণের বিষণ্ণ বদন আনন্দে সুস্মিত হয়। অদূরের ভবনদ্বারদেশের পুষ্পমালঞ্চের একটি স্নিগ্ধচ্ছায় নিভৃতের দিকে তাকিয়ে প্রসন্নচিত্তে আহ্বান করেন মাতলি—কন্যা গুণকেশী।

গুণকেশী সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। মন্ত্র পাঠ ক'রে কন্যা গুণকেশীর পাণি সুমুখের হস্তে সমর্পণ করেন মাতলি।

আর অমরপুর নয়, অশ্রুহীন এই অনন্ত হর্ষের দেশ হতে ক্ষণায়ুব্যথিত ভোগবতী পুরীর পথে সানন্দে এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় সুমুখ। স্নিগ্ধস্বরে আহ্বান করে—এস প্রিয়া গুণকেশী।

গুণকেশীর ব্যথিত দুই নয়নের কোণে সেই মধুর অশ্রুবিন্দু আবার ফুটে ওঠে—বল, তোমার মনে কোন দুঃখ নেই।

সুমুখ—কিসের দুঃখ?

গুণকেশী—অমরপুরীতে এসেও অমৃত পেলে না।

সাগ্রহে গুণকেশীর হাত ধ'রে সুমুখ বলে—পেয়েছি গুণকেশী।
গুণকেশী—পেয়েছ? পিতা তবে এনেছেন অমৃত?
সুমুখ—তোমার পিতা আমাকে দিয়েছেন অমৃত।
গুণকেশী—কোথায় সেই অমৃত?
সুমুখ—এই তো আমার সম্মুখে।
গুণকেশী--কি?
সুমুখ—তুমি।

# অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা

বিদ্রুমসঙ্কাশ বর্ণশিলার সোপান এবং বৈদূর্যখচিত স্তম্ভ, বিদর্ভরাজের সেই নয়নরম্য নিকেতনের এক স্ফটিককুট্টিমে নৃত্য করে এক মণিনূপুরিতা সৌদামিনী। বিদর্ভরাজের কন্যা লোপামুদ্রা যেন কোটি বনচম্পকের কান্তি-পীযূষধারায় শুভ্রধৌত এক কলধৌতদেহিনী। কজ্জলিতাক্ষী শত কিংকরীর কলহাস্যে পরিবৃতা লোপামুদ্রার অবিরল নৃত্যামোদচঞ্চল দেহ এই স্ফটিক-কুট্টিমের বক্ষে ক্ষণে ক্ষণে সুলাস্যলীলায়িত দ্যুতিচ্ছবির মায়াকুহক সঞ্চারিত করে। কনককেয়ূরের প্রভা, রত্নকাঞ্চীর বিপুলস্ফুরিত লাস্য, আর স্বর্ণ-তাটঙ্কের বিচ্ছুরিত রশ্মি দিয়ে রচিত মূর্তির মত সুশোভিতা কুমারী লোপামুদ্রা যেন পিতা বিদর্ভরাজের সকল ঐশ্বর্যের স্নেহে অভিষিক্তা এক আভরণেশ্বরী।

স্ফটিককুট্টিমে নৃত্য করে বিকচযৌবনা লোপামুদ্রা, আর সেই লীলায়িত বাহুক্ষেপ কটিভঙ্গ ও পদচ্ছন্দের উৎসবে যেন আত্মহারা হবার জন্য বিগলিত হয় লোপামুদ্রার মণিস্তবকিত বেণী, শিথিলিত হয় স্তোকোৎফুল্ল বক্ষের স্বচ্ছ অংশুকবসন, ছিন্ন হয়ে মৌক্তিকনির্ঝরের মত ঝরে পড়ে কণ্ঠের একাবলী রত্নহার।

চঞ্চল নিঃশ্বাস সংবরণের জন্য শান্ত হয়ে একবার দাঁড়ায় লোপামুদ্রা, তার পরে বেপথুভঙ্গা ভামিনীর মত কুতুকতরল নেত্রান্ত সমুত্থিত ক'রে হাস্যচঞ্চল স্বরে কিংকরীকে বলে—নব আভরণে সাজিয়ে দাও কিংকরী। নিয়ে এস ইন্দ্রনীলের কণিকা দিয়ে রচিত নূতন কটিমেখলা।

কিংকরী বিস্মিত হয়ে বলে—এইবার নৃত্য ক্ষান্ত কর রাজকুমারী।

লোপামুদ্রা বলে—না, বাধা দিও না কিংকরী। দাও, এই মুহূর্তে আমার দুই পায়ে পরিয়ে দাও কলহংসকণ্ঠের চেয়েও নিঃস্বনমধুর দুটি স্বর্ণবিনির্মিত হংসক। এখনি ক্ষান্ত হতে দেব না এই উৎসব।

কৌতুকিনী কিংকরী বলে—এমন ক'রে সকল রত্নাভরণ শিঞ্জিত ক'রে আর মন্দিরদাসী নর্তকীর মত ছন্দোময়ী হয়ে মনের কোন্ স্বপ্নের দেবতাকে বন্দনা করছ রত্নাধিকা লোপামুদ্রা?

চকিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নীলাকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তান্বিতার মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে লোপামুদ্রা। বিষণ্ণ অথচ স্নিগ্ধ স্বরে বলে—তোমার

অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নয় কিংকরী। দেখতে পেয়েছি, যেন আমার এই মনের এক স্ফটিককুট্টিমের নিভৃতে এক উৎসবের প্রদীপ জ্বলছে। দেবোপমকান্তি এক প্রেমিকের বিশালতৃষ্ণ দুটি চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি আমি। কিন্তু হারিয়ে গিয়েছে আমার সব রত্নাভরণ, কেয়ূর কাঞ্চী মঞ্জীর আর মৌক্তিকহার। আমার এই মধুর আতঙ্কের অর্থ বুঝতে পারছি না কিংকরী।

আতঙ্কিতের মত ছুটে এসে দাঁড়ায় বিদর্ভদুহিতা লোপামুদ্রার ধাত্রেয়িকা। সাশ্রুনয়নে বলে—উৎসব ক্ষান্ত কর দুর্ভাগিনী কন্যা।

লোপামুদ্রা—কেন?

ধাত্রেয়িকা—চুপ, কথা বলো না প্রশ্নমুখরা কন্যা। সাবধান, যেন ভুলেও কোন চাঞ্চল্যে রণিত না হয় তোমার স্বর্ণমঞ্জীর।

লোপামুদ্রা—কেন?

ধাত্রেয়িকা—চুপ চুপ। নীরব ক'রে রাখ তোমার মুখর রত্নাভরণ, যেন শুনতে না পায় ঋষি অগস্ত্য। লুকিয়ে ফেল তোমার বেণীমণিপ্রভা, যেন দেখতে না পায় ঋষি অগস্ত্য।

বিস্মিত স্বরে লোপামুদ্রা বলে—ঋষি অগস্ত্য?

ধাত্রেয়িকা—হ্যাঁ, নিঃস্ব রিক্ত ও চীরবাসসম্বল তপস্বী অগস্ত্য বিদর্ভরাজের এই রত্নপুরদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বিপন্নের মত আতঙ্কিত স্বরে সংবাদ শুনিয়ে দিয়ে পুনরায় অন্তঃপুরের দিকে চলে যায় ধাত্রেয়িকা। বিস্মিত হয় লোপামুদ্রা। এক রিক্ত ও নিঃস্ব তপস্বী এসে দাঁড়িয়েছেন কুবেরপ্রতিম ধনশালী বিদর্ভরাজের বৈদূর্যখচিত ভবনস্তম্ভের ছায়ার নিকটে, কিন্তু তার জন্য এত আতঙ্কিত হবার কি আছে? রহস্য বুঝতে পারে না কিংকরীর দল এবং কলহাস্য স্তব্ধ ক'রে বিষণ্ণ মুখে লোপামুদ্রার বিস্ময়াপ্লুত মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপরেই সেই অদ্ভুত বিপদের রহস্য বুঝবার জন্য অন্তঃপুরের অভিমুখে ত্বরিতপদে প্রস্থান করে।

নীলাকাশের দিকে আর একবার দুই ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষুর দৃষ্টি তুলে অস্ফুট-স্বরে হৃদয়ের বিস্ময় ধ্বনিত করে লোপামুদ্রা—ঋষি অগস্ত্য!

এক নিঃস্ব তপস্বী এসে দাঁড়িয়েছেন বিদর্ভরাজের ভবনদ্বারে, কিন্তু তার জন্য এমন ক'রে কেন আতঙ্কিত হয় ঐশ্বর্যসমাকুল এই বিরাট ভবনের অন্তরাত্মা? কেন লুকিয়ে ফেলতে হবে এই বেণীমণিপ্রভা? কেন নীরব ক'রে রাখতে হবে এই স্বর্ণমঞ্জীর? কঠোরহৃদয় লুণ্ঠকের মতই কি এই তপস্বী এসেছেন একটি কঠোর প্রার্থনার দ্বারা দানপুণ্যপরায়ণ বিদর্ভরাজের এই

ভবনের সকল রত্ন হরণ ক'রে নিয়ে চলে যাবার জন্য? তাই কি ভীত ও বিচলিত হয়েছে ধাত্রেয়িকা, আর তার দুই চক্ষু জলে ভরে উঠেছে?

দেখতে ইচ্ছা করে, কেমন সেই রত্নলোভাতুর ঋষির রূপ, আশ্রমনিভৃতের মৌন আর প্রশান্তি হতে ছুটে এসে যে ঋষি এখন লুব্ধ প্রার্থীর মত এক নৃপতির ভবনের দ্বারপ্রান্তপথে দাঁড়িয়ে আছে। তপশ্চর্যার পরিবর্তে রত্নকামনা বড় হয়ে উঠেছে যে অদ্ভুত তপস্বীর চিত্তে, তার প্রার্থনাকে ভয় করবারই বা কি আছে? এমন লুব্ধের কঠোর প্রার্থনাকে একটি কঠোর প্রত্যাখ্যানে বিমুখ ক'রে দিলে এই পৃথিবীর কোন দানব্রত যশস্বীর পুণ্যহানি হবে না।

স্ফটিককুট্টিমের অভ্যন্তর হতে যেন এক কৌতূহলের বিহগীর মত দুর্বার আগ্রহে ছুটে গিয়ে ভবন-পুরোভাগের নিকটে নবীন দূর্বায় আস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের প্রান্তে এসে দাঁড়ায় লোপামুদ্রা। গ্রীবাভঙ্গে হেসে ওঠে বেণীমণিপ্রভা, বায়ুভরে আন্দোলিত হয় স্বচ্ছ অংশুকবসনের অঞ্চল, কেলিমদ মরালের কলস্বরের মত বেজে ওঠে রূপমতী লোপামুদ্রার চরণলগ্ন স্বর্ণহংসক। যেন পৃথিবীর এক কঠোর লোভীর চক্ষু ও কর্ণকে উপেক্ষা করার জন্য এগিয়ে যেতে থাকে ভীতিলেশবিহীনা লোপামুদ্রা।

ঐ যে, ঐ লতাগৃহের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রার্থী। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় আর তাকিয়ে থাকে লোপামুদ্রা। বর্ষার বারিপরিস্ফীতা তটিনী যেন তার বিপুল ঊর্মিল প্রগল্ভতা ক্ষণিকের মত সংযত ক'রে তটস্থিত দেবদারুর দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যাধের সায়কাঘাতে বিদ্ধ হয়ে কূজনরতা পক্ষিণীর কণ্ঠ যেমন রবহারা হয় তেমনি হঠাৎ নীরব হয়ে যায় স্বর্ণহংসকের উদ্দাম মুখরতা। যেন এক সলজ্জ সন্ত্রাসের স্পর্শে শিহরিত হয়ে লোপামুদ্রা এক হাতে চেপে ধরে তার বেণীবন্ধের মণি আর এক হাতে অলজ্জ অংশুকবসনের অঞ্চল। বিদর্ভতনয়ার রত্নাভরণের সকল গর্বের উজ্জ্বলতা যেন সেই মুহূর্তে ক্ষুদ্র খদ্যোতের মত আত্মকুণ্ঠায় লুকিয়ে পড়বার পথ খুঁজতে থাকে।

দেখতে ইচ্ছা করে আরও ভাল ক'রে। এই অদ্ভুত ইচ্ছার আবেগ সংবরণ করতে পারে না লোপামুদ্রা। ধীরে ধীরে, যৌবনের প্রথম লজ্জাভারে মন্থর বনমৃগীর মত অদূরের লতাগৃহের শ্যামলতার দিকে লক্ষ্য রেখে সতৃষ্ণ নয়নে এগিয়ে যেতে থাকে লোপামুদ্রা। কিন্তু আর বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারে না। নবোদ্গত কিশলয়ে সমাকীর্ণ কোবিদারের বীথিকার অন্তরালে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। অভিসারভীরু দূরাকাঙ্ক্ষিণীর মত যেন গোপন নেপথ্যে দাঁড়িয়ে তরুণ তপস্বীর তপনীয়োপম তনুর অনুপম শুচিশোভাসুধা পান করতে থাকে লোপামুদ্রার বিস্ময়বিমুগ্ধ নয়নের কৌতূহল।

অগস্ত্য! নিঃস্ব রিক্ত চীরবাসসম্বল ঋষি অগস্ত্য! বিশ্বাস হয় না,

জগতের দুর্লভতম কোন রত্নের জন্য কোন লোভ ঐ দুটি দ্যুতিময় চক্ষুর ভিতরে লুকিয়ে থাকতে পারে। মনে হয়, ঐ রূপমানেরই পায়ের স্পর্শ পেলে রত্ন হয়ে যাবে তুচ্ছ যত ধূলির কণিকা। তবে প্রার্থীর মত কেন এসে দাঁড়িয়েছেন অগস্ত্য?

—তুমিই তো এই নিখিল রোদসীর রূপরুচির হৃদয়ের পরম প্রার্থনীয় রত্ন, তবে তুমি কেন এসে দাঁড়িয়েছ প্রার্থীর মত? কোবিদারকর্ণিকায় আসক্ত ষট্‌পদের ধ্বনি নয়, নিজেরই পিপাসিত চিত্তের গুঞ্জন শুনতে পেয়ে স্ফুটনোন্মুখ শতপত্রের মত সুস্মিত হয়ে ওঠে লোপামুদ্রার মুখশোভা।

মনে হয় লোপামুদ্রার, ঐ তো তার অন্তরনিভৃতের সেই স্ফটিককুট্টিমের সেই উৎসবের প্রদীপ, লতাগৃহের শ্যামলতার পাশে প্রভাময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মন বলে, যাও বিদর্ভতনয়া লোপা, সকল সংকোচ পরিহার করে একেবারে তার দুই চক্ষুর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াও, আর মন্দিরদাসী নর্তকীর মত নৃত্যভঙ্গে সকল আভরণ শিঞ্জিত ক'রে বন্দনা জানিয়ে ফিরে এস।

কিন্তু অসম্ভব, অসাধ্য এবং উচিতও নয়। নিজের মনের এই লজ্জাহীন দুঃসাহসকে নিজেই ভ্রূকুটি হেনে স্তব্ধ ক'রে দেয় লোপামুদ্রা। দেখে বুঝতে পারে লোপামুদ্রা, না ডাকলে ঐ মূর্তির কাছে আপনা হতেই এগিয়ে যাওয়া যায় না। আর, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেও বোধ হয় কোন লাভ নেই। অতি খরপ্রভ, অতি অচঞ্চল, আর অতি অবিকার ঐ তরুণ তপস্বীর দুটি চক্ষু। যেন কোন স্বপ্ন নেই ঐ চক্ষুতে আছে শুধু সংকল্প। কে জানে কিসের সংকল্প!

ফিরে যায় লোপামুদ্রা। কোবিদার-বীথিকার ছায়া পার হয়ে, নীরব ও নির্জন স্ফটিককুট্টিমের নিভৃতে আবার এসে দাঁড়ায়। দুঃসহ এক আত্মকুণ্ঠার বেদনা সহ্য করতে চেষ্টা করে লোপামুদ্রা কিন্তু পারে না। নিরোধ করতে পারে না উদ্গত অশ্রুর ধারা। বুঝতে পারে লোপামুদ্রা, জীবনে সে এই প্রথম এক প্রিয়দর্শনের মুখ দেখতে পেয়েছে, আর মনে মনে হৃদয় দান ক'রে চলে এসেছে। কিন্তু এ যেন নীলাকাশের বক্ষ লক্ষ্য ক'রে ক্ষুদ্র দুটি বাহুর আলিঙ্গনস্পৃহা। চুম্বনরসে বারিধির প্রাণ সিক্ত করার জন্য ক্ষুদ্র দুটি অধরের শিহরণ। অলভ্যকে লাভ করার জন্য অক্ষমের বাসনাবিলাস! প্রার্থী ঋষি তাঁর প্রার্থিতব্য কয়েক মুষ্টি রত্ন লাভ ক'রে চলে যাবেন এবং কল্পনাও করতে পারবেন না যে, তাঁরই প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী এক মণিনূপুরিতা নারী আজ অশ্রুসিক্ত হয়ে এই সংসারের এক নিভৃতে করকাহত শস্যমঞ্জরীর মত পড়ে রয়েছে।

কি চিন্তা করছেন পিতা বিদর্ভরাজ? ঋষি অগস্ত্যের প্রার্থনা কি তিনি

পূর্ণ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন? শান্তভাবে চিন্তা করতে করতে লোপামুদ্রা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। সকল কৌতূহল মথিত ক'রে শুধু একটি প্রশ্ন তার অন্তরে মুখর হয়ে ওঠে। কি বস্তু প্রার্থনা করলেন ঋষি অগস্ত্য? দ্রুতপদে অন্তঃপুরের দিকে চলে যায় লোপামুদ্রা।

কক্ষের দ্বারপ্রান্তের নিকটে এসেই হঠাৎ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে লোপামুদ্রা। শুনতে পায় লোপামুদ্রা, শোকাক্রান্ত স্বরে আলাপ করছেন পিতা ও মাতা।

আর্তনাদ করেন বিদর্ভরাজমহিষী—না, কখনই না আমার সুখলালিতা রত্নময়ী কন্যাকে নিঃস্ব রিক্ত চীরবাসসম্বল ঋষিব হস্তে সম্প্রদান করতে পারব না। প্রত্যাখ্যান কর লুব্ধ ঋষির প্রস্তাব।

বেদনাবিচলিত স্বরে উত্তর দান করেন বিদর্ভরাজ- উপায় নেই, অগস্ত্যের কাছে আমি অঙ্গীকারে আবদ্ধ।

কিসের অঙ্গীকার?

বলেছিলাম অগস্ত্যকে, যদি কোনদিন গার্হস্থ্যব্রত গ্রহণে অভিলাষী হন তপস্বী অগস্ত্য, তবে আমি আমারই কন্যাকে তাঁর কাছে সম্প্রদান করব।

ধিক্কার দিয়ে আবার বেদনামূর্ছিত স্বরে বিদর্ভরাজমহিষী বলেন—গৃহী হোক তপস্বী অগস্ত্য, এবং তাব জীবনসঙ্গিনী হোক অন্য কারও কন্যা। রিক্তের ও নিঃস্বের গৃহজীবনের সকল ক্লেশ ও দুঃখের সহভাগিনী হবে দীনসাধারণের কন্যা, আমার ঐশ্বর্যসুখিনী কন্যা লোপামুদ্রা নয়।

বিদর্ভরাজ বলেন—কিন্তু তুমি আমার সেই প্রতিশ্রুতির সব ইতিহাস জান না মহিষী। তোমার কন্যা লোপামুদ্রা যে ঋষি অগস্ত্যেরই কল্পনার সৃষ্টি।

—একথার অর্থ?

মনে আছে কি মহিষী, অনপত্য জীবনের শূন্যতা ও বেদনা হতে মুক্ত হবার জন্য সন্তান লাভের কামনায় একদিন আমি ব্রত পালন করেছিলাম?

হ্যাঁ মনে আছে।

—ব্রত সাঙ্গ ক'রে গঙ্গাদ্বারে গিয়ে নির্ঝরস্নান সমাপনের পর বিস্মিত হয়ে দেখেছিলাম, এক কিশোর তপস্বী সেই প্রভাতের নবতপনের আলোকে আশ্রম-তরুর পুষ্পিত শাখা স্পর্শ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে আর যেন স্বপ্নস্নাত দৃষ্টি তুলে খগ মৃগ মধুপের খেলা দেখছে।

—কে সেই তপস্বী?

—এই অগস্ত্য। 'গৃহী হও কুমার, প্রিয়াসেবিত হয়ে পুত্রলাভ কর, তবেই আমাদের অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হবে।' পিতৃগণের এই অনুরোধ স্বপ্নে শুনতে

পেয়েছিল অগস্ত্য। ব্রত সমাপন ক'রে এবং নির্ঝরস্নানে পরিশুদ্ধ হয়ে সে প্রভাতে আশ্রমতরুর পুষ্পিত শাখা স্পর্শ ক'রে জীবনসঙ্গিনীর আবির্ভাব কামনা করেছিল সেই কিশোর তপস্বী। চরাচরের সকল প্রাণের দেহশোভা হতে রূপ আহরণ ক'রে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হোক এক সকললোচন-মনোহরা নারী। ভ্রমরের কৃষ্ণতা নিয়ে রচিত হোক তার দুটি চক্ষু। মরালীর মৃদুলগতিরম্যতা, বনমৃগীর আয়তনয়নতা, জ্যোৎস্নাজীবিনী চকোরীর কোমল-তনুতা, আর মেঘসন্দর্শনে স্খলিতবর্হ প্রচলাকীর নৃত্যভঙ্গিমা নিয়ে সুন্দরী শোভনা ও সুরুচিরা হয়ে উঠুক সেই বরনারী। কিশোর তপস্বীর সেই কল্পনার পরিচয় পেয়ে ধন্য ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, আমারই সন্তানকামনা সফল করবার জন্য সেই ঋষির ভাষায় যেন মন্ত্রবাণী উচ্চারিত হয়ে উঠেছে। প্রার্থনা করেছিলাম, কিশোর তপস্বীর কল্পনা আমারই তনয়ারূপে আবির্ভূত হোক। এবং কিশোর তপস্বী অগস্ত্যকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, যদি অনপত্য বিদর্ভরাজ কন্যালাভ করে, তবে সেই কন্যা হবে অগস্ত্যেরই জীবনসঙ্গিনী।

বিদর্ভরাজের ভাবাকুল কণ্ঠস্বরও আবার হঠাৎ বেদনাঘাতে বিচলিত হয়ে ওঠে। –ঋষি অগস্ত্যের কল্পনা সত্য হয়েছে মহিষী, নিখিলের সকল প্রাণের দেহশোভা যেন রূপসার উপহার দিয়ে রূপোত্তমা লোপামুদ্রাকে নির্মাণ করেছে। ঋষি অগস্ত্যের আকাঙ্ক্ষিতা, ঋষি অগস্ত্যের কল্পনার পুষ্প, ঋষি অগস্ত্যের কামনাভাগিনী লোপামুদ্রাকে ঋষি অগস্ত্যেরই কাছে সম্প্রদানের জন্য প্রস্তুত হও মহিষী। আপত্তি করবার অধিকার আমাদের নেই।

ক্রন্দন করেন মহিষী- কিন্তু তোমার রত্নপ্রাসাদে লালিতা লোপামুদ্রা কি ঐ নিঃস্বের জীবনসঙ্গিনী হতে চাইবে?

কক্ষে প্রবেশ করে লোপা। বিদর্ভরাজ ও তাঁর মহিষীকে বিস্ময়ান্বিত ক'রে লোপা বলে—প্রতিশ্রুতি পালন করুন পিতা।

বিদর্ভরাজ বলেন—তুমি জান, কিসের প্রতিশ্রুতি?

লোপামুদ্রা—হ্যাঁ সবই শুনেছি পিতা ঋষি অগস্ত্যের কাছে আপনার প্রতিশ্রুতি।

বিদর্ভরাজ– নিঃস্ব ঋষির জীবনসঙ্গিনী হবে তুমি?

লোপামুদ্রা বলে—হ্যাঁ পিতা।

সম্প্রদত্তা লোপামুদ্রার আনন্দদীপ্ত আননের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হন বিদর্ভরাজ। বিস্মিত হন বিদর্ভরাজমহিষী। বিস্মিত হয় ধাত্রেয়িকা আর কিংকরীর দল। নিঃস্ব ঋষির বধূ হয়ে, এই রত্নময় প্রাসাদের স্নেহ হতে

বঞ্চিত হয়ে এক পর্ণকুটীরের অভিমুখে এখনি চলে যাবে যে বত্নসুখিনী কন্যা, তার মুখের হাসি দেখে মনে হয়, যেন এক আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নলোকের আশ্রয় লাভের জন্য সেই কন্যা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। যেন এক বিদ্যুল্লতা সূক্ষ্ম অংশুকবসনে সজ্জিত, মণিনূপুরে ঝংকৃত, কুঙ্কুমে বঞ্জিত আব সিন্দূরে সুরভিত হয়ে পতিগৃহে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

লতাগৃহের নিকটে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন ঋষি অগস্ত্য। বিদর্ভ ভবনেব অশ্রুসিক্ত বেদনার কাছ থেকে বিদায় নিযে লোপামুদ্রা ধীবে ধীবে এগিয়ে এসে ঋষি অগস্ত্যের সম্মুখে দাঁড়ায়। প্রণাম করে লোপা, সুস্বরে শিঞ্জিত হয় বত্নাভরণ যেন এক সঙ্গীতঝংকার এসে মূর্তিমতী হয়ে অগস্ত্যেব পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে।

অগস্ত্য ডাকেন—লোপামুদ্রা।

সুস্মিত অধরপুটে সুষমা বিকশিত ক'রে অগস্ত্যের মুখের দিকে তাকায লোপামুদ্রা। কিন্তু হঠাৎ বিষণ্ণ আব বিস্মিত হয় লোপামুদ্রা। আকাঙ্ক্ষিত জীবনসঙ্গিনীব দিকে তাকিয়ে আছেন অগস্ত্য কিন্তু কই, ঋষির ঐ চক্ষুতে প্রণয়স্মিত কোন আনন্দ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না কেন? সেই খরপ্রভ শান্ত ও নির্বিকাব দুটি চক্ষু, এবং যেন পাষাণে বচিত দুটি সুগঠিত অধব।

অগস্ত্য বলেন—সূক্ষ্ম অংশুকবসন মণিকণিকা আব বত্নজালে দেহ বিলসিত ক'রে কা'ব গৃহজীবনের আনন্দ বচনা করতে চাও নারী?

লোপা বলে—বিদর্ভরাজতনয়া লোপাব জীবনাধিক জীবনসঙ্গীব গৃহজীবন।

অগস্ত্য বলেন—কিন্তু এই আভবণ যে গর্হিত বিলাসভাব। ঋষিবনিতাব অঙ্গে এই ধ্বনিমুখর ও মণিময় আভরণ পুণ্যক্ষয়কারী বিলাসসজ্জা মাত্র।

লোপা আর্তস্বরে বলে—বিলাসসজ্জা নয় ঋষি।

অগস্ত্য—তবে কি?

লোপা—ঋষিরই প্রণয়প্রীতা এক প্রেমিকা নারীর হৃদয়ের উৎসবসজ্জা।

অগস্ত্য বিস্ময় প্রকাশ করেন। উৎসবসজ্জা? ঋষিব জীবনে উৎসবে প্রয়োজন নেই উৎসববিচক্ষণা রাজতনয়া।

লোপা—প্রয়োজন আছে স্বামী। আপনার জীবনে আপনারই এই প্রণ ধন্যা নারীর স্মিতহাস্য প্রিয়বচন আর নয়নপ্রীতির প্রয়োজন আছে।

যেন জীবনেব এক স্বপ্নভঙ্গেব বেদনায় বাষ্পাসারে অভিভূত হয় লোপাম নয়ন। প্রেমিকের বিশালতৃষ্ণ সুস্মিত চক্ষুব সম্মুখে নয়, এক তপস্ খরপ্রভ দুটি চক্ষুর সম্মুখে লোপামুদ্রা আজ দাঁড়িয়ে আছে যে তপস্ব জীবনে জীবনসঙ্গিনীর স্মিতহাস্য আর নয়নপ্রীতির কোন প্রয়োজন নেই।

ব্যথাবিহ্বল স্বরে লোপামুদ্রা বলে—প্রিয়সঙ্গবাসনায় অরণ্যের করেণুকাও পদ্মরেণুভূষিতা হয়ে উৎসব অন্বেষণ করে। আর, আপনি আপনারই আকাঙ্ক্ষিতার কনককেয়ূর ও কবরীর মণিপ্রভা কেন সহ্য করতে পারবেন না ঋষি?

অগস্ত্য—আমি জানি রাজতনয়া, তোমার অধর রত্নাভরণের শিঞ্জনে সুস্মিত হয়।

লোপা- আপনারই অভ্যর্থনার জন্য স্বামী। রত্নাভরণের ঝংকার আর দীপ্তিকে নয়, আমার অনুরাগরঞ্জিত জীবনের স্মিতহাস্যকেই রত্নাভরণে সাজিয়ে আপনাকে উপহার দিতে চাই। আমার এই স্বপ্ন ব্যর্থ ক'রে দেবেন না ঋষি।

অগস্ত্য বলেন -ঋষি অগস্ত্যের পুত্রের মাতা হবে তুমি, একমাত্র এই ব্রত গ্রহণ ক'রে আমার একমাত্র সংকল্প সত্য ক'রে তুলবে। এর জন্য তোমার কণ্ঠে রত্নমালিকার শোভা ধারণ করবার প্রয়োজন হয় না লোপামুদ্রা। নারীর কুঙ্কুমচিত্রিত চিবুক আর সিতচন্দনসিক্ত তনু চাই না। নারীর স্মিতহাস্য আর নয়নপ্রীতি চাই না। এই বিলাসসজ্জা বর্জন কর, আর চীরবাস বল্কল ও অজিন গ্রহণ ক'রে আমার কাছে এসে দাঁড়াও ঋষিবধূ লোপামুদ্রা।

লোপামুদ্রার কণ্ঠে আর্তনাদ শিহরিত হয় -স্বামী!

অগস্ত্য—কি?

লোপামুদ্রা- তুচ্ছ রত্নাভরণ ঘৃণা করুন, কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু, আপনার জীবনের প্রণয়বিহ্বল কোন মধুর ক্ষণে আপনারই জীবনের সুখদুঃখ-ভাগিনী এই নারীর অধরপুটে বিকশিত একটি ক্ষুদ্র স্মিতহাস্যও কি আপনার প্রয়োজন হবে না ঋষি?

অগস্ত্য—না, কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

অশ্রু গোপন করবার জন্য মুখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে লোপামুদ্রা। হ্যাঁ, তার কল্পনার সেই মধুর আতঙ্কের আতঙ্কটুকুই শুধু সত্য হয়েছে, আর মিথ্যা হয়ে গিয়েছে সব মধুরতা। বিদর্ভরাজতনয়ার শুধু এই জীবন্ত দেহ য়ে গিয়ে তাঁর আশ্রমের পর্ণকুটীরে একটি সংকল্পের বস্তু ক'রে রাখতে ছেন ঋষি। কোথায় গেল সেই কিশোর ঋষির মন, নিখিল প্রাণের রূপ আহরণ র যে তার জীবনসঙ্গিনীর তনু নির্মাণ করতে চেয়েছিল একদিন? রূপ না করেছিল যে, সে আজ রূপের হাসিটুকুও দেখতে চায় না। প্রেমিকের লতৃষ্ণ ও সুস্মিত দুটি চক্ষুর সম্মুখে এসে একদিন ধন্য হবে লোপামুদ্রার নের স্বপ্ন, এই কল্পনা কি ছলনা হয়ে মিলিয়ে গেল চিরকালের মত?

কিন্তু আর চিন্তা করে না, এবং আর বিলম্ব করে না লোপা। খুলে ফলে সকল রত্নাভরণ, মুছে ফেলে চিবুকের চিত্রিত কুঙ্কুমবিন্দু। বিদর্ভ-

রাজভবনে করুণ বিলাপের রোল বেজে ওঠে। চীরবাস বল্কল আর অজিন ধারণ ক'রে ঋষির সহচরী হয়ে চলে যায় লোপামুদ্রা।

পুণ্যপ্রদা ভাগীরথী যেন নভস্তলে পবনধৃত পতাকার মত শোভমান। ভাগীরথীর শীকরনির্ঝর শিখর হতে শিখরান্তরে ঝরে পড়ছে। সলিলধারা যেন নাগবধূর মত শিলাতলের অন্তরালে লুকিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে। গঙ্গাদ্বারের রমণীয় এই শৈলপ্রস্থে অগস্ত্যের আশ্রমে প্রতি প্রভাতে খগ মৃগ মধুপের আনন্দ জাগে। সকলিকা সহকারলতা বায়ুভরে আন্দোলিত হয়। উৎপলকেশরের সুরভিত রেণু গায়ে মেখে গুঞ্জন করে ভৃঙ্গ। শিশিরস্নাত নবীন শাদ্বলে বিম্বিত হয় নবমিহিরের রশ্মিলেখা। গলিত গৈরিকের অলক্তকে রঞ্জিত হয় পুষ্পিত লতাকুঞ্জের পদতলভূমি। সুন্দর হয়ে সেজে ওঠে আশ্রমের তরু লতা ও পল্লব। শুধু অগস্ত্যবধূ লোপা সুন্দর হয়ে সেজে ওঠে না।

যেন বল্কলিতা সৌদামিনী! অগস্ত্যবধূ লোপামুদ্রা শুধু স্বামী-নির্দেশিত গৃহকর্ম ও ব্রত পালন করে। ঋষি অগস্ত্যও তাঁর প্রাত্যহিদিনের পূজা ধ্যান ব্রত ও তপশ্চর্যায় এক কঠিন শান্ত ও শুচিতানিষ্ঠ জীবন যাপন করেন। সন্ধ্যারাগে অরুণিত আশ্রমভূমির উপান্তে বেনুকিশলয় মুখে নিয়ে নর্মবিহ্বল মৃগদম্পতি ছুটোছুটি করে। জ্যোৎস্নী যামিনীর কিরণসুধা পান করার জন্য শাল্মলীর কোরক উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু স্মিতহাস্য অধরদ্যুতি আর নয়নপ্রীতির কোন উৎসব নেই আশ্রমের শুধু এই দুটি মানুষের জীবনে ঋষি অগস্ত্য ও অগস্ত্যবধূ লোপামুদ্রা।

একদিন নির্ঝরসলিলে স্নান সমাপন ক'রে আশ্রমে প্রবেশ করতেই দেখতে পেলেন অগস্ত্য, পুষ্পিত তরুশাখা স্পর্শ ক'রে অপলক নয়নে নীলাকাশের দিকে তাকিয়ে আছে লোপামুদ্রা। যেন স্বপ্নায়িত ও সুদূরিত এক কামনার দিকে তাকিয়ে নারীর দুটি ভ্রমরকৃষ্ণ নয়ন মুগ্ধ হয়ে রয়েছে। নিজেরই অন্তরে অদ্ভুত এক চাঞ্চল্য অনুভব করেন কঠোরতাপস অগস্ত্য। মনে পড়ে একদিন তিনিও এইভাবে পুষ্পিত তরুশাখা স্পর্শ ক'রে জীবনসঙ্গিনীর আবির্ভাব কামনা করেছিলেন। গৃহী হও কুমার, পুত্রলাভ কর কুমার, স্বর্গত পিতৃগণের সেই অনুরোধ যেন ঋষি অগস্ত্যের হৃৎপিণ্ডে সুস্বরমধুর কলরোলের মত বেজে ওঠে।

অগস্ত্য ডাকেন—লোপা।

চমকিত হয়ে তাকায় লোপামুদ্রা, কিন্তু শান্তস্বরে প্রত্যুত্তর দেয়—আদেশ করুন।

নিকটে এগিয়ে এসে অগস্ত্য বলেন—আমার ইচ্ছা, তুমি এই তরুশাখার মতই বাৎসল্যে পুষ্পিত হও লোপা।

লোপা—আপনার ইচ্ছা সত্য হোক।

ব্যথিতভাবে তাকিয়ে ঋষি অগস্ত্য বলেন—এ কেমন আচরণ লোপা? আমার হৃদয়ের এই মধুর অশান্ততার আবেদন শুনে কি এতই শান্তস্বরে উত্তর দিতে হয়? কোন বিস্ময় আর কোন আনন্দ কি আমার এই আহ্বানে নেই?

লোপা—আমি আপনার আদেশের দাসী। আপনার ইচ্ছার কাছেই সর্বক্ষণ সমর্পিতা হয়ে আছি। আপনি ব্যথিত হবেন না ঋষি আদেশের দাসী কখনও বক্ষে বিস্ময় ও নয়নে আনন্দ নিয়ে আপনার কাছে প্রগলভা হতে পারে না, সে দুঃসাহস তার নেই।

অগস্ত্য—ভুল করো না লোপা। পুষ্পিত হবার আগ্রহে ব্রততী যেমন বিহ্বল হয়ে সমীরণের উল্লাস আপন বক্ষে গ্রহণ করে তেমনি তুমি তোমার ঐ শান্ত অধরপুট স্মিতহাস্যে বিহ্বল ক'রে তোমার স্বামীকে আজ গ্রহণ কর।

লোপামুদ্রা—পারি না ঋষি।

আহত ব্যথিতের মত আর্তনাদ করেন অগস্ত্য-লোপা, সুন্দরদেহিনী লোপা।

লোপা—আপনার সংকল্পে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হয়েই রয়েছে আপনার লোপামুদ্রার সুন্দর দেহ।

অগস্ত্য—এই নিষ্ঠুরতা পরিহার কর অগস্ত্যবাঞ্ছিতা লোপা। শুধু ক্ষণতরে ঐ সুন্দর অধর স্মিতহাস্যে মায়াময় ক'রে অগস্ত্যের শুষ্ক কঠোর ও তপঃক্লিষ্ট জীবনে এই কামনাস্মিত লগ্নের প্রথম সঞ্চার সুতৃপ্ত কর লোপা।

লোপা—নারীর তুচ্ছ একটি স্মিতহাস্যের জন্য এত ব্যাকুলতা কেন ঋষি?

অগস্ত্য—জানি না লোপা, শুধু বুঝেছি, আমার বক্ষের নিঃশ্বাস আজ প্রিয়া লোপামুদ্রার ওষ্ঠচ্ছুরিত একটি স্মিতহাস্যের জন্য তৃষ্ণায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে, চৈত্রমলয় যেমন কুসুমকুঞ্জের সুরভি পান করার জন্য অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

লোপা বলে—পারব না ঋষি।

অগস্ত্য—কেন?

লোপা—বল্কলিতদেহা এই রাজতনয়ার কাছ থেকে স্মিতহাস্য আশা করবেন না।

চমকে ওঠেন অগস্ত্য—তবে?

লোপা—চাই রত্নাভরণ। যদি কনককেয়ূরে স্বর্ণকাঞ্চীদামে আর মণি-

নূপুরে আমাকে সাজিয়ে দিতে পারেন, তবেই আপনার লোপামুদ্রা স্মিতহাস্যে সুন্দরতরা হয়ে আপনার এই প্রণয়াসঙ্গের আহ্বানে সাড়া দিতে পারবে। যদি না পারেন, তবে লোপামুদ্রা নামে এই নারীকে শুধু পাবেন, কিন্তু সে নারীর অধরের স্মিতহাস্য পাবেন না।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন ঋষি অগস্ত্য। তারপর শান্তস্বরে বলেন– রত্নাভরণ এত ভালবাস লোপা?

উত্তর দেয় না লোপামুদ্রা।

কিন্তু, ঋষি অগস্ত্যের মনে আর কোন ক্ষোভ জাগে না। নীরবে শুধু লোপার মুখের দিকে যেন সমদুঃখভাগী বান্ধবের মত ব্যথিত দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন অগস্ত্য। মিথ্যা বলেনি লোপা, নিঃস্ব ঋষির নিরাভরণ গৃহজীবনের ক্লেশ ও রিক্ততা সহ্য করতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে এই সুখাভিলাষিণী সুন্দরী নারীর ঐ শশিকলার মত অধরের চন্দ্রিকা।

অগস্ত্য বলেন—তোমার অভিলষিত রত্নাভরণ পাবে লোপা। প্রতীক্ষা কর। আমি আমার যশ মান এবং তপস্যার পুণ্য ক্ষয় ক'রেও তোমার জন্য রত্নাভরণ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসছি।

অপরাহ্ণের আকাশ রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। আশ্রমে ফিরে এসেছেন অগস্ত্য। এবং নিয়ে এসেছেন অজস্র রত্নাভরণ।

প্রার্থী হয়ে নৃপ শ্রুতর্বার নিকটে গিয়েছিলেন অগস্ত্য। প্রার্থনা পূর্ণ করেননি শ্রুতর্বা। বিমুখ হয়ে নৃপ ব্রধশ্বের ভবনদ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করলেন নৃপ ব্রধশ্ব। তারপর প্রত্যাখ্যান করলেন নৃপ ত্রসদস্যু। অবশেষে দানবপতি ইল্বলের নিকট হতে অজস্র বস্ত্র কাঞ্চন ও মণিযুত আভরণ নিয়ে ফিরে এসেছেন অগস্ত্য। সহাস্যে লোপামুদ্রার দিকে তাকিয়ে বলেন—এই নাও আর সুখী হও লোপা, রত্নাভরণের শিঞ্জন শুনে তোমার অধরদ্যুতি চমকিত হোক। আমি যাই।

লোপা আর্তনাদ ক'রে ওঠে—কোথায় যাবেন স্বামী?

শ্রান্ত ও ক্লান্ত স্বরে, এবং মৃদুহাস্যে যেন তাঁর অন্তরের এক বিষণ্ণ বেদনাকে লুকিয়ে রেখে অগস্ত্য উত্তর দেন—আশ্রমনির্ঝরের তটে, তোমারই রচিত মল্লীবিতানের নিভৃতে, তোমারই প্রতীক্ষায়।

চ'লে গেলেন ঋষি অগস্ত্য এবং আশ্রমনির্ঝরের নিকটে এসে দাঁড়াতেই বুঝতে পারেন দুর্বহ এক বেদনা যেন তাঁর অন্তরের গভীরে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। এই মল্লীবিতান লোপামুদ্রারই রচনা। কিন্তু মনে হয় এই মল্লী-বিতানের সৌরভ ও শোভা যেন প্রাণ হারিয়েছে। জীবনের সঙ্গিনীকে

প্রণয়োৎসবে আহ্বান করেছেন অগস্ত্য, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় এই মল্লীবিতানের পুষ্পে ও লতায় যখন চন্দ্রলেখার হাস্যজ্যোতি লুটিয়ে পড়বে, তখন তার সম্মুখে উপস্থিত হবে যে নারী, সে নারী শুধু রত্নাভরণ ভালবাসে। নিঃস্ব ঋষির অনুরাগের আহ্বানে নয়, ঋষির দুরায়াসপ্রাপ্ত রত্ন-কাঞ্চনের স্পর্শ পেয়ে সে নারীর অধরজ্যোৎস্না জেগে উঠবে।

যেন বিষণ্ণ এক তন্দ্রার মধ্যে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন অগস্ত্য, এবং চক্ষু উন্মীলন ক'রেই সন্ত্রস্তের মত চমকে উঠলেন। সন্ধ্যাকাশের বুকে ক্ষীণ হিমকররেখা হেসে উঠেছে। লোপার আসবার সময় হয়েছে। মিলনলগ্নের ইঙ্গিত জানিয়ে উড়ে বেড়ায় মল্লীবিতানের প্রজাপতি।

কিন্তু কল্পনা করতেই যেন অন্তরের গভীরে এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দংশন অনুভব করেন অগস্ত্য। যেন তাঁর প্রণয়োৎসুক জীবনের অপমান রত্নাভরণে ঝংকৃত হয়ে তাঁর বক্ষের দিকে এগিয়ে আসছে। আসছে এক রত্নপ্রেমিকা নারী। কি মূল্য আছে ঐ স্মিতহাস্যের? সে হাসি তো লোপা নামে প্রেমিকার মুখের হাসি নয়, এক রত্নশিলার হাসি।

কিন্তু কে এই নারী? অকস্মাৎ চমকে উঠলেন অগস্ত্য এবং দেখলেন যেন সুধারসে তরঙ্গিত নয়ন মদাবেশবিহ্বলা এক নারী অনাবরণ অঙ্গশোভায় জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হয়ে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বর্ণমঞ্জীর নেই, রত্নমেখলা নেই। নেই কনককেয়ূর আর ইন্দ্রনীলমণিহার।

বিস্মিত অগস্ত্য প্রশ্ন করেন -কে তুমি?

নারী বলে —চেয়ে দেখ কে আমি।

দেখতে পান অগস্ত্য, যেন স্নিগ্ধ চন্দ্রাংশুবিস্পর্ধী এক স্মিতহাস্যজ্যোতি শরীরিণী হয়ে, সকল কান্তি কল্লোলিত ক'রে, আর উচ্ছল যৌবনসম্ভার শুধু একটি বল্কলে বলয়িত ক'রে তাঁরই বক্ষোলগ্ন হবার কামনায় নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে।

অগস্ত্যের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ধ্বনিত হয়—তুমি লোপামুদ্রা!

—হ্যাঁ আমি তোমারই বল্কল উপহারে ধন্যা লোপামুদ্রা।

-কই তোমার রত্নাভরণ?

—পড়ে আছে তোমার পর্ণকুটীরের দ্বারে।

—কেন?

—আমি রত্নপ্রেমিকা নই ঋষি।

বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে তাকিয়ে থাকেন অগস্ত্য। লোপা বলে—আমার ওষ্ঠপুটের স্মিতহাস্য দেখবার জন্য যে ঋষির হৃদয় আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, আমি তাঁরই প্রেমিকা। এতদিন সেই প্রেমিকের প্রতীক্ষায় ছিলাম। আজ

পেয়েছি তাঁর হৃদয়, এবং তাঁর সেই হৃদয়ই হলো ঋষিবধূ লোপার জীবনের একমাত্র অলংকার।

অগস্ত্য ডাকেন—প্রিয়া লোপা!

দেখতে পায় লোপা, এক প্রেমিকের বিশালতৃষ্ণ ও সহাস্মিত দুটি চক্ষু তাকে আহ্বান করছে।

# অতিরথ ও পিঙ্গলা

নৃপতি অতিরথের প্রাসাদে নৃত্যসভা। কাঞ্চনময় মঞ্চের উপরে বসেছিলেন অতিরথ। তাঁর এই রাজসিক উচ্চতার মর্যাদা রক্ষা ক'রে মাণ্ডলিকবর্গ বসেছিলেন নীচে, হর্ম্যতলের উপরে রাঙ্কবে আবৃত এক-একটি দারুবেদিকার উপর। নৃপতি ও মাণ্ডলিকের মর্যাদার ব্যবধান অনুসারে উভয়ের আসনের মধ্যে যতখানি ব্যবধান থাকা উচিত তা'ও ছিল। নৃপতি অতিরথের কাঞ্চনময় মঞ্চাসন থেকে কিঞ্চিৎ দূরে বসেছিলেন মাণ্ডলিকের দল। উভয়ের মাঝখানে শূন্য হর্ম্যতলের অনেকখানি স্থান জুড়ে পুষ্পবলয়ে বেষ্টিত নৃত্যস্থলী। রাজধানীর শ্রেষ্ঠ রূপসী ও কলাবতী বারাঙ্গনারা এসে নৃত্যে-গীতে প্রতি সন্ধ্যায় অতিরথের প্রাসাদে উৎসব প্রমোদিত ক'রে চলে যায়।

কুমার নৃপতি অতিরথ, তরুণ দেবদারুর মত যৌবনাঢ্য মূর্তি। অসাধারণ রূপমান। অতিরথের নেত্রভঙ্গীতে অদ্ভুত এক অসাধারণত্ব আছে। যেন কোন্ এক ঊর্ধ্বলোক হতে তিনি অধঃপতিত মানবসংসারের দিকে তাকিয়ে আছেন। চতুর্দিকের এই রূপরসগন্ধস্পর্শকাতর মানুষগুলির দুর্বল জীবনের যত লোভ আশা আর উল্লাসগুলিকে তুচ্ছ করেন ঘৃণা করেন এবং কখনও বা করুণা করেন। কত সহজে এরা মুগ্ধ হয়, কত তুচ্ছের উপর এরা প্রলুব্ধ হয়!

নৃপতি অতিরথের মনে মুনিজনসুলভ বৈরাগ্যময় জীবনের জন্য কোন আগ্রহ নেই। উৎসবপরায়ণ মৃগয়াপ্রিয় ও রণোৎসুক নৃপতি অতিরথ। প্রেম প্রণয় ও অনুরাগের এই পৃথিবীর মাঝখানেই তিনি আছেন, অথচ এই জগতের কোন তৃষ্ণা যেন তাঁর হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না এমনই এক দুর্ভেদ্য বর্মে তিনি তাঁর হৃদয়বৃত্তি আচ্ছাদিত ক'রে রেখেছেন।

এই কাঞ্চনময় মঞ্চের উপর সমাসীন থেকে নৃপতি অতিরথ অবিচলিত নেত্রে কতবার নৃত্যে-গীতে বিলাসিত সান্ধ্য উৎসবের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করেছেন, নৃত্যপরা বারবিলাসিনীর তাণ্ডবিত ভ্রূলতা কত বৃদ্ধ মাণ্ডলিকের সম্বিৎ মদবেদনায় মথিত ক'রে তুলেছে। কেউ কণ্ঠ হতে গন্ধপুষ্পের মালিকা তুলে নিয়ে নর্তকীর মঞ্জীরিত চরণের উপর নিক্ষেপ করেছে। চঞ্চলবিলোচনা বারসুন্দরীর কুটিলিত ওষ্ঠসন্ধি হতে বিচ্ছুরিত একটি মদহাস্যের বিভ্রমে আত্মহারা হয়ে কেউ উষ্ণীষ হতে ভূষণরত্ন চয়ন ক'রে অঞ্জলিপুটে তুলে ধরেছে, উপহার দেবার জন্য। গীতপটীয়সী গণিকার কবরীচ্যুত কুসুমকোরক ব্যগ্র

বাহু প্রসারিত ক'রে তুলে নিয়ে উষ্ণীষে ধারণ করেছে কত যুবক মাণ্ডলিক। দেখে বিস্মিত হয়েছেন অতিরথ, কত সহজে এবং কত সামান্য লোভনীয়ের জন্য এরা এমন ক'রে নিজেকে বিলিয়ে দেয়।

নৃত্যসভার চারিদিকে বিবিধ ধাতব আধারে শিলারস পোড়ে, হেমদণ্ডের শীর্ষে খরদ্যুতি দীপিকা জ্বলে, পরিব্যাপ্ত পুষ্পস্তবক হতে উত্থিত পরিমলে বায়ু বিহ্বল হয়। আজ এই সন্ধ্যার উৎসব প্রমোদিত করবে বারাঙ্গনা পিঙ্গলা। মাণ্ডলিকেরা প্রতীক্ষাকুলচিত্তে নিঃশব্দে বসেছিলেন। পিঙ্গলা এখনও আসেনি।

অতিরথের চিত্তে কোন প্রতীক্ষা নেই, আগ্রহ নেই, আকুলতা নেই। তিনি যেন অনেক উচ্চে ও অনেক দূরে নিজেকে সরিয়ে রেখে নিত্য দিনের একটি নিয়মিত রাজকার্য মাত্র পালন করার জন্য বসে আছেন।

রাজ্যের সকলেই বিশ্বাস করেন, নৃপতি অতিরথ সত্যই অসাধারণ। অরণ্যে নয়, বৃক্ষকোটরে নয়, গিরিগুহাতে নয়, প্রেমপ্রণয়ে বিচলিতচিত্ত এই সংসারের মধ্যে থেকেও এবং বিপুল রূপ রত্ন রাজ্য ও যৌবনের অধিকারী হয়েও নৃপতি অতিরথ অবিচলিত রয়েছেন। মাণ্ডলিকেরা নৃপতি অতিরথের সম্মুখেই স্তোকবচনে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে—নৃপতি অতিরথ, বনবাসী বায়ুপায়ী ও কৃচ্ছ্রসাধক মুনিজনের বৈরাগ্যের চেয়েও আপনার এই নির্লেপ অনেক বেশী মহৎ।

পৃথিবীর কামনাগুলির নিকটেই থাকেন নৃপতি অতিরথ, কিন্তু মন তাঁর দূরেই থাকে। কত রাজতনয়ার স্বয়ংবরসভায় যাবার জন্য আমন্ত্রণ আসে। সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন না অতিরথ। কিন্তু বরমাল্যপ্রয়াসী হয়ে নয়, দর্শক অতিথিরূপে তিনি রাজকুমারীদের স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত থাকেন। নিজেকে এর চেয়ে আর বেশি দুর্বল ও সাধারণ ক'রে ফেলতে পারেন না।

স্বয়ংবরসভায় এসে শুধু দর্শকের মত তিনি তাকিয়ে দেখেন, পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে রূপরম্যা রাজকুমারী তাঁর সম্মুখে এসে চমকিত চিত্তের আগ্রহ রোধ করতে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়ায়। আয়তাক্ষী কুমারীর কম্র দৃষ্টি পিপাসাতুর হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘশ্বাস ক্ষণিকের মত কুমারীর বক্ষোবাস কম্পিত ক'রে আবার গোপনে মিলিয়ে যায়। স্পৃহাহীন দুই চক্ষু তুলে দেখতে থাকেন অতিরথ। রাজকুমারীর মনে হয়, যেন এক পাষাণের বিগ্রহ তার সম্মুখে রয়েছে, সুকঠিন ও বেদনাহীন। স্পন্দিত হস্তে পুষ্পমাল্য ধারণ ক'রে স্বয়ংবরা রাজপুত্রী দ্রুত অন্য পথে সরে যায়; বিষণ্ণ বদন ও অলস নয়ন নিয়ে অন্যান্য পাণিপ্রার্থী রাজকুমারদের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

আজ পর্যন্ত কোন নারীর কাছে আত্মদানের আগ্রহ অনুভব করেননি

নৃপতি অতিরথ। ইচ্ছা করে না, এত সহজে এত সাধারণের মত হয়ে যেতে। তার চেয়ে এই ভাল। বরং আনন্দ আছে, অনুপম রূপে ও যৌবনে ভূষিত তাঁর পৌরুষের শ্লাঘা নিয়ে কামনার সুচারু পুত্তলিকার মত এই সব বরমাল্য-ধারিণীর দুই চক্ষুর আবেদন তুচ্ছ করতে, শৈলভূমির দেবদারু যেমন স্পর্ধিত-শিরে তার পদপ্রান্তবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে। আনন্দ আছে, এই সব বিম্বাধরের অভিমানগুলিকে তুচ্ছ করতে কজ্জলিত চক্ষুর পিপাসাগুলিকে অমান্য করতে, স্মরমদাতুর ভ্রূবল্লীর ভঙ্গিমাগুলিকে মনে মনে উপহাস করতে। তাঁর সব আকাঙ্ক্ষা আর হৃদয়বৃত্তিগুলিকেও যেন এক দেবত্বের গর্বে গঠিত ক'রে নিয়ে তিনি অত্যুচ্চ এক কাঞ্চনমঞ্চে পাষাণ-বিগ্রহের মত স্থাপিত ক'রে রেখেছেন। পৃথিবীর কোন নারীকে বন্দনা করবার জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা সেই গর্বের ঊর্ধ্বলোক হতে নেমে আসতে রাজি নয়। রূপাতিশালী কুমার অতিরথ কোন নারীর রূপের কাছে উপাসকের মত এসে দাঁড়াতে পারেন না।

শুধু কল্পনা করতে ভাল লাগে, পৃথিবীর কোন এক নারী যেন দূরান্তের এক নিভৃত হতে তাঁর এই যৌবনধন্য জীবনের সকল কামনাকে প্রতি মুহূর্তের চিন্তায় ও স্বপ্নে আহ্বান করছে, তপস্বিনী যেমন তার সকল সংকল্প উৎসর্গ ক'রে অহরহ দেবতার সান্নিধ্য প্রার্থনা করে। সে নারীর কাছে জগৎ মিথ্যা হয়ে গিয়েছে, সত্য শুধু নৃপতি অতিরথের প্রেম।

কিন্তু এমন নারী কি আছে? না থাক তবু এমনই এক অসাধারণী প্রেমতাপসিকার মূর্তিকে কল্পনায় দেখতে ইচ্ছা করে, আর নিজেকে দেবতারই মত দুষ্প্রাপ্য ও দুরারাধ্য ক'রে রাখতে ভাল লাগে।

অকস্মাৎ নূপুরনিক্কণের আঘাতে চমকিত হয় নৃত্যসভাতল। বারাঙ্গনা পিঙ্গলা প্রবেশ করে।

বিলোলহারাবলীললিত পীনোন্নত বক্ষ, হরিচন্দনবিরচিত চিত্রকে চর্চিত চিবুক, কুন্দাভ স্মিতচন্দ্রিকার মত হাসি, সিন্ধুজলবিধৌত রক্তপ্রবালের মত অধরদ্যুতি, স্তোকোৎফুল্ল কোকনদোপম সুকোমল পদতল এবং কর্পূরপরাগে সুবাসিত গ্রীবা—রূপাজীবা পিঙ্গলা তার কস্তুরিকাবাসিত চীনাম্বর আন্দোলিত ক'রে, স্তবকিত চিকুরের মৌক্তিকজালিকা চঞ্চলিত ক'রে, আর মণিময় রত্নাভরণ শিঞ্জিত ক'রে পুষ্পবলয়ে চিহ্নিত নৃত্যস্থলীর মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

সভাস্থলের আর এক প্রান্তে উপবিষ্ট বাদকবর্গের ক্রোড়ে সুষুপ্ত এবং নীরব স্বরযন্ত্র অকস্মাৎ জাগ্রত ও মুখর হয়ে ওঠে। বীণা বিপঞ্চী মৃদঙ্গ ও মন্দিরা। মাণ্ডলিকবর্গ উৎসুক ও উৎকণ্ঠ হয়ে ওঠেন। কিন্তু দেখা যায়, উল্লাসলিপ্সু এই উৎসবস্থলীর সকল চঞ্চলতার মধ্যে অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে সুন্দরী পিঙ্গলা, এবং সুকঠিন পাষাণবিগ্রহের মত অবিচল মূর্তি নিয়ে কাঞ্চনমঞ্চে সমাসীন হয়ে রয়েছেন নৃপতি অতিরথ।

পিঙ্গলার দুই চক্ষুর দৃষ্টি কুমার নৃপতি অতিরথের মুখের দিকে ছুটে যায়, প্রস্ফুট পুষ্পকোরকের দিকে আসবলুব্ধ মধুপের মত। পরক্ষণে, নৃত্যস্থলীর পুষ্পবলয় অতিক্রম ক'রে মদাবেশমন্থরা মরালীর মত ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে নৃপতি অতিরথের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায় পিঙ্গলা। অতিরথ বিস্মিতভাবে অপাঙ্গে দৃষ্টিক্ষেপ করেন এবং দূরে উপবিষ্ট মাণ্ডলিকবর্গ অনুমান করে, রাজপদে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাজধানীর গণিকাগ্রগণ্যা পিঙ্গলা রাজাসনের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

নৃপতি অতিরথ অপ্রসন্নভাবে বলেন--রাজাদেশ বিনা রাজসন্নিকটে আসা উচিত নয় তোমার বারাঙ্গনা।

—রাজসভায় যখন আমন্ত্রণ করেছেন, রাজসন্নিধানে এসে দাঁড়াবার অনুমতি দান করুন নৃপতি।

—তোমার উদ্দেশ্য না শুনে অনুমতি দিতে পারি না।

—আমার দর্শনীয়কে দেখতে চাই। আমার বন্দনীয়কে হৃদয়ের অভিলাষ নিবেদন করতে চাই।

—কি তোমার দর্শনীয়?

—আপনার ঐ নবারুণোপম সুন্দবপ্রভ মুখমণ্ডলের লাবণ্যমহিমা। আজ আমার নয়নকান্তের সেই মুখ নয়নের সন্নিকটে রেখে দেখতে চাই, যে মুখ এতদিন ধ'রে শুধু দূর হ'তে দেখেছি।

—এবং কি-ই বা তোমার নিবেদন?

—আমি আপনারই প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী এক নারী, যে নারী অভিশপ্তা রসাতল-বধূর মত আপনার জগৎ থেকে অনেক দূরে পড়ে আছে, বাঞ্ছিতের সানুগ্রহ আমন্ত্রণ না পেলে যে নারীর কোন অধিকার নেই বাঞ্ছিতজনের সন্নিকটে যাবার, শত অনুরাগের পরাগপুঞ্জে যতই পরিমলবিধুর হয়ে উঠুক না কেন সে নারীর চিত্তোপবনের নিভৃতলীন কামনার কুসুমকোরকনিকর। আমার দুই চক্ষুর সকল কৌতূহলের উপাসনা হয়ে আছেন আপনি। বাতায়ন হতে দেখেছি আপনার অশ্বারূঢ় বীরমূর্তি, অরাতিদমনে ধাবমান সৈন্যঘটার সম্মুখে অগ্রনায়ক হয়ে আপনি চলেছেন। ইচ্ছা করেছে, সহচরী হয়ে আপনার তূণীর বহন করি। দেখেছি, রথারূঢ় হয়ে আপনি রাজপথ দিয়ে ইন্দ্রোৎসবের অনুষ্ঠানে চলেছেন। ইচ্ছা করেছে, এই কণ্ঠের সুরভিত মাল্যদাম আপনার ক্রোড়ে নিক্ষেপ করি। দেখেছি, পথে পথে আপনার দানযাত্রার সমারোহ, প্রার্থিজনতার হাতে হাতে অকাতরে রত্ন-বস্ত্র-শস্য দান ক'রে চলেছেন আপনি।

ইচ্ছা করেছে, ছুটে গিয়ে আপনার সম্মুখে দাঁড়াই প্রার্থিনীর মত আর নিবেদন করি—প্রণয় দানে ধন্য কর. হে কঞ্জকান্তি কুমার, আর কিছু চাহি না।

নৃপতি অতিরথ বলেন—শুনে সুখী হলাম বারাঙ্গনা।

পিঙ্গলা বলে—রাজ্যাধিপতি অতিরথের কাছে একটি সামান্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে চাই।

অতিরথ—বল।

পিঙ্গলা—আজ আমাকে আর নৃত্যে-গীতে এই সভাস্থলে উৎসব প্রমোদিত করতে বলবেন না নৃপতি।

অতিরথ ভ্রূকুটি করেন—কেন?

পিঙ্গলা—আজ মন চায় দরদলিত জলনলিনীর মত আমার এই সতৃষ্ণ অক্ষিদ্বয় বিকশিত ক'রে আপনার মুখময়ুখবিম্ব শুধু পান করি। আজ শুধু ইচ্ছা করি, আপনার ঐ অসিসঙ্গকঠিন বাহুযুগল পিঙ্গলার গ্রীবাসঙ্গ-মাধুরী পান ক'রে প্রসূনের মত কমনীয় হয়ে যাক।

আবার ভ্রূকুটি করেন অতিরথ—প্রগল্‌ভা পণাঙ্গনা, তুমি নিতান্তই দুঃসাহসিনী।

পিঙ্গলা—আমি স্বভাবিনী। স্মরবীথিকাবাসিনী মদামোদমধুরা নারী আমি। মন যাকে চায় তাকে আহ্বান করবার অধিকার আমার আছে।

অতিরথ বিস্মিত হন—তোমার অধিকার?

পিঙ্গলা—আপনিই সে অধিকার দিয়েছেন রাজ্যাধিপতি।

ঈষৎ হাস্যে ও শ্লেষযুক্ত স্বরে অতিরথ বলেন—হীনা পণাঙ্গনার কামনার আহ্বান তুচ্ছ করবার অধিকারও সবার আছে, এ-সত্য বিস্মৃত হয়ো না বিভ্রম-নিপুণা বারনারী।

পিঙ্গলার ওষ্ঠপুটে সূক্ষ্ম হাস্যরেখা কুটিল হয়ে ফুটে ওঠে।—তুচ্ছ করবার শক্তি কি সবারই আছে?

রোষকঠোর কণ্ঠস্বরে অতিরথ বলেন—আহ্বান করবার শক্তি কি সবারই আছে লাস্যজীবিনী নারী?

পিঙ্গলার আয়ত নয়নে যেন চকিতস্ফুরিত এক বিদ্যুতের ছায়া নর্তিত হতে থাকে। পৃথিবীর পৌরুষ যেন আজ সস্পর্ধ কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করেছে, বারনারী পিঙ্গলার হাস্যে লাস্যে ও কটাক্ষে আহ্বান করবার শক্তি আছে কি? প্রশ্ন উঠেছে, সৌম্য মেঘের বুকের উল্লাস বিদ্যুল্লতায় দীপিত করতে পারবে কি? পিঙ্গলার সুগর্বিত বিশ্বাসের গভীরে প্রশ্নগুলি যেন নীরবে হাসতে থাকে। কেতকীপরাগের আহ্বান উপেক্ষা করবে মদান্ধ ভৃঙ্গ? পূর্ণিমার জ্যোৎস্না জাগলে ঘুমিয়ে থাকবে চকোর? সফেনজলহাসিনী তটিনীর কলস্বর

শুনতে পেলে আকাশচারী কলহংস নেমে আসবে না তরঙ্গের আলিঙ্গনে বুক পেতে দিতে?

নিরুত্তর পিঙ্গলার ঈষদোদ্ধতা ভ্রূলতা যেন নৃপতি অতিরথের এই পৌরুষ-স্পর্ধিত প্রশ্নকে নীরবে উপহাস করে। এই প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে দিতে হবে। আহ্বান করার শক্তি তার আছে কি না, নৃত্যসভার এই সান্ধ্য উৎসবে তারই প্রমাণ চরম ক'রে জানিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হয় দ্বিতীয়া মদনবনিতাসমা রূপরম্যা নারী পিঙ্গলা।

নৃপতি অতিরথ আদেশ করেন—তোমার কর্তব্য পালন কর বারাঙ্গনা, নৃত্যে-গীতে সান্ধ্য উৎসব প্রমোদিত কর।

পুষ্পবলয়ে বেষ্টিত নৃত্যস্থলীর মাঝখানে এসে আবার দাঁড়ায় পিঙ্গলা। প্রত্যুষের সুপ্তোত্থিত বিহঙ্গদলের মত পিঙ্গলার পদমঞ্জীর অকস্মাৎ মধুর কলধ্বনি উৎসারিত করে। লীলাপূর্ণ বাহুবিক্ষেপ, ছন্দায়িত অঙ্গহার এবং স্মরতরলিত কটাক্ষধারায় রূপমাধুরীকণিকা উৎক্ষিপ্ত ক'রে রত্নকান্তিরুচিরা পিঙ্গলা নৃত্য করতে থাকে। বাদকবর্গের সুনিপুণ করন্যাসে স্বরযন্ত্রের বক্ষ হতে তাললয়সমন্বিত নাদামোদ সভাগৃহ পরিপ্লুত ক'রে তোলে। নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন নৃপতি অতিরথ।

সুধারসদ্রাবিতকণ্ঠী গীর্বাণবধূর মত মধুস্বরা পিঙ্গলা সঙ্গীতে তার কামনাবিধুর হৃদয়ের আহ্বান জানায়।

—পূর্ণতোয়া তটিনীর কাছে কত তৃষিত পান্থ আসে। শুধু তুমি একজন কেন দূরে সরে আছ বুঝি না। অন্ধ নও, তবে দেখতে পাও না কেন? ভীরু নও, তবে এত ভয় কেন? এস, সকল জনের সাথে তুমিও এস। খরযৌবনবাহিনী হ্লাদিণীর হৃদয়োপকূলে এস। সুতরঙ্গিতা তটিনীর নীরাহরণী সরণিতে এস। সকল তৃষিত পান্থের সাথে তুমিও পান্থ এস।

সঙ্গীত থামে। নৃত্যাকুল দেহলতিকার মত্ত আন্দোলন সংবরণ করে পিঙ্গলা। উদ্দাম কাঞ্চীদামপীড়িত কটিতটে চম্পকসঙ্কাশ হস্ততল ন্যস্ত করে অপাঙ্গে অতিরথের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে পিঙ্গলা।

নৃপতি অতিরথের দুই অধরে তীব্র এক শ্লেষকুটিল হাসি ফুটে ওঠে। নগরমোহিনী বারাঙ্গনার এই আহ্বানে এমন কোন শক্তি নেই যে নৃপতি অতিরথের কামনাকে বিচলিত করতে পারে। জানে না, তাই ভুল বুঝেছে পিঙ্গলা।

মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকায় পিঙ্গলা। মুহূর্তের মত কি যেন চিন্তা করে, তার পরেই প্রস্তুত হয়। পিঙ্গলার সনৃত্য গীতস্বরে আবার সভাতল উল্লসিত হয়ে ওঠে।

—ডাকে সন্ধ্যার উপবন। সকল সমীরের মাঝে সবিশেষ হয়ে, সব প্রিয়জন মাঝে প্রিয়তর হয়ে, এস তুমি সুরভিহরণ দক্ষিণ সমীরণ। এই উপবনের বিকচ কুসুমের কোমল অধরের হাসিরাশি ভার, সকলেরই তরে উপহার। কিন্তু সে অধর শুধু তোমার।

গীত বন্ধ করে পিঙ্গলা। চিবুকের চন্দনচিত্রক স্বেদাঙ্কুরে মলিন হয়ে ওঠে। ক্লান্ত বক্ষঃপঞ্জরের স্পন্দন সংযত ক'রে পিঙ্গলা সাগ্রহ দৃষ্টি তুলে নৃপতি অতিরথের মুখের দিকে তাকায়।

হেসে ওঠেন নৃপতি অতিরথ। বারসুন্দরীর আহ্বানের আবেদন যেন সুশাণিত বিদ্রূপের আঘাতে ছিন্ন ক'রে অবিচলিতচিত্তে তাকিয়ে থাকেন অতিরথ।

মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে পিঙ্গলা। স্তবকিত চিকুরভার শিথিলিত হয়েছে, দেহলগ্ন সকল রত্নাভরণও যেন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। এক পাষাণবিগ্রহের কাছে শিরীষমৃদুলাঙ্গী রূপোত্তমা নারীর কামনা বারংবার বৃথাই আবেদন করছে। সত্যই কি তার আহ্বানে শক্তি নেই? কিংবা তার আহ্বানেরই ভাষায় বার বার ভুল হয়ে যাচ্ছে? কিন্তু কোথায় ভুল?

হেমদণ্ডের শীর্ষে দীপিকা জ্বলে। জ্বালা আর আলোকের একটি শিখা। পিঙ্গলার ইচ্ছা করে, ঐ শিখার উপর এই হারাবলীললিত বক্ষঃপট আহুতির মত তুলে দিতে, যেন এই মুহূর্তে তার সকল ভ্রান্তি দগ্ধ হয়ে যায়। কাম্যজনের হৃদয় আপন করা গেল না, কি দুঃসহ এই পরাজয়ের অপমান! এই লাস্য-হাস্য-কটাক্ষ সবই ধূলির মত মূল্যহীন হয়ে গিয়েছে। আহ্বান করবার শক্তি নেই, এই ধিক্কার শুনে ফিরে যাবার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়।

বুঝতে পারেনি পিঙ্গলা, কখন বাষ্পায়িত হয়ে উঠেছে তার নয়নদ্বয়। দীপিকার শিখা হতে বিচ্ছুরিত আলোক যেন তার হৃৎপিণ্ডের অন্তরালে বহুদিনের পুঞ্জীভূত অন্ধকার স্পর্শ করেছে। তার আহ্বানের ভুল বুঝতে পেরেছে পিঙ্গলা। যে পথ কোনদিন চোখে পড়েনি, সে পথ যেন দেখতে পেয়েছে পিঙ্গলা।

আবার মঞ্জীর রণিত হয়, আবার গীতমুখরিত হয় সভাতল। পিঙ্গলা তার অন্তরের সকল সুধা উৎসারিত ক'রে আহ্বান জানায়।

—রাকা রজনীর আকাশ আমি, তুমি রমণীয় হিমকর। সকল তারকা নিভে গিয়েছে, শুধু তুমি আছ সত্য হয়ে। আমার এই অন্তরের মহাশূন্যতার মধ্যে আর কেউ কোথাও নেই, আছ একমাত্র তুমি। তুমি আমার সব, তুমিই আমার এক। আমার সর্ববাঞ্ছা তুমি, সর্বতৃপ্তি তুমি। আমার কামনার একমাত্র

আনন্দ হয়ে এস তুমি, দাঁড়াও আমার হৃদয়কুঞ্জের দেহলীপ্রান্তে হে সুন্দরতনু অতিথি বন্দনীয়।

গীত সমাপ্ত হয়। নৃত্যপরা নগরমঞ্জিকার ক্লান্ত চরণের মঞ্জীরধ্বনি দূরান্তের তটিনীকলনাদের মত ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয় তারপর আর শোনা যায় না। নৃত্যস্থলীর মাঝখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় পিঙ্গলা। নৃপতি অতিরথের মুখের দিকে তাকায়।

নিদাঘদিনের দগ্ধকেশর জলনলিনীর মত বেদনামলিন হয়ে ওঠে পিঙ্গলার মুখচ্ছবি। দেখতে পায় পিঙ্গলা, নৃপতি অতিরথ কাঞ্চনময় মঞ্চের উপরে বসে আছেন, যেন বজ্রপাষাণে নির্মিত এক নিঃশ্বাসহীন মূর্তি এবং রত্নে রচিত দুটি উজ্জ্বল অথচ কামনাহীন চক্ষু।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় পিঙ্গলা, নৃত্যস্থলীর পুষ্পবলয় পার হয়ে কাঞ্চন-মঞ্চের সন্নিধানে এসে দাঁড়ায়।

—নৃপতি অতিরথ!

—বল, আর কি কথা তোমার নিবেদন করবার আছে।

—নিবেদন করেছি নৃপতি, আর বলবার কিছু নেই। শুধু আপনার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়ে ধন্য হতে চাই।

বিরক্তিকুটিল কঠিন ভ্রূভঙ্গী ক'রে অতিরথ রুষ্টস্বরে বলেন- বারাঙ্গনা।

শিশিরায়িতনয়না সুচারুপক্ষ্মলা পিঙ্গলা মৃদুস্বরে বলে—বলুন নৃপতি।

অতিরথ—অয়ি রঙ্গিমৃতরঙ্গিণি! ধূমলেখা নীলাঞ্জনের রূপ ধারণ করে কিন্তু সে ছলনায় চাতক আকৃষ্ট হয় না।

কশাহত প্রাণীর মত বেদনানমিতশিরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে পিঙ্গলা। নৃপতি অতিরথ প্রশ্ন করেন—তোমার কাজ সমাপ্ত হয়েছে?

—হ্যাঁ নৃপতি অতিরথ।

—তবে এখন প্রীতচিত্তে বিদায় গ্রহণ কর।

স্বর্ণখণ্ডে রজতপাত্র পরিপূর্ণ ক'রে স্বহস্তে উত্তোলন করেন নৃপতি অতিরথ। আহ্বান করেন- পুরস্কার লও কলাবতী পিঙ্গলা।

অবিচলিতনেত্রে তাকিয়ে থাকে পিঙ্গলা।—এই পুরস্কারে আমি প্রীত হতে পারি না নৃপতি অতিরথ।

অতিরথ—কেন প্রীত হতে পারবে না পণ্যা?

পিঙ্গলা—প্রয়োজন নেই।

অতিরথ—তবে বল, কি চাই, কোন্ পুরস্কারে প্রীত হবে?

পিঙ্গলা—অঙ্গীকার করুন নৃপতি, প্রার্থিত পুরস্কার অবশ্যই দান করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

বিস্মিতভাবে অতিরথ বলেন—প্রার্থিত পুরস্কার অবশ্যই পাবে।

অতিমৃদু বিনম্র স্বরে এবং সাকাঙ্ক্ষ দৃষ্টি তুলে পিঙ্গলা মিনতি জানায়—আমার সঙ্কেতকুঞ্জে একদিন আসবেন, এই পুরস্কার চাই, আর কিছু চাই না নৃপতি অতিরথ।

ক্রোধোদ্দীপ্ত কণ্ঠে নৃপতি অতিরথ বলেন—দুঃসাহস সংযত কর পণ্যাঙ্গনা।

কবরীলগ্ন মল্লীমালিকা নৃপতি অতিরথের পদপ্রান্তে নিক্ষেপ ক'রে পিঙ্গলা বলে—তোমারই অনুরাগলুব্ধা অঙ্গনা তোমাকে অনুরোধ করছে অতিরথ। এস, এই কোলাহলময় জনতাযৌবনের বাধা-লাজ-ভয় আর অভিমান হতে বহুদূরে এই নগরের বাহিরে, কুশকুসুমে সমাচ্ছন্ন প্রান্তরের শেষপথরেখা পার হয়ে, সপ্তপর্ণবনের নির্ঝরমূলে লতানিকুঞ্জের নিভৃতে পিঙ্গলার সম্মুখে এসে একবার দাঁড়াও। কৃষ্ণা দ্বাদশীর চন্দ্রালোকে এই নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিও, এই নারীমুখের সবই ছলনা কি না। অতনু-তাপিতা পিঙ্গলার তনুমাধবীর সান্নিধ্যে নবীন সহকারের মত তোমার যৌবন-রুচির চারুদেহশোভা নিয়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেক। দেখে যেও, এই তুচ্ছা নারীর মৃণালবাহুর আলিঙ্গনে ও বিম্বাধরের চুম্বনে তোমার জীবননিকুঞ্জের চন্দ্রিকাবন্দিত নিশীথপ্রহর তন্দ্রাভিভূত হয় কি না।

অতিরথ - এমন হীন কৌতূহল আমার নেই।

দুই করতলে মুখ আচ্ছাদিত করে পিঙ্গলা, উত্তপ্ত এবং পাষাণের স্তূপ থেকে যেন কতগুলি স্ফুলিঙ্গকণিকা ছুটে এসে তার মুখের উপর পড়েছে।

অতিরথ বলেন—অন্য অনুরোধ কর পিঙ্গলা।

পিঙ্গলা উত্তর দেয় না।

অতিরথ—তোমার কথা শেষ কর নারী।

করতলে নিবদ্ধমুখ, নতাঙ্গী পিঙ্গলা আবার মুখ তুলে তাকায়। ধারাহত কমলের মত সে মুখশোভা অশ্রুসিক্ত ও বিশীর্ণ।—আমার শেষ অনুরোধ জানাতে চাই নৃপতি।

—বল।

—কলাবতী পিঙ্গলার সঙ্গীত আপনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারেনি, তাই আর একবার সুযোগ প্রার্থনা করি। আমার শেষ সঙ্গীতে আমার কামনার শেষ কথা আপনাকে শুনিয়ে দিতে চাই।

—শেষ কর তোমার শেষ সঙ্গীত।

—আজ নয়, এখানে নয় নৃপতি।

—কোথায়?

—সঙ্কেতকুঞ্জে।

শাণিত পাষাণের মত চক্ষু নিয়ে পিঙ্গলার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন নৃপতি অতিরথ। বারাঙ্গনার অন্তহীন ছলনার কৌশল আর দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হন। অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে পিঙ্গলা, যেন নিখিলঙ্গিলা এক ভুজঙ্গীর দৃক্‌ভঙ্গী। কুমার নৃপতি অতিরথের রূপযৌবনের কামনাগুলিকে কাঞ্চনমঞ্চের উচ্চতা থেকে পথপঙ্কধূলির মধ্যে নামিয়ে গ্রাস করার জন্য এক কুটিল সংকল্প নিষ্পলক চক্ষু তুলে তাকিয়ে আছে। অথচ সে চক্ষুর উপরে এক প্রেমিকা নারীর অশ্রুসিক্ত আবেদনের আবরণ কি সুন্দর ও করুণমধুর হয়ে ফুটে উঠেছে!

নৃপতি অতিরথ দৃষ্টি নত ক'রে কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে থাকেন। যেন তাঁর জীবনপথের এই ছলনাকে চূর্ণ করবার উপায় অন্বেষণ করছেন।

দূর দেবালয় হতে আরাত্রিক স্তোত্রের সুস্বর ও মাঙ্গল্য মৃদঙ্গের রব তরঙ্গিত হয়ে ভেসে আসে। নৃপতি অতিরথ হঠাৎ সুহাস্যনন্দিত মুখে পিঙ্গলার দিকে তাকান।

পিঙ্গলা মুগ্ধভাবে বলে—সুহৃত্তম অতিরথ!

অতিরথ—শোভনাঙ্গী ভদ্রে, শুনতে চাই তোমার শেষ সঙ্গীত, তোমার কামনার শেষ কথা। তোমার সঙ্কেতকুঞ্জে অবশ্যই যাব।

[illegible]মরালীর মত হর্ষোৎফুল্লা পিঙ্গলা নৃত্যসভাস্থল হতে চলে যায়।

কৃষ্ণা দ্বাদশীর কৃশ চন্দ্রলেখার কিরণে যখন ক্লান্তা নিশীথিনীর আকাশপটে শারদাভ্রপুঞ্জ শুচিশুভ্র হয়ে উঠেছে, তখন প্রাসাদকক্ষের রত্নপর্যঙ্কে শয়ান নৃপতি অতিরথ হঠাৎ সুপ্তোত্থিত হয়ে বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়ান। দেখতে পান, কৃষ্ণা দ্বাদশীর চন্দ্রমা পশ্চিমাচলমুখী হয়েছে। অট্টহাস্য ক'রে ওঠেন নৃপতি অতিরথ। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছলনাকে ছলিত করতে পেরেছেন। কৃষ্ণা দ্বাদশীর নিশাবশেষ ধীরে ধীরে ম্রিয়মান হয়ে আসছে, শেষ হয়ে যেতে আর দেরি নেই। কক্ষের দীপ নিভিয়ে দিয়ে রত্নপর্যঙ্কের উপর আবার নিদ্রাভিভূত অতিরথ সুখস্বপ্নে মগ্ন হয়ে থাকেন।

দূরে সপ্তপর্ণ অটবীর জ্যোৎস্নামোদিত নিঃশ্বাসবায়ু হতে তরুক্ষীরগন্ধ ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে। নির্ঝরমূলে এক লতাকুঞ্জের নিভৃতে পল্লবাসনে বসেছিল অভিসারিকা পিঙ্গলা। শুষ্কপত্রে সমাকীর্ণ বনপথে শুধু কৃকলাসের গমনধ্বনি উত্থিত হয়, যেন কতগুলি বক্ষঃপঞ্জর চূর্ণ হয়ে শব্দ করছে। প্রহরের পর প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, তবু নিকুঞ্জদ্বারে বাঞ্ছিত প্রেমিকের পদধ্বনি শোনা যায়নি। সে কি আসছে সে কি আসবে? উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলিও যে শেষ হয়ে আসছে। ব্যাকুলিতচিত্তা অভিসারিকার নবীনতনু হঠাৎ

যেন এক নির্মম প্রত্যাখ্যানের ও অপমানের হিমদ্রবসম্পাতে কঠোরীভূত হয়ে পাষাণমূর্তির মত বসে থাকে। পরমুহূর্তে দগ্ধপক্ষ বিহগীর মত নির্ঝরের সলিলে দেহ নিক্ষেপ করবার জন্য উঠে দাঁড়ায় পিঙ্গলা। আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সহ্য করতে পারে না এই স্তব্ধতা। এই নীল চেলাঞ্চল যেন অনলতন্তু দিয়ে রচিত এক দুঃসহ জ্বালাময় আবরণ, যেন মৃত্যু হবার আগেই ভুল ক'রে স্বেচ্ছায় চিতাগ্নির মাঝখানে এসে বসেছে পিঙ্গলা।

নির্ঝরনিম্নে সলিলপানতৃপ্ত শিশু হরিণের হর্ষ শোনা যায়। বৃক্ষচূড়ায় সদ্যোজাগ্রত বিহঙ্গের অস্ফুট কাকলী জাগে। কৃষ্ণা দ্বাদশীর চন্দ্রলেখা লুপ্ত হয়েছে। রক্তজবার নির্যাসে রচিত রেখার মত প্রাচীকপোলে অরুণচুম্বিত লজ্জারাগরেখা ফুটে উঠেছে। অভিসারিকা কামিনী পিঙ্গলার কাম্যজন এল না। সব ছেড়ে দিয়ে একজন যাকে একবাঞ্ছিত দেবতার মত আহ্বান করা হলো, সেও এল না।

মনে হয়, জগতের সব রূপরসবর্ণগন্ধের আনন্দ হারিয়ে এক জাগ্রত মৃত্যুর অন্ধকারে সে বসে আছে। বধির অন্ধ বাক্‌রুদ্ধ ও অচল জীবন। করতলে দুই চক্ষু আবৃত ক'রে অনেকক্ষণ বসে থাকে পিঙ্গলা।

কিন্তু ধীরে শান্ত হয়ে আসতে থাকে পিঙ্গলার মন। বাঞ্ছিতের প্রত্যাখ্যানের জ্বালা নারীর কামনাময় যে হৃদয়ে দাবদাহ সৃষ্টি করেছে, সেই হৃদয়ই যেন ধীরে ধীরে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে। সেই উৎকণ্ঠ অস্থিরতা আর বিফল প্রতীক্ষার যন্ত্রণাও ধীরে ধীরে নির্বাপিত হয়ে আসছে। উৎকলিকা লতার পত্রভার হতে প্রত্যূষের নীহারবিন্দু নতমুখিনী পিঙ্গলার বিশ্লথ কবরীভারের উপর ঝরে পড়তে থাকে।

যেন কার করুণাপূত স্নিগ্ধ হস্তের স্পর্শ এসে লুটিয়ে পড়ছে। মুখ তুলে চারিদিকে তাকায় পিঙ্গলা। দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়, তার প্রবঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত জীবনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বিশ্বসৃষ্টির কতগুলি নূতন আনন্দ চারিদিক থেকে তার অন্তরাত্মার আশেপাশে আর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার ভূমিলুণ্ঠিত চেলাঞ্চলের প্রান্তের উপর ঘুমিয়ে আছে এক হরিণশাবক। দেখতে পায় পিঙ্গলা, তার ক্রোড়ের উপর শীর্ণপক্ষ এক বৃদ্ধ পারাবত চঞ্চুপুটে যবাঙ্কুর নিবদ্ধ ক'রে বসে আছে!

নির্ঝরপ্রদেশ হতে হৃষ্ট দাত্যূহের কলনাদ শোনা যায়।– ধীরে ...পর গাত্রোত্থান করে পিঙ্গলা। লতানিকুঞ্জের বাইরে এসে দাঁড়ায় এবং পূর্ব ...াসিকা দিকে তাকিয়ে অচঞ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ...কুঞ্জের

বনবাসিনী উপাসিকার মত পিঙ্গলা যেন প্রত্যূষের শান্তির মধ্যে ...তমনি চরাচরের অধীশ্বর এক পরমানন্দময়ের পদধ্বনি শোনবার জন্য দাঁড়িয়ে ... নারী

—তুমি আনন্দ, তুমি এক, তুমিই সর্ব। আর সব মিথ্যা।

নিজের অজ্ঞাতসারে পিঙ্গলার কম্পিত অধরে অস্ফুটস্বরে আরও প্রার্থনার বাণী গুঞ্জরিত হতে থাকে।—মূঢ়া মানবী পিঙ্গলার সকল মোহ বিদূরিত কর প্রভু, জগতের একনাথ। তুমি প্রেম তুমি আনন্দ, তুমি শান্তি, তুমি সর্ববাঞ্ছা, তুমি সর্বতৃপ্তি। তোমার প্রাপ্য পূজার ফুল মর্ত্যমানবের পায়ে নিবেদন করবার ভ্রান্তি হতে রক্ষা কর।

এগিয়ে যায় পিঙ্গলা। নির্ঝরমূলে এসে দাঁড়ায়। দেখতে পায় পিঙ্গলা, তরুগাত্র হতে স্খলিত বল্কল সলিলধৌত হয়ে তটপ্রান্তে পড়ে আছে।

বিশ্বের একনাথ যেন পিঙ্গলারই জন্য উপহার রেখে দিয়েছেন। আনন্দময় জীবনপথের সন্ধান ইঙ্গিতে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর বিলম্ব করো না, যত তুচ্ছ আর ক্ষণিকের জন্য মত্ত হয়ে বৃথাই জীবনের অনেক সময় বিনষ্ট হয়েছে। কর কামনার ক্ষয়, তবে পাবে তাঁর সন্ধান, যিনি একনাথ যিনি সব সুন্দরতা শান্তি ও আনন্দের সার।

রত্নময় কেয়ূর কঙ্কণ আর কর্ণভূষা নির্ঝরের সলিলপ্রবাহে নিক্ষেপ করে পিঙ্গলা। স্নান ক'রে, বল্কল পরিধান ক'রে এবং লতানিকুঞ্জের নিভৃতে এসে একনাথের ধ্যানে নিরত হয়। কৃষ্ণা দ্বাদশীর চন্দ্রাস্তের পর এক প্রহরের মধ্যেই এক অভিসারিকা প্রমদা নারীর সংকেতকুঞ্জ তপস্বিনীর আরাধনাস্থলীতে পরিণত হয়।

দিন যায় মাস যায়, বৎসর অতীত হয়। নৃপতি অতিরথের জীবনে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তাঁর অনুপম রূপযৌবনে অন্বিত পৌরুষের অহংকার নিয়ে কাঞ্চনময় মঞ্চের উপরেই তিনি সমাসীন রয়েছেন। তাঁর প্রণয় লাভের সৌভাগ্য কোন নারীর হয়নি। তাঁর প্রণয় লাভের জন্য তাঁর মূর্তিকে কল্পনায় দেবতার আসনে বসিয়ে উপাসনা করছে এমন কোন নারীর পরিচয় তিনি পাননি। বারাঙ্গনা পিঙ্গলার কথা মনে পড়েছিল একবার। মনে মনে হেসেছিলেন অতিরথ। সে সুন্দর ছলনাকে কত সহজে একটি উপেক্ষায় এমনি চূর্ণ ক'রে দিয়েছেন যে, বিফল অভিসারের আঘাত পাওয়ার ধারে ফিরে এসে আর একটি প্রশ্ন করারও শক্তি হলো না সে নারীর। মদিরেক্ষণা বসেছিলরী তার বিলোললোচনে অশ্রুসিক্ত আবেদন নিয়ে দেখা দিতে আর গমনধ্বনি। তুচ্ছা বারসুন্দরীর একটি দিনের সেই লিপ্সার ইতিহাস এখন পর প্রহনেও পড়ে না অতিরথের।

শোনা সেদিনও নৃত্যসভার কাঞ্চনমঞ্চে নবোদিত আদিত্যের মত সুন্দর মূর্তি গুলিও বসেছিলেন নৃপতি অতিরথ। হঠাৎ মনে পড়ে, আজ কৃষ্ণা দ্বাদশী।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে বৎসরাতীত সেই কৃষ্ণা দ্বাদশীর কথা। মনে পড়ে বারাঙ্গনা পিঙ্গলার কথা। পাষাণবক্ষের নিভৃতে অদ্ভুত এক কৌতূহলের চাঞ্চল্য অনুভব করেন অতিরথ। সভাদূতের প্রতি নির্দেশ দান করেন—আজিকার নৃত্যসভায় উৎসব প্রমোদিত করবার জন্য কলাবতী প্রমদা পিঙ্গলাকে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এস।

পিঙ্গলা! সুধাকণ্ঠী, সুযৌবনা, মুনিচিত্তচঞ্চলকারিণী, রূপাতিশালিনী পিঙ্গলা! স্পর্ধাতিশয়া, কঠিন প্রণয়কলাশীলা, নৃত্যপটীয়সী পিঙ্গলা। কিন্তু কুমার অতিরথের গর্বের কাছে পরাভব স্বীকার ক'রে নিয়ে কোথায় সে আজ মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে? সে মুখ আজ নতুন ক'রে দেখতে, সেই পরাভূতা লাস্যময়ীর মলিনবদনের বিষাদ আর একবার স্বচক্ষে দেখে তাঁর অপরাজেয় পৌরুষের গর্বে আর একবার উল্লসিত হতে ইচ্ছা করেন অতিরথ।

সভাদূত এসে সংবাদ দেয়—পিঙ্গলা নেই।

চমকে ওঠেন অতিরথ—কোথায় গিয়েছে?

সভাদূত—রাজধানীর বাইরে।

অতিরথ—কতদিন হলো?

সভাদূত—এক বৎসর।

রহস্যময় এক অদ্ভুত শঙ্কার ছায়া পড়ে বীরোত্তম অতিরথের দৃপ্ত দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে।—কোথায় আছে সে?

সভাদূত—নির্ঝরপ্রদেশের সপ্তপর্ণ বনে।

বক্ষোনিভৃতের বিচলিত নিঃশ্বাসের আলোড়ন দমন করতে গিয়ে অতিরথের কণ্ঠস্বর বিচলিত হয়—কেন কি উদ্দেশে?

সভাদূত—তপস্বিনী হয়েছে পিঙ্গলা।

চমকে ওঠেন কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করেন না নৃপতি অতিরথ। কাঞ্চনমঞ্চ হতে গাত্রোত্থান করেন। নৃত্যসভা ভঙ্গ ক'রে দিয়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান করেন। প্রাসাদের দীপহীন নীরব ও শূন্য নৃত্যস্থলী পিছনে পড়ে থাকে। প্রাসাদলগ্ন উপবনের একান্তে তাঁর বৃক্ষবাটিকার নিভৃতে এসে নিঃশব্দে বসে থাকেন নৃপতি অতিরথ।

তপস্বিনী হয়েছে পিঙ্গলা। কিন্তু কিসের তপস্যা? মনে হয়, প্রেমাস্পদের হৃদয়হীন প্রত্যাখ্যানের আঘাত সহ্য ক'রেও এক কঠিন সংকল্পের ধ্যানে হৃদয় উৎসর্গ ক'রে এখনও প্রতীক্ষায় রয়েছে সে নারী। উপাসিকা যেমন দূরের দেবতাকে কাছে ডাকে, নির্ঝরপ্রদেশের বনান্তরালে লতানিকুঞ্জের নিভৃতে কামনাসুন্দরী এক নারী তার বাঞ্ছিত পুরুষের আকাঙ্ক্ষাকে তেমনি আরাধনা ক'রে কাছে ডাকছে। অতিরথের এতদিনের সেই কল্পনার নারী

যেন স্তবকিত চিকুরশোভা, রক্তিম অধরদ্যুতি আর চন্দনচিত্রিত চিবুক নিয়ে মূর্তি গ্রহণ করেছে। নৃত্যসভাতলে নয়, সেই প্রেমিকা নারীর চরণমঞ্জীর আজ যেন অতিরথের হৃৎপিণ্ডস্থলের অণুতে অণুতে রণিত হয়ে উঠছে।

চঞ্চল হয়ে ওঠেন অতিরথ। ধমনীর প্রতি শোণিতকণিকা যেন সেই মধুরাধরা নারীর একটি চুম্বনে চঞ্চলিত হবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে। কল্পনায় দেখতে পান অতিরথ সপ্তপর্ণ বনের নিভৃতে দুটি আলিঙ্গনোন্মুখ মৃণালবাহু তারই জীবনের সুখস্বর্গ রচনার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। অনির্বাণ নক্ষত্রের মত প্রতীক্ষায় নিশিযাপন করছে দুটি কম্র নয়নের তারকা।

বৃক্ষবাটিকার নিভৃত থেকে প্রমত্তের মত ছুটে বের হয়ে আসেন অতিরথ। রথশালার সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হন। অতিরথের আহ্বান শোনা মাত্র সারথি রথ নিয়ে আসে। প্রাসাদের সিংহদ্বার, তারপর নগরদ্বার পার হয়ে কুশকুসুমে সমাচ্ছন্ন প্রান্তরের পথে তিমিরপুঞ্জ ছিন্ন ক'রে নৃপতি অতিরথের রথ ধাবিত হয়।

সত্যই তপস্বিনীর মত মুদ্রিতনয়না এক নারীর মূর্তি। অযত্নবদ্ধ চিকুরভার সত্যই জটাভারের মত দেখায়। যৌবনলাবণ্যমাধুরী যেন বল্কলবসনে আবৃত ক'রে সত্য সত্যই কৃশ জ্যোতির্লেখার মত এক তাপসিকার রূপ মুখাবয়বে ফুটিয়ে রেখেছে পিঙ্গলা। লতানিকুঞ্জকে বনবাসিনী সাধিকার পর্ণকুটীর বলেই মনে হয়। দেখে বিস্মিত হন এবং মুগ্ধ হন নৃপতি অতিরথ।

পর্ণকুটীরের দ্বারপ্রান্তে প্রজ্বলন্ত শুষ্কপত্রের শিখায়িত আলোর কাছে দাঁড়িয়ে স্তিমিতদেহা পিঙ্গলার তপস্বিনীমূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকেন অতিরথ। কৃষ্ণা নিশীথিনীর প্রহর একের পর এক শেষ হয়ে গিয়েছে। এখনও তপস্বিনী চক্ষু উন্মীলন করেনি। মনের সকল আবেগ ও আকুলতা কঠিন ধৈর্যে স্তব্ধ ক'রে রেখে অতিরথ যেন একটি পরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় পিঙ্গলার ধ্যানলীন মুখশোভার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কিন্তু আর কতক্ষণ? কখন শেষ হবে এই দুঃসহ প্রতীক্ষার শাস্তি, কতক্ষণে শেষ হবে পিঙ্গলার সুকঠিন তপস্যা? পিঙ্গলার ঐ সুন্দর দুটি ভ্রূচ্ছায়ায় লালিত সুপক্ষ্মলা দুটি নয়নের কনীনিকা সন্ধ্যাতারার মত যদি এই মুহূর্তে তাকিয়ে ফেলে, তবে দেখতে পাবে পিঙ্গলা, তার কুঞ্জদ্বারে এসে তারই জীবনের দয়িত অতিথি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আর কতক্ষণ?

অতিরথ আহ্বান করেন—প্রিয়া পিঙ্গলা!

তপস্বিনীর মূর্তিতে কোন চাঞ্চল্য জাগে না।

—আমার জীবনবাঞ্ছিতা, আমার সকল আকাঙ্ক্ষার সারভূতা, সুমধুরা পিঙ্গলা!

পিঙ্গলার অধর স্ফুরিত হয় না, ভ্রূলতিকা স্পন্দিত হয় না, সুকোমল কপোলে রক্তিমচ্ছটা জাগে না।

—ঐ রূঢ় বল্কলের নিষ্ঠুর স্পর্শ বর্জন কর রূপেশ্বরী পিঙ্গলা। নীল চীনাংশুকে, মৌক্তিক জালে নবমণিবিনির্মিত কাঞ্চী কেয়ূর কঙ্কণ ও নূপুরে, পীতকুঙ্কুমের পত্রলিখায় আর নবশিরীষের মাল্যে মধুররূপিনী হয়ে প্রণয়ীর আলিঙ্গনে এসে ধরা দাও প্রেমমঞ্জুলা পিঙ্গলা।

বল্কলবাসে আবৃততনু তপস্বিনীর ধ্যান ভাঙে না।

—জাগো পিঙ্গলা, ঐ পাষাণী-মূর্তি পরিহার কর। নৃপতি অতিরথের প্রণয়বিধুর হৃদয়ের উৎসবসভাতলে এসে চিরনৃত্যচারিণী হও।

প্রজ্বলন্ত শুষ্কপত্রের স্তূপ হতে বায়ুতাড়িত স্ফুলিঙ্গ পিঙ্গলার জটায়িত চিকুরপুঞ্জের উপর এসে পড়তে থাকে। তপস্বিনীর মূর্তি নড়ে না।

—বধিরা পিঙ্গলা, এ তোমার কোন্ নতুন ছলনা?

বধিরা শুনতে পায় না। নৃপতি অতিরথ ব্যাকুল হয়ে আবেদন করেন—কথা বল পিঙ্গলা।

পিঙ্গলার ওষ্ঠ কম্পিত হয় না।

চিৎকার ক'রে ওঠেন অতিরথ—বারাঙ্গনা পিঙ্গলা!

তপস্বিনীর ধ্যানমুদিত চক্ষু উন্মীলিত হয়। শান্ত নির্বিকার ও বেদনাহীন দুটি চক্ষুর দৃষ্টি।

অতিরথ বলেন—তোমার প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়ো না অভিসারিকা। শেষ সঙ্গীতে তোমার হৃদয়ের শেষ কামনার কথা রাজ্যেশ্বর অতিরথের কাছে নিবেদন কর।

পিঙ্গলা আবার দুই চক্ষু মুদ্রিত করে। ওষ্ঠ স্পন্দিত হয়। ধীরে ধীরে, যেন এই বনচ্ছায়ার মর্মলোক হতে এক মধুনিষ্যন্দী গীতস্বর দিব্যলোকের মর্মরধ্বনির মত জেগে ওঠে। মনে হয়, নীরব সপ্তপর্ণবনের তন্দ্রায়িত নিশীথবায়ু এক তপস্বিনীর কণ্ঠস্বরমাধুরীর স্পর্শে জেগে উঠেছে। পিঙ্গলার অন্তর হতে উৎসারিত সুমন্দ্রিত মন্ত্রস্বরের মত সেই সঙ্গীতকে কৃষ্ণা দ্বাদশীর নিশীথবায়ু যেন ঊর্ধ্বলোকে এক পরমকাম্যের দিকে বহন ক'রে নিয়ে চলেছে।

—তুমি একনাথ! তুমি শান্তি, তুমি আনন্দ। তুমি কাম্য, তুমি বন্দ্য। তুমি সকল দুঃখের শেষ, তুমি সকল সুখের শেষ। তুমি সকল হীনের

সম্মান, তুমি সকল দীনের সম্পদ। তোমারই করুণা করে ক্ষয় জীবনের যত ভুল বাসনার ভয়। চিনেছি তোমাকে চির চিন্ময় একনাথ। নিরঞ্জন করুণাঘন নিখিলেশ একনাথ—তুমি আমার, আমি তোমার।

সন্ত্রস্ত শ্বাপদের মত ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকেন অতিরথ। অভিসারিকাব কুঞ্জকুটীরের দ্বার নয়; এ যে এক কামনাবিহীনা তপস্বিনীর পর্ণকুটীরের দ্বার। শুষ্কপত্রের প্রজ্বলন্ত শিখা যেন দাবানলের জ্বালা নিয়ে উদ্ধত আকাঙ্ক্ষাচারী অতিরথের বুকের ভিতর এই মুহূর্তে প্রবেশ করবে। ত্বরিত পদে বনভূমি অতিক্রম ক'রে চলে যেতে থাকেন অতিরথ। পিঙ্গলার গীতস্বর যেন করাল অগ্নিবাণের মত নৃপতি অতিরথের পিছনে ছুটে আসছে। দাবানলদগ্ধ মদমাতঙ্গের মত সপ্তপর্ণ অটবীর অভ্যন্তর হতে মুক্ত হবার জন্য দ্রুতপদে প্রস্থান করেন অতিরথ। আর্তনাদ ক'রে ওঠেন—ক্ষমা কর তপস্বিনী।

বনোপান্তে প্রান্তরপথে অপেক্ষমান রথ হতে সারথি ছুটে আসে—আজ্ঞা করুন রাজ্যেশ্বর।

রথে আরোহণ ক'রে নৃপতি অতিরথ বলেন—রাজধানী অভিমুখে নয়, এই প্রান্তরপথ ধ'রে রথ নিয়ে চল সারথি, যতদূর যাওয়া যায় এবং যতক্ষণ না এই রাত্রি শেষ হয়।

সপ্তপর্ণবনের সিদ্ধসাধিকার গীতস্বর আর শোনা যায় না। তবু রথের উপরে শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারছিলেন না নৃপতি অতিরথ। সেই দাবদাহের জ্বালা যেন নৃপতি অতিরথের ত্রস্ত বক্ষের অস্থিগুলিকে কঠিন বন্ধনে বন্দী ক'রে রেখেছে।

কৃষ্ণা দ্বাদশীর চন্দ্রমা পাণ্ডুর হয়ে এসেছে। ম্লান জ্যোৎস্নালোকে দেখা যায়, অদূরে প্রশান্তসলিলা এক নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নৃপতি অতিরথ জিজ্ঞাসা করেন—এ কোন্ নদী সারথি?

—এই নদীর নাম নীবারা। পুণ্যতোয়া নীবারা। পাতকীরা এই নদীর জলে স্নান ক'রে তাদের প্রায়শ্চিত্ত ব্রত আরম্ভ করে। বাসনা ক্ষয় করার জন্য তপঃসাধনার উদ্দেশে বনযাত্রার পূর্বে সংসারবিমুখ মানুষ এই নদীর জলে স্নান ক'রে শুচি হয়।

অতিরথ ব্যস্ত হয়ে বলেন—রথ থামাও সারথি।

রথ হতে অবতরণ করেন নৃপতি অতিরথ। মস্তক হতে মুকুট উত্তোলন ক'রে রথের আসনে স্থাপন করেন।

সারথি ভীতকণ্ঠে ডাকে—রাজ্যেশ্বর!

নৃপতি অতিরথ শান্তস্বরে বলেন—কথা বলো না সারথি, এই মুকুট নিয়ে রাজধানীতে ফিরে যাও।

সারথি তবু প্রশ্ন করে—আর আপনি?

—আমার আর ফিরে যাবার পথ নেই সারথি। দূর গিরিবক্ষের কুহেলিকা আর অরণ্যের ছায়ারেখার দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে থাকেন অতিরথ, যেন এক তপস্যার জগৎ তাঁকে নীরবে আহ্বান করছে।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে, সুশীতলা নীবারার প্রসন্ন সলিলে স্নান করার জন্য তটপঙ্ক অতিক্রম করতে থাকেন তপস্যাভিলাষী অতিরথ।

# মন্দপাল ও লপিতা

—একি? আজও তুমি একাকিনী?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—কেউ যে এখনও আসেনি।

—কবে আসবে?

—জানি না।

নিকুঞ্জের নিভৃতে দাঁড়িয়ে যেন এক প্রতিধ্বনির সঙ্গে আলাপ করে আর প্রশ্নের উত্তর দেয় ঋষিকুমারী লপিতা। কিন্তু এই প্রতিধ্বনি সত্যই সমীর-সঞ্চারিত কোন প্রতিধ্বনি নয়। সত্যই সুন্দরী লপিতার শ্রবণপদবী শিহরিত ক'রে এই প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে না। তবু শুনতে পায় লপিতা। সুন্দরী লপিতার কল্পনা যেন উৎকর্ণ হয়ে মাঝে মাঝে শুনতে পায়, তার জীবনের সব চেয়ে বেশি সুখকর এক আকাঙ্ক্ষার ভাষা তার মনের আকাশে নিয়তচঞ্চল এক চন্দনানিলের স্পর্শে পুলকিত হয়ে রবমধুর প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করছে।

ঋষি পিতার আশ্রমে তপোবন আছে, কিন্তু তপোবনতরুর ছায়ার কাছেও কোনদিন এসে দাঁড়ায়নি লপিতা। তপোবনের অদূরে ভ্রমরজল্পিত পুন্নাগ-তরুর মেখলায় পরিবৃত এই নিকুঞ্জের ছায়াকে ভালবাসে লপিতা।

কখনও দেখতে পায় লপিতা, নিকুঞ্জের লতাপল্লব যেন আর এক ছায়ার স্পর্শে শিহরিত হয়। লপিতাকে বরদান ক'রে কবে চলে গিয়েছে সেই হৃষ্ট কিন্নরমিথুন. কিন্তু হঠাৎ মনে হয়, সেই কিন্নরমিথুনেরই মায়াশরীর এসে লতান্তরাল হতে লপিতার দিকে তাকিয়ে আছে।

—সুন্দরী লপিতা?

—কি?

—নিরাশ হয়ো না।

—কখনই হব না।

—বিশ্বাস কর, আমাদের প্রদত্ত বর সত্য হবে একদিন।

—বিশ্বাস করি।

সত্যই ছায়া নয়, আর কিন্নরমিথুনের মায়াশরীরও নয়। কল্পনাবিষ্ট

নেত্রে বায়ুশিহরিত লতান্তরালের দিকে তাকিয়ে নিজেরই মনের অন্তরালে এক উপবনের ছবি দেখতে থাকে লপিতা। সেই উপবনে আছে শুধু লপিতা আর লপিতার প্রেমিক। আর কেউ নয়।

এই নিকুঞ্জে বাস করত এক কিন্নরমিথুন। তৃষ্ণার্ত কিন্নরমিথুনকে একদিন জল দান করেছিল লপিতা। তৃপ্ত কিন্নরমিথুন প্রশ্ন করেছিল লপিতাকে—কি বর চাও ঋষিকুমারী?

—কি বর দিতে পার?

—আমাদেরই মত হও, এই বর দান করা ছাড়া অন্য কোন বর দানের শক্তি আমাদের নেই।

—কে তোমরা?

—আমরা চিরাসঙ্গলীন প্রেমিক ও প্রেমিকা। আমরা কখনও ভিন্ন হই না। আমরা শুধু চিরকালের দম্পতি, আমরা কখনও পিতামাতা হই না। আমাদের ক্রোড়ে ও বক্ষে কখনও সন্তান দেখা দেয় না। আমরা চির আলিঙ্গনে সমর্পিত প্রিয় ও প্রিয়া। আমাদের মাঝখানে তৃতীয় কোন স্নেহভাক্ প্রাণের প্রশ্রয় আমরা দিই না। আমাদের জীবন চিরনর্মের জীবন।

লপিতা বলে—এই তো জীবন।

কিন্নরমিথুন—চাও কি এই জীবন?

লপিতা—চাই।

কিন্নরমিথুন—যদি চাও, তবে নিশ্চয়ই পাবে।

বরদান ক'রে চলে গিয়েছে কিন্নরমিথুন। আজও নিকুঞ্জের নিভৃতে এসে প্রতিদিন তার মনের এই আকাঙ্ক্ষার ভাষা আর ছায়ার সঙ্গে যেন নীরবে আলাপ ক'রে চলে যায় লপিতা। কিন্তু কই? এই নিকুঞ্জপথে এমন কোন পথিকের মূর্তি আজ পর্যন্ত দেখা দিল না, যাকে জীবনে আহ্বান ক'রে লপিতা তার সুখস্বপ্ন সফল ক'রে তুলতে পারে।

তাই লপিতা আজও একাকিনী। নিকুঞ্জের নিভৃতে পুষ্পদামে সজ্জিত প্রেঙ্খার দুটি আসনের মধ্যে একটি আসন শূন্য হয়েই রয়েছে। কবে পূর্ণ হবে এই শূন্য আসন? কবে দয়িতকণ্ঠ ধারণ ক'রে ধন্য হবে লপিতার দক্ষিণ বাহুভাগ? কবে আসবে লপিতার কল্পনার সেই প্রেমিক, যার বামাঙ্গসঙ্গিনী হয়ে এই পুষ্পদামসজ্জিত প্রেঙ্খায় আন্দোলিত হবে লপিতার প্রতিক্ষণমধুর কামনার স্বপ্ন?

বিশ্বাস আছে, হতাশও হয় না ঋষিকুমারী লপিতা, তবু বড় দুঃসহ এই প্রতীক্ষা। উৎসুক নয়নে নিকুঞ্জের প্রান্তে পুন্নাগতরুর ছায়াঙ্ক আকীর্ণ পথের দিকে তাকিয়ে থাকে লপিতা। প্রৌঢ় তরুণ ও কিশোর, কত পথিক যায়।

নিকুঞ্জচ্ছায়ে প্রেঙ্খোলিত এক যৌবনশোভার দিকে তাকিয়ে সকলে চলে যায়। কেউ মুগ্ধ, কেউ বিস্মিত এবং কেউ বা শঙ্কিত। পুষ্পদোলায় দুলছে যেন এক স্বপ্নায়িত কামনার রূপ, যেন এক অমর্ত্যমানবী বসন্তসমীরে ভেসে এসে এই নিকুঞ্জে আশ্রয় নিয়েছে। দোলে পুষ্পদামে সজ্জিত প্রেঙ্খা, দোলে লপিতার উল্লাসনয়নের স্মরতরলিত দৃষ্টি, দোলে লপিতার আবেশবিলোল চিকুরভার। মুগ্ধ পথিকের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় লপিতা। মুগ্ধ হয় না লপিতা।

কিন্তু একদিন আর মুখ ফিরিয়ে নিতে পারল না লপিতা।

দেখতে পায় লপিতা, পুন্নাগতরুর ছায়ার কাছে এসে লপিতার দিকে বিস্মিত নয়নে তাকিয়ে আছেন নবীন কিংশুকের মত রূপমান এক ঋষিযুবা।

সত্যসন্ধ অনসূয়ক প্রিয়বাদী ও বেদবিৎ মন্দপাল তাঁর জীবনের এক আকাঙ্ক্ষিত ব্রতের আহ্বানে চলেছেন। স্বর্গত পিতার একটি বিশেষ আগ্রহের কথা এতদিনে মন্দপালের মনে পড়েছে। বিবাহ ক'রে পুত্রবান হও পুত্র, পিতার সেই অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে লোকসমাজে নিন্দিত হয়েছেন মন্দপাল। কিন্তু শুধু লোকনিন্দার আঘাত হতে আত্মরক্ষা করবার জন্য নয়, স্বর্গত পিতার আর একটি কথা এতদিনে মনে পড়েছে মন্দপালের।—খাণ্ডবপ্রস্থের শার্ঙ্গিক-কুমারী জরিতার পাণি গ্রহণ করো পুত্র। আমি জানি, সে তোমার অনুরাগিণী।

মনে পড়েছে শার্ঙ্গিককুমারী জরিতার কথা। তাই খাণ্ডবপ্রস্থের দিকে চলেছেন মন্দপাল। এই নিকুঞ্জপ্রান্তের ছায়াঞ্চিত পথের উপর দাঁড়িয়ে দেখা যায়, কাননসমাকুল খাণ্ডবপ্রস্থের শ্যামশোভা যেন তরঙ্গভঙ্গে বিস্তারিত হয়ে রয়েছে। আজ কল্পনা করতেও বিস্ময় বোধ করছেন মন্দপাল ঐ শ্যামশোভার এক নিভৃতের ক্রোড়ে বিফল অনুরাগের বেদনায় অশ্রুসিক্তা হয়ে রয়েছে জরিতা নামে তাঁরই প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী এক নারী। কিন্তু মন্দপালের চক্ষুর সম্মুখে, যেন তাঁর পথের বাধার মতই, কে ঐ বিস্ময়?

প্রেঙ্খা হতে অবতরণ করে লপিতা। উৎসুক নয়ন আর উৎফুল্ল অধরের শোভা বিকশিত ক'রে বিকচযৌবনা লপিতা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মন্দপালের সম্মুখে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন করে লপিতা—আপনি কেন বিস্মিত হয়েছেন ঋষি?

মন্দপাল—আমার বিস্ময় দেখে তুমি বিচলিত হয়েছ কেন কুমারী?

লপিতা—সত্য কথাই বলেছেন ঋষি। জানি না কে আপনি, তবু মনে হয়, আপনিই আমার কল্পনার সেই প্রেমিক, যার প্রতীক্ষায় পথের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে আমার জীবন যৌবন ও বাসনা।

মন্দপাল—ভুল করেছ কুমারী। আমি সত্যসন্ধ ও বেদবিৎ মন্দপাল। ঐ কাননসমাকুল খাণ্ডব প্রদেশের শ্যামশোভার এক নিভৃতে আমারই প্রতীক্ষায় অপলক নয়নে পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এক নারী।

লপিতা—কে সেই নারী?

মন্দপাল—জরিতা।

লপিতা—শার্ঙ্গিককুমারী জরিতা?

মন্দপাল—হ্যাঁ।

লপিতা—সে কি আপনার ভার্যা?

মন্দপাল—আমার ভার্যা হবে জরিতা।

লপিতা—এতদিন কি বাধা ছিল, কেন আপনার ভার্যা হতে পারেনি জরিতা?

মন্দপাল—আমারই ভুল আমার বিস্মৃতি। ভুলে গিয়েছিলাম পিতার নির্দেশ। বুঝতে পারিনি, অবিবাহিত ও অপুত্রক জীবন সুখের জীবন নয়।

বিস্ময়বিচলিতস্বরে লপিতা বলে—আপনি কি সপুত্রক জীবন লাভের লোভে অনুরাগিণী জরিতার কাছে চলেছেন?

মন্দপাল—হ্যাঁ।

লপিতা—কিন্তু সে জীবন কি সত্যই সুখের জীবন?

মন্দপাল—এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন কুমারী?

লপিতা—আপনি ভুল করছেন ঋষি। আপনি সলিলের সন্ধানে মরুভূর দিকে চলেছেন। আপনি মুক্তাফলের সন্ধানে পাষাণের কাছে চলেছেন। আপনি অমৃতের সন্ধানে হলাহলের দেশে চলেছেন। শার্ঙ্গিককুমারী জরিতার প্রেমে আপনি পুত্রবান হবেন কিন্তু প্রেমিকতার আনন্দ পাবেন না ঋষি।

মন্দপাল—কেন?

লপিতা—আপনার সন্তান দস্যুর মত কেড়ে নেবে আপনারই প্রিয়া জরিতার নয়নের ও অধরের সকল আগ্রহ।

মন্দপাল—তাই তো এই জীবনের নিয়ম।

লপিতা—নিতান্তই অনিয়ম।

মন্দপাল—তুমি কি অমর্ত্যমানবী?

লপিতা—আমি এই মর্ত্যেরই নারী, কিন্তু মর্ত্যের দীনতা হীনতা ও বেদনা হতে প্রেমের জীবনকে চিরাসঙ্গে সুখী ক'রে রাখবার রীতি আমি জানি। আমি জানি সে জীবনের সন্ধান।

মন্দপাল—সে কেমন জীবন?

লপিতা—আমার পুষ্পদামসজ্জিত প্রেঙ্খার মত সদা উল্লাসে আন্দোলিত জীবন। পাশাপাশি শুধু দুটি আসন, শুধু প্রিয় ও প্রিয়ার জন্য দুটি ঠাঁই। অনুক্ষণ বাহুবন্ধনে বিলীন দুটি জীবন। সে বন্ধন কোন মুহূর্তে ছিন্ন হয় না। জীবনে কোন শিশুর কণ্ঠস্বর শুনতে হয় না।

মন্দপাল—তোমার পরিচয় জানতে ইচ্ছা করি কুমারী।

লপিতা—আমি লপিতা, ঋষির তপোবনের কাছে থাকি আমি, কিন্তু তপোবনতরুর ছায়া স্পর্শ করি না কোনদিন। আমি বসন্তসমীরের মত এই নিকুঞ্জের তরুলতার কাছে আমার জীবনের স্বপ্ন নিবেদন করি।

অকস্মাৎ প্রণয়াভিভূত স্বরে আবেদন করে লপিতা—আমার নিকুঞ্জের এই পুষ্পদামসজ্জিত প্রেঙ্খায় আমার পাশে চিরকালের প্রেমিক হয়ে উপবেশন করুন ঋষি।

মন্দপাল—ক্ষমা কর লপিতা।

লপিতা—আমি ছলনা নই, আমি কুহকিনী নই, আমি অমর্ত্যমানবীও নই ঋষি। আপনার চিরপ্রিয়া হয়ে আমার জীবন ও যৌবনের প্রতি মুহূর্তের আগ্রহ আপনারই বক্ষে উপহার দিতে চাই। আমি জরিতা নই ঋষি, আমি সন্তানের কলরব ও ক্রন্দনে মুখরিত গৃহধর্ম নই। আমি শুধু প্রেমিকা, প্রেমিকের চিরক্ষণের বক্ষোলগ্ন ললন্তিকা।

মন্দপাল—তুমি সুন্দর, কিন্তু তোমার কামনা সুন্দর নয় লপিতা।

আর্তনাদ করে লপিতা—অপমান করবেন না ঋষি।

মন্দপাল—কিন্তু তুমি সত্যই বিস্ময়। জীবনে এই প্রথম শুনলাম লপিতা, বসন্তের ব্রততী পুষ্পান্বিতা হতে চায় না।

দূরে কাননসমাকুল খাণ্ডবপ্রস্থের শ্যামশোভার দিকে তাকিয়ে রইলেন মন্দপাল। তার পরেই নিকুঞ্জপ্রান্তের তরুচ্ছায়া হতে সরে গেলেন।

—ঋষি।

আহ্বান শুনে পিছনে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন মন্দপাল। দেখলেন, নিকুঞ্জচারিণী এক মায়াহরিণীর মতই তাকিয়ে আছে লপিতা, বাষ্পাসারে মেদুরিত তার দুই চক্ষুর দৃষ্টি।

লপিতা বলে—যান ঋষি, কিন্তু লপিতার এই নিকুঞ্জ-নিভৃতের পুষ্পপ্রেঙ্খায় একটি আসন শূন্য পড়ে রইল। যদি কখনও ফিরে আসেন, তবে দেখতে পাবেন, শূন্য হয়েই রয়েছে এই আসন। লপিতার জীবনের পাশে আপনি ছাড়া আর কারও স্থান নেই।

চমকে ওঠেন মন্দপাল, এবং ব্যথাভিভূত নেত্রে লপিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কি এক ক্ষণিক মোহের ভুলে, বিচলিত বাসনার বিভ্রমে

এক কঠোর প্রতিজ্ঞা ঘোষণা ক'রে দিল লপিতা! শূন্য হয়েই থাকবে ওর পুষ্পপ্রেঙ্খার একটি আসন। কোনদিনও এখানে আর ফিরে আসবেন না মন্দপাল। এই নিকুঞ্জের নিভৃতে চিরকালের একাকিনী লপিতা শুধু তার ব্যথিত ও বিষণ্ণ মূর্তির ছায়া দেখে জীবনযাপন করবে। ভুল, ভয়ানক ভুল করল এই কল্পনাসুখিনী নারী।

মন্দপাল বলেন—বিদায় দাও লপিতা। প্রার্থনা করি, তোমার ভুল যেন ভেঙে যায়।

কাননসমাকুল খাণ্ডবপ্রস্থের শ্যামশোভার এক নিভৃতের ক্রোড়ে শার্ঙ্গিক-কুমারী জরিতার প্রতীক্ষা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। জরিতার পাণি গ্রহণ করেছেন মন্দপাল। যেন হেসে উঠেছে সংসারের দুটি প্রাণের প্রদীপ, আর সেই হাসিতে মধুর হয়ে গিয়েছে একটি কুটীরের বক্ষ।

কালচক্রে ধাবিত হয় মাস ঋতু ও বৎসর। আসে নিদাঘ, আসে প্রাবৃষা, আসে শিশির ও বসন্ত। খাণ্ডবকাননের লতাকুঞ্জের মত মন্দপাল আর জরিতার জীবনকুঞ্জেও নূতন প্রাণের আবির্ভাব পুষ্পিত হয়ে ওঠে। সন্তান ক্রোড়ে নিয়ে স্বামী মন্দপালের মুখের দিকে স্মিতনেত্রে তাকিয়েই ব্রীড়াবশে নতমুখিনী হয় পত্নী জরিতা। মন্দপাল বলেন—পুষ্পিতা ব্রততীর মতই ধন্য ও সুন্দর তুমি, প্রিয়া জরিতা।

শিশুকণ্ঠের ক্রন্দনস্বরে ব্যাকুল ও বিহ্বল হয় মন্দপালের কুটীর।

মন্দপাল বলেন—তুমি আমার স্বপ্ন সফল করেছ জরিতা। তুমি এই কুটীরের বাতাসে স্নেহ সঞ্চারিত করেছ, তুমি আমার বক্ষের কাছে কিশলয়দেহ শিশুর মধুর স্পর্শ নিয়ে এসেছ।

খাণ্ডবকাননের নিভৃতে এক কুটীরের বক্ষে জেগে উঠেছে গৃহধর্ম। ফুটে উঠেছে এক দম্পতির পরিতৃপ্ত জীবনের আনন্দ। সে আনন্দের নাম সন্তান। পিতৃত্ব লাভ করেছে এক পুরুষ, মাতৃত্বে মণ্ডিত হয়েছে এক নারী। দম্পতির প্রেমের জীবনই বাৎসল্যে অভিষিক্ত হয়ে ফুল্লদল নব কুসুমের মত ফুটে উঠেছে।

অতিক্রান্ত হয়েছে বৎসরের পর বৎসর। চারিটি পুত্রসন্তানের জননী জরিতা একদিন মন্দপালের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়। এ কি, বিষণ্ণ কেন তুমি?

মন্দপাল বলেন—এই কি প্রথম দেখতে পেলে?

জরিতা—হ্যাঁ।

মন্দপাল—আমার আশঙ্কা সত্য হলো জরিতা।

জরিতা বেদনার্তভাবে তাকায়—কিসের আশঙ্কা?

মন্দপাল—তোমার নিকটে থেকেও আমি আজ একাকী।

জরিতা—একথা বলছেন কেন স্বামী?

মন্দপাল—হ্যাঁ, আমি একাকী ও নিঃসঙ্গ। আমি আজ তোমার এই বাৎসল্যবিহ্বল কুটীরে তোমার সর্বক্ষণের ব্যস্ততার পাশে একটি অবান্তর ছায়া মাত্র।

ব্যথিতভাবে জরিতা বলে—আপনার দুঃখ বুঝতে পেরেছি স্বামী। কিন্তু...।

মন্দপাল—কিন্তু বুঝলেও তোমার সেই হৃদয় আজ আর নেই জরিতা।

জরিতা—কোন্ হৃদয়?

মন্দপাল—প্রেমিকার হৃদয়! তুমি আজ শুধু সন্তানের মাতা। সন্তানের অধরহাস্য তোমার সকল চুম্বন লুণ্ঠন ক'রে নেয়। সন্তানের অধরের স্পন্দন দেখে তার তৃষ্ণা তুমি বুঝতে পার। কিন্তু ভুলে গিয়েছ, তোমারই অনুরাগের আহ্বানে সুদূর হতে যে প্রেমিক এসে তোমাকে এক শুভদিনে কণ্ঠলগ্ন করেছিল, সে আজও তোমার নিকটেই আছে, আর তার হৃদয়ে পিপাসাও আছে। ভুলে গিয়েছ, সে প্রেমিকহৃদয় আজও উৎসব অন্বেষণ করে। কিন্তু বৃথা, বৃথা এই কাননভূমির নিভৃতে শীতাংশুকিরণ এসে লুটিয়ে পড়ে বৃথা ফুটে ওঠে বাসন্তী কুসুম বৃথা নীরব হয় যামিনীর মধ্যপ্রহর। প্রেমিক মন্দপাল তার প্রেমিকাকে আর খুঁজে পায় না।

অশ্রুসিক্ত নয়নে জরিতা বলে—আমার ভুল ক্ষমা করবেন স্বামী।

পরক্ষণেই সুস্মিত নেত্রে মন্দপালের মুখের দিকে তাকিয়ে মধুর প্রতিশ্রুতির মত সুস্বরে জরিতা বলে—আর কখনও এ-ভুল হবে না। আজ রজনীতে তোমারই জরিতার কণ্ঠ হতে আপন কণ্ঠে তুলে নিও সেই বাসন্তী কুসুমের মালিকা যে কুসুমের মালিকা দিয়ে তোমাকে আমার জীবনে প্রথম বরণ করেছিলাম। আজ তোমারই বামবাহু তোমার প্রেমিকা জরিতার উপাধান হবে প্রিয়।

কিন্তু ভুল হল জরিতার। বুকের কাছে শিশুর ক্রন্দনে যখন স্বপ্ন ভেঙে গেল নিদ্রামগ্না জরিতার, তখন জাগ্রত পিকের সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠেছে খাণ্ডব-কাননের প্রত্যূষের সমীর। দেখতে পায় জরিতা, তার বাসন্তী কুসুমের মালিকাও যেন বৃথা প্রতীক্ষার বেদনায় বিষণ্ণ হয়ে তারই শিয়রের কাছে পড়ে আছে।

বৃথা পুষ্পমালিকা তুলে নিয়ে ছুটে যায় জরিতা। কুটীরের চতুর্দিকে অন্বেষণ ক'রে ফিরতে থাকে জরিতা। কিন্তু মন্দপাল নেই। জরিতার প্রেমিক মন্দপাল, জরিতার স্বামী মন্দপাল, জরিতার সন্তানের পিতা মন্দপাল চলে গিয়েছেন।

স্বামী! বৃথা আর্তনাদ করে জরিতা। খাণ্ডবকাননের প্রত্যূষ জরিতার সেই ব্যাকুল আহ্বানের কোন উত্তর দেয় না।

ভ্রমরজল্পিত পুন্নাগতরুর ছায়ায় স্নিগ্ধকণ্ঠের আহ্বান ধ্বনিত হয়।—আমি এসেছি লপিতা।

লপিতা বলে—এস, দেখ আমার পুষ্পপ্রেঙ্খার একটি আসন আজও শূন্য পড়ে আছে কি না।

মন্দপাল—দেখেছি লপিতা। আমার সকল কঠোরতা ক্ষমা ক'রে আজ তোমার জীবনের পাশে আমাকে গ্রহণ কর লপিতা। তোমার পুষ্পপ্রেঙ্খার ঐ আসনই স্বপ্ন হয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। তোমাকে ভুলতে পারিনি। বুঝেছি, তুমিই প্রেমিকা এবং সত্য তোমার প্রেম।

লপিতার পাণি গ্রহণ করলেন মন্দপাল। লপিতা বলে—এস বিরহবিহীন চিরাসঙ্গমধুর জীবনের নায়ক হয়ে আমার জীবনে এস।

দোলে নিকুঞ্জের নিভৃতে পুষ্পপ্রেঙ্খায় দুটি প্রেমবিধুর জীবনের ক্লান্তিহীন আকাঙ্ক্ষা দোলে। মন্দপাল ও লপিতা, চিরক্ষণের প্রেমিক ও চিরক্ষণের প্রেমিকা। ওদের জীবন সংসারের কোন কুটীর চায় না, ওদের ক্রোড় ও বক্ষ কোন শিশুদেহের স্পর্শ চায় না। মন্দপাল শুধু লপিতার জন্য, লপিতা শুধু মন্দপালের জন্য। আর কারও জন্য ওরা নয়।

কালচক্রে মাস ঋতু ও বৎসর আবর্তিত হয়। আসে নিদাঘ, আসে প্রাবৃষা, আসে শিশির ও বসন্ত।

নিকুঞ্জের পুষ্পপ্রেঙ্খার আসনে বসে দেখতে পান মন্দপাল, দূরে কানন-সমাকুল খাণ্ডবপ্রস্থের শ্যামশোভা তরঙ্গিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু দেখেও যেন মনে পড়ে না, ঐ শ্যামশোভার নিভৃতে অসহায় অশ্রুর কুহেলিকায় আবৃত কোন কুটীরের কথা। মাঝে মাঝে শুধু মনে পড়ে মন্দপালের, খাণ্ডবকাননের এক প্রেমহীন ও আনন্দহীন শুষ্কপত্রস্তূপের ছলনার কাছ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি চলে এসেছেন।

সুখী হয়েছে লপিতা। প্রতিদিন প্রশ্ন করে লপিতা—তুমি সুখী হয়েছ তো ঋষি?

মন্দপাল বলেন—সুখী হয়েছি লপিতা।

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন প্রশ্ন ক'রেও উত্তর শুনতে না পেয়ে বিস্মিত হয়ে মন্দপালের মুখের দিকে তাকায় লপিতা। দেখতে পায় লপিতা, শ্যামায়মান খাণ্ডবকাননের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন মন্দপাল।

লপিতা বলে—কি দেখছ স্বামী?

অকস্মাৎ আর্তনাদ ক'রে ওঠেন মন্দপাল—রক্ষা কর।

পুষ্পপ্রেঙ্খা হতে অবতরণ ক'রে ব্যথিতস্বরে মন্দপাল বলেন—ঐ দেখ লপিতা অগ্নিশিখার ঝটিকা খাণ্ডবকাননের দিকে ছুটে চলেছে। ঐ দেখ খাণ্ডব দাহনে চলেছেন ভগবান হুতাশন।

লপিতা—কিন্তু তার জন্য তুমি এত বিচলিত হ'লে কেন স্বামী?

মন্দপাল—ঐ খাণ্ডবকাননের নিভৃতে একটি কুটীরে আমারই প্রাণের পুষ্পিত আনন্দের চারিটি মূর্তি, চারিটি শিশু রয়েছে লপিতা।

চমকে উঠে লপিতা বলে—বুঝেছি ঋষি।

-কি?

—আপনি সন্তানের পিতা। আপনার হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে রয়েছে এক পিতার প্রাণ। কিন্তু তার জন্য কোন দুঃখ করি না ঋষি। আমার সন্দেহ...।

চিৎকার করেন মন্দপাল—সন্দেহ দূরে রাখ লপিতা। চল হুতাশনের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করি যেন আমার চারিটি শিশুপুত্রের প্রাণ রক্ষা পায়।

শুনে প্রসন্ন না হ'লেও যেন এক দুঃসহ সন্দেহের পীড়ন হতে মুক্ত হয় আর নিশ্চিন্ত হয় লপিতা। শুধু চারিটি শিশুপুত্রের প্রাণের জন্য কেঁদে উঠেছে পিতা মন্দপালের প্রাণ। তবু ভাল, আর কারও জন্য নয়।

নিকুঞ্জের নিভৃত হতে অগ্রসর হয়ে দীর্ঘ প্রান্তরপথ অতিক্রম ক'রে ভগবান হুতাশনের নিকটে এসে দাঁড়ায় মন্দপাল ও লপিতা। প্রার্থনা করেন মন্দপাল—খাণ্ডব দাহনে অভিলাষী ভগবান, হে পিঙ্গলাক্ষ লোহিতগ্রীব হুতাশন, মন্দপালের কুটীর যেন আপনার জ্বালায় ভস্মীভূত না হয়।

হুতাশন—কেন? কে আছে তোমার কুটীরে?

মন্দপাল—আমার ভার্যা জরিতা ও আমার চারিটি শিশুপুত্র।

হুতাশন আশ্বাস দান করেন—চিন্তা করো না ঋষি। অগ্নির কোন শিখা আর জ্বালা তোমার কুটীর স্পর্শ করবে না।

আশ্বস্ত হয়ে ফিরে এলেন মন্দপাল।

আবার নিকুঞ্জের নিভৃতে সেই পুষ্পপ্রেঙ্খা।

লপিতা ক্ষোভকঠোর কণ্ঠস্বরে বলে—আমার সন্দেহ মিথ্যা নয় ঋষি। আপনিই প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, আমার সন্দেহ সত্য।

—কিসের সন্দেহ?

—আপনার প্রথমবিত্তা জরিতা এখনও আপনার স্বপ্নে লুকিয়ে রয়েছে ঋষি।

—কেমন ক'রে বুঝলে?

—আপনি শুধু চারিপুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য নয়, আপনার প্রথম প্রণয়িনী জরিতারও প্রাণরক্ষার জন্য হুতাশনের কাছে প্রার্থনা করতে ভুলে যাননি।

—তুমি কি সত্যই সুখী হবে লপিতা, যদি পৃথিবীর চারিটি শিশুর এক মাতা বিনা অপরাধে অগ্নিজ্বালায় ভস্ম হয়ে যায়?

—না ঋষি. আমি শুধু চাই, আমার প্রেমিকাজীবনের সকল আকাঙ্ক্ষার বাধা সেই জরিতার প্রতি আমার প্রেমিক মন্দপালের মনে শেষ অনুরাগেব স্মৃতিটুকুও যেন ভস্ম হয়ে যায়।

উত্তর দেন না মন্দপাল। আবার সেই বিপুল বহ্নিজ্বালায় অভিভূত ধূমায়মান খাণ্ডবকাননের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

লপিতা ডাকে—স্বামী।

মন্দপাল মৃদুস্মিত মুখে উত্তর দেন—সন্দেহ করো না লপিতা।

দুই অধর সুহাস্যে স্পন্দিত ক'রে লপিতা বলে—সন্দেহ করতে ইচ্ছা করে না স্বামী।

আবার নিকুঞ্জনিভৃতের পুষ্পপ্রেঙ্খা দোলে। অবিরলপ্রগল্‌ভ প্রেমিকতায় পরস্পরের বাহুলগ্ন দুটি জীবনের উল্লাস আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কিন্তু পরক্ষণেই যেন দুর্বার এক আলস্যে শিথিল হয়ে পড়ে মন্দপালেব দুটি অন্যমনা বাহু। যেন দুঃসহ এক ক্লান্তির বেদনা এতদিনে এসে এই নিয়ত-অস্থিব পুষ্পপ্রেঙ্খার জীবন গ্রাস করেছে।

লপিতা বিস্ময়ব্যথিত স্বরে প্রশ্ন করে—একি? অন্যমনা কেন তুমি স্বামী?

মন্দপাল বলেন—দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত হতে পারছি না লপিতা।

—কিসের দুশ্চিন্তা?

—জানতে ইচ্ছা করে. আমার কুটীরের প্রাণ সত্যই রক্ষা পেল কিনা?

—ভগবান হুতাশনের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েও বৃথা এত দুশ্চিন্তা করছ কেন স্বামী?

—আশ্বাস পেয়েও আশ্বস্ত হতে পারছি না লপিতা। যেতে চাই খাণ্ডব-কাননে। স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারব না লপিতা।

খরবহ্নির স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে ওঠে লপিতার অক্ষিতারকা—সত্য ক'রে বল দেখি সত্যসন্ধ ঋষি, কা'র মুখ দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তোমাব মন?

—পুত্রদের দেখবার জন্য।

—আর কারও জন্য নয়?

—না।

—তবে যাও। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাও. ফিরে আসবে তোমার লপিতার কাছে।

—আসব।

—ভুলে যেও না, আজিকার মতই এক বৎসর পূর্বের এক শুক্লা চতুর্দশীর সন্ধ্যায় তোমার কণ্ঠে পুন্নাগপুষ্পের মালিকা দান করেছিল এই লপিতা।

—ভুলতে পারি না।

—বলে যাও, তেমনি একটি প্রণয়কামনাবাসিত পুন্নাগপুষ্পের মালিকা আমার হাত হতে আজই সন্ধ্যায় কণ্ঠে বরণ করবে তুমি।

—প্রিয়া লপিতা! আজই সন্ধ্যায় তোমার কাছে এসে তোমার উপহার গ্রহণ করবে তোমার প্রেমিক স্বামী মন্দপাল।

—যদি আসতে না পার?

—কেন পারব না লপিতা?

—যদি না আস, তবে শুনে রাখ স্বামী, সেই মালিকা চারি খণ্ডে ছিন্ন ক'রে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করব।

আতঙ্কে চমকে ওঠেন এবং বাণবিদ্ধ মৃগের মত ব্যথিত নেত্রে তাকিয়ে থাকেন মন্দপাল।

লপিতা বলে—যদি তোমার চারি পুত্রের জীবনের জন্য কোন মায়া থাকে যদি লপিতার অভিশাপ থেকে তোমার চারি পুত্রের জীবন রক্ষা করতে চাও তবে লপিতার প্রেমের অপমান করো না ঋষি।

নীরবে, শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে লপিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন মন্দপাল। বিষলতার হৃদয়েও মায়াময় বাৎসল্যভাবনা আছে। বিষলতাও অঙ্গে অঙ্গে পুষ্প প্রস্ফুটিত ক'রে তৃপ্ত হয়। কিন্তু এ কেমন সৃষ্টিবিমুখিনী পীযূষবিহীনা কামনার নারী? নিতান্তই এক শোণিতবতী নারী।

কোন বাক্য উচ্চারণ না ক'রে ব্যস্তচরণে চলে গেলেন মন্দপাল।

খাণ্ডবকাননের নিভৃতের ক্রোড়ে সেই কুটীর। কুটীরে অগ্নিজ্বালার স্পর্শ লাগেনি। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে কুটীরের অঙ্গনে এসে দাঁড়ালেন মন্দপাল।

জরিতা এসে সম্মুখে দাঁড়ায়। কোন কথা না বলে শুধু প্রণাম করে জরিতা। সুস্মিত হয় না, বিস্মিত হয় না, বিচলিত হয় না, বিব্রত হয় না জরিতা। যেন, এতকাল মন্দপালের প্রাণের চারিটি শিশুমূর্তিকে স্নেহাঞ্চলচ্ছায়া দান ক'রে রক্ষয়িত্রীর মত এই কুটীরের নিভৃতে দিনযাপন করেছে জরিতা। দেখে তৃপ্ত আর শান্ত হোক মন্দপাল, তাঁর সন্তানদের কোন ক্ষতি হয়নি।

সন্তানেরা এসে একে একে মন্দপালের নিকটে দাঁড়ায়। চারিটি কিশলয়দেহ শিশু। একে একে সন্তানদের শির চুম্বন করেন মন্দপাল।

এই সুন্দর দৃশ্যের এক পাশে এক অবান্তর ও অপ্রয়োজন ছায়ার মত

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে জরিতা। হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত হয়েছে জরিতা দেখে সুখী হয়েছে জরিতা কিন্তু এই ঘটনার কাছে জরিতার জীবনের যেন কোন প্রশ্ন নেই, বক্তব্যও নেই। এসেছেন নিতান্ত এক সন্তানস্নেহের পিতা, বিপন্নপ্রাণ সন্তানের জন্য উদ্বিগ্নচিত্ত এক পিতার হৃদয় ছুটে এসেছে। জরিতার হাত থেকে বাসন্তী কুসুমের মালিকা কণ্ঠে গ্রহণ করবার জন্য ছুটে আসেনি কোন প্রেমিকের লোভ আর স্বামীর মন।

কিন্তু অকস্মাৎ দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয় জরিতা যেন এক বিভ্রমের বশে বিচলিত দুই চক্ষুর দৃষ্টি তুলে নতমুখিনী জরিতার মুখের দিকে তৃষ্ণার্তের মত তাকিয়ে আছেন মন্দপাল।

—জরিতা!

মন্দপালের আহ্বান শুনেও সাড়া দেয় না জরিতা। অভিমানকুণ্ঠিতা নায়িকার মত নয়, যেন নিদাঘতাপিতা বাসন্তী কুসুমের মত অবমানিত ও উপেক্ষিত সৌরভের বেদনায় কুণ্ঠিত হয়ে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে থাকে জরিতা।

মন্দপাল বলেন—আজও কি আমার এই আহ্বানের অর্থ বুঝতে পারবে না জরিতা?

– বুঝতে পারি স্বামী কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি না।

কি বিশ্বাস করতে পার না?

—আপনার নয়নের ঐ দৃষ্টি আর আপনার কণ্ঠস্বরের এই আহ্বান তৃপ্ত করবার মত কোন রূপ আর গুণ আছে কি এই জরিতার?

—এ সন্দেহ কি এখনও হৃদয়ে পোষণ ক'রে রেখেছ জরিতা?

—সন্দেহ নয় স্বামী।

– তবে কি?

—শিক্ষা।

—কিসের শিক্ষা?

—আমি চিরাসঙ্গমধুর পুষ্পপ্রেঙ্খা নই ঋষি, আমি নিতান্তই এক বাৎসল্য-বিধুর কুটীর।

মন্দপাল—পুত্রবতী জরিতা পুষ্পিতা ব্রততীর মত তুমি। পরাগলিপ্তা কেতকীর মত তুমি। কল্লোলিনী তটিনীর মত তুমি। তোমারই নিঃশ্বাসের সৌরভ আমার এই কুটীরে চারিটি পুষ্পের মূর্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে।

—আপনি ক্ষণিক করুণার ভুলে এই ধারণা করছেন ঋষি।

—না জরিতা।

—আপনি আপনার দুই চক্ষুকে প্রশ্ন করুন ঋষি।

—করেছি জরিতা। আমার দুই চক্ষু আজ একটি সত্যকে দেখতে পেয়েছে।

—কি?

—তুমি সাবিত্রী, তাই তুমি সুন্দর।

—স্বামী।

—তুমি শুধু সুন্দর নও জরিতা, তুমিই সুন্দরতা। তুমি শুধু আমার প্রেমিকা নও, তুমি আমার প্রেম।

কুটীরের এক কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জরিতা। একটি পুষ্পমালিকা হাতে নিয়ে ফিরে এসে মন্দপালের বক্ষঃসন্নিধানে দাঁড়ায়। জরিতার স্মিত অধরের মতই স্নিগ্ধ অথচ বিহ্বল সেই সদ্যশ্চয়িত বাসন্তী কুসুমের মালিকা সিতচন্দনে অভিষিক্ত।

মন্দপালের কণ্ঠে পুষ্পমালিকা অর্পণ করে জরিতা।

মন্দপাল বলেন আর এখানে নয় প্রিয়া জরিতা। চল এই খাণ্ডবকাননের নিভৃত হতে বহুদূরে দেশে চলে যাই, যেখানে কোন পুষ্পপ্রেঙ্খার কঠোর স্বপ্ন শত অন্বেষণেও আমাদের এই স্নিগ্ধ তৃপ্ত ও সসন্তান গৃহজীবনের সন্ধান পাবে না।

জরিতা বলে—চল স্বামী।

মন্দপাল—কিন্তু।

জরিতা—চিন্তান্বিত হলেন কেন স্বামী?

মন্দপাল—কিন্তু সেই পুষ্পপ্রেঙ্খার সেই কঠোরস্বপ্না যে আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না জরিতা। আমি তাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আশ্বস্ত ক'রে এসেছি, সেই প্রতিশ্রুতি আমাকে ভঙ্গ করতে হবে জরিতা। আমার অপরাধে তার প্রতিহিংসা আর অভিশাপ যদি...।

অকস্মাৎ সেই অভিশাপোৎসুক কঠোরস্বপ্নাকেই সম্মুখে দেখতে পেয়ে মন্দপালের আতঙ্কিত বক্ষের আর্তনাদ শিহরিত হয়।—তুমি?

—হ্যাঁ, আমি। কুটীরপ্রাঙ্গণের এক লতান্তরাল হতে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মন্দপালের সম্মুখে দাঁড়ায় লপিতা।

হেসে ওঠে লপিতা।—ভয় পেও না স্বামী। শুনে সুখী হও, হার মেনেছে লপিতা, আর সেই পরাজয় ঘোষণা ক'রে দিয়ে চলে যাবার জন্যই এসেছে লপিতা।

মন্দপাল—পরাজয়?

লপিতা—হ্যাঁ, কিন্তু তোমার কাছে পরাজয় নয় ঋষি।

নীরব হয় লপিতা। তারপর জরিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—

পরাজয় তোমার কাছেও নয় জরিতা। তোমাকে আমার চেয়ে বেশি সুন্দর ক'রে তুলেছে যারা, তারাই আমাকে হারিয়ে দিয়েছে, তারা হলো ঐ চারিটি ।

চিৎকার ক'রে ওঠেন মন্দপাল--অভিশাপ দিও না লপিতা। ওরা কোন অপরাধ করেনি।

আবার হেসে ওঠে লপিতা--কথা ছিল, তুমি যদি ফিরে না আস আমার কাছে, তবে আমার প্রেমের পুন্নাগমালিকা চারি খণ্ডে ছিন্ন ক'রে..।

সহসা অশ্রুধারায় প্লাবিত হয়ে মুছে যায় সুন্দরী লপিতার চিবুকের কুঙ্কুমরোচনা।

লপিতা বলে—আপনারই প্রাপ্য মালিকাকে চারি খণ্ডে ছিন্ন ক'রে চারিটি ক্ষুদ্র মালিকা রচনা করেছি ঋষি মন্দপাল। ভয় পাবেন না পুত্রবৎসল পিতা।

আরও নিকটে এগিয়ে আসে লপিতা। মন্দপাল ও জরিতার ক্রোড়লগ্ন চারিটি শিশুর অধর চুম্বন করে লপিতা। চারিটি শিশুকণ্ঠকে সস্নেহে পুষ্পমালিকায় শোভিত ক'রে দিয়ে লপিতা বলে—হার মেনেছি যাদের কাছে, তাদেরই গলায় মালা দিয়ে গেলাম। সুখী হও ঋষি মন্দপাল, সুখী হও জরিতা।

চলে গেল লপিতা।

নিকুঞ্জের নিভৃতে দোলে পুষ্পপ্রেঙ্খা। ভ্রমরজল্পিত পুন্নাগতরুর ছায়া স্নিগ্ধ হয়েই থাকে। বসন্তসমীরের স্পর্শে চঞ্চলিত হয় লতাপল্লব। দোলে, পুষ্পপ্রেঙ্খায় এক পীযূষবিহীন কামনার ক্লান্ত ও বেদনাক্লিষ্ট জীবনভাব দোলে। দোলে এক নির্বাসিতা অপূর্ণবাসনা।

প্রতিধ্বনি বলে—এ কি লপিতা? তুমি এখনও একাকিনী?

লপিতা বলে—হ্যাঁ, আমি চিরকালের একাকিনী।

---

# উতথ্য ও চান্দ্রেয়ী

পিতামহ অত্রির আশ্রমে থাকে সোমসুতা চান্দ্রেয়ী।

তপস্বিনী নয়; কিন্তু দেখে মনে হয়, যেন এক ক্ষান্তিহীন তপস্যার জীবন গ্রহণ করেছে চান্দ্রেয়ী। এক পরম কাম্যের পদধ্বনির জন্য তপস্যা।

ঊষাগমে যখন প্রাচীকপোল আর সন্ধ্যাগমে যখন প্রতীচীর ললাট অরুণিত হয়, তখন অত্রি-আশ্রমের ঘনশ্যামল তপোবনের নিভৃতে হেমপুষ্পের ছত্রের মত প্রস্ফুট এক সিন্ধুবারতরুর ছায়ার নিকটে এসে দাঁড়িয়ে থাকে চান্দ্রেয়ী। তরুতলের দূর্বামঞ্জরীর দিকে সস্পৃহ নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে এবং তার পরেই যেন তার বিপুলাপিপাসিত অন্তরের বেদনাকে ক্ষণিক সান্ত্বনায় প্রশমিত করবার জন্য দূর্বামঞ্জরীর গুচ্ছ সাগ্রহে চয়ন ক'রে নিয়ে সুবর্কিত কুন্তলে গ্রন্থিত করে চান্দ্রেয়ী। এই তো সেই সিন্ধুবারতরুর সেই ছায়াতল, যেখানে একদিন এসে দাঁড়িয়েছিলেন অঙ্গিরার পুত্র উতথ্য। দিব্যসলিল সরোবরের বিকশিত কমলের মত কমনীয়কান্তি উতথ্য। তাঁরই পদরেণুপূত স্পর্শের পুলক এই দূর্বামঞ্জরীর বক্ষে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে।

সেই যে কবে, আকাশের নক্ষত্রকুলের পরিচয় বিচারের জন্য অত্রির আশ্রমে একবার এসেছিলেন উতথ্য, সেই দিন থেকে সেই সিন্ধুবারতরুর ছায়াতল সোমসুতা চান্দ্রেয়ীর জীবনে এক আরাধনাস্থলী হয়ে উঠেছে। সেদিন তমস্বিনী শর্বরীর শেষযাম যখন ফুরিয়ে গেল, আর জেগে উঠল আভাময় ঊষাভাস, তখন চলে গেলেন উতথ্য। আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শেষ হয়ে গেল উতথ্যের দুই চক্ষুর কৌতূহল তাই দেখতে পেলেন না এবং বুঝতেও পারেননি যে, ভূতলবাসিনী ইন্দুলেখার মত এক নারী এই অত্রি-আশ্রমের লতাকুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়িয়ে তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রতীক্ষার তপস্যা। কুসুমিত সিন্ধুবারের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে সুদূরের নিবিড়নীলাঞ্চিত দিগ্‌বলয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে চান্দ্রেয়ী। তার বক্ষের গভীরে সকল নিঃশ্বাস যেন দুর্বার এক কামনাময় আগ্রহে একটি পদধ্বনির জন্য উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, প্রতীক্ষাময় এক তপস্যা, সোমসুতা চান্দ্রেয়ীর দুই চক্ষু যেন নিমেষ আর উন্মেষ হারিয়ে এক অব্যাজমনোহর প্রিয় মুখচ্ছবি তারই স্বপ্নমায়ানুলীন অনুভবের মধ্যে দেখতে থাকে।

অকস্মাৎ স্বপ্নের আবেশ ভেঙে যায়। ঊর্ধ্বাকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে

পায় চান্দ্রেয়ী, তৃষিত কলবিঙ্কের পংক্তি যেন আর্তকূজননাদে আকাশবায়ুকে বেদনামুখরিত ক'রে উড়ে চলেছে। অমল ক্ষৌমপটের মত ঐ আকাশের বক্ষে কোন কাদম্বিনীর রেখা নেই। বিরাট শূন্যে ও শুচিনির্মল আকাশবক্ষের শুষ্কতা দেখে যেন কেঁদে উঠেছে তৃষিত কলবিংক।

বাষ্পাসারে মেদুর হয় সোমতনয়া চান্দ্রেয়ীর নীলকঞ্জপ্রভ দুই নয়ন। অঙ্গিরাতনয় উতথ্য, তোমার হৃদয়ও কি ঐ শুচিতাময় আকাশবক্ষের মত শূন্য শুষ্ক ও বিরাট? জলদসরসা এক বিন্দু মায়াও কি নেই সেই বক্ষের কোন নিভৃতে?

পুষ্পিত সিন্ধুবারের অঙ্গে চম্পকসঙ্কাশ চিবুক সমর্পণ ক'রে তৃষিত কলবিঙ্কের আর্তনাদের মত বেদনাবিধূত স্বরে প্রার্থনা করে চান্দ্রেয়ী—এস অঙ্গিরাতনয় উতথ্য, তোমারই প্রেমিকা চান্দ্রেয়ীর এই স্তবকিত কুন্তলে নিজের হাতে পরিয়ে দিয়ে যাও নবদূর্বার মঞ্জরী।

—পৌত্রী!

আহ্বান শুনে চমকে ওঠে চান্দ্রেয়ী। দেখতে পায়, পিতামহ অত্রি নিকটে এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

অত্রি বলেন—শান্ত হও চান্দ্রেয়ী। সফল হবে তোমার প্রার্থনা।

প্রস্ফুট সিন্ধুবার কুসুমের মত প্রসন্নহাস্যে দীপ্ত হয়ে ওঠে চান্দ্রেয়ীর কুন্দেন্দুসুন্দর আননের ক্ষণমেদুরিত প্রভা। সস্নেহ স্বরে এবং সান্ত্বনাদে চান্দ্রেয়ীকে আশ্বস্ত করেন অত্রি—চিন্তা করো না পৌত্রী। জানেন না উতথ্য, মূর্তিমতী ঐন্দবী দ্যুতির মত সুচারুদর্শিনী ও সুরাকাঙ্ক্ষিতা চন্দ্রদুহিতা আমার এই তপোবনে তাঁরই প্রেমাভিলাষে তপস্বিনী হয়ে রয়েছে।

চান্দ্রেয়ী বলে—কিন্তু সে তো জীবনে কোনদিনই জানতে পারবে না।

মৃদু হাস্যে পৌত্রী চান্দ্রেয়ীর উদ্বিগ্ন চিত্তকে সহসা লজ্জিত ক'রে দিয়ে অত্রি বলেন—আমি এখনি অঙ্গিরার আশ্রমে যাব পৌত্রী। তোমার তপস্যার কথা জানতে পারবেন অঙ্গিরাতনয় উতথ্য। তারপর...।

করুণাদ্রাবিত কণ্ঠস্বরে অত্রি বলেন—তারপর এক পুণ্য লগ্নে আমিই নিজের হাতে তোমাকে উতথ্যের কাছে সম্প্রদান করব পৌত্রী।

চলে গেলেন অত্রি। ঊর্ধ্বাকাশের দিকে অপলক নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে চান্দ্রেয়ী। মনে হয়, যেন তার এই জীবনের আকাশ হতে চিরকালের মত দূরে সরে গিয়েছে তৃষিত কলবিঙ্কের আর্তকূজন। সন্ধ্যাতপনের অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে নিবিড়নীল দিগ্‌বলয়ের রেখা। দূর কান্তারের পল্লব-মর্মর ভেসে আসে, যেন ভেসে আসছে প্রিয় জীবনকান্তের পদধ্বনি, সমীরিত সঙ্গীতের মত। শোনা যায়, সরোবরতটের ক্রৌঞ্চ-কলরব। তরুশিরের পত্রগুচ্ছ

পক্ষশিহরে চঞ্চলিত ক'রে নীড় সন্ধান করে দিনান্তের পরিক্লান্ত পতত্রী। আশ্রমকুটীরের অভ্যন্তর হতে কর্পূরদীপের সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে যেন এক সুবাসবিহ্বল উৎসবের হর্ষে অভিভূত হয়েছে সন্ধ্যার তপোবনবায়ু।

আশ্রমকুটীরে ফিরে আসে চান্দ্রেয়ী। এবং ফিরে এসেই প্রতিদিনের মত আজও আবার বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখতে পায় চান্দ্রেয়ী, প্রতি সন্ধ্যার মত এই সন্ধ্যাতেও কুটীরের দ্বারপ্রান্তে পড়ে আছে একটি কনকবর্ণ কুবলয়ের কলিকা।

কোন্ এক অদৃশ্য ও গোপনচারী পূজকের নৈবেদ্য এইভাবেই প্রতি সন্ধ্যায় সুন্দরী সোমসুতা চান্দ্রেয়ীর কুটীরদেহলীর পদপ্রান্তে অধঃপতিত আবেদনের মত পড়ে থাকে? জানে না, বুঝতে পারে না এবং কল্পনাও করতে পারে না চান্দ্রেয়ী, কোথা থেকে আসে এই দুর্লভ কনকবর্ণ কুবলয়ের কলিকা। কিন্তু প্রতিদিন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আর আতঙ্কিত নেত্রে দেখেছে চান্দ্রেয়ী, যেন তার প্রেমব্যাকুল হৃদয়ের তপস্যাকে আঘাত দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত করবার জন্য তার কুটীরের দ্বারপ্রান্তে এসে এই রহস্য পড়ে থাকে। মনে হয়, এক মায়াবীর আকাঙ্ক্ষা অলক্ষ্য ছায়ার মত চান্দ্রেয়ীর প্রতি পদক্ষেপ অনুসরণ করছে। কে সে, কোথায় থাকে এবং কখন আসে আর চলে যায়, কিছুই জানে না চান্দ্রেয়ী। যেন তার কণ্ঠ নেই, কণ্ঠস্বরও নেই। সে শুধু এক নীরব আবেদন।

দেখে ভয় পেয়েছে চান্দ্রেয়ী, শিহরিত হয়েছে নিঃশ্বাস, কিন্তু পরমুহূর্তে সকল ত্রাস তুচ্ছ ক'রে আর ঘৃণাভরে সেই কুবলয়কলিকার স্পর্শ পরিহার ক'রে কুটীরে প্রবেশ করেছে চান্দ্রেয়ী। সন্দেহ হয় চান্দ্রেয়ীর, যেন সিন্ধুবার কুসুমের হেমপ্রেমপ্রভা মলিন ক'রে দেবার জন্য অতিকঠোর এক অভিসন্ধি নিত্য এসে তার জীবনপথের সম্মুখে কনকবর্ণ কুবলয়কলিকার রূপ ধারণ ক'রে পড়ে থাকে। ভুলেও অথবা অবহেলাভরেও ঐ ধূলিলীন কুবলয়কলিকার দিকে আর দৃক্‌পাত করে না চান্দ্রেয়ী। নিশীথের অন্তে বিহগের প্রথম কাকলী যখন আশ্রমতরুর সুপ্তি ভেঙে দেয়, তখন কুটীরের বাইরে এসে দেখতে পায় চান্দ্রেয়ী, রাত্রিচর কৃকলাসের দংশনে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে কুবলয়ের কলিকা।

ভালই হয়েছে। তবু সেই ছিন্ন কুবলয়কলিকা যেন চকিত আঘাতে ব্যথিত ক'রে তোলে চান্দ্রেয়ীর সুপক্ষ্মল দুটি নীল নয়নের তারকা। কে জানে কোন্ দুরাকাঙ্ক্ষের অবুঝ স্বপ্ন ভুল পথে আসার ভুলে এমন ক'রে ধূলি হয়ে গেল! হোক দুরাকাঙ্ক্ষা, তবু তো আকাঙ্ক্ষা। হোক অবুঝ স্বপ্ন, তবু তো স্বপ্ন। ছিন্ন কুবলয়কলিকা যেন পদদলিত নৈবেদ্যের মত সোমসুতা

চান্দ্রেয়ীর কুটীরদ্বারের প্রান্তে পড়ে আছে। ভালই হয়েছে, তবু দেখতে ভাল লাগে না, এবং দেখতে বেদনাও বোধ করে চান্দ্রেয়ী।

ছিন্ন কুবলয়কলিকার দিকে তাকিয়ে চান্দ্রেয়ীর ব্যথিত চক্ষু যেন নীরবে আবেদন করে -দূরে যাও অদৃশ্য মায়াবীর কামনার উপহার। ভুল কর কেন ঋষি উতথ্যের অনুরাগিণী চান্দ্রেয়ীর কুটীরদ্বারে এসে?

কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে চান্দ্রেয়ীর আবেদন। তপোবন হতে কুটীরে ফিরে এসে প্রতি সন্ধ্যায় দেখতে পেয়েছে চান্দ্রেয়ী, অলক্ষ্য প্রেমিকের মুগ্ধ হৃদয়ের উপহারের মত পড়ে আছে সেই কনকবর্ণ কুবলয়ের কলিকা।

আজও দেখতে পায়, আর দেখে আরও বিস্মিত হয় চান্দ্রেয়ী, কুবলয়-কলিকার বক্ষে চিত্রিত হয়ে রয়েছে রক্তচন্দনের একটি বিন্দু। কী ভয়ানক দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে গূঢ়প্রণয়চতুর মায়াবীর মনের অভিলাষ! মনে হয়, চিত্রিত রক্তচন্দনের বিন্দু নয়, লুব্ধ এক ভুজঙ্গের রুধিরাক্ত ওষ্ঠের চুম্বনচিহ্ন বক্ষে ধারণ ক'রে ঐ কুবলয়কলিকা চান্দ্রেয়ীর সফল তপস্যার পুণ্য ও আনন্দ বিনাশ করবার জন্য এই সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়েছে। আর সহ্য করা উচিত নয়, অদৃশ্য লুব্ধের দুঃসাহস ছলনা ও অভিসন্ধিকে আঘাত দিয়ে এখনি নিঃশেষ ক'রে দেওয়া ভাল। নিজের হাতেই এই কুবলয়কলিকা তুলে নিয়ে বিষাবহ অসিলতায় আর কণ্টকগুল্মে আবৃত ঐ বিগলিত বল্মীকস্তূপের বিবরে নিক্ষেপ করতে হবে। কঠোর আগ্রহে চঞ্চল হয় চান্দ্রেয়ী।

—পৌত্রী!

অকস্মাৎ পিতামহ অত্রির আহ্বান শুনে নিরস্ত হয়, আর মুখ ফিরিয়ে তাকায় চান্দ্রেয়ী।

অঙ্গিরার আশ্রম হতে ফিরে এসেছেন অত্রি। কৃতার্থ হয়েছেন অত্রি। মৃদুহাস্যে হৃদয়ের প্রসন্নতা মুক্ত ক'রে দিয়ে পিতামহ অত্রি বলেন—আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ সফল হয়েছে চান্দ্রেয়ী। অবিচল তপস্যার মত তোমার প্রেমাভিলাষের কাহিনী শুনে বিস্মিত হয়েছেন উদারচেতা উতথ্য। তোমার পাণিগ্রহণে সম্মত হয়েছেন।

পিতামহ অত্রিকে প্রণাম ক'রে কুটীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে চান্দ্রেয়ী। কর্পূরপ্রদীপের সুরভিত ধূমলেখা যেন আলিম্পন রচনার জন্য উৎসুক হয়ে চান্দ্রেয়ীর পুলকিত কপোল ও চিবুক বারংবার স্পর্শ করে। অনুভব করে চান্দ্রেয়ী, তার জীবনের কামনা এতদিনে সুরভিত হয়ে উঠল।

স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে চৈত্রসন্ধ্যার সমীর। অত্রি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে উৎসব আহ্বান ক'রে কর্পূরের প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। পিতামহ অত্রি মন্ত্রপাঠ ক'রে

ঋষি উতথ্যের কাছে চান্দ্রেয়ীকে সম্প্রদান করেছেন। চান্দ্রেয়ীব পাণিগ্রহণ ক'রে চান্দ্রেয়ীর হস্তে কুশতৃণের বলয় পরিয়ে দিয়েছেন উতথ্য। আশীর্বাদ ক'রে চলে গিয়েছেন পিতামহ অত্রি।

উতথ্য ডাকেন—চান্দ্রেয়ী!

চান্দ্রেয়ী—বলুন স্বামী।

উতথ্য—এখন আমি প্রস্থান করি চান্দ্রেয়ী।

অকস্মাৎ যেন দৃষ্টিহারা হয়ে যায় চান্দ্রেয়ীর উৎফুল্ল নীলকঞ্জপ্রভ দুই নয়ন। যেন সান্ধ্য চৈত্রবায়ু সহসা হিংস্র হয়ে ঐ কর্পূরের প্রদীপ এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চাইছে। অগ্নিজ্বালার স্ফুলিঙ্গ এসে দগ্ধ করছে কুশতৃণের বলয। উৎসবের সুরভিত প্রাণ যেন ঋষি উতথ্যের ঐ একটি কথার ধ্বনি শুনেই মূর্ছাহত হয়েছে।

• চান্দ্রেয়ী বলে—এখনি কেন প্রস্থান কববেন স্বামী?

উতথ্য—আমার কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে এবং তোমারও অভিলাষব্রত সফল হযেছে।

চান্দ্রেয়ী—ক্ষমা করবেন স্বামী আপনার কথাব অর্থ বুঝতে পারছি না।

উতথ্য -তুমি ঋষি উতথ্যেব ভার্যা, এই পরিচয় তোমাব জীবনে সত্য হয়ে রইল। আমাকে পতিরূপে লাভ করবার জন্য তুমি তপস্যা করেছিলে, তোমার সে তপস্যা সফল হয়েছে সোমতনয়া চান্দ্রেয়ী। নিজের হাতে কুশ-তৃণের বলয় তোমার হাতে বেঁধে দিয়েছি, আমার কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে। কৃতমানসা, সফলবাসনা ব্রতোত্তীর্ণা ও ধন্যা চান্দ্রেয়ী এইবাব সুতৃপ্ত অন্তবে আমাকে বিদায় দাও।

চান্দ্রেয়ী বলে—আপনার কর্তব্য সমাপ্ত হয়নি, আর আমারও অভিলাষব্রত সফল হয়নি ঋষি।

বিস্মিত হয়ে চান্দ্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন উতথ্য—কি বলতে চাও চান্দ্রেয়ী?

চান্দ্রেয়ীর মুখচ্ছবি ধারাহত কমলের মত সিক্ত ও ব্যথিত হয়ে ওঠে। সজলাসারে প্লাবিত চিবুকের কুঙ্কুম মুছে যায়। চান্দ্রেয়ী বলে—অভিলাষ আছে মনে, তুমি তোমারই পরিণীতা এই প্রেমাকাঙ্ক্ষণী নাবীর শূন্য কবরীতে নীহার-স্নেহে অভিষিক্ত শ্যাম দূর্বার মঞ্জরী নিজের হাতে পরিয়ে দেবে। আমি আমার জীবনের এই তৃপ্তিময় সমাদর এতদিন ধ'রে তপোবনের তরুচ্ছায়া-তলে বসে তপস্বিনীর মত প্রার্থনা করেছি ঋষি।

আক্ষেপ করেন উতথ্য—ভুল করেছ, আর জীবনে বড়ই ভুল স্বপ্ন পোষণ করেছ চান্দ্রেয়ী।

চান্দ্রেয়ী—কেন?

উতথ্য—তোমার কবরী দূর্বামঞ্জরীতে শোভিত করবার জন্য ঋষি উতথ্যের মনে কোন লোভ নেই।

আহত কুররীর মত করুণস্বরে আর্তনাদ ক'রে ওঠে চান্দ্রেয়ী—কেন ঋষি?

উতথ্য—সোমসুতা চান্দ্রেয়ীর প্রণয় কামনা ক'রে আমি তো কোন তপস্যা করিনি! জীবনে কোনদিন তোমাকে আমি দর্শনও করিনি সুদর্শনা সোম-তনয়া। আমি তোমার তপস্যাকে শুধু অনুগ্রহ দান করেছি। তুমি ঋষি উতথ্যের ভার্যা, তোমার এই পরিচয় শুধু সর্বলোকে সত্য ক'রে দেবার জন্য তোমার হাতে কুশতৃণের বলয় বেঁধে দিয়েছি। এর অধিক আর কেন প্রত্যাশা কর চান্দ্রেয়ী? অঙ্গিরাতনয় উতথ্য তোমার পতি, কিন্তু প্রণয়ী নয়।

নীরব হয়ে ঋষি উতথ্যের শান্ত কণ্ঠস্বরের ভাষণ শুনতে থাকে চান্দ্রেয়ী, আর মনে হয়, হ্যাঁ, এই ভাষা সত্যই অতি শান্ত শুচি-নির্মল ও বিরাট এক আকাশের বক্ষের ভাষা। জলদসরসা কোন মায়া বর্ষণ করবে না সেই আকাশ, কিন্তু বজ্র হানতে পারবে আর বুঝতেও পারবে না যে সে বজ্রের আঘাত সহ্য করতে গিয়ে ঐ ক্ষীণ কুশতৃণের বলয়বন্ধন অঙ্গার হয়ে যেতে পারে।

চান্দ্রেয়ীও শান্ত স্বরে বলে—আজও কি দেখতে পাননি?

উতথ্য—কি?

চান্দ্রেয়ী—আপনার প্রেমাভিলাষিণী চান্দ্রেয়ীর মুখ।

সহসা উতলা চৈত্রবায়ুর মত উচ্ছ্বসিত স্বরে আকুল হয়ে উতথ্যের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে চান্দ্রেয়ী—সোমসুতা চান্দ্রেয়ীর এই মুখের দিকে তাকিয়ে বলে যাও ঋষি, লুব্ধ হয়নি তোমার দ্যুতিময় দু'টি চক্ষু। বলে যাও, এই কবরী স্পর্শ করবার জন্য কোন পিপাসায় চঞ্চলিত হয় না তোমার বাহু। বলে যাও, তোমারই প্রেমবিধুরা চান্দ্রেয়ীর এই দুই বাহু যদি তোমার কণ্ঠাসক্ত হয়, তবে ব্যথিত হবে তোমার নিঃশ্বাস।

উতথ্য বলে—সত্য কথা বলতে পারি চান্দ্রেয়ী।

চান্দ্রেয়ী—স্বাধ্যায়ী শুচিব্রত ও সত্যপরায়ণ ঋষি উতথ্যের কাছে সত্য কথাই শুনতে চাই।

উতথ্য বলেন—সুন্দবেক্ষণা সুতনুকা ও যৌবনবিহসিতা চান্দ্রেয়ীকে সত্য কথাই শুনিয়ে দিতে চাই।

চান্দ্রেয়ী—বলুন।

উতথ্য—তুমি সত্য, তোমার রূপ সত্য, তোমার প্রণয়ও সত্য। কিন্তু আমি মুগ্ধ নই চান্দ্রেয়ী, প্রণয়িজনোচিত কোন মোহ আমার অন্তর স্পর্শ করতে পারে না।

মাথা হেঁট ক'রে স্তব্ধ শিলাপুত্তলিকার মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে চান্দ্রেয়ী। তারপরেই উতথ্যকে প্রণাম ক'রে চান্দ্রেয়ী বলে—আশীর্বাদ কর স্বামী।

উতথ্য—কি আশীর্বাদ চাও?

কয়েক মুহূর্ত শুধু কি-যেন চিন্তা করে চান্দ্রেয়ী। তার পরেই বলে—আশীর্বাদ কর, যেদিন তুমি কাছে ডাকবে, সেদিন যেন তোমার কাছে ছুটে যেতে পারি।

মৃদুহাস্যে উতথ্য বলেন—কিন্তু তোমাকে আমার কাছে ডাকবার প্রয়োজন কি হবে কোনদিন?

চান্দ্রেয়ী—যদি প্রয়োজন হয়, যদি এই চান্দ্রেয়ীর কথা মনে ক'রে কোনদিন তোমার উদার হৃদয়ের নিভৃতে কোন দীর্ঘশ্বাস জাগে, যদি শূন্য মনে হয় গৃহ, যদি তৃষ্ণার্ত হয় বামবাহু, তবে তোমার কুশতৃণের বলয়বন্ধনে অনুগৃহীতা চান্দ্রেয়ীকে আহ্বান করো।

উতথ্য—তাই হবে।

চলে গেলেন ঋষি উতথ্য।

অচঞ্চলমূর্তি চান্দ্রেয়ী নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আশ্রমপ্রাঙ্গণের কর্পূরদীপ নিভে গিয়েছে অনেকক্ষণ। তবু বিহ্বল হয়ে রয়েছে চৈত্রবায়ু। আশ্রমপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তপোবনতরুর পল্লবমর্মর শোনে চান্দ্রেয়ী, যেন চান্দ্রেয়ীর জীবনের বিফল তপস্যার বেদনায় বিলাপমুখর হয়ে উঠেছে তপোবন।

প্রাঙ্গণ পার হয়ে ধীরে ধীরে শূন্যমনা পথচারিণীর মত অগ্রসর হতে থাকে চান্দ্রেয়ী। তপোবনের পথও শেষ হয়ে যায়। মুক্ত প্রান্তরের প্রান্তে এসে দেখতে পায় চান্দ্রেয়ী, অদূরে সরিদ্বরা যমুনার জল চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

চমকিত নেত্রে আকাশের দিকে তাকায় চান্দ্রেয়ী, উদিত চন্দ্রমার দিকে অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি তুলে এবং হৃদয়ের দুঃসহ ক্ষোভ মুক্ত ক'রে দিয়ে অভিযোগ করে চান্দ্রেয়ী—বিফল তপস্যার জ্বালা হতে মুক্তি দাও পিতা।

যমুনার তরঙ্গভঙ্গে চন্দ্রবিম্ব আন্দোলিত হয়। যেন আহ্বান করছে জ্যোৎস্নায়িত যমুনাসলিল। ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে চান্দ্রেয়ী। বিফল তপস্যার জ্বালা স্নিগ্ধ সলিলস্নানে শান্ত করবার জন্য সদানীরা যমুনার তটে এসে দাঁড়ায় চান্দ্রেয়ী; তারপর, মৃদুলগতি মরালীর মত ধীরে ধীরে সলিলে অবতরণ করে। স্নান করে চান্দ্রেয়ী। জলকমলের রেণুপুঞ্জ ভেসে এসে

চান্দ্রেয়ীর সিক্তকবরী রঞ্জিত করে। মৃণাল আলিঙ্গন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে চান্দ্রেয়ী, আর যমুনার তরঙ্গসঙ্গীত উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে।

স্নান সমাপনের পর তীরে ওঠে চান্দ্রেয়ী। কিন্তু সহসা সন্ত্রস্ত হয়ে দেখতে পায়, সম্মুখে এক অপরিচিতের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। চান্দ্রেয়ীর সিক্ত তনুশোভার দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তার ব্যাকুল দুটি চক্ষু

ক্ষুব্ধস্বরে প্রশ্ন করে চান্দ্রেয়ী—কে তুমি?

—আমি জলাধিপতি বরুণ। আমি পশ্চিম দিক্‌পাল বরুণ।

—বিসদৃশ আপনার আচরণ, অন্যায় আপনার আগমন।

—মিথ্যা বলনি চান্দ্রেয়ী।

বিস্মিত হয় চান্দ্রেয়ী।—আমার পরিচয় জেনেও আপনি আমার সম্মুখে কেন এসেছেন?

বরুণ—একটি অনুরোধ জ্ঞাপন করতে এসেছি।

চান্দ্রেয়ী—আমার কাছে আপনার কি অনুরোধ থাকতে পারে জলাধিপতি?

বরুণ—একবার বরুণনিকেতনের সকল শোভার মাঝখানে এসে দাঁড়াবে তুমি, এই অনুরোধ।

চান্দ্রেয়ী—কেন?

বরুণ—তোমারই জীবনের একটি কৌতূহলের নিরসন হয়ে যাবে। জানতে পারবে, যে-সত্য কখনও জানতে পারনি। বুঝতে পারবে, যে-রহস্য কখনও বুঝতে পারনি। কোনদিন শুনতে পাওনি যে নীরব কনকবর্ণ কুবলয়কলিকার ভাষা..।

চান্দ্রেয়ীর সকল বিস্ময় যেন আতঙ্কিত হয়ে সহসা চিৎকার করে ওঠে—আপনি?

বরুণ বলেন—হ্যাঁ সোমতনয়া চান্দ্রেয়ী, আমিই তোমার কুটীরদ্বারে কনকবর্ণ কুবলয়ের কলিকা পাঠিয়েছি। তুমিই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা।

চান্দ্রেয়ী—এই আকাঙ্ক্ষা বর্জন করুন জলাধিপতি। আমি উতথ্যের পত্নী চান্দ্রেয়ী, আমার এই পরিচয় হয়তো আপনি জানেন না।

বরুণ—জানি।

চান্দ্রেয়ী—তবে চলে যান।

বরুণ—যাব, কিন্তু একাকী যাব না চান্দ্রেয়ী। যমুনার স্নিগ্ধসলিলে সিক্ত আর চন্দ্ররশ্মির স্নেহে উদ্ভাসিত এই স্বপ্নকুসুমকে বক্ষোলগ্ন ক'রে আমার সঙ্গে নিয়েই চলে যাব।

চান্দ্রেয়ী—নিবৃত্ত হও পারদারিক দুরিতদূষিত দিক্‌পাল!

ধিক্কার দিয়ে মূর্ছাহত হয় চান্দ্রেয়ী।

বরুণনিকেতন, এখানে শশিতপনের আলোকের প্রয়োজন হয় না। লক্ষ নাগমণির রশ্মিপুঞ্জে জলাধিপতির নিলয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। প্রবালকাঁটের পঞ্জরে গঠিত সৌধদেহ, মরকতযুত বেদিকা আর বৈক্রান্তস্তবকে খচিত তোরণশ্রেণী। বিগলিত ইন্দ্রধনুর চেয়েও বর্ণাঢ্য শোভায় যেন আলিম্পিত হয়ে রয়েছে রসাতলের এক রত্নপুরী। চারিদিকে বিস্ময়বিহ্বল অপলক চক্ষুর দৃষ্টি বর্ষণ ক'রে বুঝতে চেষ্টা করে চান্দ্রেয়ী, কিন্তু বুঝতে পারে না। শুধু মনে হয়, যেন তার দুঃস্বপ্নাহত প্রাণ যমুনাসলিলে নিমজ্জিত হয়ে এই বিচিত্র জগতের নিভৃতে চলে এসেছে।

• কোমল পুষ্করপলাশে রচিত একটি শয্যা, সৌরভতরুর নির্যাস পোড়ে রত্নাধারে; কে যেন তার জীবনের এক আরাধনাস্থলীর মাঝখানে সসম্ভ্রমে চান্দ্রেয়ীকে বসিয়ে রেখে গিয়েছে।• দেখতে পায় চান্দ্রেয়ী, মরীচিকার ছবি নয়, সম্মুখের এক সরোবরে তরল স্ফটিকের মত সলিল তার মধ্যে ফুটে রয়েছে কনকবর্ণ কুবলয়।

আর বুঝতে কিছু বাকি থাকে না। এক রসাতলবাসী প্রেমিকের কামনা চান্দ্রেয়ীর মূর্ছাহত দেহ লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে এই অদ্ভুত রত্নমায়াবৃত জগতের মাঝখানে চলে এসেছে।

– জলাধিপতি বরুণ! সন্ত্রস্ত স্বরে চিৎকার ক'রেই দেখতে পায় চান্দ্রেয়ী, সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন বরুণ।

চান্দ্রেয়ী বলে—আমাকে মুক্তি দান করুন জলাধিপতি।

চান্দ্রেয়ীর মুখের দিকে মুগ্ধ ও সাগ্রহ চক্ষুর অপলক দৃষ্টি তুলে বরুণ বলেন—কার কাছ থেকে মুক্তি চাও চান্দ্রেয়ী?

চান্দ্রেয়ীর নয়নে খর বিস্ময়ের ক্ষণপ্রভা চমকে ওঠে। এক প্রেমবিধুর পুরুষের কণ্ঠস্বব চান্দ্রেয়ীর কানের কাছে বেজে উঠেছে। এমন কণ্ঠস্বর জীবনে এই প্রথম শুনতে পেল চান্দ্রেয়ী।

বরুণ বলেন- আশ্রমচারিণী চান্দ্রেয়ীর পদধ্বনির তপস্যা ক'রে দিনযাপন করেছে রত্নপুরপতি এই বরুণ। তোমারই নীলকঞ্জপ্রভ ঐ নয়নের প্রভা পান করবার জন্য তোমার তপোবনতরুর অন্তরালে উৎসুক হয়ে কত লক্ষ মুহূর্ত যাপন করেছে লক্ষ প্রভামণির অধীশ্বর এই বরুণের সতৃষ্ণ দুটি চক্ষু। আমার কামনাকলিত কুবলয় তোমারই চরণ চুম্বনের আশায় নিত্য তোমার কুটীরদ্বারে উপস্থিত হয়েছে। আমি প্রণয়ী, নিদ্রাহীন শত নিশীথের সকল মুহূর্ত ও ভাবনা দিয়ে আমি পূজা করেছি তোমার ঐ প্রবল কবরীভার, ঐ চম্পকসঙ্কাশ

চিবুক, ঐ মনসিজমনোহরণ ভুরু-শরাসন, ঐ মুক্তাচ্ছ রদরুচি, আর যৌবনরাগে শোণীকৃত ঐ অধর।

প্রণয়সঙ্গীতের ঝংকার যেন নিশাবসানের বিহগকাকলির মত সোমসুতা চান্দ্রেয়ীর অন্তরে এক নবোবার অরুণিত বিহ্বলতা সঞ্চারিত করে। চান্দ্রেয়ীর সুস্মিত অধরপুট দীপ্ত হয়ে ওঠে। নীলকঞ্জপ্রভ নয়নের প্রভা খর দীপশিখার মত জ্বলে ওঠে। জলাধিপতি বরুণের হাত থেকে কনকবর্ণ কুবলয় তুলে নিয়ে কবরীতে ধারণ করে চান্দ্রেয়ী।

চান্দ্রেয়ী ডাকে—সলিলেশ্বর বরুণ!

বরুণ বলেন— বল সুচারুদর্শিনী সোমতনয়া।

চান্দ্রেয়ী—সুখী হও তুমি!

বিদ্যুল্লেখার মত স্ফুরিত লাস্যে চঞ্চলিত হয়ে ওঠে আশ্রমচারিণী ইন্দু-লেখার তনু। জলাধিপতি বরুণের সতৃষ্ণ দুটি বাহুর আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করে চান্দ্রেয়ী।

বরুণনিকেতনের নিদ্রা ভেঙে যায়। বিপুল এক প্রতিশোধের নিঃশ্বসন্ত আক্রোশ যেন ঝটিকার মত মত্ত হয়ে রসাতলের উপর এসে লুটিয়ে পড়ছে। কেঁপে উঠছে বরুণালয়ের সকল স্ফটিক মরকত আর নাগমণি।

নিকেতনের বদ্ধদ্বারের কপাটে করাঘাত। কে যেন ডাকছে। পুষ্কর-পলাশে রচিত শয্যায় উৎসবের ক্লান্ত নায়িকার মত বরুণের বাহুবন্ধনে সুখসুপ্তা চান্দ্রেয়ী যেন হঠাৎ এক দুঃস্বপ্নের আঘাত পেয়ে চমকে জেগে ওঠে।- কে ডাকে!

—কে ডাকে? জলাধিপতি বরুণও সেই উৎসবমদবিহ্বল পুষ্পশয্যার আবেশ হতে চমকে জেগে ওঠেন এবং কক্ষ হতে বের হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ান। তারপরেই অগ্রসর হয়ে বরুণনিকেতনের প্রধান প্রবেশদ্বার মুক্ত ক'রে দেন।

প্রবেশ করেন নারদ।

নারদ বলেন—ঋষি উতথ্য জানতে পেরেছেন, আপনি তাঁর পত্নী চান্দ্রেয়ীকে অপহরণ ক'রে নিয়ে এসেছেন।

শ্লেষযুত স্বরে বরুণ বলেন—জ্ঞানী ঋষি ঠিকই জেনেছেন, কিন্তু এই তুচ্ছ সংবাদ বৃথা নিবেদনের জন্য এখানে আপনার আগমনের কোন প্রয়োজন ছিল না নারদ।

নারদ—আমি ঋষি উতথ্যের অনুরোধের বাণী নিয়ে এসেছি। চান্দ্রেয়ীকে মুক্ত ক'রে দিন জলাধিপতি বরুণ।

বরুণ—না।

নারদ—ঋষি উতথ্যের কোপ আর অভিশাপ থেকে যদি মুক্ত হতে চান,

তবে এই মুহূর্তে তাঁর প্রণয়াভিলাষিণী ও পরিণীতা চান্দ্রেয়ীকে মুক্ত ক'রে দিন।

বরুণ বলেন—না।

নারদ—প্রেমিক উতথ্যের আকাঙ্ক্ষিতা নারী চান্দ্রেয়ীকে মুক্ত ক'রে দিন।

দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে কুটিল বিদ্রূপ আর কঠোর অবিশ্বাস স্ফুরিত ক'রে বরুণ বলেন—কূটতাকুশল দূত হে নারদ, আপনার বচনচাতুরী সত্য, কিন্তু নিতান্তই মিথ্যা আপনার বচন। সুকঠিন শিলার বক্ষেও শ্যামলতা জেগে উঠতে পারে, কিন্তু শুষ্কজ্ঞানের কুশতৃণ ঐ ঋষি উতথ্যের বক্ষে কখনও প্রেম-কামনা দেখা দিতে পারে না।

নারদ—এই কল্পনামোহ বর্জন করুন জলাধিপতি। অত্রি-আশ্রমের এক সিন্ধুবারতরুর ছায়াতলে এখন দাঁড়িয়ে আছেন যে কামনাকুল প্রেমিক উতথ্য...।

চমকে ওঠেন বরুণ—কি বললেন নারদ?

নারদ—হ্যাঁ দিক্‌পাল বরুণ, প্রণামনমিতা যে চান্দ্রেয়ীর সীমন্তস্খলিত সিন্দূরবিন্দুর চিহ্ন এখনও ঋষি উতথ্যের চরণে অঙ্কিত রয়েছে, সে চান্দ্রেয়ীকে স্বামী সন্নিধানে চলে যেতে দিন।

গর্জন করেন বরুণ—না।

বিষণ্ণ স্বরে নারদ প্রশ্ন করেন—সোমসুতা চান্দ্রেয়ী কোথায়?

বরুণ—কেন?

নারদ—ঋষি উতথ্যের প্রেরিত একটি উপহার চান্দ্রেয়ীকে দিতে চাই।

বরুণ—কি উপহার?

নারদ—এই দূর্বামঞ্জরী।

বরুণ—ঐ তুচ্ছ দূর্বামঞ্জরী ধূলিতে নিক্ষেপ করুন নারদ।

নারদ—কেন?

বরুণ প্রত্যুত্তর দেন—দুর্লভ কনকবর্ণ কুবলয়ের কলিকা কবরীতে ধারণ ক'রে সুখী হয়েছে চান্দ্রেয়ী. বরুণনিকেতনে সুখে আছে চান্দ্রেয়ী। এই সংবাদ নিয়ে গিয়ে উতথ্যকে নিবেদন করুন ঋষি। এখানে আপনার আর আসবার প্রয়োজন নেই।

ফিরে চললেন নারদ। অকস্মাৎ নেপথ্য হতে আর্তনাদ ক'রে ভীতা বনকুরঙ্গীর মত ছুটে এসে বরুণের সম্মুখে দাঁড়ায় চান্দ্রেয়ী। ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে—কা'কে ফিরিয়ে দিচ্ছেন জলাধিপতি বরুণ?

বরুণ—ঋষি উতথ্যের দূত নারদকে।

চান্দ্রেয়ী—আমি জানি জলাধিপতি, আমি সবই শুনতে পেয়েছি জলাধিপতি।

আর্তস্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে চান্দ্রেয়ী এবং দেখতে পায়, বিমুখ হয়ে চলে যাচ্ছেন বিষণ্ণ নারদ, হাতে দূর্বামঞ্জরীর একটি গুচ্ছ।

ব্যাকুলা প্রলাপিকার মত উচ্ছ্বসিত স্বরে ডাকতে থাকে চান্দ্রেয়ী—ঋষি নারদ! চান্দ্রেয়ীবল্লভ উতথ্যের দূত ঋষি নারদ, দিয়ে যাও ঐ শ্যামদূর্বার মঞ্জরী। দিয়ে যাও প্রেমিক উতথ্যের ঐ উপহার, চান্দ্রেয়ীর জীবনের স্বপ্ন আর মৃত্যুর শান্তি ঐ দূর্বামঞ্জরী।

কিন্তু তখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন নারদ। শূন্য দ্বারপথের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ওঠে চান্দ্রেয়ী। দুই হাতে যন্ত্রণাক্ত দুই চক্ষুর দৃষ্টি আবৃত ক'রে সন্তাপিতা লতিকার মত নতমুখিনী হয়ে বরুণের কাছে আবেদন করে চান্দ্রেয়ী—আমাকে মুক্ত ক'রে দিন জলাধিপতি বরুণ। পৃথিবীর আশ্রমচারিণী নারীকে এই রসাতলের রত্নপুর হতে মুক্ত ক'রে দিন।

বরুণ—তোমার এই আকুলতার অর্থ কি চান্দ্রেয়ী?

অশ্রুসিক্তা চান্দ্রেয়ী বলে—পৃথিবীর দূর্বামঞ্জরী আমাকে ডাকছে। ঋষি উতথ্যের প্রিয়া এই চান্দ্রেয়ীকে মুক্ত ক'রে দিন জলাধিপতি বরুণ।

বরুণ বলেন—না।

সেই মুহূর্তে যেন এক তপ্ত মরুধূলির ঝঞ্ঝা দ্বার চূর্ণ ক'রে বরুণনিলয়ের বক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। লক্ষ জ্বলদর্চিশিখার জ্বালা করাল উৎপাতের মত বরুণনিকেতনের সরোবরসলিল বাষ্পীভূত ক'রে দেয়। পুড়তে থাকে কনকবর্ণ কুবলয়।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আর অবিচলিত নেত্রে পৃথিবীর আশ্রমবাসী এক ক্রোধোন্মত্ত ঋষির অভিশাপলীলা দেখতে থাকেন আর সহ্য করেন বরুণ।

মিনতি করে চান্দ্রেয়ী—আমাকে মুক্ত ক'রে দিন দিক্‌পাল বরুণ।

বরুণ বলেন—না।

যেন লক্ষ বজ্রনাদ একসঙ্গে ধাবিত হয়ে এসে বরুণনিলয়ের সকল রত্নস্তূপের উপর আক্রোশ হানে। ধূলি হয়ে যায় রত্নের স্তূপ।

চান্দ্রেয়ী বলে—আমাকে মুক্ত ক'রে দিন রত্নেশ্বর বরুণ।

বরুণ বলেন—না।

বরুণনিকেতনের হৃৎপিণ্ড চূর্ণ ক'রে দিয়ে অকস্মাৎ সহস্র শুষ্ককণ্ঠের হাহাকার ধ্বনিত হয়। ঋষি উতথ্যের আদেশে বরুণনিলয়ের বক্ষে ঊষরতার অভিশাপ নিক্ষেপ ক'রে নদী সরস্বতী তাঁর জলধারা সরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছেন, দূর হতে দূরান্তরে। মৃত্যুযন্ত্রণায় শিহরিত হয়ে উঠেছে পিপাসার্ত বরুণ-নিকেতন। এইবার বিচলিত হন জলাধিপতি এবং সন্ত্রস্ত কণ্ঠে চিৎকার ক'রে ওঠেন—কোপ শান্ত কর ঋষি উতথ্য।

চান্দ্রেয়ী বলে—আমাকে মুক্ত ক'রে দিন সলিলেশ্বর বরুণ।
বরুণ বলেন—যাও।

উতথ্য বলেন—আমার ভুল ক্ষমা কর চান্দ্রেয়ী।

অত্রি-আশ্রমের তপোবনে সিন্ধুবার কুসুমের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে চান্দ্রেয়ীর মুখের দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে ঋষি উতথ্য বলেন—ধন্য তোমার প্রেম, তুমি আমার মহত্ত্বের অহংকার ধূলি ক'রে দিয়ে সেই ধূলিতে প্রেমের দূর্বামঞ্জরী ফুটিয়ে তুলেছ।

প্রণয়ের সঙ্গীত! সেই ঋষি উতথ্যের কণ্ঠস্বর প্রণয়ানুরাগে সঙ্গীতময় হয়ে উঠেছে, যে ঋষি এই আশ্রমের প্রাঙ্গণে এক কর্পূরসুরভিত সন্ধ্যার সকল আবেদন তুচ্ছ ক'রে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আজ জীবনের চিরাকাঙ্ক্ষিত সেই সঙ্গীত শুনতে পেয়েও বেদনাহতের মত দুই হাতে মুখ ঢাকে চান্দ্রেয়ী।

উতথ্য বলেন—তোমার সেদিনের আহ্বান তুচ্ছ করতে গিয়ে আমার প্রণয়-হীন এই হৃদয় কল্পনাও করতে পারেনি যে, এই পৃথিবীর সকল তরুলতা ও আলোছায়ার মায়া আমার জীবনে তোমারই স্মৃতিময় মূর্তি হয়ে ফুটে উঠবে। বুঝতে পারিনি, সেদিনের কর্পূরদীপের সৌরভ আমার স্বপ্ন সুরভিত ক'রে তুলবে।

চান্দ্রেয়ীর করতল অশ্রুপ্রবাহে সিক্ত হয়। মনে হয় চান্দ্রেয়ীর, সে আজ আর চান্দ্রেয়ী নয়। এই প্রণয়সঙ্গীতের শুচিতাকে শুধু ছলনায় মুগ্ধ করবার জন্য চান্দ্রেয়ীর ছদ্মরূপ ধারণ ক'রে বসে আছে এক ছায়া।

উতথ্য বলেন—ধারণা করতে পারিনি, অনুরাগের পরাগের মত তোমার সেই প্রণমিত সীমন্তের সুন্দর সিন্দুরে সুরঞ্জিত ক'রে দেবে মরুলোকের আকাশের মত আমার অমায়াবিরস অন্তরের সকল ক্ষণের চিন্তা। বুঝতে পারিনি চান্দ্রেয়ী, চন্দনবাসিত তোমার ঐ তরুণ তনু বক্ষে ধারণ করবার জন্য চঞ্চলিত হয়ে উঠবে উতথ্যের নির্মোহ জীবনের উদাস নিঃশ্বাস। শূন্য মনে হয়েছে গৃহ, তৃষ্ণার্ত হয়েছে বামবাহু, কেঁদে উঠেছে বক্ষের পঞ্জর, আমার দীর্ঘশ্বাসে অস্থির হয়ে তপোবনের বায়ু তোমাকেই অন্বেষণ ক'রে ফিরেছে চান্দ্রেয়ী।

মুখ তুলে তাকায় চান্দ্রেয়ী।

উতথ্য বলেন—কিন্তু, আজ আমি ধন্য। আমি সুখী, আমি কৃতার্থ। আমার প্রতীক্ষার তপস্যা সফল হয়েছে।

সস্পৃহ নয়নে চান্দ্রেয়ীর কবরীর দিকে তাকিয়ে থাকেন উতথ্য। তার পর দূর্বামঞ্জরীর গুচ্ছ হাতে নিয়ে চান্দ্রেয়ীর কাছে এগিয়ে যান। কিন্তু অকস্মাৎ আতঙ্কিতের মত দুই হাতে কবরীভার আবৃত ক'রে সরে যায় চান্দ্রেয়ী।

ব্যথাহত স্বরে উতথ্য বলেন—আমার একদিনের ভুল কি ভুলতে পারবে না চান্দ্রেয়ী?

চান্দ্রেয়ী বলে—সব ভুলে গিয়েছি ঋষি।

উতথ্য—তবে?

চান্দ্রেয়ী—কিন্তু তোমার হাত থেকে দূর্বামঞ্জরীর উপহার গ্রহণ করবার অধিকার হারিয়েছে চান্দ্রেয়ী।

উতথ্য—কেন?

চান্দ্রেয়ী—আমার একদিনের ভুল কি বিস্মৃত হতে পেরেছ তুমি?

উতথ্য—রসাতলের এক কামুকী তোমাকে অপহরণ করেছিল, সে তো তোমার অপরাধ নয় চান্দ্রেয়ী। আমি জানি, ধৃষ্ট বরুণের হঠপ্রণয় ও অভিলাষ অপ্রমেয়প্রেমা চান্দ্রেয়ীর এই কুন্দেন্দুসুন্দর ও শুচিস্মিত তনু স্পর্শ করতেও পারেনি।

চান্দ্রেয়ীর অশ্রুসিক্ত নয়নে সিন্ধুবার কুসুমের প্রভা বিম্বিত হয়ে আরও দ্যুতিময় হয়ে ওঠে। চঞ্চল হয় না, আর্তনাদ করে না, যেন ক্ষমাহীন এক শাস্তির জগতে শুধু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছে চান্দ্রেয়ী। অকম্পিত স্বরে চান্দ্রেয়ী বলে—তোমার বিশ্বাস সত্য নয়।

চমকে ওঠেন ঋষি উতথ্য। সত্য নয় তাঁর বিশ্বাস? তবে সত্যই ভূতল-বাসিনী এক ইন্দুলেখার দেহ দংশন করেছে রসাতলবাসী এক সরীসৃপ?

উতথ্য শান্তস্বরে বলেন—সে অপমান আমার অপমান চান্দ্রেয়ী। সে দুঃখ আমারই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত। তোমার ভুল নয়, তোমার অপরাধও নয় চান্দ্রেয়ী। পতিপ্রেমিকা চান্দ্রেয়ীর শুচিতাময় অন্তরের প্রতিবাদ তুচ্ছ ক'রে এক কলুষের দস্যু তার লালসা তৃপ্ত করেছে। তুমি নিষ্কলুষা।

চান্দ্রেয়ী—তোমার এই বিশ্বাসও সত্য নয়।

বিস্মিত হন উতথ্য—সত্য নয়?

চান্দ্রেয়ী—না। সোমসুতা চান্দ্রেয়ী স্বেচ্ছায় জলাধিপতি বরুণের উপহার এই কবরীতে ধারণ করেছে।

আর্তনাদ করেন উতথ্য—স্বেচ্ছায়?

চান্দ্রেয়ী—হ্যাঁ, স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে, জলাধিপতি বরুণের প্রণয়ভাষণে প্রীত ও মুগ্ধ হয়ে তার আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করেছে চান্দ্রেয়ী।

অন্তরের পিপাসিত বাসনার আশাগুলি যেন অকস্মাৎ এক কঠোর পরিহাসের আঘাতে উতথ্যের বক্ষের গভীরে আর্তনাদ ক'রে উঠেছে, স্তব্ধ হয়ে এবং নীরবে চান্দ্রেয়ীর দিকে অদ্ভুত এক বিস্ময়বিপন্ন দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন উতথ্য। চান্দ্রেয়ী, উতথ্যের কামনার স্বপ্ন চান্দ্রেয়ী তবে শুধু এই সত্য জানিয়ে দিতে

এসেছে যে, সে আজ পাতালপুরের এক প্রণয়ীর বক্ষের গৌরব। সত্যই এক রত্নপুরের রশ্মির স্পর্শে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে ক্ষীণ কুশতৃণের বলয়!

কিন্তু কেন ফিরে এল চান্দ্রেয়ী? বরুণনিকেতনের রত্নকিরণে অভিনন্দিত নারী কেন ফিরে এসে এবং কিসের জন্য এই কুসুমিত সিন্ধুবারতরুর ছায়াতলে দাঁড়িয়েছে? মনে হয়, জীবনের এক পরমকাম্য আশ্বাস খুঁজছে চান্দ্রেয়ীর অন্তর। বরুণলোকের আনন্দের উপর ঋষি উতথ্যের কোপ যেন আর জ্বালা বর্ষণ না করে, যেন আবার স্নিগ্ধ সুন্দর ও রঙ্গময় হয়ে ওঠে বরুণের নিলয়, উতথ্যের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে চলে যাবার জন্যই ফিরে এসেছে চান্দ্রেয়ী।

উতথ্য ডাকেন—চান্দ্রেয়ী।

চান্দ্রেয়ী—আদেশ কর ঋষি।

উতথ্য বলেন—কি চাও তুমি? বল, কি তোমার প্রার্থনীয়?

চান্দ্রেয়ী—অভিশাপ দাও স্বামী, যেন এই মুহূর্তে মৃত্যু হয় চান্দ্রেয়ীর। আর কিছু চাই না।

কুসুমিত সিন্ধুবারতরুর যে ছায়াতল সোমসুতা চান্দ্রেয়ীর প্রেমের তপস্যা লঙ্ঘন ক'রে এসেছে, সেই ছায়াতলেই সে তপস্যাকে ঋষি উতথ্যের অভিশাপের সম্মুখে উপহার দিয়ে যেন ধন্য হবার জন্য প্রস্তুত হয় চান্দ্রেয়ী। দেখতে পান উতথ্য, অবনতমুখিনী চান্দ্রেয়ীর স্তবকিত কুন্তল যেন অগ্নিজ্বালা বরণ করবার জন্য প্রতীক্ষায় অচঞ্চল হয়ে রয়েছে।

সহসা অনুভব করেন উতথ্য, ঐ নীলাকাশের মত এক অপাবৃত অন্তরের মহিমা যেন চান্দ্রেয়ীর মূর্তি ধ'রে ভূতলে দাঁড়িয়ে আছে, একবিন্দু মিথ্যার ও গোপনতার ধূলি সহ্য করতে পারে না যে অন্তর। জীবনের সকল শুচিতা নিয়ে মন্ত্রমিলিত আহুতির মত সুন্দর হয়ে রয়েছে এই নারী। হ্যাঁ, সত্যই নিষ্কলুষা।

ঋষি উতথ্য অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকেন। উতথ্যের পিপাসিত বাসনার ক্ষণমেদুর আশাগুলি যেন হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠেছে। চান্দ্রেয়ীর সেই অতি-পরিচিত সুন্দর মুখশোভাকেই কত নূতন বলে মনে হয়। দেখতে অদ্ভুত লাগে এবং আরও ভাল লাগে। এবং কি আশ্চর্য, মনে আরও মোহ জাগে। নতমুখে এবং দুই নেত্র নিমীলিত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে চান্দ্রেয়ী, যেন ব্রীড়াভারে বিনত এক অভিনবলা বধূবদনের ছবি।

চান্দ্রেয়ীর কাছে এগিয়ে আসেন উতথ্য। উৎসুক প্রণয়ীর মত সস্পৃহ নেত্র সম্পাতে প্রেমিকার স্তবকিত কুন্তলের দিকে তাকিয়ে থাকেন তার পরেই সেই স্তবকিত কুন্তলে নবীন দূর্বার মঞ্জরী পরিয়ে দিয়ে স্মিতহাস্যে আহ্বান করেন উতথ্য—প্রিয়া চান্দ্রেয়ী।

---

# সংবরণ ও তপতী

তাঁর নাম ভগবান আদিত্য, লোকে তাঁকে বলে লোকপ্রদীপ। সমাজকল্যাণই তাঁর জীবনের ব্রত।

সমাজকল্যাণ কোন নূতন কথা নয়, নূতন আদর্শও নয়। বহু আদর্শ-বাদী আছেন, যাঁরা সমাজের কল্যাণসাধনার কাজকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন।

এই জন্য নয়; ভগবান আদিত্য সমাজকল্যাণের এমন একটি নীতি প্রচার করেন, যা তাঁর আগে কেউ করেননি। সমদর্শিতার নীতি। পাত্র ও অপাত্র বিচার নেই, সকলের প্রতি তাঁর সমান মমতা, সমান সম্মান। নিতান্ত পাপাচারীর প্রতি তাঁর যে আচরণ, সদাচারীর প্রতিও তাই।

শাস্ত্রজ্ঞানীরা মনে করেন, এই আদর্শে ভুল আছে।—আপনি যে আলোক দিয়ে নিশান্তের অন্ধকার দূর ক'রে তৃষ্ণার্ত হরিণশিশুকে নির্ঝরের সন্ধান দেন, সেই আলোকেই আবার ক্ষুধার্ত সিংহ হরিণশিশুকে দেখতে পায়। যে আলোক দিয়ে হরিণশিশুকে পথ দেখালেন, সেই আলোক দিয়ে হরিণশিশুর মৃত্যুকেও পথ দেখালেন, কি অদ্ভুত আপনার সমদর্শিতা।

আদিত্য বলেন—আবার সেই আলোকেই সন্ধানী ব্যাধ সিংহকে দেখতে পায়।

শাস্ত্রজ্ঞানীরা তবু তর্ক করেন—কিন্তু এমন সমদর্শিতায় কা'র কি লাভ হলো? হরিণশিশুর প্রাণ গেল সিংহের কাছে, সিংহের প্রাণ গেল ব্যাধের কাছে। আবার ব্যাধের প্রাণ হয়তো...।

আদিত্য—হ্যাঁ, সেই আলোকে ব্যাধের শত্রুও ব্যাধকে দেখতে পেয়ে হয়তো সংহার করবে। এই তো সংসারের একদিকের রূপ, এক পরম সমদর্শীর নীতি সকল জীবের পরিণাম শাসন ক'রে চলেছে। আমি সেই নীতিকেই সেবা করি।

শাস্ত্রজ্ঞানীরা আদিত্যের এই মীমাংসায় সন্তুষ্ট হন না। তর্কের ক্ষণিক বিরামের মধ্যে হঠাৎ উপস্থিত হয় ভগবান আদিত্যের কন্যা তপতী।

তপতী বলে—যে আলোকে নিশান্তের অন্ধকার দূর হয়, সেই আলোকেই মুদ্রিত কমলকলিকা স্ফুটিত হয়, সেই আলোকেই সন্ধান পেয়ে অলিদল কমলের মধু আহরণ ক'রে নিয়ে যায়, সেই মধুই আবার ওষধিরূপে প্রাণকে পুষ্টি দান করে। শুধু সংহার কেন, সৃষ্টির লীলাও যে এক পরম সমদর্শীর সমান করুণার আলোকে চলছে।

শাস্ত্রজ্ঞানীরা অপ্রস্তুত হন। আদিত্য সস্নেহ দৃষ্টি তুলে তপতীর দিকে তাকান। শুধু আদিত্যের স্নেহে নয়, আদিত্যের শিক্ষায় লালিত হয়ে তপতীও আজ সিদ্ধসাধিকার মত তার অন্তরে এক আলোকের সন্ধান পেয়েছে। বহু অধ্যয়নেও শাস্ত্রজ্ঞানীরা যে সহজ সত্যের রূপটুকু ধরতে পারেন না, পিতা আদিত্যের প্রেরণায় শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে সেই সত্যের রূপ উপলব্ধি করেছে তপতী। ঐ জ্যোতিরাধার সূর্য, ঊর্ধ্বলোক হতে মর্ত্যের সকল সৃষ্টির উপর আলোকের করুণা বর্ষণ করছেন, যেন এক বিরাট কল্যাণের যাজ্ঞিক। কিন্তু কা'রও প্রতি বিশেষ কৃপণতা নেই, কা'রও প্রতি বিশেষ উদারতাও নেই। সমভাবে বিতরিত এই কল্যাণই নিখিলের আনন্দ হয়ে ফুটে ওঠে।

কল্যাণী হও! এ ছাড়া তপতীকে আর কোন আশীর্বাদ করেন না আদিত্য। রূপ যৌবন অনুরাগ বিবাহ পাতিব্রত্য ও মাতৃত্ব, সবই সমাজকল্যাণের জন্য, আত্মসুখের জন্য নয়। এই নিখিলরাজিত কল্যাণধর্মের সঙ্গে ছন্দ রেখে যে জীবন চলে, তারই জীবনে আনন্দ থাকে। যে চলে না, তার জীবনে আনন্দ নেই।

পিতা আদিত্যের এই শিক্ষা ও আশীর্বাদ কতখানি সার্থক হয়েছে, কুমারী তপতীর মুখের দিকে তাকালেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। মন্ত্রবারিসিক্ত পুষ্পস্তবকের মত স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে রচিত একখানি মুখ। এই রূপে প্রভা আছে, জ্বালা নেই। এই চক্ষুর দৃষ্টি নক্ষত্রের মত করুণমধুর, বিদ্যুতের মত খরপ্রভ নয়। সত্যই এক কুমারিকা কল্যাণী যেন অন্তরের শুচিতা দিয়ে তার যৌবনের অঙ্গশোভাকে মধুচ্ছন্দা কবিতার মত সংযত ক'রে রেখেছে।

শাস্ত্রজ্ঞানীরা যা-ই বলুন আর যতই বিরোধিতা করুন, আদিত্যের প্রচারিত সমাজকল্যাণ ও সমদর্শিতার নীতিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন আর একজন, নৃপতি সংবরণ। সংবরণের সেবিত প্রজাসাধারণ নূতন এক সুখী ও সম্মানময় জীবনের অধিকার পেয়েছে।

রাজ্য বিত্ত রূপ ও যৌবনের অধিকার পেয়েও রাজা সংবরণ এখনও অবিবাহিত। আত্মসুখের সকল বিষয় কঠোরভাবে বর্জন করেছেন সংবরণ। সংবরণ বিশ্বাস করেন, কল্যাণব্রত মানুষের ধর্ম হবে ঐ জ্যোতিরাধার সূর্যের ব্রতের মত, যার পুণ্যরশ্মি ভূলোকের সর্ব প্রাণীকে সমান পরিমাণ আলোক দান করে। উচ্চনীচ ভেদ নেই, পাত্রবিশেষে তারতম্য নেই। সমগ্র চরাচর যেন এই সূর্যের সমান স্নেহে লালিত এক কল্যাণের রাজ্য। যখন অদৃশ্য হন সূর্য, তখনও সর্বজীবকে সমভাবেই অন্ধকারে রাখেন। এই সমদর্শিতার নীতি নিয়ে নৃপতি সংবরণ তাঁর রাজ্যের কল্যাণ করেন।

সংবরণ বিবাহ করেননি, বিবাহের জন্য কোন ঈপ্সা নেই। সংবরণের ধারণা,

তিনি বিবাহিত হলে তাঁর সমদর্শিতার নীতি ক্ষুণ্ণ হবে, লোকহিতের ব্রত বাধা পাবে। ভয় হয়, সংসারের সকলের মধ্যে বিশেষভাবে শুধু একটি নারীকে দয়িতারূপে আপন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সকলকে পর মনে করতে হবে।

সেদিন ছিল সংবরণের জন্মতিথি। যে মহাপ্রাণ শিক্ষকের কাছে জীবনের সবচেয়ে বড় আদর্শের পাঠ গ্রহণ করেছেন, তাঁরই কাছে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য অর্ঘ্য মাল্য ধূপ ও দীপের উপহার নিয়ে আদিত্যের কুটীরে সংবরণ উপস্থিত হলেন। উপবাসশুদ্ধ স্নানস্নিগ্ধ ও সুকঠোরব্রত তরুণ সংবরণের মুখের উপর নবোদিত সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আদিত্য মুগ্ধভাবে ও সস্নেহে প্রিয় শিষ্য সংবরণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দুই চক্ষুর দৃষ্টি আশীর্বাদের আবেগে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

তবু আজ আদিত্যের মন যেন এক বিষণ্ণতার স্পর্শে প্রলিপ্ত হয়ে রয়েছে। মনে হয়েছে আদিত্যের, শিষ্য সংবরণ যেন তার জীবনের কি এক ভুল বিশ্বাসের আবেগে ভুল ক'রে চলেছে। এই তারুণ্যলালিত জীবনকে এত কঠোর কৃচ্ছ্রে ক্লিষ্ট ক'রে রাখবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সমদর্শিতার জন্য, সমাজকল্যাণের জন্য, এই কৃচ্ছ্রের কোন প্রয়োজন নেই। এই ব্রত বনবাসী যোগীর উপযোগী ব্রত, প্রজাহিতব্রত রাজন্যের জীবনে এমন ব্রত শোভা পায় না।

আশীর্বাদের পর আদিত্য বলেন—একটি অনুরোধ ছিল সংবরণ।

—বলুন।

—তোমার সমদর্শিতায় প্রজার জীবন কল্যাণে ভরে উঠেছে। কিন্তু তুমি বিবাহিত হলে তোমার ব্রতের সাধনায় বাধা আসবে, এমন সন্দেহের কোন অর্থ নেই।

—অর্থ আছে ভগবান আদিত্য।

সংবরণের কথায় চমকে ওঠেন আদিত্য। শিষ্য সংবরণ গুরু আদিত্যের উপদেশের ভুল ধরেছে।

সংবরণ বলেন—আত্মসুখের যে-কোন বিষয়কে জীবনে প্রশ্রয় দিলে স্বার্থ-বোধ বড় হয়ে ওঠে।

আদিত্য বলেন—আত্মসুখের জন্য নয় সংবরণ, সমাজের মঙ্গলের জন্যই বিবাহ। বৈরাগ্য তোমার ব্রত নয়। সমাজে সবাকার মাঝখানে থেকে সমাজের সকল হিতের সাধক হবে তুমি; যাঁরা আদর্শবান, তাঁরা সমাজকল্যাণের জন্যই বিবাহ করেন। এক পুরুষ ও এক নারীর মিলিত জীবন সমাজকল্যাণের একটি প্রতিজ্ঞা মাত্র। এ ছাড়া বিবাহের আর কোন তাৎপর্য নেই। তুমি জান সংবরণ,

আমি সমদর্শী, কিন্তু আমিও বিবাহিত। আমিও পুত্রকন্যা নিয়ে সংসারজীবন যাপন করি। এমন কি, কুমারী কন্যার বিবাহের জন্য অনেক ভাবনাও সহ্য করি।

সংবরণ কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেন—আপনার কুমারী কন্যা?

আদিত্য—হ্যাঁ, আমার কন্যা তপতী। তাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

সংবরণ আরও কৌতূহলী হন—আপনি কি বলতে চাইছেন ভগবান আদিত্য?

আদিত্য--তুমি বিবাহিত হও।

সংবরণ-- কা'কে বিবাহ করব?

আদিত্য সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারেন না। সংবরণের প্রশ্নে একটু বিব্রত হয়ে পড়েন।

সংবরণ বলেন -আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি ভগবান আদিত্য। আপনার কাছ থেকেই আমি সমদর্শিতার জ্ঞান লাভ করেছি। আপনি আমার শিক্ষাগুরু। তাই অনুরোধ করি, এমন কিছু বলবেন না, যার ফলে আপনার প্রতি আমার বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়।

আদিত্য জিজ্ঞাসুভাবে তাকান-- আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ক্ষুণ্ণ হবে, আমার উপদেশের মধ্যে এমন কোন গর্হণীয় আগ্রহের আভাস কি তুমি পেয়েছ?

সংবরণ—হ্যাঁ গুরু। মনে হয়, আপনার কুমারী কন্যার বিবাহের জন্য আপনার যে ভাবনা, এবং আমাকে বিবাহিত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখবার জন্য আপনার যে অনুরোধ, এই দু'য়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে।

ভগবান আদিত্য নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। মিথ্যা বলেনি সংবরণ। কন্যা তপতীর জন্য যোগ্য পাত্র খুঁজছেন ভগবান আদিত্য। তাঁর মনে হয়েছে, কুমার নৃপতি সংবরণই তপতীর মত মেয়ের স্বামী হওয়ার যোগ্য। নিজের মনের ইচ্ছাকে আর এক যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রে দেখেছেন এবং বুঝেছেন আদিত্য, তাঁর পুত্রবৎ এই তরুণ সংবরণ, তাঁরই শিক্ষা ও দীক্ষায় লালিত ও সমদর্শিতার আদর্শে ব্রতী এই সংবরণের জীবনে তপতীর মত মেয়েই সহধর্মিণী হওয়ার যোগ্য।

আদিত্য তাঁর অন্তর অন্বেষণ ক'রে আর একবার বুঝতে চেষ্টা করেন, সত্যই কি তিনি শুধু তাঁর আত্মজা তপতীর সৌভাগ্যের জন্য সংবরণকে পাত্র-রূপে পেতে প্রলুব্ধ হয়েছেন? নিজের মনকে প্রশ্ন ক'রে কোথাও সে-রকম কোন স্বার্থতন্ত্রের কলুষ আবিষ্কার করতে পারেন না ভগবান আদিত্য। কিন্তু কি ভয়ঙ্কর অভিযোগ করেছে সংবরণ!

আদিত্য শান্তভাবে বলেন--যদি এই দু'য়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকে, তাতে অন্যায় কিছু হয়েছে কি সংবরণ?

সংবরণ- যদি সে-রকম কোন ইচ্ছা আপনার থাকে, তবে আপনাকে সমদর্শী বলতে আমার দ্বিধা হবে ভগবান আদিত্য। আপনার কন্যাকে পাত্রস্থ করবার জন্যই আপনার আগ্রহ, সমদর্শিতা ও সমাজকল্যাণের আদর্শের জন্য নয়।

আদিত্য শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলেন—ভুল করছ সংবরণ। আমি সমদর্শী। তপতী আমার কন্যা হয়েও যতটা আপন, তুমি আমার পুত্র না হয়েও পুত্রের মতই ততটা আপন। শুধু তপতীকে পাত্রস্থ করবার জন্যই আমার চিন্তা নয়, সংবরণের জন্য যোগ্য পাত্রী পাওয়ার সমস্যাও আমার চিন্তার বিষয়। এক কুমার ও এক কুমারীর জীবন দাম্পত্য লাভ ক'রে সমাজের কল্যাণে নূতন মন্ত্ররূপে সংকল্পরূপে ব্রতরূপে ও যজ্ঞরূপে সার্থক হয়ে উঠবে, এই আমার আশা। এর মধ্যে স্বার্থ নেই, অসমদর্শিতাও ছিল না সংবরণ।

আদিত্য নীরব হন। কিন্তু সংবরণের আত্মত্যাগের গর্ব যেন আর একটু মুখর হয়ে ওঠে--ক্ষমা করবেন, আপনার সমদর্শিতার এই ব্যাখ্যা আমি গ্রহণ করতে পারছি না গুরু। আপনি ভুল করছেন ভগবান আদিত্য। আমি শুদ্ধাচারী ও সংযতেন্দ্রিয়, আমি আত্মবর্জিত সমাজসেবার ব্রত গ্রহণ করেছি। বিবাহিত হলে আমার জীবন স্বার্থের বন্ধনে জড়িয়ে পড়বে। এক নারীর প্রতি প্রেমের পরীক্ষা দিতে গিয়ে আমার জীবনে মানবসেবা সর্বকল্যাণ ও সমদর্শনের পরীক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আদিত্য আর কোন কথা বললেন না। শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে নূতন শিক্ষা নিয়ে নেয়, শিক্ষার আতিশয্যে শিক্ষাগুরুকে হারিয়ে দিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলেন সুপ্রসন্ন সংবরণ।

বনপ্রদেশে একাকী ভ্রমণে বের হয়েছেন সংবরণ। কোথায় কোন বনবাসী যোগী একান্তে দিন যাপন করছেন, কোন্ নিষাদ ও কিরাতের কুটীরে দুঃখ আছে, সবই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন সংবরণ এবং দুঃখ দূর করবেন। সমদর্শী সংবরণের অনুগ্রহ কা'রও জন্য কম বা বেশি নয়। যেমন রাজধানীর প্রজা, তেমনি বনবাসী প্রজা সর্বপ্রজার সুখ ও শুভের প্রতি স্বচক্ষুর কৌতূহল নিয়ে সর্বদা লক্ষ্য রাখেন সংবরণ, দূতবার্তার উপর নির্ভর ক'রে থাকেন না।

ভ্রমণ শেষ ক'রে বনপ্রান্তে এসে একবার দাঁড়ালেন সংবরণ। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কি সুন্দর ও শোভাময় হয়ে রয়েছে পৃথিবী! নীলিমার শান্ত সমুদ্রের মত আকাশে হীরকপ্রভ সূর্যের গায়ে অপরাহ্নের রক্তিমা; নিম্নে বিপুলবিসর্পিত অরণ্যানীর নিবিড় শ্যামলতা। নিকটে অল্পোচ্চ মেঘবর্ণ

শৈলগিরি, যার পদপ্রান্তে পুষ্পময় বনলতার কুঞ্জ। একটি দীর্ঘায়ত পথরেখা ধনের বক্ষ ভেদ ক'রে এসে, শৈলগিরির ক্রোড়ে উঠে, তারপর প্রান্তরের বক্ষে নেমে গিয়েছে। কিঞ্চিৎ দূরে এক জনপদের কুটীরপংক্তি দেখা যায়।

চলে যাচ্ছিলেন সংবরণ, কিন্তু যেতে পারলেন না। গিরিপথ ধ'রে কেউ একজন আসছে। যোগী নয়, নিষাদ নয়, কিরাত নয়, কোন দস্যুর মূর্তিও নয়। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে যে, তার দেহের ভঙ্গী ও পদক্ষেপে অদ্ভুত এক ছন্দ যেন স্পন্দিত হচ্ছে। মঞ্জীর নেই, তাই তার মধুর ধ্বনি শোনা যায় না।

সেই মূর্তি কিছুদূর এগিয়ে এসে হঠাৎ থেমে গেল। সংবরণ এতক্ষণে দেখতে পেলেন, এক তরুণী নারীর মূর্তি।

পথের উপর দাঁড়িয়ে আছেন সংবরণ। তরুণীর মূর্তিও আর অগ্রসর হয় না। তীব্র কৌতূহলে বিচলিত সংবরণ আগন্তুকার দিকে এগিয়ে যান, এবং বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই শোভাময় পৃথিবীর রূপে কোথায় যেন একটু শূন্যতা ছিল, এই বিচিত্র নিসর্গচিত্রের মধ্যে কোথায় যেন একটি বর্ণচ্ছটার অভাব ছিল, এই তরুণী পৃথিবীর সেই অসমাপ্ত শোভাকে পূর্ণ ক'রে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পর মুহূর্তে মনে হয়, শুধু তাই নয়, এই নিভৃতচারিণী রূপমতী যেন এই ধরণীর সকল রূপের সত্তা। পুষ্পে সুরভি দিয়ে, লতিকায় হিল্লোল দিয়ে কিশলয়ে কোমলতা দিয়ে, পল্লবে শ্যামলতা দিয়ে এবং স্রোতের জলে কলনাদ জাগিয়ে এই রূপের সত্তা অলক্ষ্যে ভূলোকের সকল সৃষ্টির পথে বিচরণ করে। সংবরণের সৌভাগ্য, আজ তার চক্ষুর সম্মুখে সেই রূপের সত্তা পথ ভুল ক'রে দেখা দিয়ে ফেলেছে।

অনেকক্ষণ দেখা হয়ে গেল। এতক্ষণে পথ ছেড়ে পাশে সরে যাবার কথা। কিন্তু নৃপতি সংবরণ এই শিষ্টতার কর্তব্যটুকুও যেন এই মোহময় মুহূর্তে বিস্মৃত হয়েছেন।

সংবরণের এই বিস্ময়নিবিড় অপলক দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে থেকে তরুণীর মূর্তিও ধীরে ধীরে ব্রীড়ানত হয়ে আসে। কিন্তু এই অক্ষান্ত পল্লবমর্মর, চঞ্চল সমীরের অশান্ত আবেগ, অবারিত মিলন ও আকাঙ্ক্ষার জগৎ এই বনময় নিভৃতে তরুণীর এই ব্রীড়ানত দৃষ্টির সম্ভ্রম যেন নিতান্ত অবান্তর বলে মনে হয়।

সংবরণ বলেন—শোভান্বিতা, তোমার পরিচয় জানি না, কিন্তু মনে হয় তোমার পরিচয় নেই

তরুণীর আয়ত নয়নের দৃষ্টি ক্ষণিকের মত বিহ্বল হয়ে ওঠে। এই

সুন্দর পুরুষের মূর্তি যেন সব অন্বেষণের শেষে তারই জীবনের পথে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পল্লবের সঙ্গীত, এই বনতরুর শিহরণ, এই গিরিক্রোড়ের নিভৃত এবং এই লগ্ন, সবই যেন এই দুই জীবনের দৃষ্টিবিনিময় সফল করবার জন্য পার্থিব কালের প্রথম মুহূর্তে রচিত হয়েছিল। মনে হয়, এই মর্ত্যভূমির সঙ্গে আর এই বর্তমানের সঙ্গে এই বরতনু পুরুষের কোন সম্পর্ক নেই। যেন দেশকালের পরিচয়ের অতীত এক চিরন্তন দয়িত, যার বাহুবন্ধন বরণ করবার জন্য নিখিলনারীর যৌবন আপনি স্বপ্নায়িত হয়। ঐ কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণের জন্য কামিনীর করলতা আপনি আন্দোলিত হয়।

মাত্র ক্ষণিকের বিহ্বলতা, পরমুহূর্তেই তরুণীর মূর্তি যেন সতর্ক হয়ে ওঠে।

তরুণী প্রশ্ন করে—আপনার পরিচয়?

—আমি দেশপ্রধান সংবরণ।

আকস্মিক ও রূঢ় এক বিস্ময়ের আঘাতে তরুণী চমকে ওঠে, পিছনে সরে যায়। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দূরান্তের দিগ্বলয়ের দিকে নিষ্কম্প দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিলোল স্বর্ণাঞ্চল দু'হাতে টেনে নিয়ে যেন তার বিপন্ন যৌবনের সংকোচ কবচিত করে। যেন এক অপমানের স্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করতে চাইছে অনাম্নী এই নারী।

সংবরণ বিচলিত হয়ে ওঠেন—মনে হয়, তুমি যেন এক কল্পলোকের কামনা।

– না রাজা সংবরণ, আমি এই ধূলিমলিন মর্ত্যলোকেরই সেবা।

তুমি মূর্তিমতী প্রভা, তোমার পরিচয় তুমিই।

– দিবাকর তার পরিচয়।

—তুমি স্ফুটকুসুমের মত সুরুচিরা।

পুষ্পদ্রুম তার পরিচয়।

—তুমি তরঙ্গের মত ছন্দোময়।

—সমুদ্র তার পরিচয়। আমার পরিচয় আছে রাজা সংবরণ। আমি সাধারণী, সংসারের নারী, কুমারী।

সংবরণ—যে-ই হও তুমি, মনে হয়, তুমি আমারই জীবনের আকাঙ্ক্ষা। আমার এই কণ্ঠমাল্য গ্রহণ কর।

তরুণীর অধরে মৃদু হাসি রেখায়িত হয়ে ওঠে।—আমি মানুষের ঘরের মেয়ে, পিতৃস্নেহে লালিতা কন্যা। আমি সমাজে বাস করি রাজা সংবরণ। স্বেচ্ছায় বা যথেচ্ছায় কোন পুরুষের কণ্ঠমাল্য গ্রহণ করতে পারি না, পারি সমাজের ইচ্ছায়।

—তার অর্থ?

—সমাজকুমারী কোন পুরুষকে স্বামিরূপে ছাড়া অন্য কোনরূপে আহ্বান করতে পারে না।

সংবরণের সকল আকুলতায় যেন হঠাৎ এক কঠোর বাস্তব সত্যের আঘাত লাগে। তৃষ্ণাতুরের মুখের কাছ থেকে যেন পানপাত্র দূরে চলে যাচ্ছে। সংবরণ বলেন—মনোলোভা, তোমার স্বামিরূপেই আমাকে গ্রহণ কর।

—আমি নিজের ইচ্ছায় আপনাকে গ্রহণ করতে পারি না রাজা সংবরণ। আপনি আমার পিতার অনুমতি গ্রহণ করুন।

—কেন?

—আমি সমাজের মেয়ে। পিতা আমার অভিভাবক।

—কোথায় তোমার সমাজ?

—ঐ যেখানে কুটীরপংক্তি দেখা যায়।

—এখানে এসেছ কেন?

—এসেছি, সকল কল্যাণের আধার সমদর্শী সূর্যকে দিনান্তের প্রণাম জানাতে এই আমার প্রতিদিনের ব্রত।

সংবরণ যেন দুঃসহ বিস্ময়ে হঠাৎ চিৎকার ক'রে ওঠেন—কে তুমি?

তরুণী বলে—আমি কল্পনা নই, কল্পলোকের সৃষ্টিও নই, আমি লোক-প্রদীপ আদিত্যের কন্যা তপতী।

দুই চক্ষুর উপর যেন তপ্ত বালুকার দংশন ছুটে এসে লেগেছে, চকিতে মাথা হেঁট করেন সংবরণ। শিশির ঋতুর হিমপীড়িত বনস্পতির মত স্তব্ধ সংবরণ নীরবে দাঁড়িয়ে শুধু তাঁর বক্ষঃপঞ্জরের একটি কাতরতার ধ্বনি শুনতে থাকেন। যখন মুখ তোলেন সংবরণ, তখন বুঝতে পারেন, তরুণী তপতীর তনুচ্ছবি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

সূর্যও অস্তাচলে অদৃশ্য, বনের বুকে অন্ধকার, তপতী নেই, শুধু একা দাঁড়িয়ে থাকেন সংবরণ। সারা জগতের সত্যমিথ্যার রূপে যেন এক বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। তাঁর আদর্শের অহংকার এবং তাঁর ত্যাগের দর্প এক নিষ্ঠুর বিদ্রূপের আঘাতে ধূলি হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সব স্বীকার ক'রে নিয়েও এই মুহূর্তে মর্মে মর্মে অনুভব করেন সংবরণ, ঐ মূর্তিকে ভুলে যাবার শক্তি তাঁর নেই। কোথায় তাঁর সমদর্শিতা আর চিরকৌমার্যের সংকল্প! কোথাও নেই। তপতী ছাড়া এ বিশ্বে আর কোন সত্য আছে বলে মনে হয় না।

সংবরণের সত্তা যেন এই অন্ধকারে তার সকল মিথ্যা গর্বের মূঢ়তা ও লজ্জা থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। কোথাও চলে যাবার অথবা ফিরে যাবার সাধ্য নেই। সংসারের ঘটনার কাছে আজ হাতে হাতে ধরা পড়ে গিয়েছেন

সংবরণ। কিন্তু যে স্বপ্নকে কাছে পাওয়ার জন্য তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাস আজ কামনাময় হয়ে উঠেছে, সেই স্বপ্নকে নিজেই বহুদিন আগে নিজের অহংকারে অপ্রাপ্য ক'রে রেখে দিয়েছেন। আজ তাকে ফিরে চাইবার অধিকার কই?

সংবরণ আজ নিজ ভবনে ফিরলেন না।

সংবরণের এই আত্মনির্বাসনে সারা দেশে ও সমাজে বিস্ময়ের সীমা রইল না। কেন, কোন্ দুঃখে আর কিসের শোকে সংবরণ তাঁর এত প্রিয় সেবার রাজ্য ও কল্যাণের সমাজ ছেড়ে দিলেন? এ কি বৈরাগ্যের প্রেরণা?

সকলেই তাই মনে করেন। ভগবান আদিত্যেরও তাই ধারণা। শুধু একমাত্র যে এই ঘটনার সকল রহস্য জানে, সে-ও নীরব।

তপতীকে নীরব হয়েই থাকতে হবে। বনপ্রান্তের অপরাহ্ণবেলার আলোকে যার মুখের দিকে তাকিয়ে তপতী তার অন্তরের নিভৃতে প্রেমিকের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছে, তাকে ভুলতে পারা যাবে না। কিন্তু সেকথা এই জীবনের ইহকালের কানে কানে কখনও বলাও যাবে না। সেই সুতরুণ কুমারের অভ্যর্থনাকে চিরকাল এক প্রহেলিকার আহ্বান বলে মনে করতে হবে। তপতী জানে, সংবরণ তাঁর হতদর্প জীবনের লজ্জা অতিক্রম ক'রে সমাজে আর ফিরে আসবেন না। কেউ জানবে না, বনপ্রান্তের এক অপরাহ্ণবেলায় এক পুরুষ ও এক নারীর সম্মুখ-সাক্ষাৎ শুধু চিরবিরহের বেদনা সৃষ্টি ক'রে রেখে গিয়েছে।

শুধু নীরব থাকতে পারলেন না সংবরণের কুলগুরু বশিষ্ঠ। রাজাহীন রাজ্যে অশাসন দুঃখ অশান্তি ও উপদ্রব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে অবহেলা ও বিশৃঙ্খলা। বশিষ্ঠ একদিন সংবরণের কাছে উপস্থিত হলেন।

বশিষ্ঠ বেদনার্তভাবে বলেন---হঠাৎ এ কি করলে সংবরণ?

- হঠাৎ ভুল ভেঙে গেল গুরু।

—কিসের ভুল?

উত্তর দেন না সংবরণ। বশিষ্ঠ আবার প্রশ্ন করেন—জানি না, কোন্ ভুলের কথা তুমি বলছ। কিন্তু ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তোমাকে এখানে থাকতে হবে কেন?

—হ্যাঁ, এখানেই। এই বনপ্রান্তের গিরিশিখর আমার মন্দির। কল্যাণাধার সূর্যের উদয়াস্তের পথের দিকে তাকিয়ে এখানেই আমাকে জীবনের শান্তি ফিরে পেতে হবে।

হেসে ফেলেন বশিষ্ঠ—ভুল করো না সংবরণ। তোমার মুখ দেখে বুঝতে

পারি, তোমার এই তপস্যা নিশ্চয় এক অভিমানের তপস্যা। তোমার মনে পূজাচারীর আনন্দ নেই। তুমি তোমার এক আহত স্বপ্নের বেদনা ঢাকবার জন্য মিথ্যা বৈরাগ্য নিয়ে নিষ্ঠাহীন পূজায় ব্যস্ত হয়ে রয়েছ।

সংবরণ চুপ ক'রে থাকেন, আত্মদীনতায় কুণ্ঠিত অপরাধীর নীরবতার মত। কিন্তু অতি স্পষ্ট ও কঠিন এক প্রশ্নের মূর্তির মত বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসুভাবে সংবরণের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

সংবরণ বলেন—ভগবান আদিত্যকে আমি মিথ্যা গর্বের ভুলে অশ্রদ্ধা করেছি, এই প্রায়শ্চিত্ত তারই জন্য গুরু।

কৌতূহল। বশিষ্ঠের দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিশিত প্রশ্নের মত তেমনি উদ্যত হয়ে থাকে, যেন আরও কিছু তাঁর জানবার আছে।

সংবরণ বলেন—ভগবান আদিত্যের কন্যা তপতী আমার কামনার স্বপ্ন, কিন্তু সেই স্বপ্নকে আমার জীবনে আহ্বান করবার অধিকার আমি হারিয়েছি গুরু।

স্নেহপূর্ণ এবং সহাস্য স্বরে বশিষ্ঠ বলেন—সেই অধিকার তুমি আজ পেয়েছ সংবরণ। সমাজহীন এই অরণ্যময় নিভৃত তোমার জীবনের অধিষ্ঠান নয়; ফিরে চল তোমার রাজ্যে, তোমার কর্তব্যের সংসারে ও সমাজে, এবং আদিত্যের কন্যা তপতীর পাণিগ্রহণ ক'রে সুখী হও।

বনপ্রান্তের নিভৃত হতে প্রাসাদে ফিরে এলেন সংবরণ এবং আদিত্যের ভবনে ফিরে এলেন বশিষ্ঠ। ঘটনার রহস্য এতদিনে জানতে পেরে আদিত্যও বিস্মিত হলেন। এবং তপতী এসে বশিষ্ঠ ও আদিত্যকে প্রণাম করতেই দু'জনে তপতীর সুস্মিত ও সলজ্জ মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত হলেন। আশীর্বাদ করলেন বশিষ্ঠ ও আদিত্য—তোমার অনুরাগ সফল হোক, তোমার জীবনে সূর্যারতির পুণ্য সফল হোক সুস্মিতা।

পতিগৃহে চলে গিয়েছে তপতী। কল্যাণাধার সূর্যের উপাসক সংবরণ ও উপাসিকা তপতীর মিলিত জীবন সংসারে নূতন কল্যাণের আলোক হয়ে উঠবে, এই আশায় প্রসন্ন ছিলেন আদিত্য। কিন্তু দেখা দিল আশাভঙ্গের মেঘ। আবার বিষণ্ণ হলেন আদিত্য। বেদনাহত চিত্তে তিনি নির্মম সংবাদ শুনলেন, প্রজা-সেবার সকল ভার অমাত্যের উপর ছেড়ে দিয়ে তপতীকে নিয়ে দূর উপবনভবনে চলে গিয়েছে সংবরণ।

এমন বেদনা জীবনে পাননি আদিত্য। তাঁর আদর্শ যাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করবে বলে তিনি আশা করেছিলেন, তারাই দু'জন যেন সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সমাজের জন্য নয়, সংসারের জন্য নয়, যেন

বিবাহের জন্যই এই বিবাহ হয়েছে। কোথা থেকে যেন এক জান্তব রীতির অভিশাপ এসে দু'টি জীবনের সৌন্দর্য ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিল। গুরু বশিষ্ঠও এসে আদিত্যের সম্মুখে অনুতপ্তের মত বিষণ্ণ মুখে বসে থাকেন।

সংসার সমাজ ও রাজনিকেতন হতে বহুদূরে এক উপবনভবনের নিভৃতে যেন এক স্বপ্নের নীড় রচনা করেছেন সংবরণ। এখানে তপতী ছাড়া কোন সত্যই সত্য নয়। এই যৌবনধন্যা রূপাধিকা নারীর কুন্তলসৌরভের চেয়ে বেশি সৌরভ পৃথিবীর কোন পুষ্পকুঞ্জে নেই। এই নারীর কম্র নয়নের কনীনিকার কাছে আকাশের সব তারা নিষ্প্রভ। ভূলোকললামা এই ললনার চুম্বনে যেন উষা জাগে, আর নিশা নামে আলিঙ্গনে। বরাঙ্গনা তপতীর দেহ যেন এক লজ্জাহীন কামনার পুষ্পময় উপবন, যার অফুরান পরিমল প্রতি মুহূর্তে লুণ্ঠন ক'রে জীবন তৃপ্ত করতে চান সংবরণ।

কিন্তু হাঁপিয়ে ওঠে তপতী। উপবনের মৃদুল অনিলের স্পর্শও জ্বালাময় মনে হয়। কোথায় রইল সমাজ আর সমাজের কল্যাণ? কোথায় সূর্যরীতির পুণ্য? কোথায় আদিত্যের সমদর্শিতার দীক্ষা? পতি-পত্নীর জীবন নয়, শুধু এক নর ও এক নারীর কামনাকুল মিলন।

সংবাদ আসে—আদিত্য বিষণ্ণ হয়ে রয়েছেন, বশিষ্ঠ দুঃখিত হয়েছেন, রাজপ্রাসাদে আতঙ্ক, প্রজাসমাজে বিদ্রোহ অশান্তি ও অনাচার। শত্রু ইন্দ্র সুযোগ বুঝে রাজ্যের শস্য ধ্বংস করেছে, দুর্ভিক্ষপীড়িতের আর্তরবে জাতির প্রাণ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সংবরণ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না। ওসব যেন এক ভিন্ন পৃথিবীর দুঃখের ঝড়, এই উপবনভবনের নিভৃতে ও সুখলালস জীবনে তার স্পর্শ লাগে না। সংবরণের দিকে তাকিয়ে তপতীর দৃষ্টি ব্যথিত হয়ে ওঠে। সমদর্শী প্রজাসেবক সংবরণের এমন পরিণাম তপতী কল্পনা করতে পারেনি।

তপতীর দুঃখ চরম হয়ে উঠল সেদিন, গুরু বশিষ্ঠ যেদিন আবার সংবরণের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে উপবনভবনের দ্বারে উপস্থিত হলেন। গুরু বশিষ্ঠ এসেছেন, এই সংবাদ শুনেও সংবরণ গুরুদর্শনের জন্য উৎসাহিত হলেন না। উপবনভবনের বহির্দ্বারেই দাঁড়িয়ে রইলেন বশিষ্ঠ।

সংবরণের মূঢ়তার রূপ দেখে আতঙ্কিত হয় তপতী। নিজেকেও নিতান্ত অপরাধিনী বলে মনে হয়। কিন্তু আর নয়। নিজেকে যেন আজই এক চরম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে চায় তপতী। নতমুখে এবং সাশ্রুনয়নে এবং নীরবে এক মধুরায়িত মোহের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে মনে মনে সংগ্রাম করে।

উপরে মধ্যাহ্নসূর্য, গুরু বাইরে দাঁড়িয়ে, এদিকে উপবনভবনের অভ্যন্তরে লতাবিতানে আচ্ছন্ন এক আলোকভীরু ছায়াকুঞ্জে গন্ধতৈলের প্রদীপ জ্বলে।

তারই মধ্যে সাধের স্বপ্ন নিয়ে লীলাবিভোর সংবরণ, দুই বাহু দিয়ে তপতীর কণ্ঠদেশ ভুজঙ্গের বন্ধনের মত জড়িয়ে ধ'রে রেখেছেন। লুব্ধ ভৃঙ্গের ব্যগ্রতা নিয়ে সংবরণের সুন্দর মুখ তপতীর অধর অন্বেষণ করে।

হঠাৎ অশান্ত হয় তপতী। মুখ ফিরিয়ে নেয় তপতী, এবং দুই হস্তের আপত্তির আঘাতে রূঢ়ভাবে সংবরণের বাহুবন্ধন ছিন্ন ক'রে সরে দাঁড়ায়।

সংবরণ বিস্মিত হন—এ কি তপতী?

—আমি তপতী নই।

--এই কথার অর্থ?

--তপতী কোন পুরুষের শুধু উপবননিভৃতের প্রমোদসঙ্গিনী হতে পারে না।

বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন সংবরণ, তপতীর এই অদ্ভুত ধিক্কারের অর্থ বুঝবার চেষ্টা করেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য সত্যই মনে হয় সংবরণের, তপতীর ছদ্মরূপে যেন অন্য কোন নারী তার দিকে তাকিয়ে আছে। দুই চক্ষুতে মূর্খের বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করেন সংবরণ—তবে তুমি কে?

আমি এক নারীর দেহমাত্র।

শঙ্কিতের মত চমকে ওঠেন সংবরণ। তপতীর কথাগুলি যেন শাণিত ছুরিকার মত নির্মম, নিজেরই মায়াময় রূপের নির্মোক মুহূর্তের মধ্যে ছিন্ন ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছে, ভিতরে তপতী নামে কোন সত্তা নেই। সংবরণ অসহায়ের মত প্রশ্ন করেন – তবে তপতী কে?

--তপতী হলো এক নারীর মন, যে মন পিতা আদিত্যের কাছে দীক্ষালাভ করেছে, কল্যাণাধার সূর্যের আরতি ক'রে জীবনের একমাত্র পুণ্য লাভ করেছে, যে মন সংসারের মধ্যে প্রিয়তমরূপে এক স্বামীর মন খুঁজছে, যে মন স্বামীর মনের সাথে মিলিত হয়ে সমাজে-সংসারে সবাকার প্রিয় হয়ে উঠতে চাইছে। সেই শিক্ষিতা সুরুচি কল্যাণী ও প্রিয়া তপতীর মন তুমি কোনদিন চাওনি, পাওনি।

--তবে এতদিন কি পেয়েছি?

--এতদিন যা পেয়েছ তার মধ্যে তপতীর এতটুকু আগ্রহ ছিল না।

-- সুতনু তপতীর কোন অনুভব কোন আনন্দে ধন্য হয়নি?

— এতটুকুও না।

উপবনভবনের স্বপ্ন যেন চূর্ণ হয়ে যায়। সংবরণের মনে হয় ধূলিময় এক জনহীন মরুস্থলীতে একা দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তপতী এত নিকটে দাঁড়িয়ে, কিন্তু সুদূরের মরীচিকা বলে মনে হয়। রূপ নয়, রূপের শব নিয়ে এতদিন শুধু বিলাস করেছেন সংবরণ।

**সংবরণ**—এই শাস্তি তুমি আমায় কেন দিলে তপতী? তুমি যে নিতান্ত আমারই. আমারই বিবাহিতা নারী তুমি।

তপতী—সত্য. কিন্তু শুধু বিবাহের জন্য তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়নি সংবরণ।

সংবরণ—তবে কিসের জন্য?

তপতী—জগতের জন্য। শুধু তোমার ও আমার আনন্দের জন্য নয় জগতের আনন্দের জন্য।

জগতের জন্য? জগতের আনন্দের জন্য? তপতীর উত্তর যেন মন্ত্রধ্বনির মত উপবনভবনের বাতাসে এক নূতন হর্ষ সৃষ্টি করে।

গন্ধতৈলের প্রদীপ হঠাৎ নিভে যায়। উপবনের তরুবীথিকার শীর্ষ চুম্বন ক'রে এবং বল্লীবিতানের বাধা ভেদ ক'রে ছায়াকুঞ্জের অভ্যন্তরে সূর্যনিঃসৃত রশ্মিধারা এসে ছড়িয়ে পড়ে। এক অভিশপ্ত বিস্মৃতির দীর্ঘ অবরোধ ভেদ ক'রে বহুদিন আগে শোনা এই ধ্বনি যেন নূতন ক'রে শুনতে পেয়েছেন সংবরণ—জগতের জন্য। সংসারের মানব ও মানবীর জীবন মিলিত হয় সমাজ-কল্যাণের নূতন মন্ত্ররূপে, সংকল্পরূপে, ব্রতরূপে, যজ্ঞরূপে' তারই নাম বিবাহ। শুধু নিজের জন্য নয়, নিভৃতের জন্যও নয়, জগতের জন্য।

বাষ্পায়িত হয় সংবরণের দুই চক্ষু। অবহেলিত রাজ্য সমাজ ও সংসারের দুঃখ যেন ঐ সূর্যরশ্মির সঙ্গে এসে তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছে। এই দৃশ্য দেখতে করুণ হলেও তপতী যেন এক পাষাণীর মূর্তির মত অবিচল ও অবিকার দুটি চক্ষুর শান্তকঠোর দৃষ্টি তুলে দেখতে থাকে।

সংবরণ শান্তভাবে বলেন—বার বার তিনবার আমার ভুল হয়েছে তপতী, কিন্তু তুমিই চরম শাস্তি দিয়ে শেষ ভুল ভেঙে দিলে।

উত্তর দেয় না তপতী। চরম শাস্তি গ্রহণের জন্য তপতীও আজ প্রস্তুত হয়েছে।

সংবরণ ধীরস্বরে বলেন—সত্যই তোমাকে আমি আজও আমার জীবনে পাইনি তপতী, কিন্তু এইবার পেতে হবে।

চমকে ওঠে তপতীর শান্তকঠোর চক্ষুর দৃষ্টি।

তপতীর হাত ধরবার জন্য এক হাত এগিয়ে দিয়ে সংবরণ বলেন—চল।

তপতী—কোথায়?

সংবরণ—ঘরে, সমাজে, জগতে।

তপতী বিস্মিত হয়। সংবরণ যেন সে বিস্ময়কে চরম চমকে চকিত ক'রে দিয়ে বলেন—চল তপতী; গুরু বশিষ্ঠ আমাদের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

লুব্ধা লুণ্ঠকীর মত তপতী তার দুই বাহু সাগ্রহে নিক্ষেপ ক'রে সংবরণের কণ্ঠ নিবিড় আলিঙ্গনে আপন ক'রে নিয়ে বক্ষে ধারণ করে। জীবনের আনন্দের সঙ্গীকে এতদিনে খুঁজে পেয়েছে তপতী।

হ্যাঁ, সারা জীবনের তৃষ্ণা যেন এতদিন সত্যই তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছে। সংবরণের মুখেও সেই তৃপ্তির সুস্মিত আভাস ফুটে ওঠে।

লতাবিতানের ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত হতে বের হয়ে অবারিত সূর্যালোকে আপ্লুত তৃণপথভূমির উপর দু'জনে দাঁড়ায়। মনে হয় সংবরণের, মনে হয় তপতীর, যেন ক্ষুদ্র এক কারাগারের গ্রাস হতে মুক্ত হয়ে এইবার সত্যই জীবনের পথে এসে দু'জনে দাঁড়াতে পেরেছে।

তরুপল্লবের অন্তরাল হতে অকস্মাৎ পিকস্বর ধ্বনিত হয়। স্মিত সলজ্জ ও মুগ্ধ দৃষ্টি তুলে সংবরণ ও তপতী পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, যেন নব পরিণয়ে প্রীতমানস এক প্রেমিক ও এক প্রেমিকা।

সংবরণ হাসেন—তুমি শাস্তি দিয়ে আমাকে ভালবেসেছ তপতী।

তপতী লজ্জিত হয়—তুমি ভালবেসে আমাকে শাস্তি দিয়েছিলে সংবরণ।

# ভাস্কর ও পৃথা

পৃথা বলে—আমার কোন বর প্রয়োজন নেই বিপ্রর্ষি। আমার আচরণে অতিথিরূপী দেবতা আপনি সুখী হয়েছেন, পিতা কুন্তীভোজও সুখী হয়েছেন, আমার বরলাভ হয়েই গিয়েছে। এর চেয়ে বড় আর কোন উপহারে প্রয়োজন নেই।

বিপ্রর্ষি দুর্বাসা বিদায় নেবার আগে সস্নেহ দৃষ্টি তুলে কুমারী পৃথার দিকে তাকিয়েছিলেন, এইবার হেসে ফেললেন—প্রয়োজন আছে পৃথা।

সত্যই বুঝে উঠতে পারে না পৃথা, তার জীবনে আর কোন বরের কি প্রয়োজন আছে? অনপত্য কুন্তীভোজের পিতৃস্নেহের এই সুখময় নীড়ের বাইরে জীবনের এমন আর কি সুখ থাকতে পারে, বুঝতে পারে না কুন্তীভোজের পালিতা কন্যা পৃথা। বুঝবার মত বয়সও হয়নি। এখন সবে কৈশোর, ঊষালোকের স্নিগ্ধতা দিয়ে রচিত এক কন্যকার মূর্তি। পরিপূর্ণ প্রভাতের যে লগ্ন আসন্ন হয়ে উঠেছে, যে লগ্নে মুদ্রিত কলিকার মত এই সুশান্ত রূপ আলোকের পিপাসায় উন্মুখ হয়ে উঠবে, তার আভাস কুমারী পৃথার অঙ্গে অঙ্গে ফুটে উঠলেও এখনও মনের মধ্যে ফুটে ওঠেনি। পিতা কুন্তীভোজের স্নেহে লালিতা ঐ লীলাচপলা মৃগললনার মত এই আলয় ও আঙিনায় ছুটোছুটির খেলা, দেবপূজা আর অতিথিসেবার খেলা, এর চেয়ে বেশি আনন্দের জীবন আর কি আছে? কুঞ্জলতিকার সাথে ক্ষণে ক্ষণে অভিমানের খেলা, সরোবরজলে বিম্বিত ছায়ার সাথে কৌতুকের খেলা, আর কবরীপুষ্পলুব্ধ দুরন্ত ভ্রমরের সাথে ভ্রূকুটির খেলা, এর চেয়ে বেশি মায়ার খেলা দিয়ে গড়া অন্য কোন জগৎ কি আছে?

ঋষি দুর্বাসা প্রীতস্বরে আবার বলেন—প্রয়োজন আছে পৃথা। আজ না হোক, কাল না হোক, কিন্তু বেশি দিন আর নেই, তোমাকে জীবনসঙ্গী বরণ করতে হবে। আশীর্বাদ করি, প্রিয়দর্শিনী পৃথা প্রিয়দর্শন সঙ্গী লাভ করুক।

মানুষের আচরণে কোন না কোন ত্রুটি দেখতে পেয়েই থাকেন দুর্বাসা। সে ত্রুটি সহ্য করতে পারেন না দুর্বাসা। অসুখী হন এবং অভিশাপ দিয়ে থাকেন। সংসারের রীতিনীতির কোন দুর্বলতাকে ক্ষমার চক্ষু দিয়ে দেখতে পারেন না দুর্বাসা, কারণ সাংসারিকতার জন্য কোন মমতাও তাঁর নেই।

কিন্তু এতদিন কুন্তীভোজের আলয়ে থেকে একটি দিনের জন্যও অসুখী বোধ করেননি ঋষি দুর্বাসা। কুমারী পৃথা অহর্নিশ অতিথি দুর্বাসার সেবা করেছে। পৃথার আচরণে কোন ত্রুটি দেখতে পাননি দুর্বাসা।

মানুষের সামান্য ত্রুটিতে ঋষি দুর্বাসা ক্ষুব্ধ হন বড় বেশি এবং তাঁর অভিশাপও হয় মাত্রাছাড়া। কিন্তু জীবনে আজ এই প্রথম প্রীত হয়েছেন দুর্বাসা, তাই পৃথাকে আশীর্বাদ করছেন। জীবনে বোধ হয় মানুষকে এই প্রথম আশীর্বাদ করলেন দুর্বাসা।

এই আশীর্বাদের অর্থ বুঝতে পারে না পৃথা। কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে পৃথা—সে প্রিয়দর্শন কোথায় আছেন ঋষি?

দুর্বাসা—তোমার মনে। মন যাকে চাইবে, তাকেই আহ্বান করো।

চলে গেলেন বিপ্রর্ষি দুর্বাসা। যাবার আগে এক কুমারী কিশোরিকার মনে কি মন্ত্র তিনি দিয়ে গেলেন, তার পরিণাম কি হতে পারে, দুর্বাসার পক্ষে কল্পনা দিয়ে অনুভব করাও সম্ভব নয়। কারণ, তিনি সংসার ও সমাজকে দূর থেকে দেখেছেন। তাঁর অভিশাপ যেমন মাত্রাছাড়া, আশীর্বাদ বা বরদানও তেমনি মাত্রাছাড়া। মন যাকে চাইবে তাকেই জীবনে আহ্বান করা, এত বড় ইচ্ছা-বিলাসের মন্ত্র পার্থিব দুর্বলতা দিয়ে রচিত মানুষের সমাজ সহ্য করতে পারে কি না, সেটুকুও বিচার করলেন না, এবং কুমারী পৃথা এই মন্ত্রের কি অর্থ বুঝল, তাও জানবার প্রয়োজন বোধ করলেন না দুর্বাসা।

বিস্মিত কুন্তীভোজ শুধু জেনে সুখী হলেন যে দুর্বাসার মত রোষপ্রবণ ঋষি প্রসন্নচিত্তে পৃথাকে আশীর্বাদ ক'রে বিদায় নিয়েছেন। পৃথা জেনে সুখী হলো, তারই কৃতিত্বের গুণে দুর্বাসা তুষ্ট হয়েছেন, পিতার সম্মান রক্ষা পেয়েছে। এই আনন্দেই পিতা কুন্তীভোজের আলয়ে লীলাচঞ্চল কুরঙ্গীর জীবনের মত কিশোরিকা পৃথারও জীবনের মুহূর্তগুলি চাঞ্চল্যে লীলায়িত হতে থাকে।

এই চঞ্চলতা ধীরে ধীরে তার নিজেরই অগোচরে কবে যৌবনভারে মন্দীভূত হয়ে এসেছে, নিজেই অনুভব করতে পারেনি পৃথা। শুধু সরোবরনীরে মৃদু-কম্পিত প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে চকিতপ্রেক্ষণা পৃথা তার মনের নিভৃতে অভিনব এক বেদনা অনুভব করে। মনে হয়, এই পৃথিবীর আলোছায়ার খেলা শুধুই খেলা নয়, যেন এক সুন্দরের অন্বেষণ। এই শিশির রৌদ্র জ্যোৎস্না, তৃণ পুষ্প লতা, কেউ যেন একা পড়ে থাকতে চায় না। জগতে যেন শব্দ বর্ণ ও সৌরভ শিহরিত ক'রে জীবনের সঙ্গী অন্বেষণের এক অহরহ খেলা চলেছে। নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে আরও বিস্মিত হয় পৃথা। মনের গভীরে যেন এক স্বপ্ন নীহারনদের মত ঘুমিয়ে ছিল, সেই স্বপ্ন আজ তার শোণিতের উত্তাপে তরলিত স্রোতের মত জেগে উঠে সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। কেন, কিসের জন্য?

জীবনে এই প্রথম ভাবনার ভার অনুভব করে পৃথা। নিজেরই নিঃশ্বাসের

শব্দে অকারণে চমকে ওঠে। নিশীথসমীরণের মৃদুলতাও উপদ্রব বলে মনে হয়, সুখতন্দ্রা ভেঙে যায়। আকাশের তারার মত রাত জাগে পৃথা। ভোর হয়।

সেদিনও ভোর হলো, তখনও নভঃপটের শেষ তারকা বিদায় নেয়নি, প্রাচী-মূলে ঊষারাগ যেন প্রথম লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে আছে। তেমনই নিজ দেহের প্রথম লজ্জায় বিব্রত পুষ্পবতী পৃথা ছায়াচ্ছন্ন নিশান্তের মুহূর্ত শেষ হবার আগেই উদ্যান-সরোবরের জলে স্নান সমাপন করে।

পূর্ব গগনের দিকে একবার নয়ন সম্পাত করতেই পৃথার মনে হয়, যেন নবোদিত দিবাকরের মত রশ্মিমান এক দিব্যকায় পুরুষপ্রবর তরুবীথিকার মধ্যে দাঁড়িয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছে। কি নয়নাভিরাম মুখচ্ছবি! তারুণ্যে মণ্ডিত এক প্রিয়দর্শন। ঐ চিবুক যেন ঊষালোকে জাগ্রত সমস্ত সংসারের চুম্বনে রঞ্জিত হয়ে রয়েছে। ওষ্ঠাধরে সমুদ্রের কামনা স্পন্দিত. নয়ন আকাশের নীলিমায় প্লাবিত।

কে ইনি? প্রশ্ন মনে জাগলেও তার পরিচয় অনুমান করতে পারে না পৃথা। এক প্রিয়দর্শন বিস্ময় যেন আজিকার প্রভাতে পৃথার হৃদয়কুটিরের সম্মুখপথে ক্ষণিকের জন্য এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আর কতক্ষণ? হয়তো এখনি চলে যাবে, এই ভূলোকের অপার রহস্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে ঐ রূপ।

মন চায় একবার কাছে ডাকি, কিন্তু লজ্জা বলে—ডেকো না। চক্ষু চায় অনেকক্ষণ দেখি, কিন্তু ভয় বলে —দেখো না। এই অদ্ভুত লজ্জা ও ভয়ের মধ্যেও যেন রহস্যময় এক মধুরতা লুকিয়ে আছে। এই লজ্জা রাখতে ইচ্ছা করে, ভাঙতেও ইচ্ছা করে।

অকস্মাৎ, যেন এক খরকিরণের স্পর্শে পৃথার নয়ন মনের সকল কুণ্ঠা দীপ্ত হয়ে ওঠে। সুগীত মন্ত্রের মত এক আশীর্বাণীর ধ্বনি যেন পৃথার অন্তরে হর্ষের কল্লোল জাগিয়ে তুলেছে। মনে পড়েছে ঋষি দুর্বাসার উপদেশ।

মন যাকে চায় তাকেই তো আহ্বান করতে হবে, এই প্রগল্ভ মুহূর্তে দুর্বাসার উপদেশ সবচেয়ে বড় সত্য বলে মনে হয় পৃথার। হোক না অপরিচিত, এই তো জীবনের প্রথম প্রিয়দর্শন, মণিদীপ্ত কুণ্ডলে আর রত্নখচিত কবচে শোভিত এক নয়নমোহন তনুধর।

যেন এক কৌতূহলের খেলার আবেগে সব ভয় ও লজ্জা সরিয়ে কুমারী পৃথা তার জীবনের প্রথম প্রিয়দর্শনের প্রতি আহ্বান জানায়।—এস।

সে আসে, সম্মুখে দাঁড়ায়, অংশুপুঞ্জে রচিত সেই যৌবনবান অপরিচিতের বদনপ্রভার দিকে বিস্ময়ভরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে পৃথা। তার পর প্রশ্ন করে—কে আপনি?

—আমি দেবসমাজের ভাস্কর। তুমি কে?

—আমি মর্ত্যের মেয়ে পৃথা, কুন্তীভোজের কন্যা।

—কাছে ডেকেছ কেন?

—ইচ্ছা হলো।

—কেন ইচ্ছা হলো?

—কাছে ডাকবার জন্য।

পৃথার কথায় ভাস্করের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ইচ্ছার অর্থ জানে না ইচ্ছার অর্থ বলতে পারে না, অথচ ইচ্ছার হাতেই আপন সত্তাকে সঁপে দিয়ে ফেলেছে নবোদ্ভিন্নযৌবনা এই মর্ত্যকুমারী। শুক্তির তৃষ্ণা যদি স্বাতীসলিলের হর্ষ নিকটে আহ্বান করে, জলকুমুদিনীর আকুলতা যদি পূর্ণ শশধরের রশ্মিধারা নিকটে আহ্বান করে, এলালতা যদি চন্দনতরুকে কাছে ডাকে, পরাগবিধুরা পদ্মিনী যদি মত্ত ভ্রমরের সান্নিধ্য আহ্বান করে, তবে তার কি পরিণাম হতে পারে, কল্পনা করতে পারেনি পৃথা। তবু আহ্বান করেছে পৃথা।

ভাস্করের স্মিতমুখের বিচ্ছুরিত মায়া অপার্থিব আলোকের মালিকার মত পৃথার চেতনার চারিদিকে এক মেখলা সৃষ্টি করে, তারই মধ্যে যেন এক রমণীয় মূর্চ্ছায় অভিভূত হয় পৃথার সব কৌতূহল আর আগ্রহ। প্রতিদিনের নিয়ম থেকে কতগুলি মুহূর্ত হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজ ও সংসারের অগোচরে এক গোপনমিলনের লগ্ন রচনা করে।

ভাস্কর বলে—চপল কিশোরিকা, তুমি কেন আমাকে কাছে ডেকেছ, তার অর্থ তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি।

মুহূর্তের জন্য সন্ত্রস্ত হয় পৃথা—আপনি এইবার চলে যান দেব ভাস্কর আমার দেখা হয়ে গিয়েছে।

—কি?

—দেখেছি আপনি প্রিয়দর্শন। মন চেয়েছিল আপনাকে কাছে ডাকি। কাছে ডেকেছি, আপনি কাছে এসেছেন, আমার কৌতূহল মিটে গিয়েছে।

—কিন্তু আমার নয়নের পিপাসা মিটে যায়নি পৃথা।

সুভীরু বাসনার শিহরের মত যেন এক অবশ ও অসহায় আপত্তির ভাষা পৃথার আবেদনে শিহরিত হয়—ক্ষমা করুন, চলে যান ভাস্কর।

—চলে যেতে পারি না প্রিয়দর্শিনী।

দক্ষিণ বাহু প্রসারিত ক'রে নিবিড় সমাদরে পৃথার চিবুক স্পর্শ করে ভাস্কর। দক্ষিণসমীর চঞ্চল হয়, পুঞ্জ পুঞ্জ লবঙ্গকেশর সৌরভ ছড়িয়ে উড়ে যায়। ক্রৌঞ্চনিনাদিত সরোবরতট অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হয়। ভাস্করের আলিঙ্গনে সমর্পিততনু কুমারী পৃথার সত্তা এক পরম স্পর্শমহোৎসবে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

ভাস্কর বিদায় নিয়ে চলে যান।

রাজা কুন্তীভোজের আলয়ে আর একটি প্রভাত বেলা। কর্ণে নবকর্ণিকার, নয়নে কৃষ্ণাঞ্জন, কালাগুরুধূপিত কেশস্তবকে কবরীচ্ছন্দ রচনা করছিল কুমারী পৃথা। পৃথাকে দেখতে পেয়ে সহাস্যমুখে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় ধাত্রেয়িকা।

পৃথা বলে—স্বপ্নের অর্থ বলতে পার ধাত্রেয়িকা?

ধাত্রেয়িকা—পারি।

পৃথা—অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছি ধাত্রেয়িকা, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারছি না।

ধাত্রেয়িকা—বল, কি স্বপ্ন দেখেছ?

পৃথা—দেখলাম, রাত্রির আকাশ থেকে প্রতিপদের চন্দ্রলেখা এসে আমার বুকের ভিতর মিলিয়ে গেল। জেগে উঠেও কেমন ভার ভার মনে হচ্ছে, যেন সে আমার বুকের ভিতরেই রয়েছে, আর প্রতিমুহূর্তে বড় হয়ে উঠছে।

ধাত্রেয়িকার হাস্যময় মুখে সংশয়ের বিষণ্ণ ছায়া পড়ে। পৃথার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আতঙ্কিতের মত চমকে ওঠে—এ কি পৃথা?

পৃথা বিরক্তিভরে বলে—কি হয়েছে?

ধাত্রেয়িকা—গোপনে কা'কে বরণ করেছ, বল?

পৃথা—দেব ভাস্করকে।

ধাত্রেয়িকা অসহায়ভাবে আক্ষেপ করে—মন্দভাগিনী কন্যা, কোন্ এক অধম প্রণয়ীর ছলনায় ভুলে নিজের সর্বনাশ ক'রে বসে আছ।

পৃথা—তাঁর নিন্দা করো না ধাত্রেয়িকা। মন যাকে চেয়েছে, তাকেই বরণ করেছি, কোন ভুল করিনি।

—এই মন্ত্র কোথায় শিখলে পৃথা?

—তোমার চেয়ে যিনি শতগুণে জ্ঞানী, তার কাছে শিখেছি।

—কে তিনি?

—বিপ্রর্ষি দুর্বাসা। তিনি আমাকে আশীর্বাদ ক'রে এই মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন।

—বড় ভয়ানক মন্ত্র পৃথা। তুমি ভুল বুঝেছ পৃথা। মানুষের সমাজ এই মন্ত্র সহ্য করতে পারে না। তুমি কুমারী অনূঢ়া অসীমন্তিনী, নিজের ইচ্ছায় অথবা গোপনে কিংবা মন যাকে চায় তাকে আত্মদান ক'রে সন্তানবতী হওয়ার অধিকার তোমার নেই।

—কেন?

—তুমি গোপনের প্রাণী নও পৃথা, তুমি সমাজের মেয়ে। তোমার জন্ম-মুহূর্তে শঙ্খধ্বনি হয়েছে, সংসারকে সাক্ষী করবার জন্য। তুমি প্রথম অন্ন গ্রহণ

করেছ মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে, সংসারকে সাক্ষী রেখে। সকলের সাক্ষ্যে, সবাকার স্নেহ ও আশীর্বাদের স্বীকৃতিরূপে তুমি বড় হয়ে উঠেছ। তোমার ভাল-লাগা ভাল-বাসা ও প্রিয়-সহবাস, সবই যে সংসারের আশীর্বাদ নিয়ে সার্থক করতে হবে, সংসারকে গোপন ক'রে নয় পৃথা।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে ধাত্রেয়িকা, তারপর শোকার্তের মত ক্রন্দনের সুরে বলে—কিন্তু এ কি ভয়ংকর ভুল করেছ পৃথা। সে আশীর্বাদের অপেক্ষা না ক'রে স্বেচ্ছায় ও গোপনে নির্বোধের মত এক খেলার আবেগে তোমার কুমারী জীবনের সম্মান, পিতার সম্মান, নিজ সমাজের সম্মান নাশ ক'রে দিলে!

পৃথা—এত ধিক্কার দিও না ধাত্রেয়িকা। আমার ভালবাসার সত্যকেও অসম্মান করবার অধিকার কারও নেই। তবে আমি যখন তোমাদের ঘরের মেয়ে, তখন তোমাদের ঘরের সম্মান একটুও মলিন হতে দেব না।

ধাত্রেয়িকা রূঢ় অথচ বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে—কি ক'রে?

পৃথা—আমার গোপন প্রণয়ের পরিণাম আমিই গোপনে ভাসিয়ে দেব।

ধাত্রেয়িকা—কি বললে পৃথা?

পৃথা—কুমারীর কোলে আসুক না সেই সন্তান, তার জন্য আমার মনে কোন উদ্বেগ নেই ধাত্রেয়িকা। কেউ জানতে পারবে না তার পরিচয়।

ধাত্রেয়িকা—কেমন ক'রে?

পৃথা—তাকে শুধু পরিচয়হীন ক'রে এই পৃথিবীর কোলে ছেড়ে দেব। এই পৃথিবীর কোন না কোন ঘরে নতুন পরিচয় নিয়ে সে বেঁচে থাকবে। তার জন্য আমার এতটুকু দুঃখ হবে না ধাত্রেয়িকা।

ধাত্রেয়িকা ভ্রূকুটি ক'রে ওঠে—সে কাজ কি এতই সহজ পৃথা? তা'ও কি গোপন প্রণয়ের মত একটা খেলা?

ধাত্রেয়িকা আর কিছু বলতে পারে না। পৃথাও কোন উত্তর দেয় না। হয়তো খেলাই মনে করে পৃথা। প্রিয়সঙ্গীর সাথে খেলার আনন্দে বনতলে কুড়িয়ে পাওয়া একটি ফুলের কুঁড়িকে শুধু ইচ্ছা ক'রে হারিয়ে ফেলতে হবে। এর চেয়ে বেশি কঠিন কিছু নয়। এর চেয়ে বেশি দুঃখের কিছু নয়। ধাত্রেয়িকার এত বড় ভ্রূকুটির কোন অর্থ হয় না।

রাত্রিশেষের অন্ধকার। শুকতারার আলোক। কুন্তীভোজের প্রাসাদ হতে বহু দূর। নদীর কিনারায় জলপদ্মের বন। জলের উপর ক্ষুদ্র একটি নৌকা। নৌকার ভিতরে অনাবৃত একটি পেটিকা। পেটিকার মধ্যে ঘুমন্ত কুসুমকোরকের মত সদ্যোজাত এক শিশুর ঘুমন্ত মুখের কাছে মুখ নামিয়ে দেখতে থাকে

পৃথা। একটি ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দ শোনা যায়, ক্ষুদ্র ছন্দে স্পন্দিত ছোট ছোট শ্বাসবায়ুর মৃদু উত্তাপ পৃথার মুখে এসে লাগে।

নদীর তরঙ্গস্রোতে কলরোল জাগে। তটরজ্জু ছিন্ন ক'রে এই মুহূর্তে এই নৌকা ভাসিয়ে দিতে হবে। রজ্জু ছিন্ন করবার জন্য হাত তোলে ধাত্রেয়িকা। আর্তনাদ ক'রে ধাত্রেয়িকার হাত চেপে ধরে পৃথা। ধাত্রেয়িকা ভ্রূকুটি করে—এ কি?

পৃথা—এ কি সর্বনাশ করছ ধাত্রেয়িকা!

ধাত্রেয়িকার মুখে শ্লেষাক্ত হাসির রেখা ফুটে ওঠে।—তোমার গোপন প্রেমের পরিণাম গোপনে ভাসিয়ে দিচ্ছি, এর জন্য আবার আর্তনাদ কেন পৃথা?

ধাত্রেয়িকার হাত আরও কঠিন আগ্রহে চেপে ধ'রে রাখে পৃথা, নইলে তার বক্ষঃপঞ্জর যেন বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

করুণ হয়ে ওঠে ধাত্রেয়িকার মুখ। সান্ত্বনার স্বরে বলে—দুঃখ করো না পৃথা, তোমার গোপনের কলঙ্ক এইভাবে গোপনে ভাসিয়ে না দিয়ে তো উপায় নেই।

কলঙ্ক? পৃথার যৌবনের শোণিতে প্রথম মধুরতার পুলকে স্ফুটিত করুণার এক রক্তকমল, যার স্পর্শে পীযূষধন্য হয়েছে পৃথার কুমারীদেহ, সে কি আজ এইভাবে ভেসে চলে যাবে লক্ষ্যহীন ভবিষ্যতে, এই অন্ধকারে, তরঙ্গের ক্রীড়নকের মত দূর হতে দূরান্তরে? এই তো জীবনের প্রথম প্রিয়দর্শন, মন যাকে কাছে চায় সে তো এই, যাকে বিদায় দিতে পৃথার ইহকালের সমস্ত অদৃষ্ট কেঁদে উঠেছে।

পৃথা বলে—কলঙ্ক বলো না ধাত্রেয়িকা, ও আমার সন্তান।

দুর্দম ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস রোধ করে পৃথা। কিন্তু রোধ করতে পারে না দুর্বার এক স্পৃহা। দুর্বহ বেদনারসভারে বিহ্বল বক্ষের কলিকা নিদ্রিত শিশুর স্পন্দিত অধরে অর্পণ করবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে পৃথা। বাধা দেয় ধাত্রেয়িকা। না, কাছে যেও না পৃথা। শান্ত হও পৃথা।

শান্ত হয় পৃথা।

ধাত্রেয়িকার চক্ষু বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে। দেখতে পেয়েছে, আর দেখে বিস্মিত হয়েছে ধাত্রেয়িকা, এতদিনে যেন পৃথা তার নারীজীবনের ইচ্ছার অর্থটুকু বুঝতে পেরেছে। প্রগল্‌ভা কৌতুকিনী নয়, আজ নিশান্তের অন্ধকারে বসে আছে এক মমতার মাতৃকা, যার শূন্যবক্ষের যাতনা অশ্রুস্রোত হয়ে জলপদ্মের বনে ঝরে পড়ছে।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকে পৃথা। তারপর যেন উৎকর্ণ হয়ে দূরান্তের জলরোলের মূর্চ্ছনা শুনতে থাকে।

—শুনতে পাচ্ছ ধাত্রেয়িকা?

পৃথার প্রশ্নে ধাত্রেয়িকা বিস্মিত হয়—কি পৃথা?

পৃথা—নূপুরের শব্দ। এই পৃথিবীর কোন মানুষের ঘরের আঙিনায় ক্রীড়াচঞ্চল এক শিশুর ছুটাছুটি, তার পায়ের ছোট ছোট নূপুরের ঝংকারে সে আঙিনার বাতাস মধুর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে তো আমার ঘরের আঙিনা নয়।

ধাত্রেয়িকা উত্তর দেয় না।

দূরান্তের ঘন অন্ধকারের দিকে স্থিরদৃষ্টি তুলে কি-যেন দেখতে থাকে পৃথা। ধাত্রেয়িকা বলে—অমন ক'রে কি দেখছ পৃথা?

পৃথা—দেখছি, এই পৃথিবীর কোন গৃহে, প্রাসাদে কিংবা কুটীরে, এক নারীর কোলে পরিচয়হীন এক শিশু বড় হয়ে উঠছে, দু'হাতে গলা জড়িয়ে তাকে মা বলে ডাকছে। সে মা কিন্তু আমি নই ধাত্রেয়িকা।

পৃথার মুখের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে ব্যথিতা ধাত্রেয়িকার দুই বাষ্পায়িত চক্ষু।

হঠাৎ চমকে ওঠে পৃথা। ধাত্রেয়িকা ভয়ার্ত স্বরে বলে—কি হলো পৃথা

পৃথা—উৎসবের শঙ্খ বাজছে ধাত্রেয়িকা। এখান থেকে বহু দূরে, বহু বৎসর পরে, এই রাত্রি যেন ভোর হয়ে গিয়েছে। সুন্দরতনু এক যুবক বরবেশে চন্দ্রমুখী বধূ সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলকলসে সজ্জিত এক ভবনের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে। ধান্যদূর্বা হাতে নিয়ে এক মাতা এসে বরবধূকে আশীর্বাদ করছে। পুত্র নত হয়ে মাতার পদধূলি নিয়ে শিরে ধারণ করছে। সুন্দর হাস্যে প্রসন্ন হয়ে উঠেছে মাতার আনন। সে মাতা কিন্তু আমি নই ধাত্রেয়িকা।

পৃথার সজল দৃষ্টি কিছুক্ষণের মত যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মনে হয়। ধাত্রেয়িকা অনুযোগের সুরে বলে—এখনও দূরের দিকে তাকিয়ে বৃথা আর কি দেখছ পৃথা?

পৃথা বলে—দেখছি ধাত্রেয়িকা, দীপাবলীর শোভা জেগেছে এক নগরে। উৎসবের হর্ষে আকুল পথজনতার মাঝখান দিয়ে কে আসছে দেখ ধাত্রেয়িকা। তেজোদৃপ্ত এক শত্রুঞ্জয় বীর রণযাত্রা সমাপ্ত ক'রে ঘরে ফিরে আসছে। পুত্র-গর্বে গরীয়সী মাতা এসে সেই বীর পুত্রের ললাটে জয়তিলক এঁকে দিলেন। সে বীরমাতা কিন্তু আমি নই ধাত্রেয়িকা।

চুপ করে পৃথা। নিস্তব্ধ অন্ধকারের বাতাস হঠাৎ বীতনিদ্র বিহগের রবে যেন সাড়া দিয়ে শিউরে ওঠে। ধাত্রেয়িকা ব্যস্তভাবে বলে—ভোর হয়ে এল পৃথা।

ধাত্রেয়িকার হাত ছেড়ে দিয়ে পৃথা নিজেরই দুই চক্ষু দুই হাতে আবৃত করে। নৌকার রজ্জু ছিন্ন করে ধাত্রেয়িকা। এক পরিচয়হীন শিশুর জীবন-স্পন্দন বহন ক'রে একটি তরণী নিশান্তের নদীস্রোতে দূরান্তরে চলে যায়।

ধাত্রেয়িকার ছায়া অনুসরণ ক'রে অবসন্ন দেহ নিয়ে ধীরে ধীরে রাজ-প্রাসাদের দিকে ফিরে যেতে থাকে পৃথা। পূর্ব দিগন্তে তখন নবারুণের উদয়চ্ছটা নয়নহরণ শোভা ছড়িয়ে দিয়েছে। পৃথা মুহূর্তের মত সেদিকে একবার শুধু তাকিয়ে যেন অভিমানভরে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এই তো সেই ভয়ংকর ভুলের সুন্দর লগ্ন, যে লগ্নে মন যাকে চায় তাকেই গোপনে কাছে ডেকেছিল পৃথা। তারই পরিণাম এই নিঃশব্দ ক্রন্দনের ভাব, চিরজীবন গোপনে বহন ক'রে ফিরতে হবে, অতি সাবধানে, যেন কেউ শুনতে না পায়।

পৃথা বলে—বুঝতে পেরেছি ধাত্রেয়িকা।

ধাত্রেয়িকা—কি?

পৃথা—ঋষি দুর্বাসা আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

---

# অগ্নি ও স্বাহা

সপ্তর্ষির আলয় থেকে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ এসেছে আশ্রমকুটিরের দ্বার বন্ধ ক'রে অগ্নি যাত্রা করলেন।

নবোষার আলোক মাত্র স্ফুরিত হয়েছে, রক্তাধরা পূর্বদিগ্‌বধূর রাগময় চুম্বনে গগনকপোল রঞ্জিত হয়েছে। সেই প্রথমজাগ্রত প্রহরের স্নিগ্ধতার মধ্যে মনের আনন্দে একাকী পথ ধ'রে চলেছিলেন অগ্নি। শ্যাম বনভূমিব উপান্ত পার হযে এক স্রোতস্বতীর কাছে এসে থামলেন। গন্ধপাষাণেব উপর দিয়ে ক্ষুদ্র জলধারা সলজ্জকলহর্ষে পুন্নাগকেশরের পুঞ্জ পুঞ্জ উপহার ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। এই জলধাবার ওপারেই চৈত্ররথ কানন, তারপর শিলাজতু ও স্ফটিকে আকীর্ণ এক কৃষ্ণশৈলস্থলী, তারই শীর্ষে নভঃপুরীব মত সপ্তর্ষির আলয়।

স্রোতস্বতীর কাছে দাঁড়িয়ে দূর সপ্তর্ষিভবনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন অগ্নি। কিন্তু নিকটেই বনচ্ছাযার সঙ্গে যে মেঘবর্ণ প্রস্তরে রচিত একটি ভবনের শান্ত প্রতিচ্ছবি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার কথা একবারও মনে পড়ে না।

কিন্তু সবই জানেন অগ্নি। এই মেঘবর্ণ ভবনের অভ্যন্তরে মণিময় দীপিকার মত রূপরম্যা কুমারী তরুণীর হৃদয় অনুরাগের আলোকে ভ'রে রয়েছে, কিসের জন্য এবং কা'র জন্য? এই পথেই তো কতবার এসে দেখা দিয়ে গিয়েছে সেই নারী। পদ্মপত্রে লেখা তার লিপিকা এই পথেই কতবার কুড়িয়ে পেয়েছেন অগ্নি। মঞ্জু তৃণে আস্তীর্ণ এই সুকোমল পথতলে কতবার এসে অগ্নির পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে সে, তার আবেদন অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে কতবার। অগ্নিকে ভালবেসেছে ঐ মেঘবর্ণ দক্ষভবনের মেয়ে স্বাহা।

কিন্তু ভালবাসতে পারেননি অগ্নি। স্বাহা যেন অগ্নির অবাধ আগ্রহের জীবনকে স্তব্ধ ক'রে দিতে চায়। অগ্নির জীবনকে এই বৃহৎ জগতের সহস্র আনন্দের বৈচিত্র্য থেকে বঞ্চিত ক'রে যেন ঊর্ণতন্তু দিয়ে পরিবৃত একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে বন্দী ক'রে রাখতে চায় স্বাহা, অগ্নি তাই মনে করেন। স্বাহার আহ্বানকে শুধু পিছনের আহ্বানের মত একটা বাধা বলেই মনে হয়েছে অগ্নির। তাই আজ এত নিকটে দাঁড়িয়েও মেঘবর্ণ ভবনেব দিকে একবার চোখ তুলে তাকাতেও ভুলে যান অগ্নি।

সেই প্রভাতী নীরবতার মধ্যে গন্ধপাষাণের উপর প্রবাহিত ক্ষুদ্র জলধারা পার হবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলেন অগ্নি. কিন্তু হঠাৎ চমকে ওঠেন আর উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কা'র মৃদুসঞ্চারিত পদধ্বনির ছন্দে তৃণময় পথতল যেন স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। তারপরেই দেখলেন অগ্নি, চৈত্ররথ কাননের মৃগ নয়, মেঘবর্ণ ভবনের অন্তর্লোক থেকে সেই মৃগনয়নী যেন এক দুঃস্বপ্ন দেখে হঠাৎ জাগ্রত হয়ে এই পথে ছুটে চলে এসেছে। অপ্রসন্ন হয়ে তাকিয়ে থাকেন অগ্নি। দক্ষের কন্যা স্বাহা এসে অগ্নির পথরোধ ক'রে দাঁড়ায়।

কুমারী স্বাহার কপালের উপর একটি কস্তুরীতিলক, শেষরাত্রির তারকার মত শয়নঘোরে যেন অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে. কিন্তু একেবারে মুছে যায়নি। এছাড়া আর কোন প্রসাধন ও আভরণ নেই স্বাহার। যেন বলতে চায় স্বাহা. ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা পেল না যে, তার আর প্রসাধনের প্রয়োজন কি? তারও অন্তর যে বৈধব্যেরই মত এক আঘাতের বেদনায় ভরে আছে। মিথ্যা তার কনককেয়ূর, বৃথা তার মঞ্জুমঞ্জীর আর ক্বণৎকাঞ্চীদাম।

এই পথেরই. এক পত্রচ্ছদ তরুতলে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার কতগুলি ব্যাকুল মুহূর্তের মধ্যে একদিন এই সত্য বুঝেছিল স্বাহা, অগ্নিকে সে ভালবেসে ফেলেছে। সেই অনুরাগের প্রতীক এই কস্তুরীতিলক। জীবনের প্রথম প্রেমবিচলিত কামনার স্মৃতিচিহ্ন এই কস্তুরীতিলক। আশ্রমচারী ঐ সুন্দর পাবকের কাছে সেই দিন দক্ষদুহিতা স্বাহা তার জীবন ও যৌবনের আশা নিজমুখেই নিবেদন করেছিল।

তারপর এক সায়াহ্নে এই পথ থেকেই ব্যর্থ আবেদনের বেদনা নিয়ে ফিরে গিয়েছিল স্বাহা। জেনে গিয়েছিল স্বাহা, অগ্নি তাকে ভালবাসে না। বুঝেছিল স্বাহা, তার সীমন্তের শূন্য সরণি কোনদিন সিন্দূর-বিন্দুর রক্তিমায় শোভিত হবে না। তবে আর কাজ কি এই কেয়ূরে মঞ্জীরে ও কাঞ্চীদামে?

তবু আজও আবার ছুটে এসেছে স্বাহা। বৈধব্যের চেয়ে বোধহয় ভালবাসার অপমানে বেশি জ্বালা আছে। প্রেমিকের মৃত্যুর চেয়ে বুঝি বেশি দুঃসহ প্রেমের মৃত্যু, প্রেমিকার কাছে!

স্বাহা বলে—এমন ক'রেই কি চলে যেতে হয়?

স্বাহার প্রশ্নের উত্তর দেন না অগ্নি। শুধু বিস্মিত হয়ে স্বাহার এই নিরাভরণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকেন, যেন স্বেচ্ছায় বনবাসব্রত গ্রহণ ক'রে প্রাসাদবাসিনী এই রূপমতী কুমারী অকারণে তপস্বিনীর মূর্তি ধরেছে।

অগ্নি প্রশ্ন করেন—এ তোমার কি বেশ স্বাহা?

স্বাহা—এই তো আমার যোগ্য বেশ।

অগ্নি—কেন?

স্বাহা—বুঝতে পারেন না?

অগ্নি—না। রাজপ্রাসাদের কুমারী কেন এত প্রসাধনবিহীনা ও এত নিরাভরণা হয়ে রয়েছে, বুঝতে পারি না।

স্বাহা—ব্যর্থ অনুরাগের জ্বালা অঙ্গরাগের প্রলেপে শান্ত হয় না অগ্নি। যার জীবনের নয়নানন্দ এমন ক'রে চক্ষুর নিকটপথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, তার নয়নে কৃষ্ণাঞ্জন শোভা পায় না। যার কণ্ঠে প্রিয়তমজনের বরমাল্য শোভা পেল না, মণিহার তার গলায় সাজে না।

অগ্নি বিচলিত হন না। বরং প্রতিবাদ ক'রেই বলেন- এ তোমারই ভুল স্বাহা।

স্বাহা—কিসের ভুল?

অগ্নি—আমাকে ভালবাস কেন? যে রাজকুমারী ইচ্ছা করলেই ত্রিভুবনের যে-কোন রত্নবান ও রূপবানের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করতে পাবে ..।

হেসে ফেলে স্বাহা—সে ইচ্ছাই যে হয় না অগ্নি।

অগ্নি—কেন?

স্বাহা—মনে হয়, ভালবাসা মধুপের ফুলবিলাস নয়। এক হতে অন্য জন, নিত্য নব অভিসার আর বল্লভসন্ধান নারীর প্রেমের রীতি নয়, নারীর ধর্মও নয়।

ঈষৎ ভ্রূকুটি করেন অগ্নি—নারীর ধর্ম কি?

স্বাহা—একপুরুষপ্রীতি।

অপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন অগ্নি। কি হিংস্র এক ধর্মতত্ত্বের কথা এত শান্তভাবে বলে চলেছে স্বাহা! এক পুরুষের জীবনকে চিরকাল কারাগারের পাষাণ-প্রাচীরের মত চারিদিক থেকে শুধু রুদ্ধ ক'রে রাখতে চায় যে ক্ষুদ্র সংকল্প, তারই নাম নারীর প্রেম আর নারীর ধর্ম।

অগ্নি বলেন—অতি অর্থহীন ও অতি অসুন্দর এই নারীর ধর্ম।

স্বাহা বলে—শুধু নারীর ধর্ম কেন পুরুষের ধর্মও যে তাই অগ্নি।

অগ্নি বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করেন—কি?

স্বাহা—একনারীপ্রীতি।

অগ্নি—এই ধর্মতত্ত্ব তুমিই স্মরণ ক'রে রাখ স্বাহা। আমাকে বুঝতে বলো না।

স্বাহা—কেন অগ্নি?

অগ্নি—জীবনে কোন নারীকে ভালবাসবার প্রয়োজন আমার নেই।

স্বাহা—তা'ও যে পুরুষধর্ম নয় অগ্নি।

অগ্নি উষ্মা বোধ করেন—আমার ধর্ম আমি জানি।

স্বাহা—আপনার ধর্ম কি স্বতন্ত্র?

অগ্নি—হ্যাঁ।

চুপ ক'রে থাকে স্বাহা, হয়তো তাই সত্য। ভাস্বরতনু এই পাবকের ক্ষুধা তৃষ্ণা ও আনন্দ হয়তো সাধারণের মত নয়। তাই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে স্বাহার আহ্বান। অন্তরে যার অনলশিখার আকুলতা, মণিময় দীপিকার প্রেম তার কাছে ক্ষীণদ্যুতি বলে মনে হবে বৈকি। দাহিকার জ্বালা পান করবার জন্য যার নয়নে খরতৃষ্ণা স্ফুরিত হয়, প্রেমিকা স্বাহার কম্রনয়নশ্রী তার কাছে মূল্যহীন বলেই তো মনে হবে। বক্ষে যার বেদনা নেই, তার কাছে আবেদনের কি কোন অর্থ আছে?

অগ্নি বলেন—আমি যাই।

স্বাহা—কোথায়?

অগ্নি—সপ্তর্ষিভবনে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ আছে।

স্বাহা যেন চমকে ওঠে, বেদনার্তস্বরে অনুরোধ করে—যাবেন না অগ্নি।

অগ্নি—কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না স্বাহা, কারণ স্বাহা নিজেই বুঝতে পারে না, কেন চমকে উঠেছে তার মন কেন শঙ্কিত হয়েছে তার কল্পনা। মনে হয়, অনলশিখার আকুলতা অন্তরে বহন ক'রে অগ্নি যেন চিরকালের মত স্বাহার প্রেমের জগৎ হতে দূরে চলে যাচ্ছেন, আর ফিরবেন না। কিন্তু এই শঙ্কার অর্থও স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারে না স্বাহা।

যুক্তিবুদ্ধিহীনা বিমূঢ়ার মত শুধু অসহায় অশ্রু আরও সজল এবং শঙ্কাকুল স্বর আরও ব্যাকুল ক'রে স্বাহা বলে—যাবেন না অগ্নি। জানি না কেন শুধু মনে হয়, বিপন্ন হবে আপনার..।

ক্ষুব্ধ হয় অগ্নির কণ্ঠস্বর—কি বিপন্ন হবে? আমার প্রাণ?

স্বাহা—না।

অগ্নি—তবে কি?

বলতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বলতে পারে না স্বাহা।

কিন্তু স্বাহার উত্তর শুনবার জন্য আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করেন না অগ্নি। চতুরা দক্ষদুহিতা স্বাহা যেন এক কপট ভয় নয়নে চমকিত ক'রে অগ্নির এই শুভযাত্রার আনন্দকে শঙ্কিত করতে চায়। অপাঙ্গে স্বাহার মুখের

দিকে তাকিয়ে এবং নীরব ধিক্কার নিক্ষেপ ক'রে চলে যান অগ্নি। ক্ষুদ্র জলধারা পার হয়ে চৈত্ররথ কাননের পথে অদৃশ্য হয়ে যান।

সপ্তঋষির সমাদরে, সপ্ত ঋষিপত্নীর অভ্যর্থনায়, এবং যজ্ঞে ও উৎসবে অগ্নির জীবনের কয়েকটি দিন হর্ষায়িত হয়েই যেন হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। এইবার তাঁকে চলে যেতে হবে। কিন্তু বুঝতে পারেন অগ্নি চলে যেতে মন চাইছে না।

সপ্তর্ষিভবনের যজ্ঞশালায় ধূমসৌরভ আর ছিল না, উৎসবের প্রদীপও নিভে গিয়েছে। কোন কাজ নেই, উদ্দেশ্য নেই, তবু সপ্তর্ষিভবনেই কালযাপন করেন অগ্নি।

জীবনে এই প্রথম বেদনা বোধ করেছেন অগ্নি। এই প্রথম অনুভব করেছেন, সপ্তর্ষিভবনের কিসের এক মায়া তাঁকে যেন পিছন থেকে ডাকছে আর ধ'রে রাখছে। তাই চলে যেতে পারছেন না অগ্নি। চিরজীবন এই ভবনের অন্তর্লোক সন্ধান ক'রে সেই মায়ার রহস্যকে উদ্ধার করতে ইচ্ছা করেন অগ্নি।

কিন্তু সে যে নিতান্ত অনধিকার, অতিথি অগ্নির পক্ষে আর এক মুহূর্তও সপ্তর্ষিভবনে থাকবার কোন প্রয়োজন নেই। বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে গিয়েছেন সপ্তঋষি—মরীচি ও অত্রি, অঙ্গিরা ও পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু, এবং বশিষ্ঠ। বিদায়-প্রণাম নিবেদন ক'রে গিয়েছে সপ্ত ঋষিপত্নী—সম্ভূতি ও অনসূয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতি, গতি ও সন্নীতি, এবং অরুন্ধতী। তবে সপ্তসহচরীসেবিত সপ্তঋষির এই নভঃপুরীর অভ্যন্তরে, চন্দ্রতারায় অবকীর্ণ স্নিগ্ধ আলোকের এই সংসারে কিসের আশায় পড়ে থাকতে চান অগ্নি?

নিজেকে প্রশ্ন ক'রেও কোন উত্তর পেলেন না অগ্নি। অশান্ত মনের তাড়না থেকে যেন পালিয়ে যাবার জন্য দ্রুতপদে সপ্তর্ষিভবনের আঙ্গিনা পার হয়ে চলে যান। নিস্তব্ধ যজ্ঞশালার দ্বারপ্রান্তে এসে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। পরমুহূর্তে যেন এক স্বপ্নলোক থেকে উৎসারিত কলহাস্যের শব্দ শুনে চমকে ওঠেন।

যজ্ঞশালার পার্শ্বে এক লতাগৃহের অভ্যন্তরে বসে মাল্য রচনা করছিল সপ্ত ঋষিপত্নী। নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন অগ্নি, এবং এতক্ষণে বুঝতে পারেন, এই স্বপ্নলোকেরই রূপামৃত পান করবার জন্য অন্তরের অনল তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে। যৌবনবতী সাতটি লীলায়িত অঙ্গশোভা। সাতটি শিথিল নিচোল, সাতটি বিগলিত বেণী ও চঞ্চল সমীরকৌতুকে উদ্বেলিত সাতটি অংশুক বসন। সপ্ততন্বীর হাস্যশিহরিত দেহ যেন সাতটি শিখা, যার

বিচ্ছুরিত প্রভা প্রবল দাহিকা হয়ে অগ্নির ধমনীধারায় সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে। সেই বেদনায় অস্থির হয়ে যজ্ঞশালার দ্বারপ্রান্ত হতে ছুটে চলে যান অগ্নি।

চৈত্ররথ কাননের অভ্যন্তরে এক অনলের তৃষ্ণা ঘুরে বেড়ায়। আশ্রমে ফিরে যেতে পারেননি অগ্নি। ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না।

কল্পনায় দেখতে পান অগ্নি, দূর নভঃপুরীর অঙ্গনে এক লতাগৃহের নিভৃতে সাতটি রূপশিখাময়ী দাহিকা। যেন সপ্ত ঋষিপত্নীর তনুচ্ছবি ধ্যান করার জন্য চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে নিজেকে নির্বাসিত ক'রে রেখেছেন অগ্নি। এক অসম্ভবের আশায়, অপ্রাপ্যের তপস্যায়, অনন্ত প্রতীক্ষার সংকল্প নিয়ে বসে থাকবেন অগ্নি। এই প্রতীক্ষায় যদি জীবন ফুরিয়ে যায়, ক্ষতি কি?

কি ক্ষতি, কেমন ক'রে বুঝবেন অগ্নি? কি ক্ষতি, সে বুঝবে কি ক'রে, স্নিগ্ধদ্যুতি স্বাহার আহ্বানকে জীবনের বাধা বলে মনে করেছে যে? বুঝবার মত হৃদয় কোথায় তার, সপ্তঋষিবধূকে অভিসারিকারূপে দেখবার আশায় চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে যার আকাঙ্ক্ষা এক ভয়ংকর প্রতীক্ষার তপস্যায় বসে আছে? নারীকে প্রেমিকারূপে নয়, শুধু দাহিকারূপে লাভ করবার জন্য যে পুরুষের তৃষ্ণা আকুল হয়ে রয়েছে, সে বুঝবে কি ক'রে, ক্ষতি কোথায়?

জীবনে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়ে গিয়েছে যার, দক্ষদুহিতা সেই স্বাহাই একদিন শুনতে পায় সংবাদ, চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে নিজেকে নির্বাসিত ক'রে রেখেছেন অগ্নি। দূর নভঃপুরীর দিকে তাকিয়ে এক ভয়ংকর প্রতীক্ষার তপস্যায় সেই সুন্দর পাবকের দিনযামিনীর মুহূর্তগুলি দুঃসহ এক দহন-লালসার জ্বালা সহ্য ক'রে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারে স্বাহা, তার সেই আশঙ্কাই এতদিনে সত্য হয়েছে। দক্ষের মেঘবর্ণ ভবনের নিভৃতে কুমারী স্বাহার মন বেদনায় ভেঙে পড়ে।

পুরুষধর্ম বোঝে না, নারীর প্রেমের রীতিও বোঝে না, এমন মানুষের জীবনে বনবাসের অভিশাপ লাগবে, তা'তে আর আশ্চর্য কি? মমতায় অসাধারণ নয়, প্রীতিতে অসাধারণ নয়, শুধু অনলভরা ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও কামনায় অসাধারণ, এমন মানুষকে সাধারণের সংসার সহ্য করতে পারে না, কোনদিন পারবেও না। এই সত্য উপলব্ধি করবার মত হৃদয় নেই অগ্নির।

অনুরাগিণী স্বাহার কস্তুরীতিলক যার কাছে কোন সম্মান পেল না, একনিষ্ঠার সুন্দর আবেদনকে লাঞ্ছিত ক'রে যে চলে গিয়েছে, তার জীবনের মূঢ়তা আজ বহুলিপ্সার অভিশাপরূপে চরম হয়েই দেখা দিয়েছে। এই

পৌরুষ পৌরুষ নয়, এই পরদারকামনা কামনা নয়, এই প্রতীক্ষা প্রণয়ীর প্রতীক্ষা নয়, এ শুধু নিজের অনলে নিজেকে ভস্মীভূত করা। আত্মহত্যারই মত ভয়ানক এই আয়োজন থেকে অগ্নিকে কে নিবৃত্ত করতে পারে?

কেউ নয়, অগ্নিকে এই অভিশপ্ত নির্বাসন থেকে উদ্ধার করবার জন্য এই পৃথিবীর কোন হৃদয়ে কোন উদ্বেগ কৌতূহল ও আগ্রহ নেই, শুধু একটি হৃদয় ছাড়া। সেই হৃদয় আজ থেকে থেকে এক মেঘবর্ণ ভবনের নিভৃতে বেদনায় ভেঙে পড়ে, অসিতনয়নশোভা অশ্রুসজল মেদুরতায় ভরে ওঠে। এই ক্ষতি শুধু স্বাহারই ক্ষতি, আর কারও নয়। এতদিনে যেন প্রেমিকা স্বাহার জীবনে সত্যই এক বৈধব্যের রিক্ততা চরম হতে চলেছে।

কে উদ্ধার করবে অগ্নিকে? সুন্দর পাবকের জীবনের শুচিতাকে এই ভয়ানক কলুষের আক্রমণ থেকে কেমন ক'রে রক্ষা করা যায়? এই প্রশ্ন যেন স্বাহার ভাবনার অন্ধকারে রুদ্ধ স্বপ্নের মত সারাক্ষণ বেদনা সহ্য করতে থাকে।

শক্তি নেই স্বাহার। নিজেরই এই দুর্বলতাকে ক্ষমা করতে পারে না স্বাহা। প্রার্থনা করে স্বাহা—ক্ষমা কর অদৃষ্টের দেবতা, শক্তি দাও হে সকলকালপুরুষ। হরণ কর সকল ভয়, হে ভয়হরণ! কর নিঃসঙ্কোচ, কর নির্লজ্জ, প্রেমিকা স্বাহার জীবনে পরম দুঃসাহসের অভিসার এনে দাও। চৈত্ররথ কাননের কারাগার থেকে সকল অভিশাপের প্রাচীর চূর্ণ ক'রে স্বাহার জীবনবাঞ্ছিতকে উদ্ধার ক'রে আনতে চাই, সেই উদ্ধারের মন্ত্রটুকু বলে দাও এই প্রণয়ভীরু কুমারী স্বাহার কানে কানে, হে পরম দৈব!

প্রতি মুহূর্তে স্বাহার অন্তরে এই আকুল প্রার্থনা যেন নীরবে ধ্বনিত হতে থাকে। সেই অসহায় ভ্রান্তকে উদ্ধার করতে হবে, সংকল্পে অটল হয়ে ওঠে স্বাহার মন। কিন্তু মনের নিকটে কোন উপায় খুঁজে পায় না। মেঘবর্ণ ভবনের চূড়ায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনতর হয়ে দেখা দেয়।

নিজেরই মনের পথহীন অন্ধকারের মত বাহিরের ঐ চরাচরব্যাপ্ত অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে স্বাহা। তার জীবনের স্নিগ্ধজ্যোতি প্রেম যেন এই বিরাট অন্ধকারের করাল নিঃশ্বাসের আঘাতে চিরকালের মত নিভে যেতে চলেছে। প্রেমিকা হয়ে যে সুন্দর পাবককে ভালবেসেছে স্বাহা, পতিরূপে যাকে পেয়ে জীবন ধন্য করতে চেয়েছে স্বাহা, তাকে উদ্ধার ক'রে আনবার মত শক্তি নেই স্বাহার। এই ভীরু প্রেমের দুর্বলতাকে ধিক্কার দেয় স্বাহা।

হঠাৎ জ্বালাময় আলোকের মত অদ্ভুত এক রক্তিম আভায় ভরে ওঠে স্বাহার মুখ। ঐ অন্ধকারের সমুদ্রে বহুদূরে যেন এক বড়বানলের দ্যুতি জ্বলছে, স্বাহার মুখের উপর তারই প্রতিচ্ছায়া পড়েছে।

নিষ্পলক নয়নে দেখতে থাকে স্বাহা দূর বনগিরিশিরে এক দাবানলের জ্বালালীলা জেগেছে। কোন এক প্রেমিকার ব্যর্থ আবেদনের বেদনা যেন দাহিকা হয়ে আর সকল লজ্জা ভয় ও বাধা পুড়িয়ে দিয়ে প্রেমিকের বক্ষের কাছে যাবার জন্য জগতের এই অন্ধকারে পথ সন্ধান ক'রে ফিরছে।

দক্ষতনয়ার দ্যুতিময় দুটি চক্ষু আরও প্রখর হয়ে জ্বলতে থাকে। যেন উপায় দেখতে পেয়েছে স্বাহা। ব্যস্ত হয় স্বাহা। প্রস্তুত হয় স্বাহা।

সফল হয়েছে অনলের জ্বালাময় তৃষ্ণার প্রতীক্ষা। চৈত্ররথ কাননের পথে দাহিকার অভিসার শুরু হয়েছে। যেন সত্যই অগ্নির কামনাময় স্বপ্নের কথা শুনতে পেয়ে সপ্তর্ষিভবনের হৃদয় থেকে এক একটি রূপের শিখা এসে অগ্নির আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করেছে।

অনলশিখ অগ্নির ভয়ংকর প্রতীক্ষা বনপথচারিণী অভিসারিকার মৃদু মঞ্জীরের নিক্কণে নিত্য চমকিত হয়। স্নিগ্ধবেণী, কজ্জলিত আঁখি, রঞ্জিত অধর, কেয়ূর-কিঙ্কিণী-কাঞ্চীভূষিতা মনোহরা এক একটি মূর্তি আসে। স্বচ্ছ অংশুকবসনে আবরিত মদালসমন্থর এক একটি অঙ্গশোভা ঋষিবধূর মূর্তি ধ'রে চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে প্রতি রজনীতে আসে আর রভসাকুল উৎসব সৃষ্টি ক'রে চলে যায়। অন্ধ ভৃঙ্গের মত সেই নারীদেহপুষ্পের মধু পান করেন অগ্নি। শুধু দেখতে পান না, সে মূর্তির সকল ছদ্মসজ্জার মধ্যেই কপালের উপর একটি কস্তুরীতিলক স্পষ্ট ফুটে রয়েছে।

পরদারকামনার অশুচিতা হতে প্রেমাস্পদের জীবনকে রক্ষা করবার জন্য প্রেমিকা স্বাহার জীবনে বিচিত্র এক কপট অভিসার শুরু হয়েছে। ঋষিবধূর ছদ্মমূর্তি ধ'রে প্রতি রজনীতে চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে অনলের কামনা তৃপ্ত করবার জন্য যেন দাহিকার উপঢৌকন নিয়ে যায় স্বাহা।

কোথায় ভুল হলো, ভাবতে পারে না স্বাহা। সকল লজ্জা কুণ্ঠা ও ভয় মন থেকে মুছে ফেলে এক কপট অভিসারের নায়িকা হয়ে ওঠে। হোক কপট আর কৃত্রিম অভিসার! জীবনে যার বক্ষের স্পর্শ চিরন্তন ক'রে রাখতে চেয়েছে স্বাহা, ছদ্মবেশে চৈত্ররথ বনের এক মোহকুহেলিকার আড়ালে মুখ ঢেকে তারই আলিঙ্গন বরণ করে স্বাহা। কোন অশুচিতা বোধ করে না।

ব্যর্থপ্রেমের বেদনায় ভরা জীবনের এক রঙ্গস্থলীতে যেন নাটকের নায়িকার মত অভিনয় ক'রে চলেছে স্বাহা। এই রঙ্গস্থলীর পথে পথে যে অকৃত্রিম অন্ধকার ছড়িয়ে রয়েছে, তার চেয়ে বাস্তব সত্য আর কিছু নেই; কিন্তু তারই মধ্যে যে ঋষিবধূর মূর্তি অভিসারে আসে, তার চেয়ে মিথ্যা আর কিছু নেই। এইভাবেই এই রঙ্গস্থলীতে অভিসারিকার বেশে একে একে দেখা দিয়েছে

ঋষিবধূ অনসূয়া ও সম্ভূতি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি, গতি ও সন্নীতি। কিন্তু সব মিথ্যা, সব অলীক, সব কপট। এই ঋষিবধূর মূর্তির মধ্যে লুকিয়ে থাকে শুধু স্বাহা নামে এক প্রেমিকার তনু।

সম্ভূতি, অনসূয়া, শ্রদ্ধা, প্রীতি, গতি ও সন্নীতি—ছয় ঋষিবধূর মূর্তি ধারণ ক'রে চৈত্ররথ কাননের নিশীথের অন্ধকার চলমঞ্জীরে চঞ্চলিত ক'রে ছদ্মবেশিনী অভিসারিকা স্বাহা অনলের কাছে এসেছে আর চলে গিয়েছে। তৃপ্ত হয়েছে অনলের জীবনের ছয়টি তৃষ্ণার্ত নিশীথ। হৃষ্টমানস অনল তবুও প্রতীক্ষায় রয়েছেন। কারণ, আজও আসেনি ঋষিবধূ অরুন্ধতী। বাকি আছে শুধু একজন, ঋষিবধূ অরুন্ধতী। সপ্তম নিশীথের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হলেই সমাপ্ত হবে চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে অগ্নির এই প্রতীক্ষার জীবন, সফলকাম ব্রতীর মত আনন্দ নিয়ে চলে যেতে পারবেন অগ্নি।

দূরে চৈত্ররথ কাননের রাত্রি শিশিরবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। স্বাহার যাত্রালগ্ন এগিয়ে এসেছে, বশিষ্ঠপ্রিয়া অরুন্ধতীর রূপানুরূপিণী হয়ে ছদ্মসজ্জা ধারণ করে স্বাহা।

যাত্রা করে অভিসারিকা স্বাহা। যাত্রা করে এক মিথ্যা অরুন্ধতী। কিন্তু চলতে গিয়েই যেন বাধা পায় স্বাহা।

যা কোনদিন হয়নি, তাই হয়। মনের গভীরে কে যেন প্রতিবাদ ক'রে ওঠে—ভুল করছ স্বাহা।

তবু এগিয়ে যায় স্বাহা। কিন্তু পদমঞ্জীরে সুন্দর ধ্বনি আর বাজে না, গতি ছন্দ হারায়। চকিত বিস্ময়ে পথের উপর থমকে থাকে স্বাহা। মনে হয়, কানে কানে কে যেন হঠাৎ বলে দিয়ে চলে গেল—অন্যায় করছ স্বাহা।

তবু এগিয়ে চলে আর চৈত্ররথ কাননে প্রবেশ করে স্বাহা। পথের কণ্টক-গুল্ম যেন পিছন থেকে স্বাহার চেলাঞ্চল টেনে ধরে—অপমান করো না স্বাহা।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্বাহা। কা'র অপমান? কিসের অন্যায়? কোথায় ভুল? স্বাহার সমস্ত মন দুঃসহ এক শঙ্কায় শিহরিত হতে থাকে।

ভুল ক'রে এক ভয়ানক নির্লজ্জতা দিয়ে জগতের নারীধর্মকেই কি অপমানিত করছে না স্বাহা? তারই দেহমন কি এক অশুচি স্পর্শে কলুষিত হয়ে উঠছে না? বুঝতে পারে না স্বাহা, কেন আজ এই সন্দেহ বার বার প্রশ্ন ক'রে তার অভিসারের দুঃসাহস ছিন্ন ক'রে দিচ্ছে। বনপথের উপরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে স্বাহা।

নিজের ছদ্মসজ্জার দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ চমকে ওঠে স্বাহা। এ যে পতিপ্রিয়া অরুন্ধতীর রূপানুরূপিণী এক মূর্তি! এ যে এক শুদ্ধানুরাগিণী পতিব্রতার মূর্তি!

বনপথের উপরে অসহায়ের মত বসে পড়ে স্বাহা। না, আর পারবে না স্বাহা, আর শক্তি নেই স্বাহার, পতিপ্রাণা বশিষ্ঠপ্রিয়া অরুন্ধতীকে অপমান করতে পারবে না স্বাহা। লোকপূজ্যা সেই সতী নারীর কৃত্রিম মূর্তিকে অভিনয়ের ছলেও পরপুরুষের কামনার কাছে সঁপে দিতে পারবে না।

যেন এই ছদ্মবেশের নিবিড় বন্ধনের মধ্যে বন্দিনী হয়ে বসে থাকে স্বাহা। অনুভব করে, এই ছদ্মবেশের স্পর্শ যেন ধীরে ধীরে তার অন্তরের গভীরে বিপুল এক মোহ সঞ্চারিত করছে। এই রীতি প্রেমিকার রীতি নয় স্বাহা! যেন কা'র এক স্নিগ্ধ ধিক্কার শুনে লজ্জিত হয় অভিসারিকার অলজ্জ দুঃসাহস।

কেঁদে ফেলে স্বাহা। এমন ক'রে কোনদিন কাঁদেনি স্বাহা। এত স্পষ্ট ক'রে নিজের ভুল আর ক্ষতিকে কোনদিন বুঝতে পারেনি। তার প্রেমাস্পদ সুন্দর পাবকের জীবনকে শুচিতাময় একপ্রেমের দীক্ষা দিতে পারেনি স্বাহা, বরং ভুল ক'রে বহু ছদ্মরূপে সঙ্গ দান ক'রে প্রেমিকেরই পৌরুষ কলুষিত ক'রে এসেছে। এই রীতি নারীপ্রেমের রীতি নয়, প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকার কর্তব্য নয়।

চৈত্ররথ কাননের বনপথের একান্তে এক কৃত্রিম অরুন্ধতীর অন্তর যেন অনুতাপে পুড়তে থাকে। একনিষ্ঠ প্রেমের নারী বশিষ্ঠপ্রিয়া অরুন্ধতীর মত এই রূপসজ্জা, আননের এই চন্দনরোচনা ও হস্তের এই শঙ্খবলয়, থালিকার এই অর্ঘ্যপুষ্প আর ভৃঙ্গারকের এই সলিল যেন আঘাত দিয়ে স্বাহার অন্তরের রূপ বদলে দিয়েছে। ভেঙ্গে দিয়েছে ভুল, স্মরণ করিয়ে দিয়েছে নারীধর্মের রীতি। অভিনয়ের কাছেই আজ হেরে গিয়েছে স্বাহা।

চুপ ক'রে বসে থাকে স্বাহা। চৈত্ররথ কাননের এই অন্ধকার যেন তার সারাজীবনের পথ ভুল ক'রে দিয়েছে। মেঘবর্ণ দক্ষভবনের স্নেহনীড়ে আর ফিরে যাবারও পথ নেই। কারণ, এক শিশুপ্রাণের যে সঞ্চার স্বাহার অন্তর্লোকে এসে গিয়েছে, এই নিভৃতে বক্ষোবেদনার প্রতি স্পন্দনে তারই সাড়া আজ স্পষ্ট ক'রে শুনতে পায় কুমারী স্বাহা। সকল দিক দিয়ে ক্ষতি ও অখ্যাতি এসে আজ পূর্ণ ক'রে তুলেছে কুমারী স্বাহার জীবন।

মধ্যরজনীর ক্ষীণ চন্দ্রলেখা চৈত্ররথ বনের পুষ্প গুল্ম ও লতায় চূর্ণ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আলোছায়ার মায়া সৃষ্টি করে। মুখ তুলে তাকায়, যেন পালিয়ে যাবার পথ খুঁজছে স্বাহা। রক্ষা করতে পারেনি অগ্নিকে, রক্ষা করতে পারেনি নিজেকে, কিন্তু সব ক্ষতি ও অপমানের অভিশাপ থেকে একটি শিশুজীবনকে মাতার স্নেহ দিয়ে রক্ষা করবার জন্য আজ আরও দূরান্তে সবাকার অগোচর এক নিবিড়তম বনবাসের অন্ধকারে স্বাহাকে চলে যেতে হবে। তারই জন্য যেন পথ খুঁজছে স্বাহার সিক্ত চক্ষুর দৃষ্টি।

হঠাৎ চমকে ওঠে স্বাহা। কা'র পদশব্দ? বনেচর মৃগ নয়, মৃগয়াজীব ব্যাধ নয়, তবে কে ঐ অশান্ত? স্বপ্নোদ্‌ভ্রান্তের মত পথ ভুল ক'বে এই দিকে এগিয়ে আসছে?

চিনতে পারে স্বাহা, এবং বনপথের উপর শ্রান্তালস দেহ স্তব্ধ ক'রে নিয়ে অপলক দৃষ্টি তুলে দেখতে থাকে, হ্যাঁ, সে-ই আসছে। মঞ্জীরধ্বনি শুনতে না পেয়ে এক উৎকর্ণ আকুলতা যেন বনপথ ধ'রে কাউকে সন্ধান করবার জন্য এগিয়ে আসছে।

আরও নিকটে এগিয়ে এসে সেই অস্থির পদশব্দ, স্বাহার সম্মুখে এসে ক্ষণিকের মত শান্ত হয়ে দাঁড়ায়। তারপর আগ্রহভরে প্রশ্ন করে—কে তুমি?

স্বাহা—আমি অরুন্ধতী।

অগ্নির কণ্ঠস্বরে ব্যাকুল উল্লাস ধ্বনিত হয় তুমি অরুন্ধতী!

স্বাহা হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কে?

অগ্নি আমি অগ্নি।

স্বাহা তুমি অভিশাপ। আমি অশুচি। দীনপৌরুষ প্রেমহীন পারদারিক তুমি। আমার সম্মুখ হতে দূরে সরে যাও।

প্রখর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন অগ্নি। বুঝতে চেষ্টা করেন চৈত্ররথ কাননের আলোছায়ার রহস্যের মধ্যে এ কোন্ নূতন ছলনা এসে প্রবেশ করেছে?

অরুন্ধতীরূপিণী স্বাহার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন অগ্নি। দুর্বোধ্য এক বিস্ময়ে আহত হয়ে ওঁর দুই চক্ষুর কৌতূহল কাঁপতে থাকে। হঠাৎ চমকে ওঠেন, আর চিৎকার করেন অগ্নি।

স্বাহা!

এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন অগ্নি, কপট অভিসারে ছলিত হয়েছে চৈত্ররথ কানন, ছলিত হয়েছে তাঁর প্রতীক্ষার তপস্যা। মিথ্যা উপহারে ছলিত হয়েছে তাঁর অনলশিখ বক্ষের আগ্রহ। চন্দনরোচনায় ও শঙ্খবলয়ে ভূষিতা এই নারীর কপালে অঙ্কিত ঐ কস্তুরীতিলক স্পষ্ট ক'রেই দেখতে পেয়েছেন অগ্নি। কঠোর স্বরে আবার আহ্বান করেন—স্বাহা!

অগ্নির ক্রুদ্ধ আহ্বান শুনে উঠে দাঁড়ায় স্বাহা।

অগ্নি বলেন—এত বড় ছলনা দিয়ে কেন আমাকে অপমানিত করলে স্বাহা?

স্বাহা—জানি না কেন করেছি। ভুল করেছি। ক্ষমা কর।

অগ্নি—ক্ষমা হয় না স্বাহা।

স্বাহা—দাও অভিশাপ। শুধু একটি আশীর্বাদ করো।

বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন অগ্নি। অগ্নিকে প্রণাম ক'রে স্বাহা বলে—শুধু একটি আশীর্বাদ করো, তোমার সন্তানকে যেন সকল ক্ষতি ও অখ্যাতি থেকে রক্ষা করতে পারি।

চৈত্ররথ কাননের আলোছায়া যেন দুর্বোধ্য এক স্বপ্নলোকের রূপ নিয়ে আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। তারই মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অগ্নি, যেন তাঁর জীবনের সকল অনলশিখ তৃষ্ণা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। তাঁর পথভ্রান্ত পৌরুষের জীবনকে শুচিতাহীনতার পাপ হতে রক্ষা করবার জন্য কুমারী হয়েও নিজ দেহ হতে দাহিকার উপহার দিয়ে সকল জ্বালা সহ্য করেছে যে, তাঁরই সন্তানের মাতা হতে চলেছে যে, তারই কপালে চিরন্তন হয়ে ফুটে আছে একটি প্রেমের কস্তুরীতিলক।

অগ্নি ডাকেন—স্বাহা।

কিন্তু কোথায় স্বাহা? অগ্নিকে প্রণাম ক'রে এই আলোছায়ার রহস্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, চলে গিয়েছে অগ্নির প্রেমাভিলাষিণী স্বাহা। অসহায়ভাবে বেদনাপীড়িত কণ্ঠস্বরে বনময় প্রতিধ্বনি তুলে অগ্নি ডাকেন—স্বাহা! স্বাহা!

চৈত্ররথ কাননে বৎসরের পর বৎসর শীত-গ্রীষ্ম আর বর্ষা-বসন্তের খেলা শেষ হয়। তারই মধ্যে অহরহ একটি আকুল প্রতিধ্বনি শুধু আলো অন্ধকার ও বাতাস বেদনার্ত ক'রে ছুটাছুটি ক'রে বেড়ায়—স্বাহা! স্বাহা!

সত্যই এক অনন্ত প্রতীক্ষার তপস্যা শুরু করেছেন অগ্নি। কপালে কস্তুরীতিলক, স্নিগ্ধদ্যুতিরূপিণী এক নারী এই পথে ফিরে এসে দেখা দেবে কবে? স্বাহা! স্বাহা! আগ্নেয়জননী স্বাহা! পিতৃহৃদয়ের শূন্যতা, শুদ্ধপৌরুষ পতিহৃদয়ের শূন্যতা দূর করবার জন্য যেন এক বাঞ্ছিতার উদ্দেশ্যে সাগ্রহ আহ্বান-মন্ত্র চৈত্ররথ কাননের সমীরে নিরন্তর মন্দ্রিত হয়। স্বাহা! স্বাহা! আমার আশ্রমগেহিণী রূপে এস। আমার গার্হপত্যের একমাত্র শিখা রূপে এস। এস প্রিয়া স্বাহা।

সেই একপ্রেমিকা নারীর কামনার পুণ্য স্পর্শকেই অনন্তকাল আহ্বান করবেন অগ্নি—স্বাহা! স্বাহা!

---

# বসুরাজ ও গিরিকা

শক্রোৎসব সমাপনের পর মৃগয়াভিলাষে কাননে প্রবেশ করলেন চেদিপতি বসুরাজ।

সুরপতি ইন্দ্রের অনুগ্রহে সমৃদ্ধিসমাকুল চেদিরাজ্যের প্রভুত্ব লাভ করেছেন বসুরাজ। তাঁর কণ্ঠে সুরপতির সৌহার্দ্যের উপহার অম্লানপঙ্কজকুসুমের বৈজয়ন্তী মাল্য শোভা পায়। ইন্দ্রেরই প্রদত্ত স্ফটিকনির্মিত বিমানরথে আরূঢ় বসুরাজ গগন অঙ্গনে বিগ্রহবান দেবতার মত সঞ্চরণ করেন। সুরপতি ইন্দ্র প্রদান করেছেন শিষ্টপ্রতিপালনী বেণু-যষ্টি। এই বেণু-যষ্টির মর্যাদা রক্ষা করতে কোন ভুল করেন না বসুরাজ। বিপন্ন ও প্রপন্নের রক্ষার জন্য সর্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকে চেদিপতি বসুরাজের বিপুলবলে স্পর্ধিত দুই বাহু।

কুটজ সৌগন্ধ্যে অভিভূত কাননবায়ু তখন সদ্যোজাগ্রত বিহগের কাকলীতে শিহরিত হয়ে নবারুণপ্রভার বন্দনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিঞ্জল্করাগে রঞ্জিত হয়ে রয়েছে বনসরসীর নীর। জেগেছে গন্ধাকৃষ্ট মধুব্রত, পরিপতিত পরাগে পাটলীকৃত হয়ে রয়েছে বনভূভাগ। বসুরাজ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, এবং তাঁর দুই চক্ষু যেন শিশিরস্নাত এই পুষ্পলতা ও বনস্পতির অন্তরচরী মাধুরীর অভিষেক লাভের জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে।

আলোকে আপ্লুত হয়ে উঠেছে পূর্ব গগনের ললাট। সূক্ষ্ম অংশুক নীশারের মত ধীরে ধীরে অপসৃত হয় খিন্ন কহেলিকা। আর, বিগলিত-দুকূলা কামিনীর মত শরীরশোভা প্রকট ক'রে ফুটে ওঠে কুলকামিনী এক তটিনীর রূপ। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় বসুরাজের, ঐ তটিনীরই নিকটে এক শৈলকন্দরের অন্ধকারময় নিভৃত হতে হঠাৎ উত্থিত এক আর্তনাদ শুনে একদিন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তাঁর করধৃত এই শিষ্টপ্রতিপালনী বেণু-যষ্টি।

শুক্তিমতী নামে এক পরিণতযৌবনা কুমারী স্নানাভিলাষে ঐ তটিনীর নিকটে এসে দাঁড়িয়েছিল আর কোলাহল নামে এক লালসামূঢ় কামান্ধ শুক্তি-মতীর সকল অনুনয় ও প্রতিবাদ রূঢ় আক্রমণে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে সেই কুমারী-তনুর যৌবন ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মত উপভোগ করেছিল।

কিন্তু কর্তব্য পালন করেছিলেন তরুণ চেদিপতি বসুরাজ। সেই বিপন্নাকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর বিপুল বলকুশল এই বাহুর একটি আঘাতে সেই অত্যাচারীর প্রাণ চিরকালের মত স্তব্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। ধর্ষকের উন্মাদ

আগ্রহের গ্রাস হতে যে নারীকে সেদিন মুক্ত করতে পেরেছিলেন বসুরাজ, সেই নারী প্রণতশিরে তাঁরই চরণ স্পর্শ ক'রে তাঁকেই পিতৃসম্বোধনে সম্মানিত করেছিল। তারপর একে একে কত শত কুহু রাকা ও সিনীবালী রজনী এই তটিনীরই সিকতায় শিশিরস্নেহভার সঁপে দিয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে! একে একে বিগত হয়েছে অষ্টাদশ বৎসর। কোথায় গেল সেই নারী? সেই শুক্তিমতী?

মনে পড়ে বসুরাজের, সেদিন কি-যেন বলতে গিয়েও বলতে পারেনি শুক্তিমতি। ক্রূর কিরাতের কার্মুকে আহত মৃগবধূর মত ধূলিলুণ্ঠিত দেহ নিয়ে, বসুরাজের চরণ স্পর্শ ক'রে, আর ভয়বিহ্বল ও করুণ দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে তাকিয়েছিল শুক্তিমতী। বসুরাজ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন —আর ভয় কেন নারী? চেয়ে দেখ, তোমার কুমারী-জীবনের শুচিতার ঘাতক ঐ কামান্ধ আমার এই ভীমবাহু-প্রহরণের একটি আঘাতে নিষ্প্রাণ রুধিরাক্ত শ্বাপদের মত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে আছে।

হ্যাঁ, সেদিন সেই ধর্ষকের দেহ ঐ শৈলকন্দরের নিকটে নিষ্প্রাণ আর রুধিরাক্ত শ্বাপদের দেহের মত পড়েছিল। শুক্তিমতী নামে এক বনবাসিনী কুমারী নারীর যৌবনলুণ্ঠক কোলাহল নামে সেই কামান্ধ দস্যুর শোণিতপ্রবাহে সিক্ত হয়ে গিয়েছিল শৈলকন্দরের কঠিন শিলাতল। তবুও বলাৎকারমত্ত মূঢ়ের সেই নিষ্প্রাণ দেহপিণ্ডের দিকে তাকিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হতে পারেনি শুক্তিমতী। অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন চক্ষু নিয়ে তরুণ বসুরাজের দিকে তাকিয়ে আবেদন করেছিল।- পিতা!

বসুরাজ– তুমি তো এখন মুক্ত, তবুও তুমি শান্ত ও নির্ভয় হতে পারছ না কেন নারী?

শুক্তিমতী বলে—অত্যাচারীর হিংস্র ভুজঙ্গমের বন্ধন হতে আপনি আমাকে মুক্ত করেছেন পিতা কিন্তু মনে হয় তার লালসার বিষ আমার এই কুমারী-দেহকে মুক্তি দেবে না।

চমকে ওঠেন বসুরাজ—এ কথার অর্থ?

শুক্তিমতী—ভয় হয় পিতা, অনুভব করছি পিতা, আমার এই দেহের শোণিতে যেন এক প্রাণের বীজ সন্তরণ করছে।

বিমর্ষ ও বিষণ্ণ বসুরাজ বলেন—বুঝেছি, এবং আমারও ভয় হয় নারী, তোমার এই ভয় বোধ হয় মিথ্যা ভয় নয়।

ক্রন্দন করে শুক্তিমতী—তবে বলুন নৃপতি বসুরাজ, ধর্ষকের লালসা যে প্রাণের অঙ্কুর আমার যৌবনোর্বর শোণিতে নিক্ষেপ করেছে, সেই প্রাণ এই বনকুসুমের পরাগের মত কলুষবিহীন শুচিরুচির ও সুন্দর।

উত্তর দেন না বসুরাজ।

শক্তিমতী বলে—বলুন প্রজাপালক বসুরাজ। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আমার অন্তরাত্মাকে যন্ত্রণাক্ত ক'রে, আমার জীবনকে অপমানিত ক'রে, হত্যার উৎসবের মত এক প্রমত্ততার আঘাতে আমার দেহের সকল স্নায়ু, তন্তু ও নিঃশ্বাস পীড়িত ক'রে, প্রণয়হীন আনন্দহীন ও আর্তনাদপীড়িত কতগুলি মুহূর্তের অভিশাপলীলার পরিণাম হয়ে যে প্রাণ আমার দেহে সঞ্চারিত হয়েছে, সেই প্রাণ আপনার বিচারে কোন অপরাধী-প্রাণ নয়।

উত্তর দেন না বসুরাজ।

শক্তিমতী বলে—আপনি প্রতিশ্রুতি দান করুন বসুরাজ, আমার এই প্রণয়হীন আনন্দহীন ও অবমাননাময় কয়েকটি দিবসের আর্তনাদজাত সন্তান আপনার রাজ্যের সকল প্রণয়জাত সন্তানের মত মানবোচিত সম্মান লাভ করবে।

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বিস্মিতভাবে শুধু শক্তিমতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন বসুরাজ।

শক্তিমতী বলে—আমাকে প্রতিশ্রুতি দান করুন শিষ্টপ্রতিপালক বসুরাজ, তা'হলেই আপনাকে আমার পরিত্রাতা পিতা বলে আমি বিশ্বাস করতে ও শ্রদ্ধা করতে পারব।

বসুরাজ বলেন- প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না।

শক্তিমতী—কেন পারেন না বসুরাজ?

বসুরাজ তোমার সন্তান এক অত্যদ্ভুত জন্ম-পরিচয় নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে। ধর্ষকের লালসার সৃষ্টি তোমার সেই সন্তান পৃথিবীর একটি প্রাণিরূপে গণ্য হবে, এই মাত্র, এর অধিক কোন মর্যাদা তার হতে পারে না।

শিউরে ওঠে শক্তিমতী -কেন বসুরাজ?

বসুরাজ কঠোরভাবে বলেন - শ্বাপদের সৃষ্টি শ্বাপদই হয়ে থাকে।

ধর্ষক কোলাহলের নিষ্প্রাণ দেহপিণ্ডের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত ক'রে শক্তিমতী বলে—কিন্তু মানুষের প্রণয়জাত সন্তানও তো শ্বাপদ হয়ে উঠতে পারে বসুরাজ।

বাধা দিয়ে কঠোরস্বরে বলেন বসুরাজ—কুতর্ক করো না নারী।

শক্তিমতী—ঐ শ্বাপদপ্রায় লালসান্ধ কোলাহল আপনারই রাজ্যের এক মানব-দম্পতির প্রণয়জাত সন্তান। এক নারী ও এক পুরুষের দেহ-মনের মিলন ও আনন্দেরই সৃষ্টি ঐ কোলাহল।

বিব্রতভাবে বসুরাজ বলেন—বিচিত্র তোমার মন! সন্দেহ হয় আমার,

তোমার যে আর্তনাদ শুনে বিচলিত হয়েছিলাম, সে আর্তনাদ নিতান্তই কপট এক দুঃখের প্রতিধ্বনি।

শুক্তিমতী করুণস্বরে বলে—এমন ভয়ানক সন্দেহ করবেন না বসুরাজ।

বসুরাজ—তবে কেন তুমি তোমার সেই দুঃসহ অপমানের সৃষ্টিকে পালন করবার জন্য এবং তার ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে এত আকুল হয়ে উঠেছ দস্যু-স্পর্শদূষিতা কুমারী?

আরও আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে শুক্তিমতী—সত্যই বুঝতে পারি না পিতা, এ আমার কোন্ মনোবিকার? অত্যাচারী কোলাহলের সেই লালসাক্লুব্ধ মুখাবয়ব কল্পনা করতেও ঘৃণা বোধ করি, কিন্তু আমার শোণিতে সঞ্চারিত একটি প্রাণকে কিছুতেই যে ঘৃণা করতে পারছি না।

বসুরাজ—কিন্তু আমি যে তোমার শোণিতে সম্ভাবিত অদ্ভুত আবিলতার অঙ্কুর ঐ প্রাণকে কল্পনা করতেও ঘৃণা করি।

শুক্তিমতী বলে—আপনার এই ভয় ও ঘৃণার হেতু বুঝতে পারছি না বসুরাজ। আপনার এই রাজ্যে কি কোন কুমারীর গূঢ়োৎপন্ন সন্তান নেই?

বসুরাজ—আছে।

শুক্তিমতী—আপনার রাজ্যে কি কোন বহুবল্লভা নারী নেই, আর তার সন্তান নেই?

বসুরাজ—আছে।

শুক্তিমতী—আপনার রাজ্যে কি কোন প্রোষিতভর্তৃকা নারীর ক্রোড়ে সন্তান আবির্ভূত হয়নি?

বসুরাজ—হয়েছে।

শুক্তিমতী—আপনার রাজ্যে কি কোন কৌলটেয় নেই?

বসুরাজ—আছে।

শুক্তিমতী—আপনার রাজ্যে কি কোন বিবাহিতা নারী পরপুরুষাসঙ্গে প্রজায়িনী হয়ে ক্ষেত্রজ সন্তান ক্রোড়ে ধারণ করেনি?

বসুরাজ—করেছে।

শুক্তিমতী—অদ্ভুত বিধি আর অবিধির বশীভূত এই সব মিলনের সন্তান যারা, তাদের কি আপনি আপনারই প্রজা বলে মনে করেন না?

বসুরাজ—করি।

শুক্তিমতী—আপনার ধারণায় এরা সকলেই মানুষ নিশ্চয়?

বসুরাজ—মানুষ বৈ কি।

শুক্তিমতী—এদের মনুষ্যত্ব কি আপনার কাছে সম্মাননীয় নয়?

বসুরাজ—অবশ্যই সম্মাননীয়।

শুক্তিমতী—তবে আমার সন্তান কেন শিষ্টপ্রতিপালক চেদিপতি বসুরাজের বিচারে ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হবে?

বসুরাজ—তুমি ভুল বুঝেছ নারী। আমার রাজ্যের প্রত্যেক গৃহোৎপন্ন ও কৌলটেয় হলো এক মানব ও এক মানবীর স্মরাবেশপ্রগল্‌ভ মিলনের আনন্দের ও আগ্রহের সৃষ্টি, আর্তনাদের সৃষ্টি নয়। কল্পনা করতেও আতঙ্ক হয়, কি ভয়ংকর কর্কশ সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে তোমার সন্তান! অনুমান করতেও ঘৃণা হয়, কি ভয়ংকর অপচিত্ততা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে তোমার সন্তান! ধারণা করলে শিহর দিয়ে কণ্টকিত হয়ে ওঠে সকল চিন্তা, কে জানে কোন্ বীভৎসতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে তোমার সন্তানের অবয়ব! তোমার সন্তান কখনও সমাজের মানুষ হতে পারবে না, সে হবে এই বনেরই এক প্রাণী। আমি মনে করি, বলাৎকৃতা নারীর দেহজাত সন্তানই হলো এই সংসারের অন্ত্যজাধম।

শুক্তিমতী বিস্মিত হয়ে বলে—এই কি শিষ্টপ্রতিপালকের ন্যায়বিধি?

বসুরাজ—হ্যাঁ।

শুক্তিমতী—নিতান্তই অন্যায়বিধি বসুরাজ। আপনি বলাৎকৃতা নারীর মাতৃত্বকে শাস্তি দান করছেন।

বসুরাজ—আমি বিস্মিত হচ্ছি, এক নারী তার ধর্মাপহারক দস্যুর হঠলালসার সৃষ্টিকে ঘৃণা করতে পারছে না কেন? কিসের এই মোহ?

শুক্তিমতী—আমার শোণিতের স্নেহের উত্তাপে দশ মাস দশ দিন লালিত হবে যে প্রাণ, তাকে আমি কেমন ক'রে ঘৃণা করব বসুরাজ?

বসুরাজ—অপজাত এক প্রাণকে তোমার যৌবনের সকল শুচিতার হন্তা এক দস্যুর মত্ততার সৃষ্টিকে যদি তুমি ঘৃণা করতে না পার, তবে সে অপরাধ তোমার। ঘৃণ্যকে ঘৃণা করতে যদি না পার, তবে সেই ভুলের শাস্তি তুমিই জীবনে সহ্য করবে। আমি অপ্রজা পালন করি না নারী।

শুক্তিমতী বলে—আর একটি কথা শুধু বলবার ছিল কিন্তু বলতে পারলাম না বসুরাজ।

কুটজগন্ধে অভিভূত বনবায়ুর স্পর্শে সেদিনের মত আজও বসুরাজের চিন্তা শিহরিত হয়। কোথায় গেল সেই নারী, শুক্তিমতী নামে সেই কুমারী? কল্পনা করেন বসুরাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু বিষণ্ণতার ছায়াও যেন তাঁর দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে সঞ্চারিত হয়। বোধ হয় এই তটিনীসলিলে সেদিন দেহ বিসর্জিত ক'রে সকল শাস্তি সন্তাপ ও মোহের অবসান ক'রে দিয়েছে সেই নারী। ভালই হয়েছে ধর্ষকের লালসাজাত সন্তানের মাতা হবার দুর্ভাগ্য

সেই অদ্ভুত নারীকে সহ্য করতে হয়নি। কি আশ্চর্য, কি অদ্ভুত ছিল সেই নারীর মন! বসুরাজের প্রহরণাঘাতে নিহত এক ধর্ষকের রক্তাক্ত দেহপিণ্ডের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেছিল নারীর যে চক্ষু, সেই চক্ষুই আবার ধর্ষকেরই ঔরসের পরিণাম চিন্তা ক'রে সজল হয়ে উঠেছিল। একে একে বিগত হয়েছে অষ্টাদশ বৎসর, ঐ শৈলকন্দরের এক নিভৃত হতে উত্থিত নারীকণ্ঠের সেই আর্তনাদ কোন স্মৃতিচিহ্ন না রেখে কালস্রোতে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে চিরকালের মত।

কাননভূমির অভ্যন্তরে আবার হৃষ্টচিত্তে পরিভ্রমণ করতে থাকেন বসুরাজ। শান্ত বনবীথিকার ধূলিকে ছায়ায় আকীর্ণ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে অনেক শ্যাম অনোকহ। কিন্তু ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে সূর্যকরনিকর। তৃষ্ণার্তি অনুভব করেন বসুরাজ। এগিয়ে এসে প্রচ্ছায়শান্ত তরুতলে দাঁড়িয়ে শ্রমক্লম অপনোদন করেন। তারপরেই শুনতে পান, যেন নিকটেই কোথাও তৃপ্ত সারসের কলরব ধ্বনিত হয়ে চলেছে। শুনতে পান বসুরাজ, জলোৎপলের সৌরভে অভিভূত রোলম্ব নিকুরম্বের গুঞ্জন। আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পান বসুরাজ, মিথ্যা নয় তাঁর অনুমান। অজস্র বিকচ তামরসের শোভা বক্ষে ধারণ ক'রে রয়েছে স্নিগ্ধসলিলা এক সরসী। জলপানে তৃষ্ণার্তি দূর করেন বসুরাজ।

কিন্তু সেই মুহূর্তে বিপুল তৃষ্ণায় বিচলিত হয়ে উঠল বসুরাজের দুই চক্ষু।

সরসীতটের এক নিভৃতে স্ফুটকুসুমে আচ্ছন্ন এক প্রিয়ক তরুর ছায়ায় নবীন শাদ্বলের উপর কাঞ্চনলতিকার মত শয়ান এক নারীর অলসলুলিত দেহ, নিবিড় নিদ্রায় অভিভূত। মনে হয়, ঐ নারীর হাস্যজ্যোতির্লিপ্ত অধরে ইন্দুকর কন্দল ঘুমিয়ে আছে। মনে হয়, ঊর্ধ্বাকাশের মেঘ নবীন শাদ্বলের হরিৎ বক্ষ চুম্বনের জন্য এই নারীর চিকুরের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। নীবিচ্যুত হয়ে রুক্ষ বল্কল যেন সেই রূপাভিরামা রমণীর নাভিকুহরিণী আর ত্রিবলি-রেখার দিকে তৃষ্ণাভিমানিত নয়নে তাকিয়ে আছে। বিস্মিত হন বসুরাজ, যেন রূপময় নিখিল নিসর্গের সকল মৃদুল স্পন্দন, সকল সুচারু গঠন, সকল মঞ্জুল শোভা, আর সকল মদিরকোমল বিহ্বলতা দিয়ে রচিত হয়েছে এই বরযৌবনা নারীর তনু। মনে হয়, এই তো কবিকল্পনার সেই নারী, যার মুখমদস্পর্শে প্রস্ফুটিত হয় বকুলকোরক, যার আলিঙ্গনে জাগ্রত হয় কুরুবক কুন্তল, যার চরণধ্বনিতে মঞ্জরিত হয় রক্তাশোক আর কটাক্ষে পুষ্পিত হয় তিলক।

যেন বসুরাজের সেই চঞ্চল নিঃশ্বাসের আঘাতে নারীর নিদ্রা ভেঙে যায়।

স্বপ্নোত্থিতার মত হঠাৎ উন্মীলিত দুই চক্ষুর বিস্ময় নিয়ে বসুরাজের দিকে তাকায়, আর বিপুললজ্জাবিকম্পিত হস্তে ব্যস্তভাবে বল্কল ও উৎপলমেখলা আকর্ষণ ক'রে বরাঙ্গের বিকচ শোভা আবৃত করে নারী।

বিস্মিত বসুরাজ প্রশ্ন করেন - কে তুমি ভদ্রে?

দরদলিত উৎপলকলিকার মত ঈষৎ হাস্যে অধর স্ফুরিত ক'রে উত্তর দান করে তরুণী - আমার পরিচয় আমি জানি না। আপনি কে?

বসুরাজ—আমি চেদিপতি বসুরাজ।

নারীর ভ্রূরেখা বিস্ময়ে শিহরিত হয়।—আপনি এই রাজ্যের অধীশ্বর, সুরপতি ইন্দ্রের অনুগৃহীত শিষ্টপ্রতিপালক বসুরাজ?

বসুরাজ—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কে?

নারী—আমি এক বনেচর প্রাণী মাত্র।

ব্যথিত হন বসুরাজ।—লোকললামা নারী, কি হেতু নিজেকে এই মিথ্যা রূঢ়ভাষণে নিন্দিত করছ তুমি?

নারী—সত্যই আমার পরিচয় জানি না বসুরাজ।

বসুরাজ—আমি অনুমান করতে পারি।

নারী— তবে অনুমান করুন।

বসুরাজ—তুমি কোন দেবতনয়া। নইলে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রদত্ত এই বৈজয়ন্তী মাল্যের অম্লানপঙ্কজকুসুমের চেয়েও ফুল্ল ও সুন্দর ঐ মুখরুচি কি কোন মর্ত্যনারীর হতে পারে? কখনই না।

নারী বলে—না বসুরাজ। বড়ই ভুল অনুমান করেছেন।

বসুরাজ—তোমার কি কোন নাম নেই?

নারী—আছে, আপনার এই কাননভূমির সকল প্রাণী লতা ও পুষ্পের যখন নাম আছে, তখন আমারও একটি নাম আছে।

বসুরাজ—কি নাম?

নারী—গিরিকা।

বসুরাজ—বুঝেছি গিরিকা, তুমি এই কাননেরই উপান্তবাসী কোন ঋষির তনয়া।

গিরিকা বলে—কি দেখে বুঝলেন বসুরাজ?

বসুরাজ—তোমার এই স্নিগ্ধহাস্য বচনমাধুরী আর শান্ত সম্ভাষণ তোমারই পরিচয় প্রকট ক'রে দিয়েছে। ঋষি পিতার আশ্রমচ্ছায়ে লালিতা পুষ্পলতার মত তোমার তনুসুষমা আমাকে মুগ্ধ করেছে গিরিকা।

গিরিকা—ভুল বুঝেছেন বসুরাজ আমার কোন পিতা নেই।

চমকে ওঠেন বসুরাজ—পিতা নেই? তোমার পিতৃপরিচয় জান না?

গিরিকা—না।

কিছুক্ষণ চিন্তান্বিতের মত দাঁড়িয়ে থাকেন বসুরাজ. তারপরেই স্মিতহাস্যে ও পুলকিত স্বরে বলেন—বুঝেছি গিরিকা, তুমি এক অপ্সরীর সন্তান।

গিরিকা—এমন ধারণা কেন করছেন বসুরাজ?

বসুরাজ—হ্যাঁ, তোমার ঐ বিহ্বল দু'টি অক্ষিতারকার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছি তোমার জন্মপরিচয়। তুমি এক অপ্সরীর প্রণয়জাত সন্তান। তোমার নয়নে সেই প্রণয়ের উদ্ভাস, তোমার ওষ্ঠমুদ্রায় সেই মিলনবিহ্বল আনন্দেরই স্মৃতি সুন্দর রেখায় জন্মলাভ করেছে।

গিরিকা—না বসুরাজ, আমি অপ্সরীর তনয়া নই।

বিব্রতভাবে তাকিয়ে থাকেন বসুরাজ—তবে কে তুমি?

গিরিকা—অনুমান করুন বসুরাজ।

বসুরাজ—তুমি কি কোন নির্বাসিতা রাজতনয়া?

গিরিকা হেসে ওঠে—না বসুরাজ।

বসুরাজ—তবে তুমি কি কোন কুমারী নারীর গোপন প্রণয়ের সৃষ্টি?

গিরিকা—না বসুরাজ।

বসুরাজ বিষণ্নভাবে বলেন—মনে হয়, তুমি এক পরানুরাগিণী জনপদ-বধূর সন্তান, লোকাপবাদের ভয়ে তোমার সদ্যোভূমিষ্ঠ শিশুদেহকে এই বনভূমির তরুচ্ছায়াতলে বিসর্জন দিয়ে চলে গিয়েছিল সেই নিষ্ঠুরা।

গিরিকা—না বসুরাজ।

বসুরাজ—আর অনুমান করবার শক্তি নেই আমার। তুমিই বল তোমার জন্মপরিচয়।

গিরিকা—কিন্তু আমার জন্মপরিচয় জেনে আপনার কি লাভ হবে বসুরাজ?

বসুরাজ—কোন লাভ নেই, কৌতূহল মাত্র।

গিরিকা—কৌতূহল কেন বসুরাজ?

বসুরাজ—আমি এই রাজ্যের অধীশ্বর, আমার রাজ্যের বনময় প্রদেশে কে তুমি সকল বনশোভা আরও দীপ্ত ও সুন্দর ক'রে দিয়ে এই তরুচ্ছায়াতলে দাঁড়িয়ে আছ, সেকথা জানবার ও শুনবার অধিকার আমার আছে। আমারও কর্তব্য আছে, তাই এই কৌতূহল।

গিরিকা—আপনি কি আমার কোন উপকার করতে চান বসুরাজ?

গিরিকার নিকটে এগিয়ে এসে ব্যাকুল বিহ্বল ও মুগ্ধ দুই চক্ষুর দৃষ্টি তুলে স্তবসঙ্গীতের মত সাকাঙ্ক্ষ স্বরে বলতে থাকেন বসুরাজ—আমার নিজেরই জীবনের উপকার করতে চাই গিরিকা। যে-ই হও তুমি, তুমি চৌদিপতি

বসুরাজের আকাঙ্ক্ষিতা। তুমি আমার স্পৃহনীয়া বরণীয়া ও স্তবনীয়া। আমি তোমার ঐ ওষ্ঠপুটের সঞ্চিত মকরন্দের পিপাসী। তুমিই আমার জীবনের তৃষ্ণার্তি দূর করতে পার গিরিকা। ধন্য হবে আমার জীবন, যদি তোমার ঐ চিকুরতিমিরের ছায়া এইক্ষণে আমার এই বক্ষে লুটিয়ে পড়ে। তুমি বসুরাজের জীবনসঙ্গিনী হও গিরিকা।

হঠাৎ বাষ্পার্দ্র হয়ে ওঠে গিরিকার দুই চক্ষু। কম্পিতকণ্ঠে বলে—কিন্তু...।

বসুরাজ—মিথ্যা দ্বিধা কেন গিরিকা?

গিরিকা—মিথ্যা নয় বসুরাজ।

বসুরাজ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন—আমার জীবনসঙ্গিনী হতে তোমার মনে কি কোন আপত্তি আছে গিরিকা?

গিরিকা—আপনি বলুন বসুরাজ, এই পরিচয়হীনা নারী সংসারের কোন মানুষের প্রেমিকা হতে পারবে কি? আপনার কি সন্দেহ হয় না বসুরাজ, গিরিকার এই পুষ্পস্রগাসক্ত বক্ষের অভ্যন্তরে কোন প্রেমহীন হৃৎপিণ্ড লুকিয়ে থাকতে পারে? আপনার কি ভুলেও এই ভয় হয় না বসুরাজ, গিরিকা নামে এই বনচারিণী নারীর দেহশোণিতে ভয়ংকর এক বিষাক্ত সংস্কার লুকিয়ে থাকতে পারে?

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে বসুরাজের বক্ষের নিঃশ্বাস। অপলক নেত্রে গিরিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেন অষ্টাদশ বৎসর পূর্বের এক ঘটনার স্মৃতি বসুরাজের কল্পনায় হঠাৎ আর্তনাদ ক'রে উঠেছে। চিৎকার ধ্বনির মত বিচলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করেন বসুরাজ।—তোমার জন্মপরিচয় বল অপরিচিতা। বল, কে তোমার মাতা?

গিরিকা—আমার মাতা শুক্তিমতী।

দুই চক্ষু মুদ্রিত ক'রে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বসুরাজ। গিরিকার একটি কথার আঘাতে বসুরাজের সকল জিজ্ঞাসা হঠাৎ অন্ধ হয়ে গিয়েছে। শিষ্টপ্রতিপালক বসুরাজের হাতের বেণু-যষ্টি থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে। যেন এক বিদ্রূপের অট্টহাস্যে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে বসুরাজের কঠোর ন্যায়বিধির প্রাচীর, তারই শব্দ শুনছেন বসুরাজ। যেন অষ্টাদশ বৎসর পূর্বের এক প্রভাতের ক্রন্দনরতা এক নারীর অশ্রুসমাচ্ছন্ন চক্ষুর আবেদন এতদিন পরে বসুরাজের সম্মুখে এসে প্রশ্ন করছে—এইবার বল শিষ্টপ্রতিপালক বসুরাজ, সেই প্রাণ কি সত্যই অন্ত্যজাধম প্রাণ?

বসুরাজের ভাবনাভিভূত ও ব্যথিত দুই চক্ষু হতে ছিন্ন মানিসরের মত অশ্রুর ধারা ভূতলে লুটিয়ে পড়ে।

কিন্তু দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে গিরিকা; আর বিচলিতভাবে যেন সেই

অশ্রুমুক্তা ধারণ করবার জন্য হস্ত প্রসারিত ক'রে বসুরাজের কাছে এসে দাঁড়ায়। ব্যথিত স্বরে বলে—এ কি বসুরাজ?

সিক্ত ও মুদ্রিত চক্ষুর পক্ষ্ম বিকশিত ক'রে গিরিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন বসুরাজ। পর মুহূর্তে কাঞ্চনলতার মত ললিততনু গিরিকাকে দুই বাহুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে বক্ষোলগ্ন করেন, যেন তাঁর মিথ্যা ন্যায়বিধির অন্ধকার চূর্ণ ক'রে দিয়ে এক অদ্ভুত সত্যের সুস্বপ্ন শরীরিণী হয়ে তাঁর কাছে এতদিনে দেখা দিয়েছে।

গিরিকা বলে—ভুল করবেন না বসুরাজ। আমি যে এক নিগৃহীতার নিরানন্দ জীবনের আর্তনাদ হতে উদ্ভূতা, আপনার ন্যায়বিধির ঘৃণিতা ও নিন্দিতা।

বসুরাজ—তুমি সকলশমলা, অকশ্মলা; তুমি অনবরীণা, অনবগীতা।

গিরিকা—আমি এই জগতের দুর্ঘটনা; আমি বিনা অভিলাষের সৃষ্টি। আপনি আমার জন্মপরিচয় জানেন বসুরাজ।

গিরিকার প্রতিবাদ চকিত চুম্বনের আঘাতে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে বসুরাজ বলেন—তুমি জান না, তোমার মাতা শুক্তিমতীও জানে না তোমার জন্মপরিচয়। আমিও জানতাম না গিরিকা কিন্তু আমি আজ জেনেছি।

বুঝতে না পেরে প্রশ্নাকুল নয়নে প্রণয়বিবশ বসুরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে গিরিকা।

বসুরাজ বলেন—এই নিখিলের সকল প্রাণের পিতা যিনি, তাঁরই অভিলাষের সৃষ্টি তুমি।

---

# গালব ও মাধবী

সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন এবং কত সহস্র প্রার্থীকে গো ভূমি কাঞ্চন ও শস্য দান করেছেন রাজা যযাতি! তাঁর কাছে দানই হলো মানলাভের একমাত্র ব্রত এবং মানই হলো মানবজীবনের একমাত্র পুণ্য।

পুণ্যের প্রয়োজন হয়েছে রাজা যযাতির; কারণ তিনি সেই সব রাজর্ষির মধ্যে স্থানলাভ করতে চান, যাঁরা পুণ্যবলে স্বর্লোকে অধিষ্ঠান লাভ করেছেন। এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। কিন্তু কবে এই স্বপ্ন সফল হবে?

বৈভব ক্ষয় হয়ে গিয়েছে অনেক, কিন্তু ক্ষয় হয়নি তাঁর আরও দান করবার স্পৃহা। রত্নাগার শূন্য হয়ে এসেছে, কিন্তু এখনও শূন্য হয়নি তাঁর আরও মান লাভের আকাঙ্ক্ষা। কারণ, দানের গর্বে ও গৌরবে তিনি সব রাজর্ষির মহিমা খর্ব ক'রে দিতে চান। স্বর্লোকের রাজর্ষিদের মধ্যে একজন সাধারণ হয়ে নয়; অসাধারণ হয়ে, প্রধান হয়ে এবং সর্বোচ্চ হয়েই তিনি আসন লাভ করবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। তাই সব চেয়ে বেশি পুণ্যবল সঞ্চয়ের প্রতীক্ষায় রয়েছেন রাজা যযাতি।

প্রতিদিনের মত সেদিনও সভাকক্ষে বসেছিলেন রাজা যযাতি। তখনও প্রার্থীর সমাগম আরম্ভ হয়নি।

সভাকক্ষের চারিদিকে তাকালেই বোঝা যায় রাজা যযাতির মনে দান করবার আকাঙ্ক্ষা যত বড়, দান করবার মত রাজৈশ্বর্য তত বড় নয়। রাজচ্ছত্র মৌক্তিকে খচিত নয়। রাজদণ্ড মণিবিচিত্রিত নয়। সিংহাসনে রত্নধাতুপ্রভা নেই। স্তম্ভে ও বেদিকায় বিদ্রুমশোভা নেই। নেই কোন চারণসুন্দরীর কণ্ঠোৎসারিত চিত্তহারী গীতস্বর; নেই কোন চঞ্চরীকনয়না চামরগ্রাহিণীর চারুকটাক্ষ। সিংহাসনের পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র অগুরুগর্ভিত বর্তিকার শিখা হতে বিচ্ছুরিত রশ্মি যযাতির মুকুট স্পর্শ করে, কিন্তু রত্নহীন সে মুকুট উদ্ভাসিত হয় না।

সভাকক্ষে প্রথম প্রবেশ করলেন এক তপস্বী। রাজা যযাতি কয়েকটি তাম্রমুদ্রা হাতে তুলে নিয়ে তপস্বীকে দান করবার জন্য বলেন—দান গ্রহণ করুন যোগিবর।

তপস্বী মৃদুহাস্যে বলেন—আমি বিষয়ী নই রাজা যযাতি, তাম্রমুদ্রায় আমার কোন প্রয়োজন নেই।

রাজা যযাতি পরক্ষণে ভূর্জপত্র ও লেখনী হাতে নিয়ে বলেন—তবে আপনাকে একখণ্ড ভূমি দান করি। দানপত্র লিখে দিই।

তপস্বী আবার আপত্তি করেন—আমি গৃহী নই রাজা যযাতি, আমার কোন ভূমিখণ্ডের প্রয়োজন নেই।

এক মুষ্টি যবকণা তুলে নিয়ে রাজা যযাতি বলেন—তবে এগিয়ে আসুন যোগিবর. আপনার ঐ চীরবস্ত্রের অঞ্চল বিস্তারিত করুন। আপনাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ শস্য দান করি।

তপস্বী বলেন—শস্যকণায় আমার প্রয়োজন নেই।

যযাতি—তবে কি চান আপনি? বলুন, আপনাকে কি বস্তু দান করব?

তপস্বী—যদি নিতান্তই দান করতে চান, তবে আমাকে আপনার সভায় কিছুক্ষণ উপবেশন করতে অনুমতি দান করুন।

যযাতি বিস্মিত হয়ে বলেন—আসন গ্রহণ করুন, কিন্তু আমার কাছ থেকে মাত্র এইটুকু দানেই কি আপনি পরিতুষ্ট হবেন যোগিবর? আমার কাছ থেকে কি আর কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করবার নেই?

আসন গ্রহণ করবার পর তপস্বী বলেন—আমি আপনাকে একটি দিব্য লোকনীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি রাজা যযাতি। যদি শ্রবণ করেন, তবেই আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করা হবে।

যযাতি—বলুন যোগিবর।

তপস্বী—পুণ্যার্জন লোকজীবনের একটি লক্ষ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু স্মরণে রাখবেন. পুণ্যার্জনের পথটিও পুণ্যময় হওয়া চাই।

যযাতি—আপনার উপদেশের তাৎপর্য বুঝলাম না যোগিবর।

তপস্বী—মহৎ পন্থা ছাড়া মহদভীষ্ট লাভ হয় না রাজা যযাতি। সদাচরণে সদ্‌বস্তু. সম্মানের পথে সম্মান লাভ হয়. অন্যথায় হয় না।

যযাতি—কেন হয় না?

তপস্বী—যেমন মহিষের শৃঙ্গাঘাতে পুষ্পদ্রুম মঞ্জরিত হয় না, হয় বসন্তানিলের মৃদুল স্পর্শে। নিষাদের করধৃত কাষ্ঠাগ্নির প্রজ্বলন্ত আলোকে নিদ্রিত বিহঙ্গ জাগে না রাজা যযাতি, জাগে প্রাচীপটে অভ্যুদিত নবার্কের আলোকাপ্লুত ইঙ্গিতে। শোণিতজলা বৈতরণীর তরঙ্গে স্বর্গমরাল কেলি করে না, তার জন্য চাই মানসহ্রদের স্বচ্ছোদক।

যযাতি—শুনলাম যোগিবর।

তপস্বী—স্মরণে রাখবেন নৃপতি।

যযাতি—বনবাসীর লোকনীতি বনের জীবনেই সত্য হতে পারে যোগিবর, নৃপোত্তম যযাতির পক্ষে এমন নীতি স্মরণ ক'রে রাখবার কোন প্রয়োজন

নেই। সংকল্প যে-কোন পন্থায় সিদ্ধ করাই রাজসিক ধর্ম। যদি একটি বিষদিগ্ধ শরের আঘাতে হত্যা ক'রে মাতঙ্গের মস্তক-মৌক্তিক লাভ করা যায়, তবে কোন্ মূর্খ শতবর্ষ প্রতীক্ষায় থাকে, কবে কোন্ পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রের পুলকিত জ্যোতির আবেদনে সে গজমৌক্তিক আপনি স্খলিত হবে বলে? এক মুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ ক'রে পাতালভুজঙ্গের চক্ষু এক মুহূর্তে অন্ধ ক'রে দিয়ে যদি ফণামণি লাভ করা যায়, তবে শতবর্ষ ধ'রে নাগপূজা করবার কি সার্থকতা?

তপস্বী আর প্রত্যুত্তর দিলেন না। গাত্রোত্থান করলেন এবং রাজসভা ছেড়ে চলে গেলেন। রাজা যযাতি লক্ষ্য করলেন, সভাপ্রান্তে আর একজন প্রার্থী এসে বসে আছেন কান্তিমান এক ঋষিযুবা।

যযাতি আহ্বান করেন—আপনার প্রার্থনা নিবেদন করুন ঋষি।

ঋষিযুবা বলেন- আমি অর্থের প্রার্থী।

রাজা যযাতি এক শত তাম্রমুদ্রা হাতে তুলে নিয়ে বলেন—গ্রহণ করুন ঋষি।

ঋষিযুবা হেসে ফেলেন—ঐ যৎসামান্য অর্থের প্রার্থী আমি নই রাজা যযাতি।

যযাতি—আপনার কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন?

ঋষিযুবা—নিশাকরসদৃশ শুভ্রদেহ এবং শ্যামৈককর্ণ অষ্ট শত অশ্ব সংগ্রহ করতে হলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাই আমাকে দান করুন।

ঋষিযুবার কথা শুনে রাজা যযাতির হর্ষোৎফুল্ল বদন মুহূর্তের মধ্যে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। বৈভবহীন যযাতির রত্নাগার শূন্য ক'রে দিলেও নিশাকর-সদৃশ শুভ্রদেহ ও শ্যামৈককর্ণ অষ্ট শত দুর্লভ অশ্ব ক্রয় করবার মত অর্থ হবে না। ঋষি হয়েও এমন অপরিমেয় অর্থ প্রার্থনা করেন, কে এই ঋষি?

রাজা যযাতি সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করেন—আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছা করি ঋষি।

ঋষিযুবা—আমি বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালব।

রাজা যযাতি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ান এবং আগ্রহাকুল স্বরে বলেন—আপনি বিশ্বামিত্র-আশ্রমের বিখ্যাত জ্ঞানী গালব?

গালব—আমাকে জ্ঞানী গালব বলে সংবর্ধনা করবেন না রাজা যযাতি। এত বড় সম্মান-সম্ভাষণ লাভের অধিকার আমার এখনও হয়নি। আমি এখনও ঋণমুক্ত হতে পারিনি।

যযাতি—কিসের ঋণ?

গালব—গুরুঋণ। গুরুকে এখনও দক্ষিণা দান করতে পারিনি। জ্ঞানী

গালব নামে মর্ত্যলোকে খ্যাত হবার মত গৌরবের অধিকারী হতে পারব না, যতদিন না গুরুকে দক্ষিণা দান ক'রে মুক্ত হতে পারি।

যযাতি—শুনেছি, বিশ্বামিত্রের মত উদারস্বভাব তপোধন শিষ্যের একটি মাত্র প্রণামে তুষ্ট হয়ে থাকেন, তার চেয়ে বেশি বা অন্য কোন দক্ষিণা তিনি গ্রহণ করেন না।

গালব—গুরু বিশ্বামিত্র আমার কাছে কোন দক্ষিণা চাননি রাজা যযাতি। আমিই তাঁকে দক্ষিণা দিতে চেয়েছি, কারণ আমি কারও কাছে ঋণী হয়ে থাকতে চাই না। গুরু আমাকে জ্ঞান দান করেছেন, আমি যথোচিত দক্ষিণাদানে তাঁর গুরুত্বের মূল্য শোধ ক'রে দেব। আমারই নির্বন্ধাতিশয়ে গুরু আমার কাছ থেকে দক্ষিণা গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছেন।

যযাতি—কি দক্ষিণা চেয়েছেন আপনার গুরু?

গালব—পূর্বেই বলেছি নৃপতি, শশিসদৃশ সিতদেহ এবং এক কর্ণ শ্যামবর্ণ, এইরূপ অষ্টশত অশ্ব।

যযাতি—কি দারুণ দক্ষিণা! গুরু আপনার উপর অদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন ঋষি।

গালব—হ্যাঁ রাজা যযাতি, আমার নির্বন্ধাতিশয়ে তিনি [illegible] হয়েছেন এবং আমার মানগর্ব খর্ব করবার জন্যই এই দুঃসংগ্রহণীয় দক্ষিণা চেয়েছেন।

কুণ্ঠিত স্বরে যযাতি বলেন—ঋষি গালব, ধনপতি কুবের ছাড়া বোধ হয় এমন ঐশ্বর্যশালী আর কেউ নেই, যাঁর পক্ষে এইরূপ অষ্টশত অতিদুর্লভ সুজাত অশ্ব সংগ্রহের মত উপযুক্ত পরিমাণের সম্পদ দান করা সহজসাধ্য। আমার পক্ষে তো অসাধ্য।

গালব—শুনেছিলাম, আপনি দানের গৌরবে গরীয়ান হয়ে স্বর্লোকের সকল রাজর্ষির মধ্যে মানিশ্রেষ্ঠ হবার সংকল্প করেছেন।

যযাতি—হ্যাঁ ঋষি, এই সংকল্পই আমার জীবনের স্বপ্ন।

গালব—আপনার এই স্বপ্ন সফল করবার সুযোগ আমি এনেছি রাজা যযাতি। বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালবের প্রার্থনা আপনি পূর্ণ করতে যদি পারেন, তবে আপনার খ্যাতি সকল দানীর খ্যাতি ম্লান ক'রে দেবে। আপনি মানিশ্রেষ্ঠ হতে পারবেন আপনি স্বর্লোকের সকল রাজর্ষির মধ্যে সর্বোচ্চ আসন লাভ করতে পারবেন।

যযাতি—আপনি ঠিকই বলেছেন ঋষি।

গালব—তা হলে অবিলম্বে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করবার ব্যবস্থা করুন।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন রাজা যযাতি। ঋষি গালবের প্রার্থনা পূর্ণ করতেই হবে। মানিশ্রেষ্ঠ হবার সুযোগ এসেছে এতদিনে, এই সুযোগ বিনষ্ট হতে

দিতে পারবেন না যযাতি। প্রার্থী ঋষি গালব যদি আজ বিমুখ হয়ে চলে যান দানশক্তিহীন যযাতির অপবাদ ত্রিভুবনে রটিত হয়ে যাবে। স্বর্গে যাবার পথ অবরুদ্ধ হবে চিরকালের মত। মানহীন সে জীবনের চেয়ে বেশি অভিশপ্ত জীবন আর কি হতে পারে?

কিন্তু উপায়? উপায় চিন্তা করেন রাজা যযাতি। সঙ্গত বা অসঙ্গত, সৎ বা অসৎ, কূট কিংবা সরল, করুণ অথবা নির্মম, যে কোন উপায়ে হবে আজ তাঁর দানশীল জীবনের গর্ব ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর যযাতি বলেন- আমার রত্নাগার যদিও শূন্য, কিন্তু আমার প্রাসাদে একটি দুর্লভ ও অনুপম রত্ন আছে ঋষিবর। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আশা করি, আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারব।

সভাগৃহ ছেড়ে ব্যস্তভাবে রাজা যযাতি প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

রাজা যযাতির কাছ থেকে প্রার্থিত অর্থের প্রতিশ্রুতি পেয়ে আশ্বস্ত মনে শূন্য সভাগৃহের একপ্রান্তে বসে রইলেন গালব। এতদিনে গুরুঋণ থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানী গালব নামে যশস্বী হতে পারবেন, কল্পনা করতেও তাঁর অন্তর উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল। ত্রিভুবন জানবে ঋষি গালব এক অতিকঠিন ও অসাধ্যপ্রায় দক্ষিণা দান করে গুরুদত্ত জ্ঞানের মূল্য শোধ করে দিয়েছেন। গালবের কীর্তিকথা প্রতি জনপদের চারণের মুখে সঙ্গীতের মত ধ্বনিত হবে। গালবও বিশ্বাস করেন, ত্রিলোকের জনসমাজে মানী হওয়াই একমাত্র পুণ্যকর্ম এবং মানবলই একমাত্র পুণ্যবল।

নিজের সৌভাগ্যের কথা ভেবেও মনে মনে ধন্য হচ্ছিলেন গালব। নৃপতি যযাতির কাছ থেকে প্রার্থিত অর্থের প্রতিশ্রুতি পেয়ে গিয়েছেন। এই বৈভব-হীন রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি দুর্লভ ও অনুপম রত্ন আছে সেই রত্ন দান করবেন যযাতি। দুর্লভ রত্নের বিনিময়ে অষ্টশত দুর্লভ অশ্ব সংগ্রহ করা কঠিন হবে না। সভাগৃহের প্রান্তে বসে অধীর আগ্রহে রাজা যযাতির জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন ঋষি গালব।

চমকে উঠলেন গালব। শূন্য সভাগৃহের বক্ষ যেন হঠাৎ পরিমলবিধুর সমীরের স্পর্শে মদির হয়ে উঠেছে। সভাগৃহে প্রবেশ করেছেন রাজা যযাতি, তাঁর সঙ্গে পুষ্পাভরণে ভূষিতা এক কুমারী। মঞ্জুলগতি সে নারীর পায়ে নূপুর আছে, কিন্তু কি আশ্চর্য, তার পদচ্ছন্দে নূপুর নিক্বণিত হয় না। সৌরভ্যে রমিতা ও সৌবর্ণ্যে বন্দিতা, পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত এক নারীর মূর্তি রাজা যযাতির সঙ্গে সভাগৃহে এসে ব্রীড়াকুণ্ঠিত হয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা যযাতি বলেন—ঋষি গালব, আমার এই একটিমাত্র রত্ন আছে, আমার কন্যা মাধবী। এই রত্ন ছাড়া আপনাকে দান করবার মত আর কোন রত্ন নেই।

রত্ন? ঋষি গালব তাঁর দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে সুতীব্র কৌতূহল নিয়ে কুমারী মাধবীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু কোথায় রত্ন?

রত্নের চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলেন না গালব। যযাতিনন্দিনী মাধবীর কুণ্ডলস্তবক থেকে পদনখ পর্যন্ত দেহের কোথাও কোন রত্নভূষণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। স্বর্ণনূপুরও নয়, শুধু কতগুলি স্বর্ণযূথিকার কোরক সেই রূপমতী তরুণীর কিশলয়কোমল চরণের স্পর্শপ্রণয়ে যেন মূর্ছিত হয়ে আছে।

যযাতি বলেন—আমার এই রত্নকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম ঋষি। আপনি তৃপ্ত ও তুষ্ট হোন। আমার দান সিদ্ধ হোক এবং আমার দানবলে অর্জিত পুণ্যের বলে আমি স্বর্গে গিয়ে ত্রিলোকবিশ্রুত রাজর্ষিদের মধ্যে আমার কাঙ্ক্ষিত স্থান গ্রহণ করি।

যযাতিনন্দিনী মাধবী ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে এবং গালবকে প্রণাম করে। কিন্তু গালব বিব্রত ও বিচলিতভাবে যযাতিকে লক্ষ্য ক'রে বলেন—আপনি আমাকে অর্থের প্রতিশ্রুতি দিয়েও কেন বঞ্চিত করছেন রাজা যযাতি? আমি অর্থ প্রার্থনা করেছি, আমাকে অর্থ দান করুন। পুষ্পান্বিতা বনলতিকার মত সুন্দর অথচ মূল্যহীন এই কুমারীকে দানস্বরূপ গ্রহণ ক'রে কি লাভ হবে আমার?

যযাতি দুঃখিতভাবে বলেন—চন্দ্রমণিরও অধিক রূপপ্রভাশালিনী এই কন্যাকে মূল্যহীন কেন মনে করছেন ঋষি? এই ভুবনের যে-কোন দিক্‌পাল নরপতি তাঁর রত্নাগারের বিনিময়ে আমার এই কন্যাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না।

—পিতা!

অবনতমুখিনী মাধবী হঠাৎ মুখ তুলে পিতা যযাতির মুখের দিকে তাকায়। মাধবীর কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক, অসিতনয়নে যেন চকিত বিদ্যুতের জ্বালা, এবং ভীরু ভ্রূলতায় যেন খর গ্রীষ্মবায়ুর আঘাত এসে লেগেছে।

পিতা যযাতির কথার অর্থ এতক্ষণে স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পেরেছে কুমারী মাধবী। ঐ সুন্দরতনু তরুণ ঋষির কাছে তাঁর স্নেহের কন্যাকে সম্প্রদান করছেন না পিতা যযাতি। এক মুষ্টি তাম্রমুদ্রা অথবা যবশস্যকণা হাতে তুলে নিয়ে প্রার্থীকে যেমন অকাতরচিত্তে দান করেন দাতা যযাতি, এই দানও তেমনই দান। এই দানের অনুষ্ঠান যযাতিনন্দিনী মাধবীর পতিলাভের আয়োজন

নয়; ঋষি গালব শুধু দাতা যযাতির কাছ থেকে মূল্যবান একটি বস্তু লাভ করছেন, যে বস্তুর বিনিময়ে রত্ন ও অর্থ সংগ্রহ করা যায়।

-কিসের জন্য, কার কাছে এবং কি সম্বন্ধে আমাকে দান করছেন পিতা?

প্রশ্ন করতে গিয়ে কুমারী মাধবীর চক্ষু বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে। এই তো মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত আগে তার কুমারী-জীবনের সকল আগ্রহ নিয়ে যেন এক পরিণয়োৎসবের আলিম্পিত অঙ্গনভূমিতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাধবী, গালব নামে কুবলয়নয়ন ঐ পুরুষপ্রবরের বরতনু বরণ করবার জন্য। কিন্তু বৃথা সে কল্পনা এক ক্ষণিকা মরীচিকার চিত্র মাত্র।

শান্তস্বরে এবং অবিচলিতভাবে রাজা যযাতি প্রত্যুত্তর দেন—প্রার্থীকে বিমুখ করতে পারি না কন্যা। নৃপতি যযাতির কাছ থেকে দান চেয়েও প্রার্থী ফিরে যাবে দান না পেয়ে, এই অপযশের চেয়ে আমার কাছে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতিও কম ক্লেশকর। রাজা যযাতি যদি সবচেয়ে বড় দানবলে সবচেয়ে বেশি মানবান ও পুণ্যবান হয়ে স্বর্গলোকের রাজর্ষিদের মধ্যে উচ্চাসন লাভ না করতে পারে, তবে যযাতির জীবনে শত ধিক্। সারা জীবন ধ'রে, প্রতি মুহূর্তের নিঃশ্বাসে ও প্রশ্বাসে লালিত আমার আকাঙ্ক্ষাকে আজ বিফল করতে পারি না তনয়া। গুরুদক্ষিণার দায় হতে মুক্ত হবার জন্য ঋষি গালব আমার কাছে অর্থ প্রার্থনা করেছেন, আমিও অর্থের পরিবর্তে তোমাকে ঋষি গালবের হস্তে প্রদান ক'রে দায়মুক্ত হতে ও আমার দানগৌরব রক্ষা করতে চাই। বৈভবহীন এই যযাতিকে বাৎসল্যহীন পিতা বলে মনে করো না কন্যা। এই পিতৃহৃদয়কে কুলিশবৎ কঠোর ক'রে, আমার সকল মমতার মণিস্বরূপিণী তোমাকে আজ প্রার্থীর হস্তে পণ্যবস্তুর মত প্রদান করতে হচ্ছে। কল্পনা করতে পার কন্যা, আমার এই ত্যাগের চেয়ে বড় ত্যাগ, আমার এই দানের চেয়ে বেশি দুঃসাধ্য দান আর কি হতে পারে?

মাথা হেঁট করে মাধবী। বাষ্পায়িত চক্ষু আবার শুষ্ক হয়ে ওঠে। আর কোন প্রশ্ন করার ইচ্ছা হয় না। পিতা যযাতির হৃদয় কুলিশ না হোক, কিন্তু তাঁর সংকল্প যে সত্যই কুলিশবৎ কঠোর।

অন্য কথা ভাবছিল মাধবী। সূর্যালোকস্নাত নব দেবদারুর মত যৌবন-সিঞ্চিত দেহশোভা নিয়ে যে ঋষিব মূর্তি নিকটে দাঁড়িয়ে আছে, তার সংকল্পও কি কুলিশবৎ কঠোর? ঐ বিস্তৃত বক্ষঃপটের অন্তরালে কি অনুরাগ নেই? ঐ ফুল্ল কুবলয়সদৃশ চক্ষু দুটি কি অকারণে নীলিম হয়ে রয়েছে? যযাতি-তনয়া মাধবীর প্রণামের অর্থ বুঝতে পারবে না, সে কি এমনই অবুঝ? যে নারীকে পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত সুন্দর মনে হয়েছে, তাকে কি সত্যই মূল্যহীন বলে মনে করতে পারে এই মনসিজগঞ্জন সুন্দর ঋষি?

কিন্তু. নিজেরই মনের মোহে বৃথা এক মরীচিকার চিত্র দেখছে মাধবী। এবং পরক্ষণেই সে চিত্র যেন এক তপ্ত ধূলিবাত্যার তাড়নায় ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে গেল, যখন কথা বললেন ঋষি গালব।

—চন্দ্রমণিসমা রূপশালিনী নারী আমি চাই না নৃপতি যযাতি, আমি চাই চন্দ্রমণি। আমি গুরুদক্ষিণার দায় হতে মুক্ত হতে চাই, তার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ চাই। এ ছাড়া অন্য কোন দানে আমি তৃপ্ত হতে পারব না নৃপতি যযাতি। যদি আপনার কন্যা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে আপনার দানের মর্যাদা রক্ষা করবে এই ভুবনের যে কোন দিক্‌পাল নরপতির কাছ থেকে আমার আকাঙ্ক্ষিত গুরুদক্ষিণার সামগ্রী অথবা মূল্য সংগ্রহের প্রযত্নে সহায়িকা হবে, তবেই আমি আপনার কন্যাকে সমুচিত মূল্যযুক্ত দান বলে গ্রহণ করতে পারি, নচেৎ পারি না।

—ঋষিবর।

মৃদুভাষিণী কুমারী মাধবীর দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে চমকিত ঋষি গালব ক্ষণিকের মত অপ্রস্তুত হয়ে মাধবীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। মুখ তুলে ঋষি গালবের দিকে তাকিয়ে মাধবী বলে—আপনার গুরুদক্ষিণার সামগ্রী অথবা মূল্য সংগ্রহের প্রযত্নে সহায়িকা হব আমি, প্রতিশ্রুতি দিলাম ঋষি।

গালব বলেন—শুনে সুখী হলাম কুমারী।

কৃতার্থচিত্তে রাজা যযাতির দিকে তাকিয়ে গালব বলেন—আমি আপনার এই কন্যাকে আপনার দানস্বরূপ গ্রহণ করলাম রাজা যযাতি।

পিতা যযাতিকে প্রণাম করে মাধবী। তারপর বিদায় গ্রহণ ক'রে, কুণ্ঠাহীন ও স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে সভাগৃহ ছেড়ে ঋষি গালবের সঙ্গিনী হয়ে চলে যায়।

কাশীশ্বর দিবোদাসের প্রাসাদ। স্ফটিক শিলায় নির্মিত চূড়া দূর থেকে পথিকের নয়নে সূর্যাংশুগঠিত দণ্ডের মত প্রতিভাত হয়। মরকতে মণ্ডিত স্তম্ভ ও প্রবালে খচিত সোপান। রত্নাঢ্য রাজা দিবোদাস কুবেরের ঈর্ষা সমুৎপন্ন ক'রে রাজসিক ঐশ্বর্যে সমাসীন হয়ে আছেন।

দিবোদাসের স্ফটিকশিলার প্রাসাদ হতে কিঞ্চিৎ দূরে সীধুগন্ধ বকুলে আকীর্ণ একটি উদ্যান, মাঝে মাঝে নীলাঙ্গী অতসীর কুঞ্জ। তারই মধ্যে প্রিয়ঙ্গুলতিকায় মণ্ডিত এক অতিথিবাটিকায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন ঋষি গালব ও তাঁর সাথে যযাতিনন্দিনী মাধবী।

গালব ও মাধবী, একজনের হৃদয় শুধু অর্থের প্রার্থনা এবং আর একজনের জীবন অর্থসংগ্রহে সহায়তার প্রতিশ্রুতি মাত্র। এ ছাড়া দুজনের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক নেই।

এই মাত্র পরস্পরের বন্ধন। তবু যখন গালব ও মাধবী এক তরুণ ঋষি আর এক সুযৌবনা কুমারী, অতিথিবাটিকার অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন উদ্যানের বকুলসৌরভ অকস্মাৎ মদিরতর হয়ে ওঠে; প্রিয়ঙ্গুলতিকা হঠাৎ আন্দোলিত এবং অলিচুম্বিত অতসী হঠাৎ শিহরিত হয়। ভুল করে উদ্যানের প্রণয়-প্রগল্‌ভ লতা কিশলয় ও পুষ্পের দল, কিন্তু ভুল করে না গালব ও মাধবী।

গালব বলেন—শোন যযাতিতনয়া।

মাধবী—বলুন।

গালব—আমার গুরুদক্ষিণার জন্য প্রয়োজন সেই শ্যামৈককর্ণ শুক্লাশ্ব এই ভুবনের কোথায় কার কাছে কত সংখ্যক আছে, তার সন্ধান পেয়েছি।

• মাধবী—কোথায় আছে?

গালব—এই কাশীশ্বর দিবোদাসের ভবনে এইরূপ দুই শত শুক্লাশ্ব আছে। অথচ আমার গুরুদক্ষিণার জন্য প্রয়োজন এইরূপ অষ্টশত শুক্লাশ্ব।

মাধবী—আর ছয় শত?

গালব—দুই শত আছে অযোধ্যাধিপতি হর্যশ্বের ভবনে।

মাধবী—আর চারি শত?

গালব—ভোজরাজ উশীনরের ভবনে দুই শত আছে।

মাধবী—আর দুই শত?

গালব—ত্রিভুবনে কোথাও নেই। দুঃসংবাদ পেয়েছি, বিতস্তার সলিলে নিমজ্জিত হয়েছে আর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এই দুর্লভ শুক্লাশ্বের শেষ যূথ। এইবার তোমার কর্তব্য অনুমান ক'রে নাও কুমারী।

মাধবী ব্যথিতভাবে তাকায়—অনুমান করতে পারছি না ঋষি।

গালব—নৃপতি দিবোদাস হর্যশ্ব আর উশীনরের তুষ্টি সম্পাদন ক'রে আমার গুরুদক্ষিণার সামগ্রীস্বরূপ এই ছয় শত শুক্লাশ্ব তুমি উপহার-স্বরূপ অর্জন কর।

মাধবী—অর্জন করব ঋষি, আপনার নির্দেশের অমান্য করব না। কিন্তু তবুও যে আপনার গুরুদক্ষিণার পরিমাণ পূর্ণ হয় না ঋষি। এই খণ্ডিত পরিমাণের দক্ষিণায় কেমন ক'রে তুষ্ট হবেন আপনার গুরু রাজর্ষি বিশ্বামিত্র?

গালব—রাজর্ষি বিশ্বামিত্রেরও তুষ্টি সম্পাদন ক'রে দক্ষিণার এই অদত্ত অংশের মূল্য পূর্ণ ক'রে দেবার দায় তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে এবং পালন করতেও হবে মাধবী।

মাধবী—বুঝতে পেরেছি ঋষি।

বুঝতে পেরেছে যযাতিদুহিতা মাধবী, পর পর চারিটি কঠোর পরীক্ষার

সম্মুখে গিয়ে ভিক্ষার্থিনীর মত দাঁড়াতে হবে। বিশ্বাস করে মাধবী, বিফল হবে না সেই ভিক্ষার্থনা। তার অশ্রুসিক্ত চক্ষুর আবেদনের দিকে তাকিয়ে গালবানুরাগিণী যযাতিতনয়ার হৃদয়ের অনুরোধ কি দেখতে পাবেন না রাজা দিবোদাস হর্যশ্ব ও উশীনর, এবং রাজর্ষি বিশ্বামিত্র? বুঝতে পারবেন না কি পৃথিবীর এই তিন ঐশ্বর্যবান ও এক পুণ্যবান মহানুভব পৃথিবীর এক দীনা রত্নলেশবিহীনা প্রেমিকা তার বাঞ্ছিতের মুক্তিপণ প্রার্থনা করবার জন্য তাঁদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে? জাগবে না কি অনুকম্পা, আর্দ্র হবে না কি চক্ষু?

সংশয়াপন্ন স্বরে পুনরায় প্রশ্ন করেন গালব—সত্যই কি বুঝতে পেরেছ যযাতিতনয়া?

মাধবী—কি?

গালব—পৃথিবীর এই তিন ঐশ্বর্যবান ও এক পুণ্যবান যদি তুষ্ট হন তবেই তাঁরা তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।

মাধবী—আমি বুঝেছি ঋষি; তাঁরা আমার প্রার্থনা পূর্ণ ক'রে তুষ্ট হবেন।

—বুঝতে পারনি যযাতিতনয়া। অপ্রসন্ন স্বরে প্রতিবাদ করেন গালব, এবং মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হন। কি-এক মিথ্যা আশ্বাসে ও বিশ্বাসে যেন মুগ্ধ হয়ে এই লতাবাটিকার ছায়াচ্ছন্ন শান্তির মধ্যে শান্ত হয়ে রয়েছে রূপবতী এই কুমারী। ভুলে গিয়েছে মাধবী, পিতা যযাতির নির্দেশে এক প্রতিশ্রুতির কাছে বিক্রীত হয়ে গিয়েছে পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত যযাতিতনয়ার যৌবনকমনীয় দেহ।

লক্ষ্য করেন গালব, জীবনের একমাত্র প্রতিশ্রুত কর্তব্যের জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ না ক'রে মাধবী যেন দিন দিন আরও অন্যমনা ও উদাসীনা হয়ে উঠছে। কখনও বা লক্ষ্য করেছেন, কুঞ্জের অন্তরালে শীতভীরু মল্লিকার মত যেন মুখ লুকিয়ে বসে থাকে মাধবী। সুপ্তির মাঝখানে হঠাৎ জাগরিত হয়ে অন্ধকারের মধ্যে অনুভব করেছেন গালব, তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে কে যেন তার পরাগবাসিত চেলাঞ্চল আন্দোলিত ক'রে এতক্ষণ তাঁকে ব্যজন করছিল, হঠাৎ অন্তর্হিত হলো। উদ্যানের তৃণভূমিতে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাকাশের চন্দ্রের দিকে যখন তাকিয়েছেন গালব, তখনও অনুভব করেছেন, যযাতিনন্দিনী মাধবী তার অসিত নয়নের নিবিড়দৃষ্টি তাঁরই দিকে নিবদ্ধ ক'রে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে।

ভীত বিরক্ত এবং আরও অস্থির হয়ে উঠেছেন গালব। কি চায় মাধবী? কৈতবিনী এই নারী কি বিশ্বামিত্রশিষ্য গালবকে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট করতে চায়?

পিতা যযাতির দানগৌরব বিনষ্ট করতে চায়? নিজ মুখে উচ্চারিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে চায়? নইলে, নিঃসম্পর্কিতা এই নারী ঋষি গালবের সঙ্গে প্রিয়াসুলভ লীলাকলাপের প্রয়াস করে কেন?

গালব বলেন—আমি আর অপেক্ষায় থাকতে পারি না মাধবী। প্রতিশ্রুতি পালন কর কুমারী। তারপর তুমি দায়মুক্ত হয়ে তোমার পিতার কাছে ফিরে যাও, আমিও গুরুদক্ষিণা দান ক'রে আমার গৃহে ফিরে যাই।

মাধবী—কেন গালব?

চমকে উঠলেন গালব। আর সন্দেহ নেই, সকল কুণ্ঠা ও লজ্জা বর্জন ক'রে যযাতিকন্যা আজ প্রণয়াভিলাষিণী প্রিয়ার মতই মধুর সম্ভাষণে গালবকে ডাকছে।

• গালব বলেন—ভুল করো না মাধবী। অঙ্গীকার পালন করা ছাড়া আমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করো না। নারীর প্রেমের চেয়ে লোকসম্মান আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান।

মাধবী—এমন নির্মম কথা বলো না গালব। তোমার প্রেমিকা মাধবীর দিকে একটি মুহূর্তের জন্যও মুগ্ধ হয়ে তাকালে তোমার সম্মান বিনষ্ট হবে না।

গালব—তা হয় না মাধবী।

মাধবী—তোমার শুভার্থিনী ও কল্যাণকামিকা, তোমার চরণের স্পর্শের জন্য প্রণামনমিতা এই মাধবীর জন্য একটুও মমতা আর একটুও লোভ হয় না গালব?

গালব ক্ষমা কর কুমারী মাধবী, এমন লোভে আমার প্রয়োজন নেই।

পরুষস্পর্শে আহত বীণাতন্ত্রীর মত বেজে ওঠে মাধবীর কণ্ঠস্বর—দুঃসাহসী ঋষি, সন্ধ্যাকাশের ঐ সুন্দর শশাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বল দেখি, কোন প্রয়োজন নেই?

গালব—প্রয়োজন নেই যযাতিনন্দিনী মাধবী।

শান্ত স্বরে মাধবী বলে—তবে আজ্ঞা করুন ঋষি।

গালব—আর অকারণ এই লতাকুঞ্জের জ্যোৎস্নাময় নিভৃতে কালক্ষেপ না ক'রে নৃপতি দিবোদাসের সন্নিধানে গমন কর যযাতিতনয়া। তিনি তোমারই প্রতীক্ষায় কালযাপন করছেন। আমি যথাবিহিত সংস্কারে ও মন্ত্রবচনে তাঁর কাছে তোমাকে প্রদান ক'রে এসেছি।

মাধবীর দুই নয়নে দুরন্ত বিস্ময় অকস্মাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।—আমাকে প্রদান করেছেন?

গালব—হ্যাঁ, প্রদান করবার অধিকার আমার আছে। তোমার পিতা আমাকে সেই অধিকার দিয়েছেন।

মাধবী—এইভাবেই কি একে একে আরও দুই ঐশ্বর্যবান নৃপতি ও এক পুণ্যবান রাজর্ষির কাছে আমাকে প্রদান করবেন আপনি?

গালব—হ্যাঁ কুমারী।

মাধবী—আমি কি বিক্রেয়া পণ্যা এবং সত্তাবিহীনা এক যৌবনসামগ্রী?

গালব—তুমি প্রতিশ্রুতি।

যন্ত্রণাক্ত ধিক্কারধ্বনির মত সুতীক্ষ্ম স্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে মাধবী হীনা বারযোষার মত এক হতে অন্য জনের, বহু হতে বহুতরের এক একজন প্রবলকাম রাজা ও রাজর্ষির মদোৎসবের নায়িকা হবার প্রতিশ্রুতি আমি নই ঋষি। নারীধর্মাপহ আচরণে আমাকে কখনই প্রবৃত্ত করতে পারেন না আপনি। অবিধিবশ হবার কোন অধিকার আপনার নেই।

গালব—আমি একান্তই বিধিবশ, এবং তোমাকে এক প্রথানুকুল জীবনের আনন্দ বরণ করবার জন্য প্রস্তুত ও প্রবৃত্ত হতে বলেছি।

বিস্মিত হয় মাধবী—প্রথানুকূল জীবন?

গালব—হ্যাঁ কুমারী।

মাধবী—তোমার প্রদত্তা এক কুমারী নারীকে কোন্ অভীষ্টলাভের জন্য গ্রহণ করবেন পৃথিবীর তিন ঐশ্বর্যবান ও এক পুণ্যবান?

গালব—বিবাহের জন্য।

মাধবী—এ কেমন বিবাহ?

গালব—অস্থেয় বিবাহ। এই বিবাহ এক নর ও এক নারীর জীবনে অচিরমিলনের অঙ্গীকার, যে অঙ্গীকার ব্রতাচারের মতই উদ্‌যাপিত হয়ে নির্দিষ্ট কালের অন্তে শেষ হয়ে যায়। পরিসীম পরিণয়ের এই রীতিও জগতে প্রচলিত আছে যযাতিতনয়া। যথানির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হলে পরিণীতা নারী পুনরায় কন্যাকাদশা লাভ ক'রে সমাজে কুমারীরূপে স্বীকৃতা ও পরিচিতা হয়ে থাকে।

মাধবী—কবে সমাপ্ত হবে আমার এই অস্থেয় বিবাহের জীবন?

গালব—পরিণেতাকে যেদিন তুমি এক পুত্রসন্তান উপহার দিতে পারবে, সেইদিনই পত্নীত্বের সকল দায় হতে মুক্ত হয়ে যাবে তুমি।

মাধবীর ওষ্ঠপ্রান্তে যেন এক মূঢ় বিস্ময়ের হাসি বেদনায় পুড়তে থাকে। —সুন্দর এক বৈধ ব্যভিচারের কথা বলছেন ঋষি!

গালব—আমার বক্তব্য বলেছি, আর কিছু বলবার নেই। এইবার তুমি তোমার কর্তব্য বুঝে দেখ কুমারী।

শান্তভাবে দুই চক্ষুর উদ্‌গত অশ্রুবারি হস্তালেপে মোচন করে মাধবী বলে বুঝেছি ঋষি, আমার জীবনের এক একটি দশ মাস ও দশ দিনের যাতনাসঞ্জাত পুষ্প আমারই বক্ষ হতে ছিন্ন ক'রে নিয়ে, আমার বক্ষের উচ্ছ্বসিত পীযূষকে অধন্য ক'রে দিয়ে, পৃথিবীর তিন ঐশ্বর্যবান ও এক পুণ্যবান আমাকে আমারই শূন্য সংসারের কাছে পুনরায় ফিরিয়ে দেবেন।

গালব—হ্যাঁ কুমারী।

মাধবী—তারপর?

গালব—তারপর তুমি মুক্ত।

মাধবী—আর তুমি?

গালব—আমিও গুরুঋণ হতে মুক্ত হব।

মাধবী—তারপর?

ক্রূরবায়ুবিমর্দিতা ব্রততী যেন তার আশাভঙ্গে ভগ্ন দেহভারের বেদনা সহ্য ক'রে তবু এক আশ্বাসের স্বপ্ন দেখতে চাইছে। দুই হাতে সিক্ত চক্ষু আবৃত ক'রে ব্যাকুল স্বরে মাধবী প্রশ্ন করে।—বল ঋষি, তারপর কি হবে?

নীরব হয় মাধবী। জ্যোৎস্নালিপ্ত লতাকুঞ্জও যেন হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

মাধবী আবার বলে—বল ঋষি যেদিন স্বাধীন হবে আমার হৃদয় ও আমার হাতের বরমাল্য, সেদিন কোথায় থাকবে তুমি?

মাধবীর প্রশ্নের কোন উত্তর লতাকুঞ্জের নিভৃতের বক্ষে আর ধ্বনিত হয় না। অনেকক্ষণের স্তব্ধতার পর যেন হঠাৎ মূর্ছা হতে জেগে ওঠে মাধবী, চমকে চোখ মেলে তাকায়। দেখতে পায় মাধবী, কেউ নেই, তার নিকটে দাঁড়িয়ে এই ব্যাকুল প্রশ্ন কেউ শুনছে না। চলে গিয়েছেন গালব। দেখা যায়, দূরের লতাবাটিকার এক কক্ষের বাতায়নের কাছে সন্ধ্যাপ্রদীপের নিকটে ঋষি গালবের মূর্তি শান্ত আনন্দের ছায়ার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নৃপতি দিবোদাসের স্ফটিকভবনের দিকে তাকায় মাধবী।

মধ্য রাত্রি, নিশাবসানের এখনও অনেক বাকি। উদ্যানের কোকিল কূজন বন্ধ করেছে। অতিথিবাটিকার নিভৃতে একাকী বসেছিলেন গালব; গন্ধতৈলের প্রদীপে আলোকশিখার চাঞ্চল্য ছাড়া আর কোন চাঞ্চল্য কোথাও ছিল না। প্রতিশ্রুতির নারী মাধবী রাজা দিবোদাসের স্ফটিকশিলার প্রাসাদে চলে গিয়েছে।

অকস্মাৎ রত্ননূপুরের শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে অতিথিবাটিকার নিভৃত। দেখে বিস্মিত হন গালব, কুমারী মাধবী এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু

পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মূর্তি নয়, যেন অমরেশ্বর ইন্দ্রের অমরাপুরীর শতবত্ন-ভূষিতা এক প্রমদার মূর্তি।

অট্টহাস্যনাদে বিস্মিত গালবকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে মাধবী প্রশ্ন করে—চিনতে পারেন কি ঋষি?

গালব—চিনেছি।

মাধবী—পুষ্পাভরণে ভূষিতা সেই মাধবীকে এখন এই রত্নভূষণে বেশি সুন্দর মনে হয় কি?

গালব—না।

মাধবী—বেশি মূল্যবতী মনে হয় কি?

গালব—মনে হয়।

মাধবী—আপনারই পায়ে প্রণামাবনতা সেই মাধবীকে এখন আরও বেশি সম্মানিনী বলে মনে হয় কি ঋষি?

দৃষ্টি নত করেন নিরুত্তর গালব। মাধবী যেন তার নারীজীবনের এক সুগভীর বেদনাকে বিদ্রূপে ছিন্নভিন্ন করবার জন্য আরও তীক্ষ্ণ অট্টহাস্যে বলে ওঠে—চোখ তুলে তাকান ঋষি বলুন দেখি, এই নারীকে দেখে লোভ হয় কি না?

তবু নিরুত্তর থাকেন ঋষি গালব। মাধবী বলে—আপনার লোভ না হোক, রাজা দিবোদাস লুব্ধ হয়েছেন। তিনি আজ আমাকে তাঁর রাজ্যশ্রীরূপে গ্রহণ করবেন। এই রত্নভূষণ তাঁরই উপহার, আজ আমার আশ্রয় হবে রাজা দিবোদাসের বৈদূর্যখচিত শয়নপর্যঙ্ক।

যেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে চমকে উঠলেন ঋষি গালব এবং মাধবীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

অট্টহাসিনী প্রগল্‌ভা মাধবী হঠাৎ বাণবিদ্ধা কুরঙ্গীর মত যন্ত্রণায় চঞ্চল হয়ে ওঠে, উদ্গত অশ্রুধারা নিরোধের জন্য দু'হাতে চক্ষু আবরিত করে। পরমুহূর্তে দুর্বলা লতিকার মত ঋষি গালবের পায়ে লুটিয়ে পড়ে।—একবার লুব্ধ হও ঋষি, মুগ্ধ হও নিমেষের মত। পিতা যযাতির দান এই কুমারীর অনুরাগ প্রতিদানে সম্মানিত কর ঋষি সুকুমার! এখনও সময় আছে, থামাও তুমি, তাহ'লে এই মুহূর্তে এই রাজ্যশ্রীর রত্নাভরণ দিবোদাসের সম্মুখে অবহেলাভরে নিক্ষেপ ক'রে চলে আসি।

গালব—তারপর?

মাধবী—তারপর এই ভুবনে শুধু আমরা দু'জন।

গালব—তা হয় না মাধবী। জ্ঞানী গালব তার প্রখ্যাতি ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না। গুরুদক্ষিণাদানে অপারগ গালব জীবনব্যাপী অপবাদ নিয়ে বেঁচে

থাকতে পারবে না। বেঁচে থাকলেও সে অপবাদের জ্বালা যযাতিকন্যার বিম্বাধরের চুম্বনে শান্ত হবে না।

ধীরে ধীরে গালবের পদপ্রান্ত হতে লুণ্ঠিত দেহভার তুলে উঠে দাড়ায় মাধবী। শান্ত দৃষ্টি তুলে তাকায়। অবসন্ন দীর্ঘশ্বাসের ধ্বনির মত ক্লান্ত স্বরে বলে—ঠিকই বলেছেন ঋষি। আপনার জীবনের শান্তি ও সম্মান নষ্ট করতে পারি না। দয়িতের সুখের জন্য প্রণয়িনী নারী মৃত্যুবরণও করে। দুর্ভাগিনী যযাতিনন্দিনী না হয় কয়েকটি রাত্রির মত মৃত্যুবরণ করবে। আপনি প্রসন্ন হোন ঋষি।

অতিক্রান্ত হয়েছে বৎসরের পর বৎসর। আনন্দহীন বনবাসব্রতের মত অস্নেহ বিবাহের বন্ধন বরণ ক'রে তিন ঐশ্বর্যবান ও এক পুণ্যবানের অভিলাষের সহচরী হয়েছে মাধবী। তিন রাজা ও এক রাজর্ষির সংসারে তার সুন্দর তনুর স্নেহনির্যাসের মত এক একটি পুত্রসন্তান উপহার দিয়ে দায়মুক্ত হয়েছে মাধবী।

গুরুঋণ হতে মুক্ত হয়ে সসম্মানে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন গালব। জ্ঞানী গালবের সুকীর্তিকথা দেশে দেশে প্রচারিত হয়ে গিয়েছে।

দায়মুক্ত হয়েছেন যযাতি। জ্ঞানী গালবের মত ঋষির প্রার্থনা যিনি পূর্ণ করতে পেরেছেন তাঁর দানের গৌরববার্তা স্বর্লোকের রাজর্ষিসমাজেও পৌঁছে গিয়েছে।

আর মাধবী? বৈভবহীন রাজা যযাতির আলয়ে মাধবী ফিরে এসেছে।

ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন রাজা যযাতি। আর বিলম্ব করতে পারেন না। দানিশ্রেষ্ঠ নামে সর্বখ্যাত যযাতি স্বর্লোকে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

রাজা যযাতির বৈভবহীন এই মর্ত্য-প্রাসাদের জীবনে একটি মাত্র কর্তব্য যা বাকি আছে, তাই পালন করবার জন্য আয়োজন করলেন যযাতি, স্বর্গধামে যাবার আগে। কন্যা মাধবীকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদানের জন্য স্বয়ংবরসভা আহ্বান করলেন।

মাধবীর স্বয়ংবরসভা! সংবাদ শুনে ও আয়োজন দেখে মাধবী তার কক্ষের নিভৃতে অশ্রুসিক্ত চক্ষু মুছতে গিয়েও হাস্য সংবরণ করতে পারে না। কোথায় তার স্বয়ং এবং কোথায়ই বা তার বর? যার জীবনের কোন ইচ্ছার সম্মান কেউ দিল না, যার কামনার বরমাল্য অবাধ অবহেলায় তুচ্ছ ক'রে চলে গিয়েছে জীবনের একমাত্র বাঞ্ছিত, তার জন্য প্রয়োজন স্বয়ংবরসভা নয়, প্রয়োজন বধ্যমঞ্চ।

মনে পড়ে মাধবীর, ঋণমুক্ত হয়ে গালব তাঁর গৃহাশ্রমে চলে গিয়েছেন।

সে ঋষির জীবনে সম্মান ও শান্তি এসেছে। ভালই হয়েছে। কিন্তু একবারও কি সেই কুবলয়নয়ন তরুণ জ্ঞানিবরের মনে এই প্রশ্ন জাগে, পৃথিবীর আর কারও কাছে তাঁর কোন ঋণ রয়ে গেল কি না?

নৃপতির স্ফটিকপ্রাসাদের এবং রাজর্ষির আশ্রমভবনের এক একটি নিশীথের ঘটনা মনে পড়ে মাধবীর। এই স্মৃতি সহ্য করতে পারে না মাধবী; গৃহের নিভৃত হতে ছুটে এসে প্রাসাদের বাহিরের উপবনবীথিকার কাছে দাঁড়ায়। চোখে পড়ে, তারই স্বহস্তে রোপিত সেই শিশু রক্তাশোক কত বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু অযত্নে শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। বারিপূর্ণ ভৃঙ্গারক নিয়ে এসে রক্তাশোকমূলে জলসেক দান করে মাধবী।

তবু বুঝতে পারে মাধবী, তার নয়ন-ভৃঙ্গারকের বারিধারা থামছে না। কা'কে প্রশ্ন করবে মাধবী, যযাতিনন্দিনী তার প্রেমাস্পদের শান্তি আর সম্মান রক্ষার মোহে যে দুঃসহ ব্রত পালন করেছে, তার কি কোন মূল্য নেই? এই রক্তাশোকের মুখে যে ভাষা নেই, নইলে জিজ্ঞাসা করা যেত সত্যই কি ঘৃণ্য হয়ে গিয়েছে মাধবী, স্ফটিকপ্রাসাদের আর আশ্রমভবনের কামনার কক্ষে ধনাঢ্য রাজা ও রাজর্ষির আলিঙ্গনে তার দেহ উপঢৌকন দিয়েছে বলে? নইলে মাধবীর এই নয়নের আবেদন বিস্মৃত হয়ে কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত চিত্তে দিনযাপন করছে মাধবীর প্রেমের আস্পদ সেই তরুণ ঋষি গালব?

জগৎ ঘৃণা করুক মাধবীকে কিন্তু জগতের মধ্যে একজন তো ঘৃণা করতে পারে না। কারণ, আর কেউ না জানুক, সে-ই তো জানে, কেন ও কিসের জন্য অদ্ভুত এক অশ্রেয় বিবাহের রীতি বরণ ক'রে মাধবী তার রূপ ও যৌবনকে রাজা ও রাজর্ষির আসঙ্গবাসনার কাছে নিবেদন করতে বাধ্য হয়েছে। যযাতি-কন্যার সেই ভয়ংকর আত্মাহুতির বিনিময়ে ঋণমুক্ত হয়েছে যে জ্ঞানী গালব সেই জ্ঞানী কি আজ যযাতিকন্যাকেই ঘৃণা ক'রে দূরে সরে থাকবে? মাধবীর স্বয়ংবরসভার সংবাদ কি সে এখনও শুনতে পায়নি?

কোথায় তুমি গালব? আজ তুমি মুক্ত, আমিও মুক্ত। এস তোমার কুবলয়সদৃশ নীলনয়নের দ্যুতি নিয়ে; তোমারই জন্য সমর্পিত তনুমনপ্রাণ, তোমারই জন্য পণ্যায়িতা হয়ে অনেক বেদনা সহ্য করেছে যার যৌবন, সেই যযাতিকন্যা মাধবীর স্বাধীন হৃদয়ের বরমাল্য কণ্ঠে গ্রহণ ক'রে তাকে তোমার জীবনসহচরী ক'রে নিয়ে চলে যাও। তুমি তো এখন ঋণমুক্ত, শান্ত সম্মানিত ও সুখী, তবে এখন এই বৈভবহীন প্রাসাদ থেকে পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত মূল্যহীনাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে তোমার প্রেমের স্পর্শে অমূল্য ক'রে তুলতে বাধা কই তোমার?

উপবনবীথিকার কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে পায় মাধবী, প্রাসাদের দূর দক্ষিণে

কলস্বরা এক স্রোতস্বতীর কূলে শ্যামদূর্বাদলে আকীর্ণ প্রান্তরে স্বয়ংবরসভার হর্ষ জেগে উঠেছে। চন্দ্রাতপের বর্ণশোভা দেখা যায়। শোনা যায়, রূপবতী যযাতিকন্যার পাণিগ্রহণের আশায় সমাগত বহু প্রিয়দর্শন রাজপুত্র ও বীরোত্তমের বিশ্রান্ত অশ্বের হ্রেষাধ্বনি।

অপরাহ্ণের রক্তাভ সূর্য অস্তাচলের পথে ধাবমান। বিষণ্ণ হয়ে ওঠে মাধবীর অসিতনয়নশ্রী। তবু যেন এক ক্ষীণাশার গুঞ্জরণ ক্লান্ত নূপুরের মত মাধবীর মনের নেপথ্যে বাজে—সে কি আজও না এসে থাকতে পারবে? যযাতিকন্যার সেই প্রণমিত আত্মনিবেদনের কথা কি সে ভুলে গিয়েছে? গুণী মানী ও জ্ঞানী গালব কি অকৃতজ্ঞ হতে পারে?

কিন্তু আর এই উপবনবীথিকার নিভৃতে রক্তাশোকের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবনা করবার সময় ছিল না। পিতা যযাতি এসে আহ্বান করলেন এবং সচ্ছন্দ পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে রাজা যযাতির সঙ্গে স্বয়ংবরসভায় এসে দাঁড়াল মাধবী।

বরমালা হাতে তুলে নিয়ে সভার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অসিতেক্ষণা মাধবীর দৃষ্টি কিছু ক্ষণের মত কা'কে যেন অন্বেষণ করে। কিন্তু কুবলয়নয়ন কোন স্নিগ্ধদর্শন তরুণ ঋষির মূর্তি কোথাও দেখা যায় না। নবীনকুসুমে গ্রথিত বরমাল্য কঠোরভাবে মুষ্টিবদ্ধ ক'রে পাণিপ্রার্থী রাজপুত্রদের পংক্তি পরিক্রম করে মাধবী। কোন দিকে এবং কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। শুধু এগিয়ে যেতে থাকে পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত সুচারুদেহা এক যৌবনবতীর অন্যমনা ও উদাসিনী মূর্তি। রাজা যযাতি কন্যার অনুসরণ ক'রে চলতে থাকেন। দুন্দুভির উল্লাসে দিগ্‌বায়ু প্রকম্পিত হয়।

অগ্রসর হতে হতে সভার শেষপ্রান্তে গিয়ে একবার ক্ষণিকের মত দাঁড়াল মাধবী। কারণ, আর এগিয়ে যাবার কোন অর্থ হয় না। কারণ, তার পরেই স্রোতস্বতীর সুতরল জলরেখা, ওপারে তৃণপ্রান্তর এবং তার পর বনভূমির আরম্ভ।

সুহরিৎ বনশীর্ষে অস্তোন্মুখ সূর্যের লোহিতাভ বেদনার ছায়া পড়েছে। অকস্মাৎ, যেন দুই হস্তের চকিতক্ষিপ্ত আগ্রহের একটি কঠোর টানে বরমাল্য ছিন্ন ক'রে ভূতলে নিক্ষেপ করে মাধবী। মত্তা পলাতকার মত ত্বরিত পদে ছুটে চলে যায়, এবং স্বয়ংবরসভার শেষ প্রান্তও পার হয়ে স্রোতস্বতীর কূলে এসে দাঁড়ায়।

যযাতি চিৎকার ক'রে ডাকেন—কোথায় যাও মাধবী?

মাধবী—অরণ্যের ক্রোড়ে।

যযাতি—রাজপ্রাসাদের মেয়ের অরণ্যে কি প্রয়োজন?

মাধবী—আমাকে ক্ষমা কর পিতা, ক্ষমা করুক তোমার রাজপ্রাসাদ আর রাজ্যজনপদ। অরণ্যই আমার যথার্থ আশ্রয়।

স্রোতস্বতীর ক্ষীণ জলরেখা পার হয়ে শরাহত হরিণীর ত্রস্তগতি ছায়ার মত, যেন পিছনের যত করাল দান-মান-পুণ্যের ভয়ে অরণ্যের দিকে চলে গেল মাধবী। সন্ধ্যা নামে, অন্ধকারে মাধবীকে আর দেখা যায় না।

যযাতির প্রাসাদ শূন্য। দাতা যযাতি স্বর্লোকে গিয়ে পুণ্যশীল রাজর্ষি সমাজে উচ্চাসন অধিকার করেছেন। আর, বনবাসিনী হয়েছে পুণ্যহীনা মাধবী।

এই বনে দাবানল নেই। মাসান্তের পর মাস, তারপর বৎসরান্ত, বৈশাখী রক্ত-পুনর্নবার পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নূতন বৎসর দেখা দেয়। কিন্তু বরবর্ণিনী যেই যযাতিনন্দিনী মাধবীর কর্ণ ও কবরী নবকুসুমের স্তবকে আর শোভিত হয় না। সেই স্নিগ্ধ চিকুরনিকুর আজ কঠিন জটাভার, কণ্ঠাভরণ শুধু একটি রুদ্রাক্ষের মালিকা। উপবাস বল্কলবাস এবং অধোশয্যা, রূপ-যৌবনের সকল অভিমান ক্লিষ্ট ক'রে স্নান ব্রত পূজা ও তপস্যায় দাবানলহীন এই বনের দিনযামিনীর প্রতি মুহূর্ত উদ্‌যাপন করেছে মাধবী এবং তার অন্তরের নিভৃতে এক পরম শান্ত সত্তার সাক্ষাৎ লাভ করেছে। রাজপ্রাসাদের পুণ্যতত্ত্ব কোনদিন বুঝে উঠতে পারেনি যে মাধবী, সেই মাধবী আজ তার বনবাসিনী তপস্বিনীর জীবনে উপলব্ধি করেছে—কামনাহীন চিত্তের এই আনন্দই তো পুণ্য। অতীতের সকল ঘটনার কথা আজও মনে পড়ে; আজও বিস্মৃত হয়নি মাধবী সেই পরিচিত মুখগুলি সুন্দর ও অসুন্দর, রূঢ় ও কোমল। সেই আঘাত ও অপমানের সকল ইতিহাস আজও স্মরণ করতে পারা যায়। কিন্তু স্মরণ করলেও মাধবীর মনে অভিমানের কোন সাড়া জাগে না। সিদ্ধসাধিকা মাধবীর ভাবনা আজ বেদনাহীন হয়েছে, কারণ ক্ষয় হয়ে গিয়েছে সকল কামনা।

এই বনে দাবানল নেই, মাধবীর মনেও কোন মোহানল নেই। বিশাল শাল শাল্মলী মুচুকুন্দ ও কোবিদারের ছায়াঘন গহনে বনাধিষ্ঠাত্রী দেবতার নীরাজন-দীপিকার একটি পুণ্যশিখার মত ভাস্বর হয়ে উঠেছে তপস্বিনী মাধবীর জীবন।

সেদিন দিবাবসানের পর বনসরসীর জলে স্নান সমাপন ক'রে বনাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজার জন্য যখন প্রস্তুত হয় মাধবী, তখন দেখতে পায়, ঊর্ধ্বাকাশ হতে যেন একটি নক্ষত্র স্খলিত হয়ে ভূপতিত হলো। দেখে দুঃখিত হয়

মাধবী। কে জানে, কোন্ মহাজনের পুণ্য ক্ষয় হয়েছে, তারই লক্ষণ। পরক্ষণে শুনতে পায় মাধবী দূর জনপদে অদ্ভুত এক কোলাহল জেগেছে।

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবতে থাকে মাধবী। তারপরেই বনাধিষ্ঠাত্রীর পূজা সমাপন করে এবং ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ বনপথ ধ'রে অগ্রসর হয়ে বনের উপান্তে এসে দাঁড়ায়। তখন রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে এবং জনপদের সকল কোলাহলও ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়েছে।

অকস্মাৎ সেই অদ্ভুত কোলাহলের উচ্চরোল শুনতে পায় আর বিস্মিত হয় মাধবী।— ধিক্ পুণ্যহীন রাজা যযাতি! ধিক্ মানহীন রাজা যযাতি! রাজা যযাতির নামে প্রবল অপযশ নিন্দা ও ধিক্কারের ধ্বনি সহস্র কণ্ঠ হতে উৎসারিত হয়ে ক্ষুব্ধ ঝটিকানিনাদের মত জনপদের প্রত্যুষসমীরের শান্তি মথিত করছে।

ধীরে হিরণ্ময় উদিত আদিত্যের রশ্মিপাতে প্রাচীপট আলোকিত হয়ে ওঠে। অরণ্যের প্রান্ত অতিক্রম ক'রে আরও অগ্রসর হয় মাধবী। তারপর, স্রোতস্বতীর ক্ষীণ জলরেখা পার হয়ে সুশ্যাম তৃণপ্রান্তরের পথরেখার উপর এসে দাঁড়ায় তপস্বিনীর মূর্তি। শান্ত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে যযাতির প্রাসাদের অভিমুখে এগিয়ে যেতে থাকে।

স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়েছেন যযাতি। পুণ্যক্ষয়ে আকাশভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত স্বর্গ হতে স্থানচ্যুত হয়েছেন রাজা যযাতি। স্বর্লোকাশ্রিত দেব মানব ও রাজর্ষির কেউ যযাতিকে পুণ্যবান বলে স্বীকার করেননি। যযাতির দান যথার্থ দান নয়, যযাতির পুণ্য যথার্থ পুণ্য নয়। যযাতির সকল প্রখ্যাতি বিনষ্ট হয়েছে, কারণ স্বর্লোকের রাজর্ষি সমাজ এতদিনে জানতে পেরেছেন, কি উপায়ে রাজা যযাতি জ্ঞানী গালবের প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। ধিক্কৃত নিন্দিত ও অপমানিত রাজা যযাতি স্বর্গ হতে ফিরে এসে বিষণ্ণ বদনে সভাগৃহে একাকী বসেছিলেন। তাঁর মানের গৌরব অপহৃত হয়েছে, তাঁর দানের গর্ব চূর্ণ হয়েছে।

সভাগৃহে প্রবেশ করলেন চীরধারী এক তপস্বী। রাজা যযাতি বিস্মিত হ'য়ে দেখলেন, সেই তপস্বী।

তপস্বী মৃদুহাস্যে বলেন— আজ আমি আবার আপনাকে সেই লোকনীতির কথা স্মরণ করিতে দিতে এসেছি নৃপতি।

যযাতি আর্তস্বরে নিবেদন করেন— বলুন যোগিবর। আমার এই মানহীন ও পুণ্যহীন দগ্ধমরুবৎ জীবনের শান্তির জন্য আপনার সান্ত্ববাদ দান করুন।

তপস্বী—সর্বলোকনীতির সারভূত এই সত্যবাদে আজ বিশ্বাস করুন রাজা যযাতি, পুণ্যার্জনের পথটিও পুণ্যময় হওয়া চাই। আপনি কর্মব্রতের এই নীতি অস্বীকার করেছেন, তাই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি।

যযাতি—আপনার বাণীর সত্যতা আজ বিশ্বাস করি তপস্বী। কিন্তু পুণ্যভ্রষ্ট ও মানহীন জীবনের গ্লানি নিয়ে আর বেঁচে থাকতে চাই না যোগিবর।

তপস্বী করুণামিশ্রিত স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে বলেন—কিন্তু আর একটি কথা বিশ্বাস করবেন কি নৃপতি?

যযাতি—অবশ্যই বিশ্বাস করব তপস্বী।

তপস্বী—আজ আপনার এক প্রখ্যাতি ত্রিভুবনে রটিত হয়েছে।

যযাতি—আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না যোগিবর!

তপস্বী—জনপদের কোলাহল কি শুনতে পাননি নৃপতি?

যযাতি—শুনেছি যোগিবর। তুষানলের জ্বালা বরণ ক'রে বরং মৃত্যুও সহ্য করা যায়, কিন্তু ঐ ধিক্কার-কোলাহলের জ্বালা বরণ ক'রে জীবন সহ্য করা যায় না।

তপস্বী বলেন—আর একবার ঐ কোলাহল শ্রবণ করুন নৃপতি।

উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকেন নৃপতি যযাতি। অকস্মাৎ যযাতির বিষণ্ণ দুই নেত্রে প্রবল বিস্ময় চমকিত হয়। সহস্র কণ্ঠ হতে উৎসারিত উল্লাস হর্ষ ও আনন্দনাদ জনপদের বায়ু শিহরিত করছে।—ধন্য পুণ্যবতী তাপসিকা মাধবী! ধন্য মাধবীপিতা রাজা যযাতি!

তপস্বী বলেন—যে সিদ্ধসাধিকা পুণ্যবতী মাধবী আজ জনপদে আবির্ভূতা হয়ে আপনার এই রাজ্য ও জনপদ ধন্য করেছে, আপনি যে তারই পিতা। সে পুণ্যবতী যদি আপনাকে প্রণাম করে, তবেই সম্মানে ও গৌরবে ধন্য হবেন আপনি, স্বর্গলোকের রাজর্ষি সমাজ আপনাকে সাগ্রহে ও সানন্দে স্থান দান করবেন।

রাজা যযাতি চিৎকার ক'রে ওঠেন—আমার বনবাসিনী কন্যা মাধবী! সে কি বেঁচে আছে?

কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে প্রস্থান করেন অভ্যাগত তপস্বী। যযাতি ব্যাকুল দৃষ্টি তুলে দ্বারপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, মূর্তিমতী পুণ্যশিখার মত তপস্বিনী মাধবী দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাকুল পদক্ষেপে পিতা যযাতি ছুটে গিয়ে কন্যা মাধবীকে বক্ষোলগ্ন করলেন। কন্যার শির চুম্বন ক'রে অশ্রুসিক্ত নয়নের আবেদন আরও করুণ ক'রে যযাতি বলেন—ক্ষমা কর কন্যা। যে অপমান ও তুচ্ছতার জ্বালা নিয়ে

প্রাসাদ বর্জন ক'রে অরণ্যের আশ্রয় নিয়েছিলে, সে জ্বালা আজ আমাকে দান কর। চাই না পুণ্য, চাই না স্বর্গ।

পিতা যযাতিকে প্রণাম ক'রে মাধবী বলে—আমার তপশ্চর্যার পুণ্য গ্রহণ করুন পিতা।

বেদনা বিস্ময় ও আনন্দ যেন একই সঙ্গে চিৎকার ক'রে ওঠে। যযাতি ডাকেন—কন্যা!

মাধবী—বিচলিত হবেন না পিতা। আমার অনুরোধ. আপনি নিশ্চিন্ত চিত্তে স্বর্লোকে গমন করুন।

বিদায় নেয় মাধবী। সভাগৃহের দ্বারপ্রান্তে এসে রাজা যযাতি কন্যা মাধবীর শির চুম্বন ক'রে বিদায় দান করেন।

স্বর্গধামে প্রস্থানের পূর্বে শূন্য সভাগৃহে প্রসন্ন অন্তরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন রাজা যযাতি। তাঁর শিক্ষা আজ সম্পূর্ণ হয়েছে। দিব্য লোকনীতির সারভূত সত্য আজ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

রাজা যযাতিকে আর একটু বিলম্ব করতে হলো। সুন্দরদর্শন এক তরুণ ঋষিযুবা অকস্মাৎ সভাগৃহে প্রবেশ করেন। রাজা যযাতি সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন, জ্ঞানী গালব এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন।

উদ্‌ভ্রান্ত অশান্ত দাবানলতাড়িত প্রাণীর মত বেদনার্ত দৃষ্টি, জ্ঞানী গালব বলেন—জ্ঞানী গালবের সকল মান ও পুণ্য আপনি গ্রহণ করুন রাজা যযাতি. আমি পুণ্যহীন হতে চাই।

যযাতি—কেন ঋষি গালব?

গালব- জ্ঞানী গালবের সকল মান ও পুণ্য তার জীবনের অভিশাপ হয়েছে রাজা যযাতি। শান্তি পাই না নৃপতি, পুষ্পান্বিতা ব্রততীর মত শুচিস্মিতা এক নারীর মুখচ্ছবি ভুলতে পারছি না। তার দুই অসিতনয়নের শোভা আমারই মূঢ়তার আঘাতে অশ্রুসিক্ত হয়েছে। চাই না মান, চাই না পুণ্য. আজ আমি এক প্রেমিকা নারীর বরমাল্য লাভ ক'রে ধন্য হতে চাই।

যযাতি—কার কথা বলছেন জ্ঞানী গালব?

গালব—যযাতিকন্যা মাধবীর কথা।

সস্নেহ স্বরে যযাতি বলেন—তার কথা জিজ্ঞাসা ক'রে আপনার কোন লাভ হবে না জ্ঞানী গালব। আমার আমন্ত্রণের বার্তা পেয়েও আপনি সেদিন যে স্বয়ংবরসভায় আসেননি, সেই স্বয়ংবরসভায় কুমারী মাধবীর বরমাল্যের পরিণাম সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে।

গালব—অসম্ভব, সে যে আমারই দয়িতা!

যযাতি—বড় বিলম্ব করেছেন জ্ঞানী গালব।

গালব আর্তনাদ ক'রে ওঠেন—এমন নির্মম কথা বলবেন না, বিশ্বাস করতে পারি না রাজা যযাতি। বলুন, গালবের হৃদয়হীন জীবনের সকল স্বপ্ন তৃষ্ণার্ত ক'রে দিয়ে কোথায় গিয়েছে সেই সুধাময়ী নারী, কার কণ্ঠে বরমাল্য দান করেছে মাধবী?

যযাতি—তপস্বিনী হয়েছে মাধবী।

পাষাণবৎ স্তব্ধীভূত গালব তাঁর কুবলয়নয়নের অসহায় হতাশ ও বেদনাভিভূত স্বপ্ন অশ্রুসলিলে ভাসিয়ে দিয়ে শুধু নীরবে তাকিয়ে থাকেন।

যযাতি বলেন—ঐ যে তৃণাঞ্চিত প্রান্তর দেখতে পাচ্ছেন জ্ঞানী গালব, তারই শেষ প্রান্তে এক বিষণ্ণ অপরাহ্নের আলোকে ক্ষণিকের মত দাঁড়িয়ে, স্বয়ংবরসভার হর্ষ স্তব্ধ ক'রে দিয়ে, নিজের হাতে বরমাল্য ছিন্ন ক'রে এবং ভূতলে নিক্ষেপ ক'রে চলে গিয়েছে মাধবী।

সভাগৃহ ছেড়ে ধূলিলিপ্ত পথের উপর এসে দাঁড়ান গালব। তারপর অবসন্নভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন; তৃণাঞ্চিত প্রান্তরের শেষ প্রান্তে স্রোতস্বতীর কিনারায় এসে দাঁড়ান। দিগ্‌ভ্রান্তের মত কি যেন অন্বেষণ করতে থাকেন গালব!

বোধ হয় ছিন্ন বরমাল্যের একটুকু অবশেষ খুঁজছিলেন গালব। অনেক অন্বেষণের পর দেখতে পেলেন গালব, স্রোতস্বতীর তটলগ্ন দূর্বাদলের উপর খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে আছে জগতের এক স্থিরপ্রেমা নারীর অভিমানদগ্ধ বরমাল্যের স্বর্ণসূত্র।

স্বর্ণসূত্রের মলিন ও তপ্ত খণ্ডগুলির দিকে তাঁর শূন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন গালব; প্রেমিকার চিতাবশেষ অঙ্গারখণ্ডের দিকে প্রেমিক যেমন স্তব্ধ দৃষ্টি তুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

— —

# রুরু ও প্রমদ্বরা

মহাতেজা প্রমতির পুত্র রুরু এসেছিলেন মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমে এবং মহর্ষির সাক্ষাৎ না পেয়ে ফিরে চলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ বিস্মিত হয়ে থেমে রইলেন কিছুক্ষণ। দেখলেন, ছায়াপাণ্ডুর সন্ধ্যাকাশের ক্রোড়ে নয়, অজস্র সৌরভ্যরম্য এই আশ্রম-প্রাঙ্গণেরই লতাপ্রাচীরের ছায়াচ্ছন্ন অন্তরালে যেন পূর্ণিমার কোরক লুকিয়ে রয়েছে।

নিকটে এগিয়ে গেলেন রুরু এবং বুঝলেন, মিথ্যা নয় তাঁর অনুমান। রূপাভিরামা এক কুমারী যেন রাকারজনীর আকাশলোক হতে কৌমুদীকণিকা আহরণ ক'রে এক শিল্পী এই তরুণীর দেহকান্তি রচনা করেছেন। ভুল হবে না, যদি জ্যোৎস্নাপিপাসী চকোর এই মুহূর্তে এসে মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রম-নিভৃতের এই লতাপ্রাচীরের উপর লুটিয়ে পড়ে। ভুল হবে না, যদি দক্ষিণ সমীর তার চন্দনগন্ধভার নিয়ে এখনি ছুটে আছে। এই স্মিতাননের সিতরশ্মির স্পর্শ পেয়ে আরও শীতল হয়ে যাবে দক্ষিণ সমীর।

প্রশ্ন করেন রুরু—তোমার পরিচয় জেনতে ইচ্ছা করি শুচিস্মিতা।

কুমারী বলে—আমি মহর্ষি স্থূলকেশের কন্যা প্রমদ্বরা। আপনি কে?

-আমি ভার্গবগৌরব প্রমতির পুত্র রুরু।

পূর্ণিমার কোরকের মত সুযৌবনা কুমারীর রূপরুচির তনুভঙ্গিমার দিকে বিস্ময়বিচলিত বক্ষের তৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে থাকেন রুরু। তাঁর দুই চক্ষুর কৌতূহল যেন সুদুঃসহ এক আগ্রহে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ঋষির কন্যা আশ্রম-চারিণী কুমারী, কিন্তু তপস্বিনী নয়। মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন রুরু, যেন নিদ্রিতা কেতকীর নিশীথের বাসনার মত সুস্বপ্নবিহসিত এক কামনার শিহর এই নারীর অধরপুটে ঘুমিয়ে রয়েছে। পরাগচিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে নারীর চম্পকগৌর গ্রীবার উপর, বোধ হয়, অপরাহ্ণের পুষ্পরেণুমেদুর ভ্রমরের মদামোদিত চুম্বনের স্মৃতি। বরবর্ণিনী প্রমদ্বরায় কপালে কিসের রেণু বর্ণমনোহর তিলকের মত অঙ্কিত রয়েছে? দেখে বুঝতে পারেন রুরু, লব্ধ প্রজাপতি তার পক্ষধূলির চিহ্ন রেখে দিয়ে চলে গিয়েছে। বিশ্বাস হয়, এই রূপরম্যারই পীনবক্ষের আলিঙ্গন লাভ ক'রে ফুটে উঠেছে ঐ রক্তকুরুবকের কুটমল।

রুরু বলেন—সার্থক তোমার নাম।

প্রমদ্বরা বলে—কেন, আমার নামের মধ্যে কি অর্থ দেখলেন?

রুরু—তুমি প্রমদ্বরা, তুমি এই পৃথিবীর সকল প্রমদার মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তোমার তনুশোভা উপভোগ করবার জন্য, তোমারই প্রস্ফুট যৌবনের সঙ্গ লাভের জন্য আকুল হয়ে উঠেছে পৃথিবীর সকল পুষ্পকুঞ্জের ভ্রমর আর প্রজাপতি। ধন্য তোমার রূপ।

অপাঙ্গে রুরুর মুখের দিকে একবার নিরীক্ষণ ক'রে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে প্রমদ্বরা, যেন তার মনের স্বপ্ন একটি হঠাৎ আঘাতে আহত হয়েছে। এ হেন প্রগল্‌ভ প্রশংসা আশা করেনি প্রমদ্বরা এবং এই প্রশংসা যে প্রশংসাই নয়। অধন্য এই রূপ, যদি এই রূপ শুধু এক প্রমোদসঙ্গিনী প্রমদার রূপ মাত্র হয়। কি আনন্দ আছে সে-নারীর জীবনে, যে-নারীর জীবন শুধু দিনরজনীর প্রমদার জীবন?

রুরু ডাকেন—বিম্বোষ্ঠী প্রমদ্বরা!

চমকে এবং মুখ তুলে ব্যথিত নেত্রে রুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রমদ্বরা বলে—ঋষির কুমারী কন্যার প্রতি এই সম্ভাষণ উচিত নয়।

রুরু বলেন—আমি আমার আকাঙ্ক্ষিতা নারীকেই আহ্বান করেছি।

প্রমদ্বরা—ক্ষমা করুন প্রমতিতনয়, আমি আপনার আকাঙ্ক্ষার পরিচয় কিছুই জানি না।

রুরু—আমার এই মুগ্ধ চক্ষুর দিকে তাকিয়েও কি কিছুই বুঝতে পার না?

প্রমদ্বরা—হ্যাঁ, বুঝতে পারি, আপনার ঐ সুন্দর চক্ষু দুটি শুধু মুগ্ধ হয়েছে।

রুরু—মুগ্ধ হয়েছে আমার এই দেহের সকল শোণিতকণিকা, সন্ধ্যারুণের রক্তরাগে রঞ্জিত হয়ে যেমন মুগ্ধ হয়ে ওঠে সুশ্বেত শারদ মেঘের বক্ষের পরমাণু। শালীননয়না বনহরিণীর মত অয়ি নিবিড়েক্ষণা নারী, তোমার নেত্রবিচ্ছুরিত রশ্মি বহ্নি হয়ে আমার অন্তরে প্রবেশ করেছে। ক্ষীণকটিমধুরা অয়ি শোভনাঙ্গী, তোমার ঐ অনুপম অঙ্গহিল্লোল পান করবার জন্য প্রমতিতনয়ের এই আলিঙ্গন-সমুৎসুক দুটি বাহু বাসনায় বিহ্বল হয়ে উঠেছে। এস, এই শুভক্ষণে ক্ষণপ্রণয়ের মহোৎসবে জীবন ধন্য কর শুভাননা।

আর্তনাদ ক'রে পিছনে সরে যায় প্রমদ্বরা, যেন এক বিষধরের গরলময় নিঃশ্বাসের বায়ু তার অঙ্গে এসে লেগেছে। কি ভয়ংকর এক আকাঙ্ক্ষার প্রাণী ভার্গবগৌরব প্রমতির পুত্রের মূর্তি ধ'রে তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে!

বেদনাদিগ্ধ স্বরে রুরু বলেন—তুমি তপস্বিনী নও প্রমদ্বরা।

প্রমদ্বরা—আমি তপস্বিনী নই।

রুরু—তবে কেন এই কঠোর কুণ্ঠা?

প্রমদ্বরা—আমি সাধারণী, আমি ঋষি পিতার স্নেহে পালিতা কন্যা, আমি কুমারী, এই কুণ্ঠাই যে আমার জীবনের ধর্ম।

রুরু বলেন—এমন ধর্মের কোন অর্থ হয় না নারী।

প্রমদ্বরা কুপিত স্বরে বলে—বুঝেছি, আপনার পৌরুষ ধর্মহীন হয়েছে প্রমতিতনয়। আপনি প্রস্থান করুন, আপনার সান্নিধ্য আমি সহ্য করতে পারছি না।

অপলক নেত্রে বিস্ময়াবিষ্টের মত ঋষিকুমারী প্রমদ্বরার মুখের দিকে তাকিয়ে এই নিষ্ঠুর ধিক্কারবাণীর অর্থ বুঝতে চেষ্টা করেন রুরু; কিন্তু বুঝতে পারেন না। কোপকঠোর স্বরে ধিক্কারবাণী শুনিয়ে দিয়েছে প্রমদ্বরা, কিন্তু কেন? বসন্তের কুঞ্জবনের পুষ্পে কি পিকনাদ শুনে বিমর্ষ হয়? কলহংসের কণ্ঠস্বর শুনে কি জলনলিনী কুপিতা হয়? নীলাঞ্জনের ছায়া দেখে কি দুঃখিতা হয় সুনিবিড়া নীপবনলেখা?

অভিমানকাতর কণ্ঠে রুরু বলেন—তোমার এই ধিক্কারবাণীরও অর্থ বুঝতে পারছি না কুমারী।

প্রমদ্বরা বলে—আমি অপ্সরী নই প্রমতিতনয়, ক্ষণপ্রণয়ের ঘৃণ্য আনন্দে আত্মসমর্পণ করতে পারে না কোন ঋষিকুমারী।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন রুরু। তারপর শান্তভাবে বলেন—শোন ঋষিকুমারী, আমি আমার পিতার ও মাতার ক্ষণপ্রণয়ের সন্তান।

চমকে ওঠে প্রমদ্বরা—আপনার এই কথার অর্থ কি প্রমতিতনয়?

রুরু—অপ্সরী ঘৃতাচী আমার মাতা।

প্রমদ্বরা নিষ্পলক নয়নে প্রমতিতনয় রুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রুরু বলেন—বিস্মিত হয়ে কি দেখছ নারী? ক্ষণপ্রণয়ের সন্তান কি দেখতে মানুষের মত নয়?

প্রমদ্বরার দুই চক্ষু অকস্মাৎ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। রুরু বলেন—অকারণে বেদনার্ত হও কেন নারী?

প্রমদ্বরা বলে—আমিও সত্যই ঋষিকুমারী নই প্রমতিতনয়।

রুরু—তবে কে তুমি?

প্রমদ্বরা—আমি মহর্ষি স্থূলকেশের পালিতা কন্যা। আমার পিতা গন্ধর্ব বিশ্বাবসু, মাতা অপ্সরা মেনকা। আমিও ক্ষণপ্রণয়ের সন্তান।

প্রসন্নচিত্তে আনন্দে দীপ্ত হয়ে ওঠে রুরুর মুখ। হাস্যতরলিত কণ্ঠস্বরে রুরু বলেন—কিন্তু তার জন্য দুঃখ কেন প্রমদ্বরা?

প্রমদ্বরা—তার জন্য নয়; আমার রূঢ় সম্ভাষণে আপনি ব্যথিত হয়েছেন।

রুরু—ব্যথিত হইনি নারী, তোমার কঠোর কুণ্ঠার নিষ্ঠুরতায় বিস্মিত হয়েছিলাম। অপ্সরীতনয়া প্রিয়হাসিনী প্রমদ্বরা গন্ধর্বতনয়া মঞ্জুভাষিণী প্রমদ্বরা, এস, সকল কুণ্ঠা পরিহার ক'রে এক অপ্সরীতনয়ের ক্ষণপ্রণয়ের অনুরাগে রঞ্জিত কণ্ঠমাল্য গ্রহণ কর। এই স্নিগ্ধ সন্ধ্যার আশীর্বাদে ধন্য হোক আমাদের মিলন, আর কারও আশীর্বাদ চাই না।

প্রমদ্বরা—কিন্তু..।

রুরু—মিথ্যা দ্বিধা বর্জন কর প্রমদ্বরা। তুমি ঋষিকন্যা নও।

প্রমদ্বরার সুন্দর আনন তাপিতা কেতকীর মত যেন নীরবে বেদনার জ্বালা সহ্য করতে থাকে। উত্তর দেয় না প্রমদ্বরা। অশ্রুপ্লুত হয়ে ওঠে দুই চক্ষু।

অকস্মাৎ আশাহত স্বরে আক্ষেপ ক'রে ওঠেন রুরু।—বুঝেছি প্রমদ্বরা।

প্রমদ্বরা—কি বুঝেছেন?

রুরু—তুমি অন্য কোন প্রেমিকের আকাঙ্ক্ষিতা নারী, তাই প্রমতিতনয়ের আহ্বান এত সহজে তুচ্ছ করতে পারছ।

আর্তনাদ ক'রে ওঠে প্রমদ্বরা -অকারণে নিষ্ঠুর হবেন না প্রমতিতনয়। আপনিই আমার জীবনের একমাত্র বাঞ্ছিত পুরুষ। আপনি আছেন আমার স্বপ্নে, আপনিই আছেন আমার প্রতীক্ষায়, আপনিই আমার অন্তরমন্দিরের একমাত্র বিগ্রহ।

রুরু—বিশ্বাস করতে পারছি না প্রমদ্বরা।

প্রমদ্বরা—বিশ্বাস করুন প্রমতিতনয়। উপবনপথে দাঁড়িয়ে দূর হতে দেখেছি আপনাকে, কিন্তু আপনি দেখতে পাননি, ঋষিপিতার পালিতা এক আশ্রমচারিণী কুমারীর চক্ষু তখন কোন্ বেদনায় সজল হয়ে উঠেছিল। পথের উপর নবমুকুলের স্তবক ফেলে রেখে ছায়াতরুর অন্তরালে লুকিয়েছি। আপনারই চরণস্পর্শে আহত সেই মুকুলস্তবক তুলে নিয়ে এই আশ্রমের কুটীরে ফিরে এসেছি। কেউ দেখতে পায়নি, কেউ সাক্ষী নেই, শুধু আকাশ হতে দেখেছে প্রতিপদের চন্দ্রলেখা, কুমারী প্রমদ্বরা কি শ্রদ্ধায় আর কত আগ্রহে সেই নবমুকুলের স্তবকে তার কবরী শোভিত করেছে। আপনাকে প্রণাম করবার সৌভাগ্য কোনদিন হয়নি এই প্রণয়ভীরু কুমারীর, কিন্তু আপনার পদস্পর্শপূত পথধূলি তুলে নিয়ে এই কুমারী নিজের হাতেই তার শূন্য সীমন্তসরণি লিপ্ত করেছে। আপনি পূজ্য, আপনি প্রিয়; আপনিই এই আশ্রমচারিণীর চিরকালের প্রেমের আস্পদ।

রুরু ডাকেন—প্রিয়া প্রমদ্বরা।

প্রমদ্বরা বলে—এই সম্ভাষণই চিরন্তন হোক প্রিয় প্রমতিতনয়।

রুরু বিব্রতভাবে প্রশ্ন করেন—চিরন্তন? চিরন্তন হবে কেমন ক'রে?

প্রমদ্বরা—চিরপ্রণয়ে।

রুরু—বিবাহের বন্ধনে?

প্রমদ্বরা—হ্যাঁ।

উচ্চহাস্যে প্রমদ্বরার চিরপ্রণয়ের অভিলাষ যেন বিদ্রূপে ছিন্ন করবার জন্যই বলে ওঠেন রুরু—চিরপ্রণয়ের বন্ধন স্বীকার করতে চাও ক্ষণপ্রণয়িনী অপ্সরার কন্যা?

প্রমদ্বরা বলে—হ্যাঁ প্রমতিতনয়, আমি তোমারই জীবনের চিরসঙ্গিনী হতে চাই।

রুরু—কেন?

প্রমদ্বরা—নারীর জীবন ক্ষণপ্রণয়িনী প্রমদার জীবন নয়।

রুরু—তবে কিসের জীবন?

প্রমদ্বরা—দয়িতার জীবন।

রুরু—সে কেমন জীবন?

প্রমদ্বরা—যে জীবনে সর্বক্ষণ শুনতে পাব তোমার প্রাণের আহ্বান। তোমার শ্রান্তিতে তুমি খুঁজবে আমার সেবা, তোমার সংকল্পে তুমি খুঁজবে আমার সাহায্য, তোমার শান্তিতে তুমি খুঁজবে আমার সান্নিধ্য।

প্রমতিতনয় রুরুর মনে হয়, যেন চতুরা এক বাচালিকা নারী কতগুলি সুন্দর কথার ছলনা দিয়ে তার আজিকার কঠোর হৃদয়ের অপরাধ আর প্রত্যাখ্যানের নিষ্ঠুরতাকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। যার জীবনের দয়িতা হতে চায় এই নারী তারই বক্ষের এই মুহূর্তের ব্যাকুলতা উপেক্ষা ক'রে কি আনন্দ লাভ করছে এই বিচিত্রহৃদয়া প্রেমিকা?

যেন শেষবারের মত প্রমদ্বরার হৃদয় পরীক্ষার জন্য ব্যগ্রভাবে হস্ত প্রসারিত ক'রে রুরু বলেন—প্রিয়া প্রমদ্বরা, তোমার ঐ স্নিগ্ধ করপল্লব তোমারই দয়িতের হস্তে সমর্পণ কর। সাক্ষী থাকুক সন্ধ্যাকাশের তারকা, দয়িতের সাকাঙ্ক্ষ চুম্বনে সিক্ত হোক প্রেমিকা প্রমদ্বরার করপল্লব।

দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে সিক্ত নেত্রে এবং সাগ্রহ স্বরে প্রমদ্বরা বলে—আজ আমাকে ক্ষমা কর। আর, আমার একটি অনুরোধের বাণী শোন প্রমতিতনয়।

রুরু—বল।

প্রমদ্বরা—মহর্ষি স্থূলকেশের কাছে গিয়ে আমার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন কর।

চিৎকার ক'রে ওঠেন রুরু—বিবাহের প্রস্তাব?

প্রমদ্বরা—হ্যাঁ। এস এক শুভক্ষণে, এস আমার ঋষিপিতার আশীর্বাদে পূত এই ভবনে, এস এক মাঙ্গল্য উৎসবের অঙ্গনে, তোমার প্রেমিকা প্রমদ্বরার আজিকার এই ভীরু পাণি সেইদিন নির্ভয় আনন্দে তোমারই পাণিতে আত্ম-সমর্পণ করবে।

নিষ্পলক নেত্রে প্রমদ্বরার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন তাঁর অপমানিত আকাঙ্ক্ষার জ্বালা সহ্য করতে চেষ্টা করেন রুরু। সন্ধ্যাকাশের নক্ষত্রকেও অপমানিত করল এই নারী। প্রণয় নয়, প্রণয়ের রীতিই পূজ্য হয়ে উঠেছে এই নারীর কঠিন ও অদ্ভুত এক লোকবিধিশাসিত হৃদয়ে!

তবু প্রতিবাদ করতে পারেন না প্রমতিতনয় রুরু; এই নারীর প্রস্ফুট অধরের দ্যুতি তুচ্ছ ক'রে চলে যেতে ইচ্ছা করে না। বুঝতে পারেন রুরু, ধিক্কার আর অভিশাপ দিয়ে এখনি চলে যেতে পারতেন, যদি এই মুহূর্তেও তাঁরই চিরপ্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী এই নারীকে ঘৃণা করতে পারতেন। কিন্তু সে যে অসম্ভব! ধন্য এই নারীর সুরম্য যৌবন ঘৃণ্য শুধু এই নারীর প্রণয়ের রীতি। কিন্তু, জানে না এই আশ্রমচারিণী নারী, কত সহজে এই রীতিকেও ছলনা করা যায়। সংকল্প করেন রুরু, সুন্দর কথার ছলনা দিয়েই এই কঠোর মাঙ্গল্য উৎসবের শাসন আর চিরপ্রণয়ের রীতি ব্যর্থ ক'রে দিতে হবে।

রুরু বলেন—তাই হবে, তোমার অনুরোধের জয় হোক প্রমদ্বরা।

প্রমদ্বরা—জয়ী হোক তোমার হৃদয়ের প্রেম।

মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রম পিছনে রেখে ফিরে চললেন প্রমতিতনয় রুরু। পিছনে মুখ ফিরে আর তাকালেন না, তাই দেখতে পেলেন না রুরু, পূর্ণিমার কোরকের মত সেই রূপাভিরামা নারী পূজার্থিনীর মত সশ্রদ্ধ আগ্রহে তাঁরই পদপীড়িত তৃণ চয়ন ক'রে তার চেলাঞ্চলের প্রান্তে তুলে রাখছে।

জয়ী হয়েছে প্রমদ্বরার অনুরোধ। আশ্রমের লতাপ্রাচীরের অন্তরালে দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছে প্রমদ্বরা, ভার্গবগৌরব প্রমতি স্বয়ং এসে মহর্ষি স্থূলকেশের পালিতা কন্যা প্রমদ্বরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন মহর্ষি। সানন্দে এবং সাশ্রুনয়নে পিতা স্থূলকেশ তাঁর কন্যাকে প্রমতিতনয় রুরুর হস্তে সম্প্রদানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা ক'রে মন্ত্রপাঠ করেছেন। সেদিন আসন্ন, যেদিন ঐ আকাশেই একটি সন্ধ্যায় হীরকবিন্দুর মত তারকা উত্তরফল্গুনী ফুটে উঠবে। সেই সন্ধ্যায় প্রমদ্বরার প্রেমের পুরুষ প্রমতিতনয় রুরু শুভবিবাহের মাঙ্গল্য উৎসবের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে প্রমদ্বরার পাণি গ্রহণ করবে। আশ্রমচারিণী নারীর এই পুষ্পচয়নব্রত হস্ত প্রেমিকের পাণিস্পর্শে ধন্য হবে।

আশ্রমতড়াগের সলিলশোভার দিকে নয়, অপর প্রান্তে উপবনবীথিকার দিকে তৃষ্ণাতুরার মত দৃষ্টি তুলে সেদিন দাঁড়িয়ে ছিল প্রমদ্বরা। নবীনার্ক কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে উপবনস্থলী। বিহগের কাকলী আর মধুপের গুঞ্জনে যেন এক উৎসবের আনন্দ নিঃস্বনিত হয়ে উঠেছে। প্রভাতপ্রসূনের সৌরভে বায়ু বিহ্বল হয়েছে।

পুষ্প চয়নের জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে উপবনস্থলীর প্রান্তে এসে দাঁড়ায় প্রমদ্বরা। কিন্তু অদূরের তৃণাঙ্কিত পথরেখার দিকেই আবার তৃষ্ণাতুরার মত তাকিয়ে থাকে। এই তো সেই পথ, যে-পথের প্রান্তে প্রতি প্রভাতে তার হৃদয়বরেণ্য প্রেমিকের মূর্তিকে অভ্যুদিত হতে দেখেছে প্রমদ্বরা।

—প্রিয় প্রমদ্বরা!

আহ্বান শুনে চমকিত হয়ে পিছনে তাকায় প্রমদ্বরা এবং দেখতে পায়, দাঁড়িয়ে আছেন তারই প্রেমাস্পদ প্রমতিতনয় রুরু।

—বাগ্‌দত্তা প্রমদ্বরা!

সম্ভাষণ শুনে ব্রীড়াভঙ্গে কুণ্ঠিত হয়ে যেন দুই অধরের সুস্মিত আনন্দ গোপন করতে চেষ্টা করে প্রমদ্বরা।

রুরু বলেন—আমি এক স্বপ্ন দেখেছি প্রমদ্বরা। তারকা উত্তরফল্গুনী আকাশে হাসছে, এবং প্রেমব্যাকুলা এক নারী বিবাহের মাঙ্গল্য উৎসবের পর এই উপবনের নিভৃতে এসে তার পরিণেতার সঙ্গ লাভ করেছে।

প্রমদ্বরার অধর সুস্মিত হয়।—তারপর?

রুরু—তারপর সেই শুভরজনীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মিলনোৎসবের আনন্দ বক্ষোলগ্ন ক'রে তৃপ্ত হলো দু'জনের জীবনের আকাঙ্ক্ষা।

প্রমদ্বরা—তারপর?

রুরু—তারপর প্রভাত হতেই শূন্য হয়ে গেল উপবন।

প্রমদ্বরা—তারপর কোথায় গেল তারা দু'জন?

রুরু—দুই দিকে, ভিন্ন দিকে, কেউ কারও জীবনের বন্ধন হয়ে উঠল না।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তুলে এবং ব্যথিত স্বরে প্রমদ্বরা বলে—এ কি সত্যই আপনার স্বপ্ন, অথবা কল্পনা?

রুরু বলেন—আমার সংকল্প।

—সংকল্প? বাণবিদ্ধা হরিণীর মত যন্ত্রণাক্ত প্রমদ্বরার দুই চক্ষু সজল হয়ে ওঠে। প্রমদ্বরা বলে—আমার স্বপ্নের কথা শুনবেন কি প্রমতিতনয়?

রুরু—বল।

প্রমদ্বরা—আমার স্বপ্ন জানে, মিথ্যা হবে প্রমতিতনয়ের সংকল্প। ক্ষণ-প্রণয়াভিলাষী প্রমতিতনয় দেখতে পাবেন, তাঁর পরিণীতা নারী ছলনায় মুগ্ধ

হয়নি, একরাত্রির কামনার লীলাকুরঙ্গীর মত এই উপবনে সে আসেনি। প্রমদ্বরা ভুলেও কখনও সে ভুল করবে না প্রমতিতনয়. যে-ভুলের পরিণাম নারীর শূন্য বক্ষের ব্যথিত পীযূষের চিরক্রন্দন!

শুষ্ক ও কঠোর অথচ ব্যথিত দৃষ্টি তুলে রুরু বলেন—তবে চিরকালের মত বিদায় দাও প্রমদ্বরা।

চলে গেলেন প্রমতিতনয় রুরু। যেন এক ভুজঙ্গীর নির্বোধ হৃদয়ের নিষ্ঠুরতা ভাঙ্গতে গিয়ে নিজেই পরাহত হয়ে আর চূর্ণ হয়ে গিয়েছেন। ভালই হয়েছে, মিথ্যা হয়ে যাক আকাশের উত্তরফল্গুনী। এক নারীর চিরপ্রণয়ের বন্ধন তাঁর জীবনের অভিশাপ হয়ে উঠবার জন্য স্বপ্ন দেখছে। চূর্ণ হয়ে যাক সেই নারীর অভিসন্ধির স্বপ্ন।

নিজভবনে ফিরে এলেন প্রমতি তনয় রুরু, কিন্তু অনুভব করেন, তাঁরই মনের গভীরে বিষণ্ণ একখণ্ড মেঘের মত একটি স্তব্ধ দীর্ঘশ্বাসের আড়ালে যেন এক দুরন্ত বিদ্যুতের জ্বালা অশান্ত হয়ে রয়েছে। কেন, কিসের জন্য এই বেদনা বুঝতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বুঝতে পারেন না প্রমতিতনয় রুরু।

অপ্সরী-জীবনকে ঘৃণা করে অপ্সরীতনয়া প্রমদ্বরা। কিন্তু কেন? কোন্ সুখের আশায় নিজের জীবনকে চিরপ্রণয়ের বন্ধনে বদ্ধ ক'রে এক দয়িত পুরুষের পায়ে সমর্পণ করতে চায় প্রমদ্বরা? কোন্ লাভের লোভে? বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু মনে পড়ে প্রমতিতনয়ের, আশ্রমচারিণী সেই প্রেমিকার কাছে এই প্রশ্ন করতে ভুলে গিয়েছেন তিনি।

অনেকক্ষণ, মধ্যাহ্নের খরতাপিত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন প্রমতিতনয় রুরু। তাঁর মনের ভাবনা যেন ঐ তপ্তপ্রান্তরের মত এক ছায়াহীন জগতের পথে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। যেন তাঁর কল্পনায় তৃষ্ণার্ত এক অসহায় শিশুর ক্রন্দনধ্বনির করুণতা বেজে উঠেছে।

চমকে উঠলেন প্রমতিতনয় রুরু এবং বুঝলেন, তাঁর জীবনের এক বিস্মৃত অতীত যেন তাঁর চেতনার নিভৃতে কেঁদে উঠেছে। পরভৃতিকার মত আপন-বক্ষের সন্তান অপরের স্নেহনীড়চ্ছায়ার নিকটে ফেলে রেখে চলে গেলেন এক অপ্সরী মাতা, কিন্তু পরিত্যক্ত শিশুর ক্রন্দনস্বর শুনেও কি সেই মাতার নয়নে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দেয়নি সেদিন? দুই চক্ষুর উদ্‌গত অশ্রুবিন্দু মুছে ফেলে বক্ষের দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করেন প্রমতিতনয়।

শূন্যবক্ষের চিরক্রন্দন সহ্য করতে পারবে না প্রমদ্বরা, এ কি কথা বলে ফেলল প্রমদ্বরা? কি বলতে চায় প্রমদ্বরা? মনে পড়তেই আবার চমকে

ওঠেন, যেন ছিন্নমেঘ আকাশের শশিলেখার মত এক সত্যের রূপ হঠাৎ দেখতে পেয়েছেন রুরু।

এতক্ষণে যেন প্রেমিকা প্রমদ্বরার স্বপ্নের অর্থ বুঝতে পারছেন প্রমতি-তনয় রুরু। তবে কি অমাতা হবার অভিশাপ হতে বাঁচতে চায়; সন্তানের পালয়িত্রী তার প্রেমিকের গৃহিণী হতে চায় প্রমদ্বরা? অপ্সরী-জীবনের সেই ভয় হতে রক্ষা পেতে চায় প্রমদ্বরা?

নিজের মনের এই প্রশ্নের আঘাতে প্রমতিতনয়ের ক্ষণপ্রণয়লুব্ধ হৃদয়ের মূঢ়তা অকস্মাৎ চূর্ণ হয়ে যায়। এবং মনে পড়ে যায়, আজই তো আকাশে উত্তরফল্গুনী ফুটে উঠবার তিথি।

ব্যথিত অপরাধীর মত জীবনের এক ভয়ংকর মূঢ়তা হতে পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উপবনস্থলীর দিকে ছুটে চলে যান প্রমতিতনয়। স্নিগ্ধ উত্তর-ফল্গুনীর মত দ্যুতিময় যার নিবিড়ায়ত নয়নের কনীনিকা সেই চিরপ্রেমের উপাসিকা প্রমদ্বরা, প্রমতিতনয়ের জীবনোপবনের প্রেমবাপীমরালী প্রমদ্বরা, সে কি এখনও তার চিরদয়িতের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে?

উপবনস্থলীর নিভৃতে এসে দাঁড়ালেন রুরু এবং দেখলেন, যে পুষ্প-তরুতলের তৃণাস্তীর্ণ ভূমির উপর দাঁড়িয়েছিল প্রমদ্বরা, সেইখানে এক কৃষ্ণসর্প ক্রীড়া করছে। পল্লবিত উপবনতরুর শ্যামশোভার উপর অপরাহ্নের আলোক ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রমদ্বরা নেই।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমের লতাপ্রাচীরের নিকটে এসে দাঁড়ালেন প্রমতিতনয় রুরু। শুনলেন, আশ্রমের এক কুটীরের অভ্যন্তরে যেন বেদনাহত সঙ্গীতের মত করুণ বিলাপের রোল বেজে উঠছে। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মহর্ষি স্থূলকেশের উচ্চারিত মন্ত্রস্বরও শুনতে পেলেন রুরু। এবং আরও এগিয়ে এসে কুটীরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখলেন, কিশলয়াস্তীর্ণ ভূমিশয্যার উপর ঘুমিয়ে আছে সেই পূর্ণিমার কোরক। প্রমতিতনয় রুরুকে দেখতে পেয়েই অধোবদনা আশ্রমসখীদের বিলাপের রোল আরও করুণ হয়ে ওঠে। সকলে অনুরোধ করে—আসুন প্রমতিতনয়, আপনার প্রমদ্বরাকে আপনিই মৃত্যু হতে রক্ষা করুন।

—মৃত্যু হতে?

—হ্যাঁ, কৃষ্ণসর্পের দংশনে বিষজ্বালায় মূর্ছিতা হয়েছে আপনার প্রিয়া প্রমদ্বরা। এই মূর্ছাই মৃত্যু হয়ে উঠবে প্রমতিতনয়; কৃষ্ণভুজঙ্গের গরলে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে আপনারই প্রেমাভিষিক্ত পুষ্পের প্রাণ।

প্রিয়া প্রমদ্বরা! আর্তনাদ ক'রে প্রমদ্বরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন প্রমতিতনয় রুরু। কিন্তু সেই প্রিয়সম্ভাষণে প্রণয়িনীর নয়নকমল অক্ষিপল্লব

বিকশিত ক'রে আর হেসে ওঠে না। অধরের রক্তরাগ বিষজ্বালায় নীল হয়ে গিয়েছে, কুন্তলভার চূর্ণ মেঘস্তবকের মত লুটিয়ে পড়ে আছে। কোকনদোপম পদতলে ফুটে রয়েছে একটি রক্তবিন্দু, হিংস্র কৃষ্ণসর্পের দংশনের চিহ্ন।

মহর্ষি স্থূলকেশ এসে সম্মুখে দাঁড়াতেই অশ্রুসিক্ত নেত্রে ও ব্যাকুলস্বরে প্রশ্ন করেন প্রমতিতনয় রুরু—বলুন মহর্ষি, আপনার কন্যার এই ঘুম কি আর ভাঙ্গবে না?

মহর্ষি বলেন—ভাঙ্গবে, যদি তোমার জীবনে কোন পুণ্য থেকে থাকে।

অশ্রুরুদ্ধস্বরে মন্ত্র পাঠ করেন বৃদ্ধ মহর্ষি এবং মন্ত্রপূত বারি নিয়ে কন্যার ললাটে সস্নেহে সিঞ্চন করেন।

কক্ষান্তরে চলে গেলেন মহর্ষি, চলে গেল আশ্রমসখীর দল। আর, নীরব কুটীরের নিভৃতে প্রমদ্বরার নিদ্রিত মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন রুরু। দেখতে থাকেন রুরু, যেন মৃত্যুময় অথচ মধুর এক স্বপ্নের স্নেহে ডুবে রয়েছে তাঁরই জীবনের উত্তরফল্গুনী। মনে হয়, কৃষ্ণসর্পের দংশনে নয়, তাঁরই ছলনার বিষ সহ্য করতে না পেরে উপবনের সেই কৃষ্ণসর্পের দংশন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে প্রমদ্বরা।

কিন্তু কি বলে গেলেন মহর্ষি? কোন পুণ্য আছে কি রুরুর জীবনে? যদি থাকে কোন পুণ্য, তবে হে নিখিল প্রাণের বিধাতা, ঐ দুটি সুরুচির অধর হতে অপসারিত কর এই মৃত্যুময় নীলচ্ছায়া। প্রার্থনা করেন রুরু।

তারপরেই যেন উন্মত্ত পিপাসুর মত দুই ব্যগ্র হস্তের বিপুল আগ্রহে প্রমদ্বরার কোকনদোপম পদতল বুকের উপর তুলে নিলেন প্রমতিতনয় রুরু। কৃষ্ণসর্পের দংষ্ট্রাঘাতের চিহ্ন প্রেমিকের চুম্বনে চিহ্নিত হয়ে বিষবেদনার রক্ত-বিন্দু মুছে নিল। ওষ্ঠপুটে আহৃত গরলের জ্বালায় প্রমতিতনয় রুরু মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

যেন এক স্বপ্নের জগতে দাঁড়িয়ে এক সন্ধ্যাকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন রুরু। দেখছেন, সে আকাশে ফুটে ওঠে কি না তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষিত উত্তরফল্গুনী। কিন্তু কিছুই দেখা যায় না, শুধু শোনা যায়, আকাশের বক্ষ স্পন্দিত ক'রে যেন কা'র বাণী প্রণাদিত হচ্ছে।

প্রশ্ন করেন রুরু—কা'র বাণী তুমি, হে আকাশবাণী?

—আমি এক বাণীময় দেবদূত।

—কোন্ দেবতার দূত?

—জীবনের দেবতার দূত।

—আমাকে শান্তি দান করুন দেবদূত।

দেবদূত বলেন—ভুল ভেঙ্গেছে কি ক্ষণপ্রণয়াভিলাষী মূঢ়?

রুরু বলেন—ভেঙ্গেছে।

—আশ্রমচারিণী প্রমদ্বরাকে চিনতে পেরেছ কি?

—চিনেছি।

—কি চিনেছ? তোমার জীবনের প্রমদা অথবা দয়িতা?

—জীবনের দয়িতা।

—তবে তাকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর।

—কেমন ক'রে?

—তোমার জীবনের পুণ্য দিয়ে?

—কি পুণ্য আছে জানি না।

—তোমার প্রিয়াকে তোমার আয়ুর অর্ধ দান কর।

—বলুন আকাশচারী দেবদূত, কেমন ক'রে আমার প্রাণহীনা প্রিয়াকে আমার আয়ুর অর্ধেক দান করি?

দেবদূত বলেন—সে দান সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। তোমার প্রাণের অর্ধ তোমারই প্রিয়া প্রমদ্বরার দেহে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে।

রুরু—বুঝতে পারছি না দেবদূত।

দেবদূত—তোমার প্রমদ্বরার পদতলক্ষত হতে বিষবেদনা নিজ অধরপুটে আহরণ ক'রে তুমি তোমার আয়ুর অর্ধ হারিয়েছ প্রমতিতনয় রুরু কিন্তু প্রাণ লাভ করেছে তোমার প্রিয়া। শুনে সুখী হলে কি প্রমতিতনয়?

বিপুল হর্ষে উদ্বেল হয় রুরুর কণ্ঠস্বর -শুনে ধন্য হলাম দেবদূত।

—কেন প্রমতিতনয়?

—প্রিয়াহীন অনন্ত আয়ুর চেয়ে প্রিয়ার প্রণয়ে বিলীন মিলনের একটি মুহূর্তের জীবনকেও যে প্রিয়তর বলে মনে হয় দেবদূত।

—ধন্য তোমার প্রেম! সুহাস্য বর্ষণ ক'রে আকাশের বাণী। চলে গেলেন আকাশচারী দেবদূত এবং সেই স্বপ্নময় মূর্ছা হতে জেগে উঠলেন রুরু। দেখলেন, তেমনি ঘুমিয়ে আছে প্রমদ্বরা।

—জাগো চিরদয়িতা প্রমদ্বরা। ব্যাকুল আগ্রহে আহ্বান করেন প্রমতিতনয় রুরু। নিভে আসছে অপরাহ্ণের আলোক, দক্ষিণ সমীর হঠাৎ ছুটে এসে প্রমদ্বরার চূর্ণকুন্তলের স্তবক লীলাভরে চঞ্চলিত ক'রে যায়। দেখতে পান রুরু, তিরোহিত হয়েছে মৃত্যুময় গরলের নীলচ্ছায়া, ফুটে উঠেছে প্রমদ্বরার প্রভাময় অধরের কৌমুদীকণিকা।

আহ্বান করেন প্রমতিতনয় রুরু।—চিরপ্রণয়ীর প্রাণের অর্ধ উপহার নিয়ে জেগে ওঠো প্রমদ্বরা। প্রমতিতনয় রুরুর জীবন প্রাণ গৃহ ও সন্তানবাসনা

তোমারই জন্য প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে। প্রণয়ী প্রমতিতনয়ের প্রাণাধিকা প্রমদ্বরা মিথ্যা হতে দিও না তোমার জীবনের উত্তরফল্গুনী

যেন বিকশিত হয় মুদ্রিত কমলকলিকা। চোখ মেলে তাকায় প্রমদ্বরা। এই জগতেরই এক প্রেমের সঙ্গীত যেন তার অন্তর স্পর্শ ক'রে তার মৃত্যুময় নিদ্রা ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু প্রাণের অর্ধ উপহার দিয়ে চিরজীবনের সঙ্গিনীকে এমন ক'রে কে আহ্বান করছে?

বিস্মিত হয়ে প্রমতিতনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে প্রমদ্বরা। —কে ডাকছে আমাকে?

রুরু বলেন—আমি।

প্রমদ্বরা—প্রাণের অর্ধ উপহার দিয়ে কা'কে ডাকলে তুমি?

রুরু—আমার জীবনের চিরদয়িতাকে।

অপলক নয়নে প্রমতিতনয় রুরুর মুখের দিকে স্নিগ্ধ ও স্মিতপুলকিত দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে প্রমদ্বরা। রুরু বলেন—কি দেখছ প্রিয়া প্রমদ্বরা?

প্রমদ্বরা—দেখছি, স্বপ্নও কি সত্য হয়!

রুরু বলেন—সত্য হয়েছে। ঐ সন্ধ্যাকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ।

বিস্ময়াকুল দুই চক্ষুর দৃষ্টি তুলে সন্ধ্যাকাশের দিকে তাকিয়ে প্রমদ্বরা বলে—কি?

রুরু বলেন—ঐ দেখ উত্তরফল্গুনী।

---

# অনল ও ভাস্বতী

মাহিষ্মতী নগরী। দূর হতে দেখে মনে হয়, যেন স্বর্ণপ্রাচীরে পরিবৃত শরৎ-মেঘের স্তবক। নিকটে এসে দাঁড়ালে দেখা যায়, কুসুমাকীর্ণ অরণ্য-বলয়ে বেষ্টিত শঙ্খধবল ও শিল্পরুচিরম্য সৌধাবলী, পদ্ম স্বস্তিক ও বর্ধমান। এই মাহিষ্মতী নগরীর এক পুষ্পকাননের নিভৃতে মনঃশিলাময় পাষাণের অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে আছে এক কলস্বনা স্রোতস্বিনী। এইখানে এসে প্রতি অপরাহ্ণে একবার দাঁড়িয়ে থাকেন অনল এবং দেখে বিস্মিত হন, তাঁরই আসা-যাওয়ার পথের মাঝখানে কে যেন নানা মাঙ্গল্য উপচার সাজিয়ে প্রত্যহের এক ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে চলে গিয়েছে। সিতচন্দনে সিক্ত সহকার-কিশলয়ের একটি গুচ্ছ ও একটি দীপ। যূথিকার কোরক নয়, কিন্তু দেখতে সুশ্বেত যূথিকারই কোরকের মত, কা'র হৃদয়ের নিবেদিত শ্রদ্ধার লাজাঞ্জলি যেন পথের উপর লুটিয়ে পড়ে আছে। এই কাননিভৃতের ক্ষিতিসৌরভ উশীরবাসিত সলিলে আরও সুবাসিত ক'রে দিয়ে কা'র ভৃঙ্গার যেন এখনই চলে গিয়েছে।

প্রতি অপরাহ্ণের মত আজও আবার বিস্মিত হয়েছেন অনল। কা'র পূজা এমন ক'রে তাঁরই আসা-যাওয়ার পথের উপর পড়ে থাকে? বুঝতে পারেন না এবং আজ পর্যন্ত জানতেও পারেননি. এই পূজা কিসের পূজা! মাহিষ্মতীর একটি দীপ কা'র নীরাজনের জন্য প্রতিদিন এই নিভৃতে আসে আর চলে যায়?

জানতে পারেন না. কিন্তু জানতে ইচ্ছা করেন তাই আজও এই মাহিষ্মতী নগরী ছেড়ে চলে যেতে পারছেন না অনল।

অকস্মাৎ বিপুল স্ফূর্জথুর মত প্রবল নিনাদের আঘাতে মাহিষ্মতীর অরণ্যবলয় যেন শিহরিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সে নিনাদ মেঘারাব নয়, অরণ্যের মদমত্ত মাতঙ্গযূথের বৃংহিতও নয়। শুনতে পেলেন অনল, চতুরঙ্গবলোপেত দিগ্বিজয়ীর ভীমল রণোল্লাস এসে মাহিষ্মতী নগরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অনুমানও করতে পারেন অনল, কে এই দিগ্বিজয়ী। রণামোদে চঞ্চল যে বীরবাহিনীর করধৃত পতাকার প্রোৎফুল্ল কিঙ্কিণীজাল মাহিষ্মতীর প্রাসাদ-কেতনের গর্ব হরণ করবার সংকল্পে নিক্বণমুখর হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় জানেন অনল।

এসেছেন দিগ্বিজয়প্রয়াসী পাণ্ডব সহদেব। নর্মদা অতিক্রম ক'রে রাজ্যের

পর রাজ্য জয় ক'রে মহাশূর সহদেবের অভিষেণনাভিলাষী সৈন্য প্রভঞ্জনের বেগে ধাবিত হয়ে এসেছে। পরাজয় স্বীকার করেছেন অবন্তিরাজ। পরাভূত হয়েছে ভীষ্মকের ভোজ-কটকপুর। বিপর্যস্ত হয়েছে নিষাদভূমি। উৎসাদিত হয়েছে পুলিন্দ দেশ। এইবার মাহিষ্মতী। পাণ্ডবের গজযূথের কর্ণতাল-শব্দ পটহধ্বনির মত বাজে; সেই ধ্বনির আঘাতে মাহিষ্মতীর নগরদ্বারের লৌহকপাট কেঁপে উঠেছে। মনে হয়, পাণ্ডববাহিনীর নিক্ষিপ্ত শরজালে আচ্ছন্ন মাহিষ্মতীর আকাশের নিবিড়ধবল বলাহক যেন ভীত বলাকার মত আর্তনাদ ক'রে উঠেছে।

কিন্তু জানেন না পাণ্ডব সহদেব, এই মাহিষ্মতীর একটি দীপের দিকে এখন করুণাভিভূত নেত্রে তাকিয়ে আছেন জ্বলদর্চিতনু কৃশানু, যাঁর খরনেত্রের বিচ্ছুরিত ক্রোধ এই মুহূর্তে লক্ষ প্রজ্বলন্ত উল্কার জ্বালা নিয়ে পাণ্ডবের চতুরঙ্গবাহিনীকে দগ্ধ ক'রে ফেলতে পারে।

আতঙ্কিত মাহিষ্মতী নগরীকে দিগ্বিজয়ী সহদেবের আঘাত হতে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হলেন অনল। পুষ্পকাননের নিভৃত হতে অগ্রসর হয়ে নগরীর উপান্তে এসে দাঁড়ালেন। প্রচণ্ড জ্বালাময় স্বরূপ প্রকট ক'রে দিলেন অনল। করালধূম জ্বালাবাষ্প আর উল্কাবৎ লক্ষ জ্বলদ্‌বহ্নিশিখা পাণ্ডব অনীকিনীর উপর যেন এক ভয়ংকর আক্রোশের উৎসবে মত্ত হয়ে ওঠে। ভস্মীভূত হয় পাণ্ডবের রণরথ, নির্জিত হয় গজ অশ্ব ও পদাতিক। সহসা এই জ্বালালীলার উৎপাতে ভীত হয়ে অস্ত্রসংবরণ করেন সহদেব। বুঝতে পেরেছেন সহদেব, এ নিশ্চয় অনলদেবের লীলা। অনলের পরাক্রমে ও প্রসন্নতায় সুরক্ষিত মাহিষ্মতীকে অস্ত্রবলে নির্জিত করবার অভিলাষ বর্জন করেন সহদেব। স্তব্ধ হয় পাণ্ডবকটকের ধনু প্রাস ও ভল্ল, অঙ্কুশ পট্টিশ ও তোমর। অনলের অনুকম্পা প্রার্থনা ক'রে দূত প্রেরণ করেন দিগ্বিজয়ী সহদেব।

দূত এসে নিবেদন করে—দিগ্বিজয়প্রয়াসী পাণ্ডব আপনার সহায়তা প্রার্থনা করে, হে বায়ুসখা বৈশ্বানর। মাহিষ্মতী নগরীর অধিপতি নীল শুধু পাণ্ডবের বশ্যতা সুবিনীতচিত্তে ঘোষণা ক'রে ক্ষণকালের জন্য কিরীট অবনত করুক, এইমাত্র অভিলাষ। আপনি বাধা না দিলে পাণ্ডবের এই অভিলাষ অবশ্যই সিদ্ধ হবে। হে হিমারাতি হব্যবাহন, জানি না, যজ্ঞপ্রিয় পাণ্ডবের প্রতি আপনি কেন পরাঙ্মুখ হয়েছেন, আর আপনার সৌহার্দ্য লাভ ক'রে অপরাজেয় হয়েছে মাহিষ্মতীর অযাজ্ঞিক নরপতি নীল!

মাহিষ্মতীর শঙ্খধবল পাষাণের প্রাসাদে নৃপতি নীলের ঈষৎ প্রসন্ন ও

ঈষৎ বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে নীলতনয়া ভাস্বতী—তবুও আপনি বিষণ্ণ কেন পিতা? প্রসন্ন হয়েছেন অনল, প্রচণ্ড সহদেবের বিকট সমরস্পর্ধার আঘাত হতে মাহিষ্মতীর সম্মান রক্ষা করেছেন অনল। আর দুশ্চিন্তা কেন পিতা?

নীল বলেন—এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারছি না তনয়া। অনলের অনুকম্পা প্রার্থনা ক'রে অনলের কাছে প্রচুর পুজোপচার আর রত্নরথ প্রেরণ করেছেন মাদ্রীসুত সহদেব। ভয় হয় কন্যা, তোমার শ্রদ্ধার ঐ সচন্দন সহকারকিশলয় ও দীপ ও লাজাঞ্জলির দিকে আর বেশিক্ষণ করুণাভিভূত নেত্রে তাকিয়ে থাকতে পারবেন না বহ্নিদেব অনল। সহদেবের অভিবাদনে বন্দিত অনল যদি এই মাহিষ্মতীর প্রতি তাঁর এতদিনের কৃপা প্রত্যাহার ক'রে পাণ্ডবশিবিরে চলে যান, তবে এই মাহিষ্মতীকে আর কে রক্ষা করবে?

ভাস্বতী—আমার বিশ্বাস হয় না পিতা। হিরণ্যকৃৎ অনল কি পাণ্ডব প্রেরিত রত্নরথের ঔজ্জ্বল্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন, আর ভুলে যাবেন মাহিষ্মতীর অন্তরের এতদিনের পুজা?

নীল—কিন্তু অনল কি কখনও তোমার পুজার উপচার দেখে মুগ্ধ হয়েছেন?

ভাস্বতী—জানি না পিতা।

নীল—তুমি কি কখনও অনলকে দেখেছ?

ভাস্বতী—না।

নীল—অনল তোমাকে কোনদিন দেখেছেন?

ভাস্বতী—না।

নৃপতি নীলের নয়নে আরও গভীর বিষাদের ছায়া পড়ে।—তাই তো নিশ্চিন্ত হতে পারছি না কন্যা।

পিতা নীলের কথা শুনে হঠাৎ ঔৎসুক্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে ভাস্বতীর সুভঙ্গিম ভ্রূরেখা—আপনার কথার অর্থ কি পিতা?

নীল—যদি চিত্রিতা কেতকীর মত নয়নাভিরামা এই পুজাচারিণীকে, মাহিষ্মতীর অন্তরের জ্যোতির্লেখার মত নীলতনয়া এই ভাস্বতীকে কোন শুভ মুহূর্তে দেখতে পেতেন অনল, এবং দেখে মুগ্ধ হতেন, তবে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হতে পারত মাহিষ্মতী। অনলপ্রিয়া ভাস্বতীর মাহিষ্মতীকে স্পর্শ করবার দুঃসাহস কোন দিগ্বিজয়ীর মনে আর দেখা দিত না। পাণ্ডব সহদেবের শত স্তুতিবাদ পুজোপচার আর উজ্জ্বল রত্নরথনেমির হর্ষ অনলের প্রত্যাখ্যানে বিফল হয়ে ফিরে চলে যেত চিরকালের মত।

ভাস্বতী বলে—আশীর্বাদ কর পিতা, যেন আমার ব্রত সফল হয়।

নীল—কিসের ব্রত কন্যা?

সলজ্জ স্বরে ভাস্বতী বলে—আমারই জীবনের এক নূতন ব্রত।

প্রসন্নস্বরে পিতা নীল তাঁর অন্তরের আশা অভিব্যক্ত করেন—বুঝেছি কন্যা; আশীর্বাদ করি, তোমার এই ব্রত সফল হোক, অনলের ভার্যা হোক মাহিষ্মতীর কুমারী ভাস্বতী।

অপরাহ্নের আলোকে আলিম্পিত হয়ে আছে মাহিষ্মতীর পুষ্পকানন। মনঃশিলাময় পাষাণের ক্রোড়সঞ্চারিণী স্রোতস্বিনী, যেন তরলিত রক্তাভার প্রবাহ; যেন চুম্বনরভসে ক্লান্ত গীর্বাণগণিকার দল নিশাবসানে নির্ঝরমূলে এসে অধররাগ ধৌত ক'রে চলে গিয়েছে, তাই শোণিম হয়ে গিয়েছে সলিল। নক্তমালের পল্লবভার আতপতাপিত তৃণভূমির উপরে ছায়া বিস্তার করে। অনলের আসা-যাওয়ার পথের মাঝখানে প্রতিদিনের মত আজও একটি পূজা-দীপের শিখা জ্বলে। আর, দাঁড়িয়ে থাকে নীলতনয়া ভাস্বতী।

জীবনে স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করেনি ভাস্বতী, এইভাবে অভিসারিকার মত উৎকণ্ঠা নিয়ে এক পুরুষের আসা-যাওয়ার পথের উপর এসে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কিন্তু এ কেমন অভিসার! জীবনে কোন মুহূর্তেও যার মূর্তি নয়নগোচর হয়নি, তারই দর্শনলাভের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা। নিদ্রা ও জাগরণের কোন ক্ষণে যার জন্য মনের কোন ভাবনা অনুরাগে চঞ্চলিত হয়ে ওঠেনি, তারই জন্য বিচলিতচিত্তে পথ চেয়ে থাকা। অদ্ভুত এই পরীক্ষা স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়েছে ভাস্বতী।

মাহিষ্মতী নগরীর গর্ব ও সম্মানকে দিগ্বিজয়ী পাণ্ডবের কাছে বশ্যতা স্বীকারের অভিশাপ হতে রক্ষা করতে পারেন যে, এমনই এক পরম পরাক্রান্তের করুণা ও সহায়তা আহ্বান ক'রে এতদিন এক বন্দনাব্রত উদ্‌যাপন ক'রে এসেছে ভাস্বতী। এতদিন ছিল শুধু এক শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্রত। শক্তিমানের কাছে প্রপন্নের আবেদনের ব্রত। কিন্তু আজ সেই পূজাস্থলীর কাছে প্রণয়াভিলাষিণী নায়িকার মত দাঁড়িয়ে আছে অবিদিতপ্রণয়া কুমারী ভাস্বতী। আসবেন অনল, এবং নীলতোয়দলালিতা তড়িল্লেখার মত তন্বী নীলতনয়ার তনুরুচি মুগ্ধনেত্রসম্পাতে অভিষিক্ত ক'রে আহ্বান করবেন—এস চিত্রভানুর চিত্তবিমোহিনী ভাস্বতী।

নিজেরই কল্পনার ভাষা শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে ভাস্বতী। ক্লান্ত দ্রুমোৎপলের নিঃশ্বাসপরিমল হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়। শিহরিত হয় বনবায়ু। শিহরিত হয় ভাস্বতীর ভ্রূলতা। নবপরিণয়লজ্জাবিধুরা ও বাসকশয়নভীরু বধূর মত ভাস্বতীর আরক্তিম কপোলে স্বেদাঙ্কুরকণা ফুটে ওঠে। আজ এই পুষ্পবনের নিভৃতে এসে ভাস্বতীর জীবন যেন উদ্ভিন্ন শতদলের মত বিকশিত

হয়ে উঠতে চায়। যেন নিখিলমধুরিমার উৎসেক লাভ ক'রে পুষ্পিত হতে চায় যৌবনবেদনা। হ্যাঁ, বুঝতে পারে ভাস্বতী, সে আজ এক প্রেমিকের দুই মুগ্ধ চক্ষুর দৃষ্টি বরণ করবার ব্রত উদ্‌যাপনের আশায় কলস্বনা এই স্রোতস্বিনীর তটে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কে তুমি কুমারী?

দীপ্ততনু এক পুরুষ-সত্তম এসে নীলতনয়া ভাস্বতীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন।

ভাস্বতী বলে—আমি নীলতনয়া ভাস্বতী। আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছা করি ধীমান্‌।

মৃদুহাস্যে অধর শিহরিত ক'রে ভাস্বতীর উৎসুক নয়নের দিকে তাকিয়ে দীপ্ততনু আগন্তুক বলেন—আমি অনল।

ভাস্বতী—মাহিষ্মতীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন অনলদেব।

অনল—শ্রদ্ধা কেন?

ভাস্বতী—আপনারই লীলা-পরাক্রমে বিপন্মুক্ত হয়েছে মাহিষ্মতী। আপনি সহায় থাকলে দিগ্বিজয়ী পাণ্ডব মাহিষ্মতীব প্রাসাদকেতন অবনমিত কববার আশা বর্জন ক'রে ফিরে যাবে।

অনল—আমার সহায়তা হতে বঞ্চিত হতে পারে মাহিষ্মতী. এমন সংশয়ের কোন হেতু কি দেখতে পেয়েছ নীলতনয়া?

ভাস্বতী—না অনলদেব, তবু পিতা শুনে নিশ্চিন্ত হতে চান, মাহিষ্মতীর পূজা গ্রহণ ক'বে আপনি তৃপ্ত হয়েছেন।

অনল—তৃপ্ত হয়েছি কুমারী।

ভাস্বতী—কিন্তু আপনার আসা-যাওয়ার পথের মাঝখানে এই পুষ্প-কাননের নিভৃতে প্রতি প্রভাতে এসে পূজার উপচার সাজিয়ে রেখে গিয়েছে যে পূজাচারিণী, তাকে আপনি কোনদিন দেখতে পাননি।

অনল—পাইনি। আশা আছে মনে একদিন তাকে দেখতে পাব আর দেখে মুগ্ধ হব।

ভাস্বতী—আজ তাকে দেখতে পেয়েছেন অনলদেব।

বিস্মিত অনল বলেন—তুমি?

ভাস্বতী বলে—হ্যাঁ, আমি। আমারই সুবর্ণভৃঙ্গার উশীরবাসিত সলিল ঢেলে আপনারই পদস্পর্শপূত পথের মৃত্তিকা নিত্য সুরভিত করেছে।

অনল বলেন—মাহিষ্মতীর প্রিয়কারিণী কন্যা, তোমার শ্রদ্ধায় তৃপ্ত হয়েছি আমি. আর বিস্মিত হয়েছি তোমাকে দেখে, কিন্তু...।

ভাস্বতী—বলুন অনলদেব।

অনল—কিন্তু মুগ্ধ হতে পারিনি।

ভাস্বতীর নয়নদ্যুতি বাত্যাহত দীপশিখার মত ব্যথিত হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে ভাস্বতী, মিথ্যা বলেননি অনল। নীলতনয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন অনল, যেন কৌতুকামোদে কুতূহলী এক দহনদাতা এক মৃৎপ্রদীপের দিকে তাকিয়ে আছে। ঐ দৃষ্টি প্রেমবিবশ পুরুষের মুগ্ধ চক্ষুর দৃষ্টি নয়।

অনল প্রশ্ন করেন—ব্যথিত হলে কেন নীলরাজতনয়া?

ভাস্বতী—আশা ছিন্ন হলে, স্বপ্ন চূর্ণ হলে, আর কল্পনা দগ্ধ হয়ে গেলে কে না ব্যথিত হয় অনল?

অনল—কি বলতে চাও নীলতনয়া? তবে তুমি কি মাহিষ্মতীর রক্ষাকারী অনলের অনুরাগিণী?

ভাস্বতী—না অনলদেব।

অনল—তবে?

ভাস্বতী—আমি দুটি মুগ্ধ পুরুষনয়নের অনুরাগিণী। মন চায়, তারই কণ্ঠে বরমাল্য দান করি, যে এই নীলতনয়া ভাস্বতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

অনল—সুন্দর তোমার আকাঙ্ক্ষা! আশীর্বাদ করি, তোমার এই আকাঙ্ক্ষা সত্য হয়ে উঠুক। তারপর একদিন সত্য হবে অনলের আকাঙ্ক্ষা।

ভাস্বতী—কি আশীর্বাদ করলেন, বুঝতে পারছি না অনলদেব।

অনল—পরানুরাগিণী নীলতনয়ার সেই বরমাল্য জয় ক'রে নিয়ে আর কণ্ঠে ধারণ ক'রে একদিন তৃপ্ত হবে অনল।

আর্তনাদ ক'রে ওঠে ভাস্বতী—নিষ্ঠুর কৌতুকের অধীশ্বর, হে বৈশ্বানর!

অনল—বল নীলতনয়া ভাস্বতী!

ভাস্বতী—আমার প্রেম কামনা করবেন যিনি, আমি শুধু তাঁকেই প্রেম দান করব।

অনল—করো।

ভাস্বতী—আমাকে দেখে মুগ্ধ হবেন যিনি, আমি শুধু তাঁরই কণ্ঠে বরমাল্য দেব।

অনল—দিও।

ভাস্বতী—প্রেমিকের কাছে সমর্পিতপ্রাণ ভাস্বতীর হাতের সেই বরমাল্য কেড়ে নিতে পারে, এমন শক্তি ত্রিলোকে কারও নেই হুতবহ অগ্নি, আপনারও নেই।

অনল বলেন—কিন্তু, যদি এই মুহূর্তে তোমারই প্রণয়বাসনায় চঞ্চল হয়ে

তোমাকে আহ্বান করি ভাস্বতী, তবে? যদি পুষ্পাসবপিপাসী মধুপের মত লুব্ধ হয়ে তোমার ঐ সুন্দর মুখকমলের কাছে এগিয়ে যায় অনলের বক্ষের তৃষ্ণা, তবে?

ভাস্বতী—তবে এই মুহূর্তে অনলের কণ্ঠে বরমাল্য দান ক'রে ধন্য হবে নীলরাজতনয়া ভাস্বতী।

কৌতুকভরে, পুনরায় হাস্য উচ্ছ্বসিত ক'রে অনল বলেন—বিদায় দাও ভাস্বতী।

ভাস্বতী—বিদায় গ্রহণ করুন বৈশ্বানর।

চলে গেলেন অনল। আর, পুষ্পকাননের নিভৃতে দাঁড়িয়ে সুরভিশ্বাসী দ্রুমোৎপলের দিকে তাকাতে গিয়ে বুঝতে পারে ভাস্বতী, তার দুই চক্ষুর উদ্গত অশ্রুবাষ্পও যেন ঐ চূর্ণ মনঃশিলার মত তার আহত মনের ছায়াসম্পাতে বক্তিম হয়ে উঠেছে।

কি অদ্ভুত এই অনলের কামনা! রজনীহাস শেফালিকার মত অতাপ-স্পর্শিতা কুমারীর স্ফুটযৌবনের শুচিসুধার জন্য তাপদহনবিলাসী অনলের হৃদয়ে কোন তৃষ্ণা নেই। তাই নীলতনয়া ভাস্বতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলো না অনলের চক্ষু। প্রেম দান ক'রে অবিদিতপ্রণয়া নারীর হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার করতে জানে না, চায়ও না, লীলাপরাক্রমের আনন্দে উদ্ভ্রান্ত ঐ পাবকের হৃদয়। চিরজীবনের সঙ্গিনী হবার জন্য যে নারী বরমাল্য হাতে নিয়ে কাছে এগিয়ে যেতে চায়, তার আশা বিফল ক'রে দিয়ে সুখী হয় এই বিচিত্র জ্বালাস্বপ্নচারী বৈশ্বানর। অপরের প্রেমবন্দিতা নারীর কামনামধুর অন্তরের নিষ্ঠা লুণ্ঠন করবার জন্য কৌতুকরঙ্গে চঞ্চল হয়ে রয়েছে জ্বলদর্চি-প্রভায় অর্চিততনু অনল।

চলে গিয়েছেন অনল, কিন্তু মনে হয় ভাস্বতীর, যেন এক হৃদয়হীন কৌতুকীর দৃষ্টি তার দেহ রূপ আর যৌবনের উপর অপমানের জ্বালা নিক্ষেপ ক'রে চলে গিয়েছে। নীলতনয়া ভাস্বতী কি সত্যই এত অমধুরা যে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হতে পারে না জগতের কোন পুরুষের চক্ষু?

কণ্টকবিদ্ধা মৃগবধূর মত পুষ্পকাননের নিভৃতে সুচ্ছায় নক্তমালতলে বসে থাকে ভাস্বতী। অপরাহ্ণের আলোক ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে। স্নিগ্ধতর হয় নক্তমালের ছায়া। রাগময়ী সন্ধ্যার প্রথম দ্যুতি এসে ভাস্বতীর কপোল স্পর্শ করে। অকস্মাৎ এক আগন্তুকের পদধ্বনি শুনে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে নীলতনয়া ভাস্বতী।

স্নিগ্ধদর্শন এক ব্রাহ্মণকুমার ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সন্ধ্যার বিষাদলীনা জলকমলিনীর মত অশ্রুমায়াময়ী ভাস্বতীর মুখের দিকে মুগ্ধ ও অপলক

চক্ষুর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে। বিস্মিত হয় ভাস্বতী, যেন তারই অন্তর-বেদনার ভাষা শুনতে পেয়ে অন্তরীক্ষ হতে এক অনিন্দ্যসুন্দর প্রেমিকের হৃদয় ছুটে এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। ঐ দুই চক্ষুর দৃষ্টি-পীযূষধারার উৎসেক পেয়ে যেন জেগে উঠেছে ভাস্বতীর যৌবনময় প্রাণের কামনা, হিমকর-দীধিতির স্পর্শে যেমন জেগে ওঠে তন্দ্রাভিভূত বনমল্লিকার কোরক। মনে হয়, এই পুষ্পকাননের আর এক নিভৃতে জেগে উঠেছেন নিখিলকামনার অধীশ্বর অতনু কুসুমেষু। জীবনের প্রথম অনুরাগের আবেগে স্মিতহাস্য-জ্যোতি অধরে স্ফুরিত ক'রে ভাস্বতী প্রশ্ন করে—কে আপনি?

—আমি ব্রাহ্মণকুমার সুবর্চা। পুষ্পকাননচারিণী জ্যোতির্লেখার মত কে তুমি কুমারী?

—আমি নীলতনয়া ভাস্বতী।

—কা'র পদধ্বনির উপাসনার জন্য এই কাননভূমিতে বসে আছ রাজতনয়া ভাস্বতী?

—আপনি কা'র পদধ্বনি অন্বেষণের আশায় এই কাননের নিভৃতে এসেছেন কুমার?

—কোন আশা নিয়ে আসিনি। আমার আশার অতীত প্রিয়দর্শিনী এক নারীর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে আমার জীবন আজ ধন্য হলো। ঐ মুখচ্ছবি আমার জীবনের চিরকালের স্বপ্ন হয়ে থাকবে। অনাহত সঙ্গীতের মত তোমার ঐ মঞ্জীরিত চরণের ধ্বনি আমার সকল কল্পনার অন্তরে চিরকাল বাজবে। বরবর্ণিনী ভাস্বতী, তোমার হাতের বরমাল্যের দিকে তাকিয়ে শুধু ব্যর্থ পিপাসার বেদনা নিয়ে চলে যাবে সুবর্চা।

—নীলতনয়া ভাস্বতীর হাতের বরমাল্যের প্রতি এত মোহ কেন প্রকাশ করছেন কুমার?

—সত্যই কি বুঝতে পার না নীলতনয়া?

—না।

—মন চায়, আমার জীবনের সকল মুহূর্তের কামনায় বন্দিত হও তুমি। হও চিরপ্রেয়সী। হও আমার সকল স্বপ্ন সুপ্তি তন্দ্রা ও কল্পনার তৃপ্তি। হও সুবর্চার সুখদুঃখভাগিনী গেহিণী!

ভাস্বতী বলে—তাই সত্য হোক প্রিয় সুবর্চা।

সুবর্চা—তবে দাও তোমার বরমাল্য। আমার প্রণয় সফল কর নীলতনয়া ভাস্বতী।

ভাস্বতী—একটি অনুরোধ আছে।

সুবর্চা—বল।

ভাস্বতী—পিতা নীলের স্নেহাভিষিক্ত হৃদয়ের আশীর্বাদ লাভ ক'রে যেদিন তুমি গ্রহণ করবে ভাস্বতীর এই হাত...।

সুবর্চা—সেদিন কবে আসবে ভাস্বতী?

ভাস্বতী—প্রার্থনা কর, সেই শুভদিন যেন অচিরাসন্ন হয়। সেই দিন, এক উৎসবমধুর সন্ধ্যার এক পুণ্যক্ষণে এই পুষ্পকাননের স্রোতস্বিনীর তটে এসে, তোমার কণ্ঠে তোমারই প্রিয়ার প্রেমব্যাকুল হাতের বরমাল্য নিও।

—ভাস্বতী!

রবরোষিত কেশরীর মত পিতা নীলের ক্রোধকম্পিত আহ্বান শুনে চমকে ওঠে ভাস্বতী।

• মাহিষ্মতীর প্রাসাদের এক কক্ষের নিভৃতে পিতা নীলেব সম্মুখে এসে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকে ভাস্বতী।

—মাহিষ্মতীর সর্বনাশ চাও কন্যা?

—এই সন্দেহ কেন পিতা?

—সন্দেহ নয়; সবই দেখেছি কন্যা। তুমি ব্রতভঙ্গকারিণী, তুমি এক কামতস্করের সঙ্গিনী। তোমাব আচবণে কুপিত হয়ে অনল অদৃশ্য হয়েছেন। মাহিষ্মতীর রক্ষাকারী অনলের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা প্রেমে পরিণত হবে, তুমি হবে অনলভার্যা ভাস্বতী, আমাব এই আশা তুমিই চূর্ণ ক'রে দিলে উদ্ভ্রান্তা কন্যা!

—আমি আমাব প্রেমিকের কাছে হৃদয় দান করেছি পিতা।

—ঐ বনচারী ব্রাহ্মণ তোমার প্রেমিক?

—হ্যাঁ পিতা।

—অনলের প্রেমলাভের জন্য তোমার মনে কোন আকাঙ্ক্ষা নেই?

—না।

—কেন?

—অপ্রেমিক অনলের মনে আপনার কন্যা ভাস্বতীর জন্য কোন প্রেম নেই।

—কিন্তু সেই কারণেই তো ব্রতচারিণী হবে তুমি। মাহিষ্মতীর বিপদবারণ লোকপ্রবীর অনলের প্রেমাভিলাষে তুমি তপস্বিনী হবে। বিশ্বাস ছিল, সেই তপস্যা একদিন সফলও হবে। কিন্তু সামান্য এই প্রতীক্ষার ধর্মও বর্জন ক'রে তুমি কোন্ এক বনচারী ছলপ্রণয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে আর মুগ্ধ হয়ে বরমাল্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ দুরাচারিণী কন্যা। কিন্তু তোমার এই দুরাশা সফল হবে না।

—পিতা! আর্তনাদ ক'রে পিতা নীলের মুখের দিকে তাকিয়ে বাষ্পায়িত

নয়নে হৃদয়ের বেদনা নিবেদন করে ভাস্বতী—এমন অভিশাপ দেবেন না পিতা।

নীল—অভিশাপ শান্তচিত্তে সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হও কন্যা।

চিৎকার ক'রে ওঠে ভাস্বতী—স্পষ্ট ক'রে বলুন পিতা, কোথায় আছেন সুবর্চা।

নীল—এই প্রাসাদেরই এক লৌহকক্ষে কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ সুবর্চা এখন তার দুঃসাহসের শাস্তি সহ্য করছে।

—পিতা!

—আর্তনাদ স্তব্ধ কর কন্যা।

কিন্তু কি বিস্ময়ের বিষয়! নীলতনয়া ভাস্বতীর সেই আর্তনাদের প্রতিধ্বনি যেন লক্ষ অগ্নিশিখা হয়ে প্রাসাদের চতুর্দিকে জেগে উঠল। যেন অন্তরীক্ষ হতে এক প্রজ্বলিত দাবানল অকস্মাৎ মাহিষ্মতীর শঙ্খধবল পাষাণে রচিত প্রাসাদের শিরে লুটিয়ে পড়েছে। আতঙ্কিত হয়ে আর বিস্মিত হয়ে এই করাল ধূমপুঞ্জ ও অগ্নিজ্বালাব বিভীষিকার লীলা দেখতে থাকেন মাহিষ্মতীর অধিপতি নীল। এ যে অনলেরই আক্রোশের মত এক করাল জ্বালালীলা।

কে এই ব্রাহ্মণবেশী সুবর্চা? অকস্মাৎ, যেন তাঁর অন্তরের ভিতরে এক দাবদগ্ধ বিস্ময় আর কৌতূহলেব জ্বালা সহ্য করতে না পেরে দ্রুত ছুটে চলে যান নীল, এবং লৌহকক্ষের নিকটে এসেই হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। হ্যাঁ, সত্য হয়েছে তাঁব অনুমান। ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে লৌহকক্ষ, আর সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আছেন সেই স্নিগ্ধতনু ব্রাহ্মণ-কুমার সুবর্চা।

কাতরস্বরে প্রশ্ন করেন নীল—আপনার পরিচয় প্রদান করুন ব্রাহ্মণকুমার। দৈব পরাক্রমে বলী, কে আপনি ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ?

মৃদুহাস্য স্ফুরিত ক'রে সুবর্চা বলেন—আমি অনল।

অদৃশ্য হলো অগ্নিজ্বালার বিভীষিকা। সান্ধ্য বায়ুব মৃদু শীতসঞ্চারে আবার শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে মাহিষ্মতীর প্রাসাদ। কৃতাঞ্জলি করে এবং প্রসন্ন হাস্যে হৃদয়ের আনন্দ নিবেদন করেন নীল।—ধন্য হলো মাহিষ্মতী! ধন্য হলো মাহিষ্মতীর অধিপতি নীল ও নীলতনয়া ভাস্বতী! আপনার কৃপালীলায় আমার সকল আশা সফল হলো দেব বীতিহোত্র।

অনল বলেন—নিশ্চিন্ত হোন নৃপতি নীল, আমার নির্দেশে দিগ্বিজয়ী পাণ্ডব শুধু আপনার দান গ্রহণ ক'রে তৃপ্ত হয়ে চলে যাবে।

নীল—মাহিষ্মতীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন দেব বৈশ্বানর।

অনল বলেন—আর, আমারই বাঞ্ছিতা ভাস্বতীকে আমার কাছে সম্প্রদান করুন ভাস্বতীপিতা নীল।

—ভাস্বতী! স্নেহাভিভূত কণ্ঠে আহবান করেন নীল।

অনল—একটি প্রস্তাব আছে নৃপতি নীল। ভাস্বতীর কাছে আমার পরিচয় এখনই প্রকাশ ক'রে দেবেন না।

নীল—তথাস্তু অনলদেব।

নৃপতি নীল পুনরায় আহবান করেন—ভাস্বতী!

ভাস্বতী এসে সম্মুখে দাঁড়ায়। মৃদু হাস্যে কৃতার্থ হৃদয়ের আনন্দ উদ্ভাসিত ক'রে নীল বলেন—এস কন্যা, এই দেখ, তোমার প্রেমধন্য জীবনের সহচর সুবর্চা তোমারই প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

মন্ত্র পাঠ ক'রে তনয়া ভাস্বতীকে সুবর্চার কাছে সম্প্রদান ক'রে চলে গেলেন নৃপতি নীল। ভাস্বতীর পাণি গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ সুবর্চা সাকাঙ্ক্ষ স্বরে প্রশ্ন করেন—বরমাল্য কই প্রিয়া ভাস্বতী?

স্নিগ্ধহাসিনী বনমল্লিকার মত সুষমা বিকশিত ক'রে স্মিতাধরা ভাস্বতী বলে—আছে।

—কোথায়?

—পুষ্পকাননের নিভৃতে, সেই নক্তমালের ছায়ায়, সেই মনঃশিলার অলক্তকে রঞ্জিত স্রোতস্বিনীর তটে।

সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হয়ে আছে নক্তমালের ছায়া। উৎপল-পরিমলে বিহবল হয়েছে বনবায়ু। পুষ্প চয়ন করেছে ভাস্বতী, এবং মাল্য রচনাও সমাপ্ত হয়েছে। নিকটে এসে দাঁড়ায় ভাস্বতীর প্রেমিক সুবর্চা, ভাস্বতীর স্বামী সুবর্চা।

প্রণাম করে ভাস্বতী, এবং তার পরেই দুই হাতে বরমাল্য উত্তোলন ক'রে সুবর্চার মুখের দিকে তাকায়—প্রিয় সুবর্চা!

কিন্তু একি? এ কা'র মূর্তি? সেই মুহূর্তে যেন এক দুঃসহ শাস্তির আঘাতে ব্যথিত হয়ে যন্ত্রণাক্ত স্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে ভাস্বতী—কে তুমি?

—আমি তোমারই প্রিয় প্রেমিক ও পতি সুবর্চা।

—মিথ্যা কথা! তুমি অনল, তুমি শুধু অনল, জ্বালালীলাবিলাসী অনল। তুমি সুবর্চা নও।

—সুবর্চার ছদ্মরূপ ধারণ ক'রে আমিই তোমার প্রেম কামনা করেছি

ভাস্বতী। যে অনলের মুগ্ধ চক্ষুর দৃষ্টি বরণ করবার আশায় পুষ্পকাননের এই নিভৃতে সেদিন দাঁড়িয়েছিলে তুমি, সেই অনলই সুবর্চা হয়ে তোমাকে মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে বরণ করেছিল ভাস্বতী।

ভাস্বতী—নিষ্ঠুর কৌতুকের অধীশ্বর হে বৈশ্বানর!

বিস্মিত হন অনল - নিষ্ঠুর বলছ কেন ভাস্বতী? আমিই তো তোমার সুবর্চা।

ভাস্বতী—না, আমার সুবর্চা তুমি নও।

অনল—তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না ভাস্বতী।

ভাস্বতী– কেন পারছেন না অনলদেব? পরপুরুষের কণ্ঠে মাল্য দান করতে পারে না সুবর্চার ভার্যা ও প্রেমিকা ভাস্বতী।

—পরপুরুষ?

—হ্যাঁ, আমার আশার স্বপ্ন উদ্ভাসিত করেছে যে, আমার কামনার আশা উদ্দীপিত করেছে যে, আমার অন্তরের স্তরে স্তরে মুদ্রিত হয়ে আছে যার মূর্তি সে হলো সুবর্চা। আমার কাছে আপনি পরপুরুষ মাত্র। অপরের প্রেমবন্দিতা নারীর হাতের বরমাল্য জয় করবার দুর্বাসনা বর্জন করুন অনলদেব।

—ভাস্বতী! উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অনলের কণ্ঠস্বর। জানেন নৃপতি নীল, সুবর্চার ছদ্মরূপে আমি অনল তাঁর তনয়া ভাস্বতীর প্রেম কামনা করেছি। তোমার পিতা নৃপতি নীল আমার কাছেই তাঁর দুহিতা ভাস্বতীকে সম্প্রদান করেছেন। তুমি তোমার পিতার মন্ত্রোচ্চারিত সম্প্রদান ব্যর্থ করতে পার না। সে অধিকার তোমার নেই।

ভাস্বতী—তুমি সুবর্চার রূপ ধারণ ক'রে পিতা নীলের সম্মুখে ভাস্বতীর যে হাত গ্রহণ করেছ, আজ এই সন্ধ্যারাগে অরুণিত পুষ্পকাননের নিভৃতের উৎসবে সুবর্চারই রূপ ধারণ ক'রে প্রেয়সী ভাস্বতীর হাতের সেই বরমাল্য গ্রহণ কর।

সকল জ্বালালীলার অধীশ্বর অনলের অন্তরে যেন এক অপমানের জ্বালা লাগে। বিষণ্ণস্বরে বলেন—তোমার কাছে আমি চিরকাল সুবর্চার রূপ ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকি, এই কি তোমার ইচ্ছা?

ভাস্বতী—হ্যাঁ অনল। তুমি সুবর্চা হও।

অনল—না।

ভাস্বতী—এস অনল, আমার জীবনের একমাত্র প্রেমিক সেই সুবর্চার রূপ নিয়ে আমার জীবনের চিরসঙ্গী হয়ে থাক।

অনল—না, এই দুরাশা বর্জন কর নীলকন্যা।

ভাস্বতী—তবে সুবর্চার প্রিয়া ভাস্বতীর বরমাল্য লাভের আশা বর্জন করুন অনলদেব।

সেই মুহূর্তে বরমাল্য ছিন্ন ক'রে বিস্রস্ত কুসুমদাম স্রোতস্বিনীর সলিলে নিক্ষেপ করে ভাস্বতী।

বিদ্রূপকুটিল ভ্রূভঙ্গী ও কৌতুকতরল হাস্য শিহরিত ক'রে তাকিয়ে থাকেন অনল। আর, স্থির চিত্রলেখার মত দাঁড়িয়ে স্রোতস্বিনীর অস্থির সলিলের দিকে তাকিয়ে থাকে ভাস্বতী।

অনল বলেন—তোমার সকল প্রলাপ ক্ষমা করলাম ভাস্বতী।

উত্তর দেয় না ভাস্বতী।

অনল—সুন্দরাননা ভাস্বতী তোমার ঐ চিবুক ও অধর, ঐ পীনবক্ষ ও ক্ষীণকটি. ঐ সুগ্রীবাভঙ্গী আর গুরুশ্রোণিভার, সকলই আমার অধিকার।

প্রাণহীনা ও ভাষাহীনা পাষাণের পুত্তলিকার মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভাস্বতী।

অনল বলেন—অনলের বক্ষোলগ্ন হও মাহিষ্মতীর দীপশিখা।

সাড়া দেয় না ভাস্বতী!

নিবিড় আলিঙ্গনে ভাস্বতীর অচঞ্চল মূর্তি বক্ষোলগ্ন করেন অনল। পুষ্পকাননের নিভৃতে সন্ধ্যারাগে অভিভূত নক্তমালের ছায়া অনলের বাসনা-বাসিত উৎসবের মুহূর্তগুলিকে নীরবে সহ্য করতে থাকে।

—অনলের তৃষ্ণার তৃপ্তি নীলতনয়া ভাস্বতী।

তৃপ্তপ্রাণ অনলের আহ্বানে যেন মূর্ছা ভেঙ্গে জেগে ওঠে ভাস্বতী। বিশ্লথ কবরীভার কম্প্রহস্তে বিন্যস্ত ক'রে অনলের মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু চমকে ওঠেন অনল এবং আর্তস্বরে বলেন- এ কি ভাস্বতী, তোমার নয়ন অশ্রুসিক্ত কেন?

ভাস্বতী—অন্যপূর্বা নারীকে বক্ষোলগ্ন করেছেন আপনি, আপনার সংকল্প সিদ্ধ হয়েছে। আপনার লীলা-পরাক্রমে উপকৃত মাহিষ্মতীর একটি কৃতজ্ঞতার দেহকে আপনি শুধু আপনার অধিকারের উল্লাসে উপভোগ করেছেন। তৃপ্ত হয়েছেন আপনি, কিন্তু আমার তৃপ্তি সুবর্চার সন্ধানে স্রোতস্বিনীর জলে ভেসে গিয়েছে।

আহত কণ্ঠস্বরে চিৎকার করেন অনল।—কি বললে ভাস্বতী?

ভাস্বতী—যা শুনলেন তাই বলেছি অনলদেব। আমার বরমাল্য, আমার মঞ্জীরধ্বনি, আমার নিঃশ্বাস আর অতৃপ্ত অধর অনন্তকাল আমার সুবর্চাকেই খুঁজে বেড়াবে।

অনল—তবে বৃথা কেন অনলের এই প্রণয়োৎসুক বাহুর আলিঙ্গন বরণ করলে নীলতনয়া?

ভাস্বতী—বরণ করেছে নীলতনয়া ভাস্বতীর অসহায় দেহ। ভাস্বতীর মন আপনাকে বরণ করেনি অনলদেব।

অনল—ভাস্বতী!

ভাস্বতী—বলুন অনলদেব।

অনল—এহেন কৃত্রিম জীবনই কি তোমার কাম্য?

ভাস্বতী—হ্যাঁ অনলদেব, ভাস্বতীর মন কখনও আপনার বক্ষের নিকটে যাবে না। আপনার কামনার জ্বালা চিরকাল নীরবে সহ্য করবে ভাস্বতীর দেহ, কিন্তু ভাস্বতীর মন চিরকাল তার স্বপ্নচারী প্রেমিক সুবর্চার বুকে লুটিয়ে থাকবে।

অনলের চক্ষু অকস্মাৎ খরবহ্নিশিখার মত জ্বলে ওঠে।—এ যে অভিশাপ, অশুচি স্বৈরিণীর জীবন!

হেসে ওঠে ভাস্বতী—হ্যাঁ, আপনারই আশীর্বাদ আপনারই কৌতুকের দান, হে সর্বশুচি বৈশ্বানর।

# ভৃগু ও পুলোমা

মহর্ষি ভৃগু ডাকলেন—পুলোমা!

স্বামী ডাকছেন, মহাতপা আর্য ভৃগু, পুলোমার স্বামী।

—আদেশ করুন আর্য।

পুলোমা ব্যস্ত হয়ে, অন্য কাজ ফেলে রেখে ভৃগুর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। স্বামীর আহ্বানে এমন ক'রে সাড়া দেওয়াই ধর্মপত্নীর কর্তব্য। আর্যের সংসারে বিবাহিতা নারীর এই রীতি।

ভৃগুর সংসারে কর্তব্যই সবচেয়ে বড় বিধান। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে পুলোমার জীবন ভৃগুর জীবনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই সংসারে দুজনের কেউ কখনও কর্তব্য বিস্মৃত হয় না। ভৃগু তাঁর জীবনের প্রতিটি কর্তব্যে পুলোমাকে স্মরণ করেন পুলোমাও ভৃগুর প্রতিটি অনুরোধ ও আহ্বানে সাড়া দেয়।

শুধু পুত্রার্থে ভার্যা গ্রহণ করেছেন ভৃগু। তাঁর সেই সংস্কার সফলও হতে চলেছে, কারণ পুলোমা এখন অন্তর্বত্নী। পুলোমার জীবনে মাতৃত্বের আবির্ভাব আসন্ন হয়ে উঠেছে।

পুলোমাও তার জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলে মনে করে। সমাজে ভৃগুজায়ারূপে পুলোমা যে গৌরব অনুভব করে, ভৃগুসন্তানের মাতারূপে তার সেই গৌরব এইবার আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যিনি আর্য ঋষির ধর্মপত্নী, তাঁর পক্ষে জীবনে এই তো ধন্য হওয়ার মত ঘটনা।

পুলোমা কাছে এসে দাঁড়াতেই ভৃগু বলেন—আমি স্নানে চললাম পুলোমা।

পুলোমা বলে—আসুন।

ভৃগু চলে যাবার পর, ঠিক পূর্বের মত আবার গৃহকর্মে মন দিতে পারে না পুলোমা। হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনা হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু আজ নয়, এবং স্বামীর এই ক্ষণকালের অন্তর্ধানের জন্যও নয়, মাঝে মাঝে কে জানে কিসের জন্য হঠাৎ এই রকম অন্যমনা হয়ে যায় পুলোমা। পুলোমা নিজেও তাঁর এই বৈচিত্ত্যের অর্থ বুঝতে পারে না।

পুলোমার এই আকস্মিক অন্যমনা আবেশ লক্ষ্য করেন একজন, বৃদ্ধ হুতাশন। ভৃগুর কুটীরে গৃহরক্ষকরূপে রয়েছেন হুতাশন। পুলোমার শিশুকাল থেকেই পুলোমাকে তিনি জানেন। পিতার আলয়ে যতদিন যেভাবে

কুমারী-জীবন যাপন করেছে পুলোমা. তার সকল ইতিহাস জানেন হুতাশন। আজ স্বামিগৃহে ঋষিবধূ হয়ে যেভাবে জীবনযাপন করছে পুলোমা, তা'ও প্রত্যক্ষ করেন হুতাশন। তাই, আর কেউ নয়, শুধু বৃদ্ধ হুতাশন লক্ষ্য করেন, পুলোমা মাঝে মাঝে অন্যমনা হয়ে যায়।

—পুলোমা!

চমকে ওঠে ভৃগুপত্নী পুলোমা। নাম ধ'রে কে যেন ডাকছে মনে হয়। কিন্তু এই কণ্ঠস্বর ধর্মপতি ভৃগুর কণ্ঠস্বর নয়, গৃহগুরু বৃদ্ধ হুতাশনেরও নয়। তবু মনে হয়, যেন এক পরিচিত কণ্ঠস্বর। অতীতের এক বিস্মৃত স্বপ্নলোক থেকে যেন এই আহ্বান ভেসে এসে পুলোমার চেতনার দ্বারে আঘাত করছে। সমাজ সংস্কার ও কর্তব্যের বাইরে থেকে বুকভরা আকুলতা নিয়ে এক তৃষ্ণাতুর অনিয়ম যেন পুলোমাকে সারা জগতে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এতদিনে সে এসে পৌঁছেছে।

বুঝতে পারে পুলোমা, হ্যাঁ, সে-ই এসেছে। ভৃগুপত্নী পুলোমার সেই কৈশোরের নর্ম-সহচর, প্রথম যৌবনের প্রণয়াস্পদ এক অনার্য তরুণ, তারও নাম পুলোমা। সনাম সখা অনার্য পুলোমা তার প্রথম প্রেমের অধিকার নিয়ে আজ পুলোমার পতিব্রত জীবনের দ্বারে এসে কঠিন পরীক্ষার মূর্তি ধ'রে দাঁড়িয়েছে।

তরুণী পুলোমার অনুভবের জগতে যেন বহুদিনের বন্ধনে আবদ্ধ এক ঝঞ্ঝাসমীর হঠাৎ পথ খোলা পেয়ে আবার উদ্বেল হয়ে ওঠে। ঋষির সংসারে কর্তব্যচারিণী নারীর মূর্তিকে যেন এক নির্বাসিত বসন্ত দিনের সৌরভ এসে জড়িয়ে ধরেছে। সুন্দরী পুলোমার দেহ ব্যাকুলা মাধবী বল্লরীর মত সেই স্পর্শে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

অনার্য পুলোমা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার প্রথম প্রণয়ভাগিনী ও জীবনবাঞ্ছিতা পুলোমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

অনার্য পুলোমা প্রসন্ন স্বরে আহ্বান জানায়—এস পুলোমা।

আর্যা পুলোমা সন্ত্রস্তভাবে বলে—কোথায়?

অনার্য পুলোমা—আমার সঙ্গে, আমার জীবনে।

আর্যা পুলোমা তার হৃদয়ের চাঞ্চল্য সংযত ক'রে বলে—কোন্ অধিকারে তুমি আজ এই ভয়ংকর আহ্বান নিয়ে ঋষিবধূর কুটীরের কাছে এসেছ অনার্য?

অনার্য পুলোমা বলে—তোমাকে ভালবেসেছি, এই অধিকারে।

আর্যা পুলোমা—কিন্তু আমি কোন্ অধিকারে তোমার কাছে যাব?

অনার্য পুলোমা—প্রেমিকা হয়ে বেঁচে থাকবার অধিকারে।

অনার্য পুলোমার ক্লান্ত মুখচ্ছবি যেন দুঃসহ এক জ্বালাময় আবেগে তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলোমার আরও কাছে এগিয়ে এসে স্পষ্টতর ভাষায় বলে—আমি ঋষি নই, আর্য নই, তপস্বীও নই। আমি শুধু প্রেমিক। আমি পুত্রার্থে তোমাকে চাই না পুলোমা, তোমারই জন্য তোমাকে চাই।

যেন ভক্তের স্তবসঙ্গীতের মত ধ্বনিত হয়েছে এই অভিনব ভালবাসার তত্ত্ব, এই ভয়ানক আবেদন। অনার্য প্রেমিক যেন অদ্ভুত এক অহেতুক প্রেমের অর্ঘ্য দিয়ে শুধু অহমিকাময়ী পুলোমাকে মহীয়সীর সম্মান দান করছে। যেন জগতের জন্য পুলোমা নয়, পুলোমার জন্যই এই জগৎ। কন্যা নয়, বধূ নয়, মাতা নয়, শুধু নারীরূপে তরুণী পুলোমার ভিন্ন একটি সত্তা যেন আছে এবং সেই সত্তা উপেক্ষায় অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে। অনার্য পুলোমা আজ নারীর সেই সত্তার কাছেই অনন্ত সমাদরের উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই আবেদনের দুর্বার এক শক্তি আছে।

অনার্য পুলোমা বলে—আমার আকাঙ্ক্ষা তোমার মধ্যেই সম্পূর্ণ, তোমার বাইরে নয়, তোমার অতিরিক্ত নয়। আমার সমাজ সংসার জগৎ সবই তুমি। তুমি আমার প্রেমের প্রথমা, তুমি আমার প্রেমের অন্তিমা।

আর্যা পুলোমার মনে হয় এই ঋষির কুটীরে যেন তার আত্মা বন্দিনী হয়ে আছে। মাত্র পুত্রার্থে গৃহীত ভার্যার সম্মান নিয়ে, নিতান্ত এক প্রয়োজনের উপচাররূপে এই ঋষিকুটীরে সে স্থান লাভ করেছে। তার বেশি কোন গৌরব এখানে নেই। এই জীবন শাস্ত্রসম্মত ও সমাজসম্মত কিন্তু হৃদয়সম্মত নয়।

আর্যা তরুণীর, ঋষিবধূ পুলোমার সব প্রতিবাদের শক্তি যেন ঐ অনার্য আবেদনের টানে দূরান্তরে ভেসে যায়। তবু শেষবারের মত নিজেকে সংযত করে পুলোমা। ভীতা অথচ প্রলুব্ধা বিহঙ্গীর মত যেন আকাশভরা অবাধ পবনের ঝঞ্ঝার দিকে তাকিয়ে বলে -না পুলোমা আমাকে ধর্মের বাইরে যেতে বলো না।

অনার্য পুলোমা বিস্মিত হয়--ধর্ম কি?

আর্যা পুলোমা—এই প্রশ্নের উত্তর দেবার সাধ্য আমার নেই।

অনার্য পুলোমা—কিন্তু আমি আজ এই প্রশ্নের উত্তর জেনে যাব পুলোমা, ধর্ম কি?

আর্যা পুলোমা বিব্রতভাবে বলে—আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। গৃহগুরু বৃদ্ধ হুতাশন রয়েছেন, তাঁরই কাছে গিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর শুনে নাও।

অনার্য পুলোমা—বেশ, চল, সংসারের সব ইতিহাসের সাক্ষী হুতাশনের

সম্মুখে গিয়ে তুমি আমার পাশে একবার দাঁড়াও। তারপর আমি তাঁকে প্রশ্ন করব।

বৃদ্ধ হুতাশনের সম্মুখে গিয়ে দু'জনে দাঁড়ায়। অনার্য পুলোমা প্রশ্ন করে—ভগবান হুতাশন আপনি একদিন আমাদের দু'জনকে দেখেছেন, জীবনের প্রভাতবেলায় আমরা দু'জনে যখন দু'জনের খেলার সাথী হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম।

হুতাশন শান্তস্বরে বলেন—হ্যাঁ।

অনার্য পুলোমা—আজ আবার অনেকদিন পরে আমরা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছি। আপনি বলুন, এর মধ্যে বিসদৃশ কিছু দেখেছেন কি? এর মধ্যে অন্যায় কোথায়? আপনি বলুন, ধর্ম কি?

হুতাশন—যা সত্য, তাই ধর্ম।

অনার্য পুলোমা—সত্য কি?

হুতাশন—ঘটনাই একমাত্র সত্য।

অনার্য পুলোমা—তবে বলুন, আপনার সম্মুখে এই যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুটি জীবনের মূর্তি, এর মধ্যে কি কোন সত্য নেই? প্রথম ভালবাসার অধিকার কি মিথ্যা? যাকে চিরজীবন ধ'রে অন্বেষণ ক'রে বেড়াই, তাকে জীবনের কাছে পাওয়ার দাবি কি মিথ্যা?

হুতাশন—না, মিথ্যা নয়।

আর্যা পুলোমা বিস্মিতভাবে হুতাশনের মুখের দিকে তাকায়। এবং মুগ্ধভাবে তার কৈশোরের সখা অনার্য তরুণ পুলোমার মুখের দিকে তাকায়।

অনার্য পুলোমা আর্যা পুলোমার হাত ধ'রে বলে—এস পুলোমা'

হুতাশনের সান্নিধ্য থেকে দু'জনে ধীরে ধীরে চলে এসে ঋষিকুটীরের নিস্তব্ধ আঙ্গিনায় একবার দাঁড়ায়। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। অন্তঃসত্ত্বা ধর্মপত্নীর মূর্তি যেন মুহূর্তের মধ্যে এই সংসারের আঙ্গিনা হতে মুছে গিয়েছে। যেন তরুণী পুলোমার স্বপ্নলোক থেকে হঠাৎ জাগরিতা এক প্রেমকেলিকামিনীর পিপাসিত বাসনার মূর্তি অনার্য পুলোমার হাত ধ'রে সংস্কার ও সমাজের বাইরে চলে যায়।

বনোপান্তের এক কুটীরে প্রবেশ ক'রে অনার্য তরুণের সহচরী আর্যা পুলোমা অনুভব করে, ধন্য এই প্রেমিকতার জীবন।

অরণ্যপুষ্পের সৌগন্ধ্য বাতাসে ছুটাছুটি করে, কিন্তু কি আশ্চর্য, তরুণী পুলোমা যেন আরণ্য কণ্টকে বিক্ষতদেহা হরিণীর মত বেদনাতুর দৃষ্টি তুলে

আকাশপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রেমিকেরই শত সাগ্রহ প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না তরুণী পুলোমা। কোথা থেকে যেন বাস্তব সংসারের এক সংশয় এসে তরুণী পুলোমার অবাধ প্রেমিকতার জীবনে কঠিন প্রশ্নরূপে দেখা দিয়েছে।

অনার্য পুলোমার প্রশ্নে বিব্রত হয়ে আর্যা পুলোমা একদিন বলে—তুমি কি জান যে, আমি অন্তঃসত্ত্বা?

অনার্য পুলোমা—জানি।

আর্যা পুলোমা—ভৃগু ঋষিরই সন্তানকে আমি ধারণ করছি তা'ও নিশ্চয় জান?

অনার্য পুলোমা—জানি।

আর্যা পুলোমা কিন্তু সেই সন্তানের জীবনে তার পিতৃপরিচয় চিরকাল অজানা হয়েই থাকবে।

অনার্য পুলোমা সান্ত্বনার সুরে বলে—কিন্তু পিতৃস্নেহ তার কাছে অজানা হয়ে থাকবে না পুলোমা। তাকে লালন করবার জন্য আমি আছি, কোন দুঃখ করো না পুলোমা।

আর্যা পুলোমার কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ রূঢ় হয়ে ওঠে—দুঃখ না ক'রে পারি না। ঋষির সন্তান পৃথিবীতে অনার্য পুলোমার সন্তানরূপে পরিচয় বহন করবে, আমি আমার সন্তানকে এতটা মিথ্যা ক'রে দিতে পারব না।

অনার্য পুলোমার উদ্বিগ্ন বক্ষের অস্থিনিচয় যেন বেদনায় দীর্ণ হয়ে যায়। ব্যথিত স্বরে বলে—এ কি বলছ পুলোমা?

আর্যা পুলোমা—পারব না, এত ভয়ংকর ধর্মহীন হতে পারব না। সন্তানের পরিচয় মিথ্যা ক'রে দিতে পারব না। সংসারের ভার্গবকে পৌলমেয় ক'রে দিতে পারব না।

অসহ এক অপমান যেন আকস্মিক বজ্রপাতের মত অনার্য পুলোমার সব প্রেমিকতার গর্ব গৌরব ও প্রসন্নতাকে চূর্ণ ক'রে দেয়। অনার্য! অনার্য! অনার্য! আর্যা পুলোমার কাছে সে আজ হীনশোণিত এক প্রাণী ছাড়া আর কিছু নয়। প্রেমিকের অন্তরের চেয়ে জাতিশোণিতের উত্তাপকেই বেশি পূজনীয় বলে আজ উপলব্ধি করতে পেরেছে এক আর্যা নারীর মন। অনার্য পুলোমা নিঃশব্দে মাথা হেঁট ক'রে বসে থাকে।

হঠাৎ বিচলিত হয় অনার্য পুলোমার দুই চক্ষুর কৌতূহল। দেখতে পায় অনার্য পুলোমা, আর্যা পুলোমার সারা দেহ মন্থিত ক'রে এক অভিনব বেদনার ঝড় আকুল হয়ে উঠছে। সে বেদনায় আর্যা তরুণীর কমনীয় দেহ ভূতলে লুটিয়ে পড়ে।

—ভয় নেই পুলোমা, আমি কাছে আছি পুলোমা। অনার্য পুলোমা ব্যগ্রভাবে আর্যা পুলোমার একটি হাত ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়।

যেন আর্যা পুলোমার জীবনের এক পবিত্র মুহূর্তে অশুচি এক স্পর্শ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আর্তনাদ করে আর্যা পুলোমা—দয়া ক'রে দূরে সরে যাও অনার্য। ভৃগু ঋষির সন্তান আসছে. জন্মলগ্নের প্রথম মুহূর্তে তাকে আমি অপিতার দৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে পারব না।

শান্ত দৃষ্টি তুলে অনার্য পুলোমা তারই প্রণয়াস্পদা নারীর এই কঠোর ধিক্কার শুনতে থাকে। না, আর কোন সন্দেহ নেই; আর্যা পুলোমা তার জীবনের সকল আগ্রহ দিয়ে আবার তার সমাজ ও সংস্কারকে ফিবে পেতে চাইছে। ভৃগুপত্নী পুলোমার সম্মুখে অনার্য প্রেমিক পুলোমার অস্তিত্ব একেবারে অর্থহীন।

দূরে সরে যায় অনার্য পুলোমা।

সূর্য অস্ত যাবার আগেই এক রক্তিম মুহূর্তে আর্যা পুলোমার সন্তান জন্মলাভ করে। কিন্তু শিশু ভার্গবের ক্রন্দনধ্বনি ছাড়া সেই কুটীবের বাতাসে আর কোন শব্দের চাঞ্চল্য জাগে না। সদ্যোজাত আর্য শিশুর প্রথম কণ্ঠস্বব ধ্বনিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কুটীরোপান্তের তরুতলের ছায়ায় এক অনার্যের শেষ নিঃশ্বাস শেষ আর্তস্বর উৎসারিত ক'রে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। মৃত্যু বরণ করেছে অনার্য পুলোমা।

তরুণী পুলোমা এক নবজাত শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ ক'রে ভৃগুব আশ্রমেব প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়েছিল। আর দাঁড়িয়েছিলেন ভৃগু, সেই প্রবেশপথে অটল নিষেধের প্রতিমূর্তির মত। এবং দাঁড়িয়েছিলেন বৃদ্ধ হুতাশন, যেন ঘটনাব আর এক সত্য দেখবার জন্য।

শ্লেষবিহসিত স্বরে প্রশ্ন করেন ভৃগু—আবার কোন্ স্বপ্নের দুঃসাহসে উৎসাহিত হয়ে আর্য ঋষির সংসারের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ পুলোমা?

পুলোমা বলে—আমার স্বপ্নে আর কোন দুঃসাহস নেই ঋষি। আমি আপনারই পিতার সান্ত্বনায় উৎসাহিত হয়েছি।

ভৃগু—কি বললে পুলোমা?

পুলোমা—লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার প্রতি করুণাপরবশ হয়ে আমাকে আশ্বাস দান করেছেন। তিনি আশা করেন, তাঁর পুত্রও তাঁরই মত করুণাপরবশ হয়ে তাঁর পুত্রবধূর বেদনাকে বুঝতে পারবেন।

ভৃগু—পিতা ব্রহ্মা তোমার মত স্বাভিলাষ-প্রগল্‌ভা উদ্‌ভ্রান্তার প্রতি করুণাপরবশ কেন হবেন পুলোমা?

পুলোমা—উদ্‌ভ্রান্তার জীবনের বেদনাকে তিনি দেখতে পেয়েছেন ঋষি। দেখেছেন লোকপিতামহ ব্রহ্মা, আমার জীবনের বেদনা অশ্রুনদী হয়ে আমাকে অনুসরণ করছে। আপনি জানেন না ঋষি, ঐ বনলোকের মৃত্তিকায় এখনও আমার অশ্রুনদীর সিক্ত চিহ্নরেখা ফুটে রয়েছে।

ভৃগু—শুনে বিস্মিত হলাম পুলোমা। কিন্তু আমার আর একটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এই ঘরে প্রবেশের চেষ্টা করো না পুলোমা।

পুলোমা—বলুন ঋষি; কি আপনার প্রশ্ন?

ভৃগু—কোন্ প্রসন্নভাব আশায় এবং কিসের জন্য তুমি আবার এই ঋষি-কুটীরের বন্দিনী হতে চাইছ পুলোমা?

পুলোমা তার ক্রোড়ের শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়—এরই জন্য ঋষি।

ভৃগু—এই কথার অর্থ?

পুলোমা—আপনার সন্তানের পরিচয় আর জন্মগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য। ঋষির ছেলেকে তাই ঋষির ঘরে নিয়ে এসেছি।

ভৃগু—ঋষির ছেলেকে ঋষির ঘরে রেখে দাও, তার স্থান এখানে আছে। কিন্তু তোমার স্থান নেই পুলোমা।

পুলোমা আতঙ্কিতের মত আর্তনাদ করে—ঋষি, এত বড় শাস্তি আমাকে দেবেন না।

ভৃগু—শাস্তি নয়, তোমার কর্তব্য তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। স্বেচ্ছায় ঋষিপত্নীর ধর্ম বর্জন ক'রে তুমি চলে গিয়েছিলে, তেমনি স্বেচ্ছায় ঋষিমাতার ধর্ম বর্জন ক'রে চলে যাও।

পুলোমা অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকে। আজ পর্যন্ত জীবনে স্বেচ্ছায় সে অনেক কিছু করেছে। প্রথম যৌবনে স্বেচ্ছায় এক অনার্য তরুণকে ভালবেসেছে, স্বেচ্ছায় বিবাহিত জীবনের সংস্কারকে তুচ্ছ ক'রে প্রেমিকের আহ্বানে চলে যেতে পেরেছে। স্বেচ্ছাচারের শক্তি তার আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে, এই শিশু পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে আজ প্রথম উপলব্ধি করে পুলোমা, স্বেচ্ছাচারের শক্তি তার আর নেই। ঋষিমাতা হওয়ার সম্মান সৌভাগ্য ও সুযোগ হেলায় তুচ্ছ ক'রে চলে যাবার শক্তি তার নেই।

না, যেতে পারবে না পুলোমা, চলে যাওয়ার সাধ্য তার নেই। সব অভিশাপ স্বীকার ক'রে, তার জীবনে ঋষিমাতা আর্যনারীর পরিচয় বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শুধু পুত্রার্থে, অন্য কিছুর জন্য নয়।

পুলোমা বলে—সেই অনার্য আপনার পুলোমাকে অপহরণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। আমার ভুল, আমি তাকে বাধা দিতে পারিনি ঋষি।

ভৃগু বিস্মিত হন—হুতাশন ঘরে থাকতে তোমাকে অপহরণ ক'রে নিয়ে যেতে পারে, কোন্ দুরাত্মার এমনি শক্তি আছে?

পুলোমা—হুতাশনের সম্মতি ছিল ঋষি।

ভৃগুর বিস্ময় ক্ষমাহীন ক্রোধ হয়ে জ্বলে ওঠে—হুতাশনের সম্মতি ছিল?

পুলোমা—হ্যাঁ।

বৃদ্ধ হুতাশনের মুখের দিকে তাকিয়ে রূঢ় ও ক্রোধাক্ত স্বরে ভৃগু বলেন—আপনি বিশ্বাসহন্তা ও অধর্মচারী?

হুতাশন শান্তভাবে উত্তর দেন—না।

ভৃগু—আমি পুলোমার ধর্মপতি, পুলোমা আমার ধর্মপত্নী, এই সত্য কি আপনি জানেন না?

ভৃগু ও পুলোমা, দুজনের মুখের দিকে বৃদ্ধ হুতাশন একবার তাকিয়ে দেখেন, তারপর বলেন—হ্যাঁ সত্য।

ভৃগু—তবে আপনি কেন দুরাত্মা অনার্যকে ঋষিপত্নী অপহরণে সম্মতি দিলেন?

হুতাশন—তা'ও সত্যের জন্য।

ভৃগু ভ্রূকুটি করেন—সত্যের জন্য?

হুতাশন—হ্যাঁ, প্রেমের সত্য।

পুলোমার মাথা হেঁট হয়ে পড়ে, তার দুই চক্ষুর দৃষ্টি যেন শুষ্ক ধূলির আড়ালে লুকিয়ে পড়বার পথ খুঁজছে।

হুতাশন বলেন—জীবনের প্রথম প্রণয়, জীবনব্যাপী এক প্রেমিকতার তৃষ্ণা পুলোমাকে অপহরণ করেছিল ঋষি। সে ইতিহাস আমি জানি, আমি তার সাক্ষী, তাকে নিতান্ত মিথ্যা মনে করতে পারি না। আমি আপনাদের মত শিক্ষাগুরু নই, আপনাদের তত্ত্ব দিয়ে সত্য-মিথ্যার বিচারও আমি করি না। আমার কাছে ঘটনাই একমাত্র সত্য। ঘটনাকে আমি বাধা দিই না। যারা যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল আর প্রস্তুত হয়েছিল, তাদের আমি যেতে দিয়েছি। যারা সম্মত হয়েই ছিল, তাদেরই কাজে আমি সম্মতি দিয়েছি। আমি যেমন প্রেরণা দিই না, উপদেশ দিই না ও প্ররোচিত করি না, তেমনি বাধাও দিই না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন হুতাশন। তারপর রূঢ়ভাবে একেবারে স্পষ্ট ক'রেই বলেন—আপনি পুত্রার্থে পুলোমাকে চেয়েছেন, আর সেই অনার্য প্রেমিক পুলোমার জন্যই পুলোমাকে চেয়েছে। এই দুই চাওয়ার দ্বন্দ্বে তিনটি জীবনের জয়পরাজয়ের পরীক্ষা হয়ে গেল। সংসারে তারও সাক্ষী হয়ে রইলাম আমি।

হুতাশন চুপ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দেখতে পেলেন, ভৃগু ঋষি রুষ্টভাবে

প্রখর দৃষ্টি তুলে যেন তাঁকে বাচালতা সংবরণ করার জন্য সাবধান ক'রে দিচ্ছেন।

আরও মুখর হয়ে ওঠেন হুতাশন। আপনি শুধুই শাস্ত্র, এই তরুণী পুলোমা শুধুই অহমিকা, আর সেই অনার্য শুধুই প্রেমিকতা। আপনি হৃদয়ের ধর্ম বুঝতে পারেননি, তরুণী পুলোমা সমাজের ধর্ম বুঝতে পারেনি, আর সেই অনার্য নারীত্বের ধর্ম বুঝতে পারেনি। আপনারা জীবনে এক একটি ভ্রান্তিকে ভালবেসেছেন, ঘটনা তারই প্রতিশোধ নিয়েছে। আমি ঘটনার সাক্ষী মাত্র, যা দেখি তাই বলি। যা দেখেছি তাই বলে দিলাম এর জন্য আমার এতটুকুও দুঃখ নেই।

পাষাণীভূত বৃক্ষের মত স্তব্ধ ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন ভৃগু। সকল রহস্য ভেদ ক'রে সমস্ত ঘটনার স্বরূপ যেন এতক্ষণে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে, নিষ্পলক নয়নে তাই দেখছেন ভৃগু।

হঠাৎ, যেন এক ঝঞ্ঝাহত কাননের উৎক্ষিপ্ত পুষ্পের মত ভৃগুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তরুণী পুলোমা। বিচলিত হন ভৃগু। শান্ত স্বরে বলেন—কি বলতে চাও পুলোমা?

পুলোমা—আপনার এই আশ্রমের এক কোণে ঠাই পেতে চাই।

ভৃগু—কেন পুলোমা?

পুলোমা—ভার্গবের মাতা হবার গৌরব নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই, আর কিছু চাই না।

ভৃগুর দুই চক্ষুর বেদনাও যেন স্নিগ্ধ হাস্যে সস্মিত হয়ে ওঠে।—শুধু পুত্রার্থে?

পুলোমা—হ্যাঁ ঋষি।

ভৃগু—আর কোন গৌরব আশা কর না পুলোমা?

পুলোমার কণ্ঠস্বরে যেন এক কুণ্ঠাহত অভিমান উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। —আশা করবার সাহস হয় না ঋষি।

নিবিড় দৃষ্টি তুলে পুলোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন ভৃগু। যেন পুলোমাকে নূতন ক'রে চেনবার চেষ্টা করছেন, চিনতে পারছেন। সুন্দর বিম্বাধরে ও ভ্রূলতায় রচিত এই মুখচ্ছবি, যৌবনে ললিত অঙ্গ, সদ্যোমাতৃত্বে কমনীয় দেহ, ভার্গবের জন্মদাত্রী, ভৃগুগৃহের গৌরবে গর্বিনী পুলোমা। পুলোমাকে বুঝতে কোথায় যেন একটু ভুল থেকে গিয়েছিল, আজ ঘুচে গেল সেই ভুল। পুলোমাকে চেনা যেন এত দিনে সম্পূর্ণ হয়েছে। ভৃগুর মনে হয়, এই পুলোমা অপহৃত হয়নি। অপহৃত হয়েছিল পুলোমার এক অভিমান।

ভৃগু বলেন—কিন্তু আমি যদি বলি, শুধু ভৃগুবধূ হয়ে নয়, ভৃগুপ্রিয়া

হয়ে তুমি আমার জীবনে নূতন গৌরব এনে দাও? যদি বলি, আজ আমি শুধু পুত্রার্থে নয়, তোমারও জন্য তোমাকে চাই পুলোমা?

—স্বামী? অকস্মাৎ যেন এক তৃপ্ত স্বপ্নের উল্লাসে বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় পুলোমা।

হৃদয়ের সকল আগ্রহ নিয়ে একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভৃগু ঋষি পুলোমার হাত ধরলেন—হ্যাঁ, তুমিই আমার প্রিয়া ধর্মপত্নী।

বৃদ্ধ হুতাশনের দৃষ্টি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কৃতার্থভাবে বলেন —আপনার শাস্ত্রসঙ্গত সংসারে এই হৃদয়সঙ্গত দৃশ্য দেখবার জন্যই বোধ হয় আপনার কুটীরে এতদিন ছিলাম ঋষি। আমার সে আশা সফল হলো। এখানে আমার কাজ ফুরিয়েছে, এইবার আমাকে বিদায় দিন ঋষি।

হুতাশনের কথা শুনে কি যেন চিন্তা করেন ভৃগু। তারপর বললেন - আপনি সংসারের সাক্ষী, সত্য কথা শুনিয়ে দেন, আপনার এই মহত্ত্ব স্বীকার করি হুতাশন। কিন্তু আপনিও একটি ভুল করেছেন।

হুতাশন—কি?

ভৃগু আপনি আমার গৃহের রক্ষক ছিলেন, গৃহের আলোকরূপে আপনাকে আমি স্থান দিয়েছিলাম; কিন্তু আপনি গৃহদাহকের কাজ করেছেন। আপনার এই ভুলের জ্বালা আপনার জীবনে লাগবেই। লোকে আপনাকে গৃহদাহক-রূপে ভয় পাবে আর ঘৃণা করবে, সম্মান কখনও করবে না।

হুতাশন—আপনাকেও অভিশাপ দিতে পারি ঋষি।

হুতাশনের হঠাৎ চোখে পড়ে, পুলোমা তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে। পুলোমার সুন্দর মূর্তির মধ্যে শুধু দুই বেদনার্ত চক্ষুর দৃষ্টি যেন নীরবে আবেদন করছে।

কি বলতে চায় পুলোমা? পুলোমার সেই আবেদনমেদুর নয়নের দিকে তাকিয়ে মনে হয় হুতাশনের, পুলোমা আজ তার স্বামীর জীবনের আনন্দকে সব অভিশাপের আঘাত হতে রক্ষা ক'রে সুখী হতে চায়। ভৃগুবধূ পুলোমা। পতিপ্রেমিকা আর্যা পুলোমা। সত্যই স্বামী ভৃগুর ইচ্ছায় ইচ্ছায়িতা হয়ে যেন হুতাশনকে গৃহদাহক বলে মনে করছে আর ভয় করছে পুলোমা।

হুতাশনের ওষ্ঠপ্রান্তে বিচিত্র এক বিস্ময়ের হাস্য দীপ্ত হয়ে ওঠে। ভৃগুর ক্ষোভদিগ্ধ মুখের দিকে শান্ত দৃষ্টি তুলে হুতাশন বলেন— কিন্তু আমি আপনাকে অভিশাপ দেব না ঋষি।

ভৃগুবধূ পুলোমার সুন্দর আননে মেঘমুক্ত শশিলেখার মত স্মিতদ্যুতিময় প্রসন্নতা ফুটে ওঠে। যেন এতক্ষণে সংসারের সব ভ্রূকুটির ভয় হতে মুক্ত হয়েছে পুলোমার প্রাণ। সুস্মিত হয়ে উঠেছে পুলোমার জীবনেরই রূপ।

হুতাশনের নেত্রে সেই বিচিত্র বিস্ময়ের প্রশ্ন আরও প্রখর হয়ে ফুটে ওঠে। এই কি ঘটনার শেষ? এই কি শেষ সত্য? এবং এই কি সব সত্য? পুলোমার নারী-হৃদয় কি সত্যই এইবার সর্ববেদনাবিমুক্ত এক সুখস্বর্গের আশ্রয় লাভ ক'রে ধন্য হয়েছে?

—আপনি এখন বিদায় গ্রহণ করুন হুতাশন।

অকস্মাৎ ঋষি ভৃগুর রূঢ়ভাষিত অনুরোধ ধ্বনিত হয়। হুতাশনের কৌতূহলাভিভূত শান্ত মূর্তিকে বিচলিত ক'রে আশ্রমের অভ্যন্তরে চলে গেলেন ভৃগু। বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হন হুতাশন। এবং, পুলোমার সুস্মিত ও প্রসন্ন মুখচ্ছবির দিকে সেই বিস্ময়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে স্নিগ্ধস্বরে বলেন হুতাশন—বিদায় নিলাম পুলোমা।

পুলোমা এগিয়ে এসে হুতাশনের চরণে প্রণাম নিবেদন করে।

হঠাৎ চমকে উঠলেন হুতাশন. যেন তাঁর প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ পেয়ে গিয়ে চমকে উঠেছে তাঁর মনের এতক্ষণের বিস্ময়। ব্যথাহত লতিকার মত হঠাৎ শিউরে উঠেছে পুলোমার ললিত-নমিত দেহ। দেখতে পেলেন হুতাশন. দেখে বিস্মিত হন, এবং উৎকর্ণ হয়ে শুনতেও থাকেন, যেন দূরান্তের এক বনস্থলীর বক্ষ হতে উত্থিত এক আর্তনাদের ভাষা বায়ুতাড়িত ঝটিকার বিলাপের মত ছুটে এসে তপোবনস্থলীর তরুপুঞ্জের উপর পড়ে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে! হুতাশনের চরণে প্রণামাবনতা পুলোমা যেন এক স্বপ্নের কপাটে কান পেতে শুনছে সেই বিলাপের ভাষা। দুঃসহ এক ক্রন্দনের শব্দহারা উচ্ছ্বাস পুলোমার সুখী ও নিশ্চিন্ত বক্ষের নিঃশ্বাসবায়ুকে হঠাৎ আঘাতে আহত করেছে। পুলোমার দুই চক্ষু যেন নীরব বেদনার দুটি উৎস: অশ্রুসলিল ধারা হয়ে ঝরে পড়ছে।

হুতাশন বলেন—এ কি পুলোমা?

পুলোমা বলে—পুলোমার অশ্রুধারা, ভগবান হুতাশন। এই অশ্রুধারার নাম বধূসরা।

বিস্মিত হন হুতাশন—তোমার অশ্রুধারাকে এই নাম কে দিয়েছে পুলোমা?

পুলোমা—লোকপিতামহ ব্রহ্মা। সেদিন ঠিকই দেখেছিলেন তিনি, আমার অশ্রু নদী হয়ে আমাকে অনুসরণ করছে।

হুতাশন—কিন্তু কেন, কার জন্য এবং কিসের জন্য, বুঝতে পেরেছ কি পুলোমা?

পুলোমা—বুঝতে পেরেছি ভগবান হুতাশন।

এতক্ষণে সত্যসাক্ষী হুতাশনের সব কৌতূহলের অবসান হয়। আর বিস্মিত হবার কারণ নেই। হুতাশন বলেন—আমি যাই পুলোমা।

পুলোমা বলে—বলে যান ভগবান হুতাশন, দূর বনস্থলীর এক আর্তনাদের স্মৃতি, আমারই ঘৃণায় অবমানিত এক প্রেমিকের শেষ নিঃশ্বাসের বেদনা কি চিরকাল আমার জীবনের শান্তি এইভাবে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুসিক্ত ক'রে তুলবে?

হুতাশন—হ্যাঁ পুলোমা।

আর্তনাদ করে পুলোমা- কেন, ভগবান হুতাশন?

হুতাশন—জীবনে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত যে জীবনের সত্য।

ত্রাসবিকম্পিত হস্তে দুই ব্যথিত নয়ন আচ্ছাদিত করে পুলোমা। তবু করতল প্লাবিত ক'রে অবিরল অশ্রুধারা ঝরে পড়তে থাকে।

হুতাশন শুধু ভাবেন, পুলোমার এই নয়নবারিকে বধূসরা নাম দিলেন কেন ব্রহ্মা? ভুল করেছিলেন আর্য ভৃগু, ভুল করেছিল অনার্য পুলোমা, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভুল করেছে বোধহয় ঋষিবধূ পুলোমা। তাই কি?

চলে গেলেন সত্যসাক্ষী হুতাশন।

---

# চ্যবন ও সুকন্যা

বল্মীক নয়, বল্মীকবৎ স্থাণুক এক তপস্বীর শরীর। দীর্ঘ তপস্যার ক্লেশে অভিভূত দেহ, যেন জরাপ্রাপ্ত ত্বগস্থির একটি ধূলিক্লিন্ন স্তূপ। অপহৃত হয়েছে যৌবন; নিরুদক সরোবরের মত শুষ্ক সেই অবয়ব হতে অপসৃত হয়েছে তারুণ্যতরলিত কান্তির শেষ কল্লোল। আপন বক্ষের অগ্নিতে আপনি দগ্ধীভূত শমীবৃক্ষের দুটি শাখার মত দুটি অঙ্গারবর্ণ বাহু, ভৃগুতনয় চ্যবন সেই কাননের নিভৃতে শিলাসনে বসে ভাবছিলেন, এতদিনে তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। ভাবছিলেন বিপুল তপঃক্লেশের পুণ্যে এতদিনে ক্ষয় হয়ে গেল তাঁর ত্বগস্থিশোণিতের সকল কামনার অবলেশ। এই বক্ষে তৃষ্ণা নেই এই চক্ষে কৌতূহল নেই, সংসারের কোন রূপ ও মায়াকে আলিঙ্গন দান করবার জন্য এই দুই বাহুতে কোন স্পৃহা নেই।

সহসা কাননিভৃতের সমীরে যেন কা'র দুটি চলোচ্ছল চরণের মঞ্জীর ধ্বনিত হয়। আর, সেই ধ্বনির স্পর্শে হঠাৎ আহত হয়ে শুষ্ক বল্মীকের পঞ্জর কেঁপে ওঠে। উৎকর্ণ হয়ে তরুচ্ছায়ামেদুর বনপথের তৃণাঞ্চিত রেখার দিকে তাকিয়ে থাকেন চ্যবন।

কিছুক্ষণ আগেই সহস্র মত্তকণ্ঠের উল্লাস এই শান্ত বনভূমির নীরবতা মথিত ক'রে চলে গিয়েছে। জানেন চ্যবন, নৃপতি শর্যাতি আজ বসন্ত-মৃগয়ার আমোদ উপভোগের জন্য কাননে প্রবেশ করেছেন। সঙ্গে আছে লক্ষ্যভেদনিপুণ শত শত ধনুর্ধর সৈনিক। আছে চামরগ্রাহিণী কিংকরী ও করঙ্কবাহক কিংকর। আছে সঙ্গীতপরায়ণ সূত মাগধ ও চারণ। সৈনিকের হর্ষ কলরব ও জয়নাদ, আর সূত-মাগধ-চারণের সুমধুর গীতস্বর ও স্নিগ্ধ বেণুপ্রণাদ শুনেছেন চ্যবন। কিন্তু সেই ধ্বনি শুনে বল্মীকবৎ স্থাণুক তপস্বীর বক্ষঃপঞ্জরের শান্তি শিহরিত হয়নি। তাঁর এই কৌতূহলহীন স্পৃহাহীন ও কামনাহীন নিভৃতজীবনের নেপথ্যকে শুধু ক্ষণকালের মত ক্ষুব্ধ ক'রে চলে গিয়েছে সেই ধ্বনি। চঞ্চলিত হয়নি চ্যবনের চিন্তার বিরাগ।

কিন্তু একি অদ্ভুত ধ্বনি! স্ফুটকুসুমের বর্ণে ও সৌরভে পরিকীর্ণ এই বনস্থলীর বসন্ত যেন শিঞ্জিত হয়ে উঠেছে। যেন পিকনাদপীযূষে মদিরায়িত এক যৌবনাবেগ মঞ্জীরিত হয়ে ছুটে আসছে। মনে হয়, খঞ্জনের চঞ্চলতা নিয়ে দুটি কজ্জলিত নয়ন এই মধুমাসমদ কাননের অন্তর অন্বেষণ করবার

জন্য এগিয়ে আসছে। কিংবা, শ্যামশোভাবিহ্বলা এক মায়ামৃগবধূর চরণে কেউ নূপুর পরিয়ে দিয়েছে। চঞ্চল উদ্দাম ও মধুর সেই শব্দ।

যে চক্ষুতে কৌতূহল ছিল না. সেই চক্ষুই কৌতূহলে দীপ্ত হয়ে ওঠে। দেখলেন চ্যবন, বিপুল লাস্যে লীলায়িততনু ও রূপমঞ্জুলা এক নারী লতাকুঞ্জ হতে চয়িত পুষ্প দুই হস্তের হেলাবলীলায় বিক্ষেপ ক'রে নর্তিত পুষ্পোৎসবের মত এগিয়ে আসছে। যৌবনান্বিতা বনভূমির শোভাকে যেন রূঢ় রীঢ়াকটাক্ষে তুচ্ছ ক'রে এগিয়ে আসছে এক নারীর মত্ত যৌবনের অহংকার। বিলোলা ব্যালাঙ্গনার মত একটি বেণী সাগ্রহে জড়িয়ে ধরেছে সে নারীর কণ্ঠদেশ, যেন বিলোল হয়ে রয়েছে পুরুষহৃদয় দংশনের জন্য উৎসুক এক বাসনা। যেন দরদলিত কোকনদের রক্তাভ কোমলতা দিয়ে নির্মিত পদতল। সেই লাবণ্য-গরীয়সী নারীর নীলাংশুক বসনের অঞ্চল সমীরশিহরিত কেতনের মত উড়ছে।

নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে নারী। কিন্তু দেখেও বুঝতে পারে না নারী, যে বল্মীকের কাছে এসে সে এখন দাঁড়িয়েছে, সে বল্মীক সত্যই বল্মীক নয়। কল্পনাও করতে পারে না নারী, সে এখন দুটি জীবন্ত চক্ষুর নিকটে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বসনবন্ধন স্খলিত ক'রে অঙ্গে পুষ্পরজঃ লেপন করে পুষ্পাধিক কমনীয়দেহা নারী।

—কে তুমি কুমারী?

যেন নিভৃতের এক তরুচ্ছায়া হঠাৎ প্রশ্ন করেছে। চকিত হস্তে বিবৃত বরাঙ্গের শোভা নীলাংশুকে আবৃত ক'রে এবং বিস্ময়াভিভূত নেত্রে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে নারী।

—কে তুমি অনুপমা?

আবার প্রশ্ন। মনে হয়, এই নিভৃতের এক বৃক্ষের কন্দর হতে ধ্বনিত হয়েছে এই প্রণয়সম্বোধন। আতঙ্কিতের মত আর্তনাদ ক'রে ওঠে নারী —কে তুমি অবয়বহীন?

—আমি তপস্বী চ্যবন।

এতক্ষণে বল্মীকের দিকে দৃষ্টিপাত করে নারী এবং বুঝতে পারে, এই বল্মীক সত্যই বল্মীক নয়। জীর্ণ বল্মীকবৎ জরাধূলিসমাচ্ছন্ন ও বিগতযৌবন এক তপস্বীর দেহ। তারই দিকে তাকিয়ে আছে সেই তপস্বীর চক্ষু। তপস্বী চ্যবনের দুই চক্ষুতে তীক্ষ্ণ এবং উজ্জ্বল দুটি দৃষ্টি জ্বলছে।

নারী বলে—আমি নৃপতি শর্যাতির দুহিতা সুকন্যা।

চ্যবন বলে—তুমি ধন্যা, তপস্বী চ্যবনের মনোহারিণী অয়ি বিপুলযৌবনা!

তোমার নীলাংশুক বসনের অঞ্চল তোমারই অঙ্গসৌগন্ধ্যের স্পর্শ দান ক'রে আমার এই নিভৃতজীবনের নিঃশ্বাসসমীর সুরভিত করেছে।

ভ্রূভঙ্গী কঠোর ক'রে সুকন্যা বলে—আপনার ভাষণে বিস্ময় বোধ করছি ঋষি।

চ্যবন—কিসের বিস্ময়?

সুকন্যা—আপনি তপস্বী, আপনি বয়ঃপ্রবীণ, আপনি জরাগ্রস্ত। আপনার দেহ আছে, কিন্তু দেহে প্রাণ আছে বলে মনে হয় না। আপনার নিঃশ্বাস আছে, কিন্তু সে নিঃশ্বাসে সমীর আছে বলে বিশ্বাস করতে পারি না। দাবদগ্ধ বৃক্ষের মত অঙ্গার হয়ে গিয়েছে আপনার যৌবন। তবে কেন আর কিসের আশায় এক বিপুলযৌবনার প্রতি প্রণয় নিবেদন করছেন ঋষি?

চ্যবন—তোমার বিস্ময় মিথ্যা নয় সুকন্যা। দীর্ঘ তপঃক্লেশে ক্ষয় হয়েছে আমার দেহ, কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি, ক্ষয় হয়নি আমার কামনা। আমার দেহে জরা, কিন্তু আমার অন্তরে জরা নেই সুকন্যা। আমার দেহে কামনা নেই, কিন্তু আমার মনে কামনা আছে কামিনী শর্যাতিতনয়া।

সুকন্যা—কিন্তু সে কামনা যে নিতান্তই নিরর্থক। আপনি পক্ষহীন বিহগের মত, পত্রহীন বিটপীর মত ও তৈলহীন প্রদীপের মত অক্ষম কামনার আধার মাত্র। আমাকে প্রণয় নিবেদন ক'রে কি লাভ হবে আপনার? আমি আপনার উৎসঙ্গ শোভিত করলে কোন্ পরিতৃপ্তি লাভ করবেন আপনি?

চ্যবন—তোমার সান্নিধ্য আর তোমার স্পর্শই আমার পরিতৃপ্তি। আমি আমার নিমেষহীন চক্ষুর দৃষ্টি দিয়ে তোমার সুহাসিত বিম্বাধরপ্রভা আর কুন্দাভ দন্তরুচিজ্যোৎস্না চিরক্ষণ পান করে পরিতৃপ্ত হব শর্যাতিতনয়া।

সুকন্যা—কেমন ক'রে পরিতৃপ্ত হবেন হে জরায়িতদেহ তপস্বী? আপনার দেহ যে তৃষ্ণা ধারণেও অক্ষম।

চ্যবন—পরিতৃপ্ত হবে আমার মন। তৃষ্ণা আছে আমার মনে।

সুকন্যা—কুৎসিত এই তৃষ্ণা।

ভ্রূকুটি করেন চ্যবন—তপস্বী চ্যবনের প্রতি নিন্দাবাদ প্রকাশের দুঃসাহস সংবরণ কর শর্যাতিতনয়া সুকন্যা!

ভ্রূকুটি করে সুকন্যা—আপনি আমার প্রতি আপনার জরাগ্রস্ত প্রণয় নিবেদনের উৎসাহ সংবরণ করুন তপস্বী।

চ্যবন—ভার্গব চ্যবনের পত্নী হবে তুমি, তোমার এই সৌভাগ্য বিনষ্ট করো না শর্যাতিতনয়া।

হেসে ওঠে সুকন্যা—আপনার পতিত্ব স্বীকার ক'রে যৌবনিত জীবনের অপমান সহ্য করবার দুর্ভাগ্য বরণ করতে চায় না শর্যাতিতনয়া।

চ্যবন—ভুলে যেও না শর্যাতিতনয়া, তোমার এই অহংকার চূর্ণ করবার শক্তি তপস্বী চ্যবনের আছে।

সুকন্যা থাকতে পারে, কিন্তু শর্যাতিতনয়ার অনুরাগ চূর্ণ করবার শক্তি নেই আপনার। ঘৃণ্য আপনার প্রস্তাব।

—ঘৃণ্য? ক্রোধোদ্দীপ্ত স্বরে চিৎকার ক'রে প্রশ্ন করেন চ্যবন।

সুকন্যা বলে—হ্যাঁ তপস্বী, জরাকে ঘৃণ্য বলে মনে না ক'রে পারে না যৌবন।

চলে যাচ্ছিল সুকন্যা। চ্যবন আহ্বান করেন শুনে যাও সুকন্যা?

—বলুন।

—একবার তাকিয়ে দেখ আমার দিকে?

—দেখেছি।

—কি দেখলে?

—ক্রোধোদ্দীপ্ত দুটি চক্ষু।

—দেখতে ভয় করে না?

—দেখতে ঘৃণা বোধ করি।

সহসা দুই চক্ষু মুদ্রিত করেন চ্যবন। যেন এই যৌবনগর্বিতা নারী ঘৃণাভরে তাঁর দুই চক্ষু তীক্ষ্ণ কণ্টকে বিদ্ধ ক'রে দিয়েছে।

চ্যবন বলেন - যাও।

•

কাঁদছিল সুকন্যা। কিন্তু নৃপতি শর্যাতি বলেন—না, আর কোন উপায় নেই রাজকন্যা। ভার্গব চ্যবনের রোষ আর অভিশাপ হতে রক্ষা লাভ করবার আর কোন উপায় নেই।

সুকন্যা—আপনারই তনয়ার প্রতি কেন এত কঠোর হলেন পিতা?

শর্যাতি—তোমারই আচরণে রুষ্ট হয়েছেন চ্যবন।

সুকন্যা—আমার আচরণে কি অপরাধ আর কিসের অন্যায় দেখলেন পিতা?

অকস্মাৎ অশ্রুধারায় প্লাবিত হয় শর্যাতির নয়ন। বেদনাভিভূত স্বরে বলেন—তোমার অপরাধ হয়নি সুকন্যা। কিন্তু, ক্রুদ্ধ চ্যবনের অভিশাপে আমার রাজ্যের সকল সৈনিক অকস্মাৎ ব্যাধি ও জরায় আক্রান্ত হয়েছে। তোমার দর্প পরাভূত করবার জন্য নৃপতি শর্যাতির ক্ষত্রবলদর্প চূর্ণ ক'রে দিয়েছেন চ্যবন। আমার রাজ্য লুপ্ত হবে, আমার এই গৌরবের কিরীট ভূমিসাৎ হবে, আমার প্রজার সংসার হতে সকল হর্ষ ও আনন্দ চলে যাবে, এই ভয়ানক অভিশাপ তুমিই অপসারিত করতে পার কন্যা।

সুকন্যা—যদি চ্যবনের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তবে কি তিনি আমাকে ক্ষমা ক'রে তুষ্ট হবেন না?

শর্যাতি—না তনয়া, তিনি তোমাকে শাস্তি না দিয়ে তুষ্ট হবেন না।

সুকন্যা—শাস্তি?

শর্যাতি—হ্যাঁ, তুমি তার পত্নী না হলে তিনি তুষ্ট হবেন না।

সুকন্যা—আমাকে শাস্তি দেবার জন্যই কি তিনি আমাকে তার কাছে পত্নীত্ব গ্রহণে বাধ্য করতে চান?

শর্যাতি—হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ চিন্তিত মনে অথচ শান্ত নেত্রে দাঁড়িয়ে থাকে সুকন্যা। তারপরেই বলে—আপনি কি ইচ্ছা করেন পিতা?

শর্যাতি সদসৎ বিবেচনা করবারও আর আমার কোন সাহস নেই কন্যা। আমার রাজ্যের আনন্দ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। চ্যবনের অভিশাপ হতে রক্ষা লাভের জন্য তোমাকে যদি ।

সুকন্যা—তাই হোক পিতা। আমার জীবনই অভিশপ্ত হোক আর চ্যবনের অভিশাপ হতে মুক্ত হয়ে সুখী হোক আপনার রাজ্য ও আপনার ইচ্ছা।

জরাগ্রস্ত তপস্বীর জীবনের সঙ্গিনী হয়েছে বিপুলযৌবনা সুকন্যা। হ্যাঁ, শাস্তিই দান করেছেন চ্যবন। তার ক্রোধোদ্দীপ্ত দুই চক্ষুর দৃষ্টি যেন কিরাতের জাল, এবং এই জালের বন্ধন শান্তচিত্তে জীবনে গ্রহণ করেছে এক সুন্দরদেহিনী মায়ামৃগী। প্রণয়সম্ভাষণ নয়, করুণাবচন নয়, সান্ত্বনা নয়, শুধু তপস্বী চ্যবনের রুষ্ট দুই চক্ষুর নির্দেশ। সেই নির্দেশ মান্য ক'রে আশ্রমদাসীর মত নিকেতকর্তব্য পালন করে সুকন্যা। দিন যায়, মাস অতীত হয়, বর্ষের পর বর্ষ অতিক্রান্ত হয়, কাননভূমির নিভৃতে বসন্তামোদ জাগে, কিন্তু চ্যবনপত্নী সুকন্যার জীবন যেন চিরনিদাঘে তাপিত জীবন।

এই শাস্তিভীরু জীবনের ভারে অবসন্ন সুকন্যার মন মাঝে মাঝে যেন মুক্তির স্বপ্ন দেখে। মনে হয়, তপস্বী চ্যবনের ঐ দুই চক্ষু হতে ক্রোধজ্বালা অন্তর্হিত হয়েছে। শান্ত দৃষ্টি তুলে সুকন্যার দিকে তাকিয়ে আছেন চ্যবন। —এইবার আমাকে মুক্তি দান করুন তপস্বী। সাশ্রুনয়নে আবেদন করতে গিয়েই সুকন্যার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। দেখতে পায়, তেমনি ক্রুদ্ধ ও কঠোর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছেন চ্যবন। না, ঋষি চ্যবনের মনে ক্ষমা নেই, সুকন্যার জীবনে এই শাস্তির শেষ নেই।

আবার এক একদিন সুকন্যার মনের ভাবনাগুলি যেন হৈমন্তী কুহেলিকার

মত মায়াময় হয়ে ওঠে। তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়নে দেখতে পায় সুকন্যা, সত্যই স্বামী চ্যবনের নয়নে সেই ক্রোধজ্বালা আর নেই। ব্যথিত দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছেন চ্যবন। প্রশ্ন করে সুকন্যা—এ কি? আপনি ব্যথিত হয়েছেন কেন তপস্বী?

কিন্তু প্রশ্ন করতে গিয়েই সুকন্যার তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। দেখতে পায় সুকন্যা, তরুতলে দাঁড়িয়ে তারই দিকে শুষ্ক কঠোর ও বেদনাহীন দৃষ্টি তুলে দাঁড়িয়ে আছেন চ্যবন। না, বৃথা স্বপ্ন, বৃথা তন্দ্রা, বৃথা এই আশামুগ্ধ লোভ। ঐ ক্ষমাহীন তপস্বীর চক্ষু কোনদিন ব্যথিত হবে না।

দিবস-রজনীর প্রতি মুহূর্তে যেন এক বল্মীকের সেবা ক'রে চলেছে শর্যাতিতনয়া সুকন্যা। এই বল্মীকই যেন এক দেববিগ্রহ, এবং তার উপাসিকা হয়েছে বনবাসিনী নৃপতিতনয়া সুকন্যা। মাঝে মাঝে উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে থাকে সুকন্যা, আর নীরবে আক্ষেপ করে। এই তপস্বীকে শিলাময় দেব-বিগ্রহের মত শ্রদ্ধেয় মনে হতো, যদি তাঁর দুই চক্ষুতে এই নির্মম ক্রোধের জ্বালাটুকু শুধু না থাকত। কিন্তু কঠিন শিলার বিগ্রহকেও পূজা ক'রে যেটুকু আনন্দ লাভ করা যায় চ্যবনের এই মূর্তিকে পূজা ক'রে সেটুকু আনন্দও পায় না সুকন্যা। নিতান্তই এক শাস্তার মূর্তি। দুর্ভাগ্য, প্রেমহীন জীবনের ক্রন্দন শান্ত করবার মত একটা ছলনাও খুঁজে পায় না সুকন্যা। কোন মুহূর্তে এক বিন্দু মিথ্যা হর্ষেরও স্পর্শে ঋষি চ্যবনের চক্ষু স্নিগ্ধ হয় না।

নববসন্তাগমের ইঙ্গিত ঘোষণা ক'রে একদিন কাননের তরু ও লতার বক্ষে জেগে ওঠে নব কিশলয়। জেগে ওঠে পিককলরব। কাননসরোবরের নিকটে এসে দাঁড়িয়ে থাকে সুকন্যা। মনে হয় সুকন্যার, সরোবরের ঐ সলিল যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে তারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে! মনে হয়, পরাগভারে বিহ্বল কুসুমের স্তবক তারই যৌবনমদয়িত তনুচ্ছবির স্পর্শ পেতে চাইছে।

বল্কলবসনের ভার ভূতলে নিক্ষেপ করে সুকন্যা। বিকচ শতদলের মত রাগবিহসিত বিহ্বল দেহভার সরোবরসলিলে লুটিয়ে দিয়ে স্নানামোদে তৃপ্ত হয় সুকন্যা। তারপর তীরতরুর ছায়ায় এসে দাঁড়ায়। অতনুবিমোহন সেই বরতনুর অনাবরণ কোমলতাকে পুষ্পপরাগের লেপনে আরও কমনীয় ক'রে তোলে সুকন্যা। যেন এক স্বপ্নলোকের বক্ষে দাঁড়িয়ে জীবনের নির্বাসিত কামনার বেদনাগুলিকে স্নিগ্ধ সলিলের ও পুষ্পপরাগের প্রলেপ দিয়ে শান্ত করছে সুকন্যা।

অকস্মাৎ নিকটাগত এক পদশব্দ শুনে চমকে উঠেই দেখতে পায় সুকন্যা, সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে সুন্দর এক পথিকপুরুষ।

আগন্তুক বলেন—আমি অশ্বিনীকুমার রেবন্ত।

অসম্বৃত বসন সম্বৃত ক'রে বিব্রতভাবে প্রশ্ন করে সুকন্যা—কিন্তু আমার সম্মুখে আপনার আগমনের হেতু কি অশ্বিনীকুমার?

রেবন্ত—হেতু তুমি।

সুকন্যা—আমার পরিচয় আপনি জানেন কি?

রেবন্ত—জানি, তুমি শর্যাতিতনয়া সুকন্যা, তুমি চ্যবনভার্যা সুকন্যা।

সুকন্যা—তবে?

রেবন্ত—তোমারই বিপুল যৌবনভার বক্ষে ধারণ করবার তৃষ্ণা নিয়ে আমি এসেছি সুকন্যা।

সুকন্যার অন্তর যেন পিকসঙ্গীতের চেয়ে মধুরতর এক সুস্বরের স্পর্শে শিহরিত হয়।

মুগ্ধ রেবন্তের কণ্ঠে যেন বন্দনার সঙ্গীত ধ্বনিত হয়—এস লোকললামা বরারোহা, এস সুমধ্যমা বামোরু, এস নিতম্বগুর্বী কুচভারভীরুকটি সুভ্রূ, এস সুমধুরাধরা সুদতী, আজিকার পুষ্পময় বসন্তের মত যৌবনবান এই রেবন্তের পরিরম্ভনে এসে ধরা দাও সুকন্যা। তৃপ্ত রমিত ও প্রীত হোক তোমার সকল বাসনার অভিমান।

মুগ্ধভাবে রেবন্তের মুখের দিকে তাকিয়ে বিচলিতস্বরে সুকন্যা বলে—আপনি সুন্দর, আপনার আহ্বানও সুন্দর, কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন অশ্বিনীকুমার রেবন্ত।

রেবন্ত—কেন সুকন্যা?

সুকন্যা—আমি ঋষি চ্যবনের ভার্যা. আপনার আহ্বানে যতই মধুরতা থাকুক, সে আহ্বান আমি গ্রহণ করতে পারি না রেবন্ত।

রেবন্ত—জরাভিভূত ক্ষীণদেহ ও প্রণয়বিরহিত স্বামীর জীবনসঙ্গিনী নারী...।

অকস্মাৎ বক্ষের গভীরে যেন তীক্ষ্ণ এক কণ্টকের আঘাত অনুভব করে সুকন্যা। সত্য বাক্য উচ্চারণ করেছেন রেবন্ত, এক জরাগ্রস্তের উদ্দেশে ঘৃণা নিবেদন করছে এক যৌবনের গর্ব। কিন্তু বিস্মিত হয় সুকন্যা, আর বেদনার্তভাবে অন্যমনার মত তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে কেন ব্যথা বাজে অন্তরে?

—সুকন্যা।

রেবন্তের আহ্বানে সাড়া দেয় না সুকন্যা। যেন তার দুই বিষণ্ণ ও ভীত চক্ষুর দৃষ্টি অনেক দূরে ছুটে চলে গিয়েছে। রেবন্তের ধিক্কার সেই জীর্ণ বল্মীকের কঠোর অহংকারের সব প্রসন্নতা চূর্ণ করতে চায়। সুকন্যার বুক কেঁপে ওঠে।

রেবন্তের ধিক্কার যেন সুকন্যার এক নিরর্থক গর্বকে অপমানে আহত করেছে। সুকন্যা বলে—আমার স্বামী জরাভিভূত এক যৌবনহীন বলেই কি আপনি আমাকে সহজলভ্যা বলে মনে করেছেন রেবন্ত?

রেবন্তের প্রগল্‌ভ হর্ষও যেন হঠাৎ আহত হয়। চিন্তান্বিতের মত সুকন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন রেবন্ত।

সুকন্যা বলে—ঋষি চ্যবন যদি যৌবনবান হতেন, তবে কি আপনি তাঁর ভার্যাকে এইভাবে প্রণয়াসঙ্গে আহ্বান করতে পারতেন রেবন্ত?

রেবন্ত বলেন—বুঝেছি সুকন্যা।

সুকন্যা—কি বুঝেছেন?

রেবন্ত—বুঝেছি, কোথায় তোমার দুঃখ কিসের জন্য তোমার অভিমান, আর আমার প্রণয়ে কেনই বা তোমার সংশয়। কিন্তু আমি হীনপ্রেমিক নই শর্যাতিতনয়া। আমার প্রণয় কোন সুযোগের অনুগ্রহ গ্রহণ করে না। আমি ক্ষীণ খদ্যোৎ নই নারী, দীপহীন অন্ধকারের সুযোগ চাই না। আমি ক্ষুদ্র ভৃঙ্গ নই নারী, আমি নিদ্রিতা কমলকলিকার অসহায় অধর অন্বেষণ করি না। আমার অন্তরে কোন তস্করতা নেই সুকন্যা। চ্যবনের জরাতুর দুর্বল হস্তের মুষ্টিবন্ধন হতে ঐ রূপবহ্নি অনায়াসে ছিন্ন ক'রে সুখী হতে পারে না স্পর্ধিতযৌবন রেবন্তের স্পৃহা।

রেবন্তের ভাষণ যেন বিশালহৃদয় এক প্রেমিকের অন্তরের গভীর মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে সুকন্যা। তপোবলে মন্ত্রবলে অথবা অস্ত্রবলে নারীর হৃদয় নিপীড়িত ও আতঙ্কিত ক'রে নারীর অনুৎসুক হস্তের বরমাল্য কণ্ঠে ধারণ করতে গৌরব বোধ করে না যে প্রেমিক, স্বয়ংবরার বরমাল্য ছাড়া তৃপ্ত হয় না যে প্রেমিকের অন্তর, তেমনই এক প্রেমিক সুকন্যার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

রেবন্ত—আমি তোমার মনের সংশয় অপসারিত করতে চাই সুকন্যা। আমি ভিষগীশ্বর রেবন্ত, আমি জরা অপহরণের বিজ্ঞান জানি, আমি রুগ্ন দেহে রূপ স্বাস্থ্য কান্তি ও পুষ্টি প্রদানের রহস্য জানি।

চকিত হর্ষে দীপ্ত হয়ে ওঠে সুকন্যার দুই চক্ষু—তবে ঋষি চ্যবনের জরা অপহরণ ক'রে তাকে যৌবন ও কান্তি প্রদান করুন রেবন্ত।

হেসে ওঠেন রেবন্ত—তাই হবে সুকন্যা। এই কাননে যে সরোবরের জলে ওষধীশ চন্দ্রমা নিত্য স্নান করেন, সেই সরোবরের সন্ধান আমি জানি। যদি আমার সঙ্গে গিয়ে সেই সরোবরের জলে স্নান করেন ঋষি চ্যবন, তবে তিনি সুযৌবন ও দিব্যকান্তি লাভ করবেন।

সুকন্যা—আমার অনুরোধ...।

রেবন্ত—আমার অনুরোধ শোন সুকন্যা। ঋষি চ্যবনের কাছে গিয়ে আমার এই প্রস্তাব নিবেদন কর।

চলে যাচ্ছিল সুকন্যা। রেবন্ত বলে—আমার আর একটি প্রস্তাব শুনে যাও সুকন্যা।

—বলুন।

—আমি ও প্রাপ্তযৌবন চ্যবন, উভয়েই তোমার বরমাল্যের প্রার্থী হয়ে তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়াব। অঙ্গীকার কর, যার মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হবে তোমার প্রাণ, তারই কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করবে। হয় আমি নয় ঋষি চ্যবন, উভয়ের একজনের জীবনসঙ্গিনী হবে তুমি।

সুকন্যা বলে—অঙ্গীকার করলাম রেবন্ত।

রেবন্ত—অঙ্গীকার কর, এই প্রস্তাবও ঋষি চ্যবনের কাছে নিবেদন করবে তুমি।

সুকন্যা—নিবেদন করব।

রেবন্ত—অঙ্গীকার কর, ঋষি চ্যবনকে এই প্রস্তাবে তুমি অবশ্যই সম্মত করাবে।

পুলকাঞ্চিতা বনকুরঙ্গীর মত চকিতহর্ষে নিবিড় নয়নের দৃষ্টি ক্ষণ-প্রগল্‌ভতায় তরলিত ক'রে সুকন্যা বলে—অঙ্গীকার করলাম রেবন্ত।

চলে গেল সুকন্যা, এবং আশ্রমকুটীরে এসে উল্লসিত স্বরে চ্যবনের কাছে শুভবার্তা জ্ঞাপন করে—আপনার জরা অপহরণ ক'রে যৌবন প্রদান করবেন অশ্বিনীকুমার রেবন্ত। হৃষ্টচিত্ত চ্যবন রেবন্তের উদ্দেশে আশীর্বাণী বর্ষণ ক'রে সেই মুহূর্তে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

আবার স্বাধীন হবে শর্যাতিতনয়া সুকন্যার প্রণয়বাসনা; সুকন্যার হাতের বরমাল্য তারই পরিণয় বরণ ক'রে নেবে জীবনে, যার মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হবে সুকন্যার প্রাণ। এই পরীক্ষার প্রস্তাবেও সানন্দে সম্মত হয়ে চলে গেলেন চ্যবন।

আশ্রমকুটীরের নিভৃতে নীরব হয়ে বসে থাকে সুকন্যা। কি অদ্ভুত পরীক্ষা! এই পরীক্ষার পরিণামে সুকন্যা যে এক শাসনকঠোর ও হৃদয়হীন স্বামীর সান্নিধ্য ছেড়ে এক বিশালহৃদয় প্রবলপ্রেমিকের ব্যাকুল আহ্বানের কাছে চিরকালের মত চলে যেতে পারে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও ব্যথিত হলেন না শঙ্কিত হলেন না, বিষণ্ণ হলেন না কেন ঋষি চ্যবন?

ঝটিকাঘাতে একটি পল্লব শাখা হতে ছিন্ন হয়ে গেলে যতটুকু ব্যথা অনুভব করে বিশালদেহ দেবদারু, ততটুকু ব্যথাও বোধ হয় ঋষি চ্যবনের বক্ষে বাজবে

না, যদি সুকন্যা আজ প্রণয়াভিলাষী রেবন্তের কণ্ঠে বরমাল্য দান করে। শাস্তির দাসীকে চিরকাল কঠোর নেত্রে ঘৃণা ক'রেই দিনাতিপাত করলেন যে জরাভিভূত ঋষি, সে ঋষি যৌবনাঢ্য হয়ে সেই নারীর মুখের দিকে কি প্রেমদৃষ্টি দান করবেন? বিশ্বাস হয় না, তাই ভয় হয় সুকন্যার। কিন্তু কেন এই অদ্ভুত ভয়? অকারণে বিচলিত নিজেরই এই হৃদয়ের উপর রুষ্ট হয় সুকন্যা।

—ওঠ সুকন্যা, তাকাও দুই পাণিপ্রার্থীর মুখের দিকে, স্বয়ংবরার গর্ব নিয়ে বেছে নাও তোমার জীবনের সঙ্গী। কানের কাছে যেন এক মায়াস্বর গুঞ্জরিত হয়ে অবসন্নহৃদয়া সুকন্যাকে উৎসাহিত করে। কিন্তু তবু দুই হাতে অশ্রুপ্লুত চক্ষু আবৃত ক'রে বসে থাকে সুকন্যা। কেন কিসের জন্য এই বেদনা, এবং কি চায় সুকন্যা, নিজের মনকেই প্রশ্ন ক'রে বুঝতে পারে না সুকন্যা।

বুঝতে পারে না সুকন্যা, আজ এতদিন পরে তার মুক্তির মুহূর্ত যখন আসন্ন হয়ে উঠেছে, তখন কেন আবার বক্ষের স্পন্দনে ও নিঃশ্বাসে এই নূতন ও অদ্ভুত এক বেদনার সঞ্চার জাগে?

আশ্রমকুটীরের আঙ্গিনায় দুই আগন্তুকের পদধ্বনি শোনা যায়। চমকে ওঠে সুকন্যা। আসছেন সুন্দরতনু রেবন্ত আসছেন সুন্দরতনু চ্যবন।

—শর্যাতিতনয়া সুকন্যা! হর্ষাকুল রেবন্তের কণ্ঠস্বর আশ্রমের প্রাঙ্গণের বক্ষে ধ্বনিত হয়। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর কই? নীরব কেন সুকন্যার যৌবন-গর্বের শাস্তিদাতা সেই ঋষি, যিনি স্বয়ং আজ রেবন্তের অনুগ্রহে যৌবনান্বিত হয়ে ফিরে এসেছেন?

পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে কুটীরের বাইরে এসে দাঁড়ায় সুকন্যা। দেখতে পায়, যৌবনাঢ্য দুই পুরুষের দুই মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে প্রাঙ্গণের বক্ষের উপর। উভয়েই সমানসুন্দর, একই তরুর দুই পুষ্পের মধ্যে যতটুকু রূপের ভিন্নতা থাকে, তা'ও নেই। কান্তিমান দ্যুতিমান ও বিশাল বক্ষঃপট, নবীন শাল্মলী সদৃশ যৌবনান্বিত দুই দেহী।

রেবন্তের মুখের দিকে তাকায় সুকন্যা। দেখতে থাকে সুকন্যা, হর্ষে উজ্জ্বল ও আনন্দে সুস্মিত হয়ে উঠেছে রেবন্তের চক্ষু। রেবন্তের দুই সুন্দর নয়নে জ্যোৎস্নালিপ্ত সমুদ্রতরঙ্গের মত কী বিপুল প্রণয়োচ্ছল আহ্বান হিল্লোলিত হয়! মুগ্ধ হয় সুকন্যার দুই নয়ন।

চ্যবনের মুখের দিকে তাকায় সুকন্যা। চমকে ওঠে সুকন্যার হৃৎপিণ্ড। ক্রোধজ্বালা নয়, অবহেলা নয়, অহংকার নয়, দুঃসহ ব্যথায় বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে সুন্দরতনু ঋষিযুবা চ্যবনের চক্ষু। যেন এক হতাশ ও অসহায়ের

দৃষ্টি। এতদিন পরে তাঁরই শাস্তিনিঃসারী দুই শুষ্ক চক্ষুর কঠোর শাসনে নিগৃহীতা নারীর উপর তাঁর সকল অধিকার একটি পুষ্পমাল্যের প্রতিহিংসার জ্বালায় ভস্মসাৎ হয়ে যাবে, যেন সেই শাস্তি নীরবে সহ্য করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন চ্যবন। কিন্তু সুকন্যা যেন এক অকল্প্য দৃশ্য দেখছে; বিস্ময়াভিভূত অন্তরের উল্লাস সংযত ক'রে ব্যথিত নয়নে চ্যবনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একই তরুর দুই পুষ্পের মত দুই সমানসুন্দর রূপ, কিন্তু একজনের নয়নে হর্ষ, আর একজনের নয়নে বেদনা। রেবন্তের সুস্মিত নয়নের দিকে তাকিয়ে নয়ন মুগ্ধ হয় সুকন্যার, কিন্তু চ্যবনের ব্যথিত চক্ষুর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় সুকন্যার হৃদয়।

ফুল্লরুচি ফুলদলের মত সুস্মিত হয়ে ওঠে শর্যাতিতনয়া সুকন্যার অধর। যেন আজ এতদিন পরে নিজেকেই দেখতে পেয়েছে সুকন্যা। যেন ঋষি চ্যবনের চক্ষুতে ঐ বেদনার আবির্ভাব দেখবার আশায় এতদিন ধ'রে দুর্বহ এক প্রতীক্ষার ব্রত পালন ক'রে এসেছে সুকন্যা।

ধীরে ধীরে ঋষি চ্যবনের সম্মুখে এসে আহ্বান করে সুকন্যা।—ঋষি!

চ্যবন—বল শর্যাতিতনয়া।

সুকন্যা—কি ভাবছেন ঋষি?

চ্যবন—প্রতিশোধ গ্রহণ কর সুকন্যা।

হেসে ওঠে সুকন্যা—সুযোগ পেয়েছি ঋষি, প্রতিশোধ গ্রহণ করাই উচিত।

চ্যবন—হ্যাঁ সুকন্যা।

–এই লও প্রতিশোধ! চ্যবনের কণ্ঠে বরমাল্য দান ক'রে মুগ্ধ চক্ষু তুলে চ্যবনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুকন্যা।

চমকে ওঠেন রেবন্ত, এবং নিজেরই মনের বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে ধিক্কার ধ্বনিত করেন—ধন্য ছলনানিপুণা সুকন্যা!

---

# জরৎকারু ও অস্তিকা

যাযাবর বংশের সকলেই অতিবৃদ্ধ হয়েছেন। দ্বিতীয় পুরুষ বা সন্তান বলতে বংশের মধ্যে মাত্র একজন, জরৎকারু। কিন্তু জরৎকারুও বৃদ্ধ হতে চলেছেন। আজ পর্যন্ত বিবাহ ক'রে গৃহী হলেন না। অতিবৃদ্ধ পিতৃসমাজের এই এক দুঃখ।

যাযাবর বংশের গৌরব জরৎকারু, কঠোর ব্রতপরায়ণ তপস্বী। পরম-প্রতাপ রাজা জনমেজয় তাঁকে ভক্তিনম্র শিরে অভিবাদন করেন। তপস্যা ও ব্রত ছাড়া সংসারে ও সমাজে আর কোন কর্তব্য গ্রহণ করতে চান না জরৎকারু। রাজা জনমেজয় সংকল্প ঘোষণা ক'রে রেখেছেন, যদি ঋষি জরৎকারু কোনদিন গৃহিজীবন গ্রহণ ক'রে পুত্রলাভ করে, তবে জরৎকারুর সেই পুত্রকেই তিনি তাঁর মন্ত্রগুরুরূপে সম্মানিত করবেন।

কিন্তু এই গৌরব ও সম্মান সত্ত্বেও যাযাবর পিতৃসমাজের মন বিষণ্ণ হয়ে আছে। জরা বা বার্ধক্যের জন্য নয়; বংশলোপের আশঙ্কায়। একমাত্র বংশধর জরৎকারু ব্রহ্মচর্যে রতী হয়ে আছে, এই হলো তাঁদের দুঃখের কারণ। জরৎকারুর তপোবল ও বিদ্যার জন্য তাঁরা গৌরব অনুভব করেন ঠিকই কিন্তু যখন চিন্তা করেন যে, জরৎকারুর পরে যাযাবর কুলের প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীতে কেউ থাকবে না, তখনই তাঁদের মনের শান্তি নষ্ট হয়। পিতৃসমাজের মনে এমন আক্ষেপও মাঝে মাঝে জাগে, এই প্রভূত তপোবলের গৌরব ক্ষুণ্ণ ক'রেও যদি জরৎকারু এক সংসারসঙ্গিনী নিয়ে গৃহী হতো, সন্তানের পিতা হতো, তাও শ্রেয় ছিল। জরৎকারুর উগ্র তপস্যা শুদ্ধতা সংযম ও তীর্থ-পরিক্রমার পুণ্য, এসবের জন্য হয়তো পৃথিবীতে যাযাবর বংশের নাম থাকবে, কিন্তু যাযাবর বংশ আর থাকবে না। পিতৃপুরুষের বিদেহী সত্তাকে তৃষ্ণার জল দিয়ে তর্পণ করতে কেউ থাকবে না। দুঃখ না হয়ে পারে না।

পিতৃসমাজের দুঃখের কারণ একদিন শুনতে পেলেন জরৎকারু। তাঁরা জরৎকারুকে বললেন—আমাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে, তোমার গৌরব নিয়ে আমরা সুখে মরব, কিন্তু শান্তি নিয়ে মরতে পারব না। তোমার ব্রহ্মব্রতের জন্য আমাদের বংশ লুপ্ত হতে চলেছে।

জরৎকারুর মত তপস্বীর কঠিন মনে তবু বিন্দুপরিমাণ সমবেদনাও জাগে না। পিতৃসমাজ বলেন—তোমার কাছে অনুগ্রহ বা সমবেদনার প্রার্থী আমরা

নই। তোমার কর্তব্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বংশরক্ষার জন্য যখন আমাদের সমাজে দ্বিতীয় আর কেউ নেই শুধু তুমি আছ, তখন এই কর্তব্য পালনের দায় একান্তভাবে তোমারই। সমাজের প্রতি, পিতৃপুরুষের প্রতি কর্তব্য অবহেলা ক'রে তপস্বী হওয়ার অধিকার তোমার নেই। তুমি নিজে কর্তব্যবাদী বিবেকবান ও বিদ্বান; তুমি জান আমরা যা বলছি, তা তোমারই ধর্মসঙ্গত নীতি।

জরৎকারু কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বলেন—আপনারা ঠিকই বলেছেন। আপনাদের দ্বিতীয় পুরুষে যখন আমি ছাড়া আর কেউ নেই, তখন বংশধারা রক্ষার কর্তব্য একান্তভাবে আমারই ধর্ম। কিন্তু আমি যেভাবে আমার জীবন গঠন করেছি, তাতে আমার পক্ষে গৃহিজীবন যাপন করা সম্ভব নয়। পতি হওয়া বা পিতা হওয়ার আগ্রহ বোধ হয় আমার শেষ হয়ে গিয়েছে। সংসার অন্বেষণ ক'রে কোন নারীকে জীবনে আহ্বান করবার রীতি-নীতিও আমি ভুলে গিয়েছি। আমি বিষয় উপার্জনের পদ্ধতিও জানি না।

পিতৃসমাজ বলেন—কিন্তু উপায় কি? যে ভাবেই হোক তোমাকে বংশ-রক্ষার কর্তব্য গ্রহণ করতেই হবে।

জরৎকারু বলেন—আমি একটি প্রতিশ্রুতি আপনাদের দিতে পারি। আমারই সমনাম্নী কোন নারী যদি স্বেচ্ছায় আমার জীবনে এসে শুধু পুত্রবতী হতে চায়, তবে আমি তার ইচ্ছা পূর্ণ করব, নিজের ইচ্ছা নয়; কারণ ইচ্ছাহীন হয়েছে আমার জীবন। আমার মনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই, সে-মনে সম্ভোগের তিলমাত্র বাসনা নেই।

অতিবৃদ্ধ পিতৃসমাজ হৃষ্টচিত্তে বলেন—তোমার কাছ থেকে এই আশ্বাসও যথেষ্ট। তুমি ভার্যা গ্রহণে সম্মত আছ, এই সত্য জেনেই আমরা শান্তিতে মরতে পারব। মরবার আগে আমরা প্রার্থনা ক'রে যাব, এমন নারী তোমার জীবনে সুলভ্যা হোক, যে নারী স্বেচ্ছায় এসে তোমার সাহচর্যে পুত্রবতী হবে।

ব্রহ্মচারী জরৎকারু, যিনি শুধু আকাশের বায়ুকে ভোজ্যরূপে গ্রহণ ক'রে শরীর ক্ষীণ ক'রে ফেলেছেন, তিনিও প্রবীণ জীবনে দারগ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন, জনসমাজে এবং দেশ ও দেশান্তরে এই সংবাদ রটিত হয়ে গেল। রাজা জনমেজয় শুনে সুখী হলেন।

শ্রদ্ধেয়রূপে সর্বজনবরেণ্যরূপে যিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে কিন্তু বরমাল্য লাভ করবার কোন লক্ষণ বা ঘটনা দেখা দিল না। নিঃসম্পদ

এক তপস্যাপরায়ণের সংসারভাগিনী হওয়ার মত আগ্রহ হবে, এমন কন্যা দুর্লভ বৈকি।

কিন্তু আশ্চর্য, দেশান্তরে এক রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে এই সংবাদ একজনের বিষণ্ণ মনের চিন্তায় প্রবল এক আগ্রহের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। নাগরাজ বাসুকির মনে।

নাগরাজ বাসুকিও কুলক্ষয়ের আশংকায় বিষণ্ণ হয়ে আছেন। শুধু তাঁর পুরুষপরম্পরা বংশধারার ক্ষয় নয়, তার চেয়েও ভয়ানক এক ক্ষয়ের আশংকা। সমগ্র নাগ জাতিকেই ধ্বংস করবার জন্য রাজা জনমেজয় তাঁর নিষ্ঠুর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ক'রে ফেলেছেন। পরাক্রান্ত জনমেজয়ের বৈরিতা ও আক্রমণের সম্মুখে দুর্বল নাগসমাজ আত্মরক্ষা করতে পারে, এমন উপায় আজও আবিষ্কার ক'রে উঠতে পারেননি বাসুকি। নাগপ্রধানেরা একে একে এসে সকল রকম প্রয়াস ও পন্থার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন, সূক্ষ্ম কূট ও প্রচ্ছন্ন, কিন্তু কোনটিকেই জাতিরক্ষার উপযোগী পন্থা বলে বিশ্বাস করতে পারছেন না বাসুকি। বিশ্বাস হয় না, পরাক্রান্ত জনমেজয়ের শক্তিকে এই সব সূক্ষ্ম কূট বা প্রচ্ছন্ন কোন আঘাত দিয়ে পরাভূত করা সম্ভব হবে।

জাতিরক্ষার জন্য এই চিন্তার মধ্যে বাসুকি আজ কেন যেন বার বার জরৎকারুর কথা স্মরণ করছিলেন। জনমেজয়ের শ্রদ্ধাস্পদ জরৎকারু, যে জরৎকারুর পুত্রকে ভবিষ্যতের মন্ত্রগুরুরূপে নির্বাচিত ক'রে রেখেছেন জনমেজয়, সেই জরৎকারু পরিণত বয়সে ব্রহ্মব্রতের রীতি ক্ষুণ্ণ ক'রে বিবাহের সংকল্প করেছেন। স্বজাতিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা, আর জরৎকারুর বিবাহের সংকল্প, দুই ভিন্ন বিষয় ও ভিন্ন প্রশ্ন, দুই ভিন্ন ঘটনা ও ভিন্ন সমস্যা। তবু এই দুই প্রশ্নকে এক ক'রে নিয়ে চিন্তা করছিলেন বাসুকি। মনে হয় বাসুকির, জনমেজয়ের নিষ্ঠুর পরিকল্পনার আঘাত থেকে জাতিকে রক্ষা করবার উপায় আছে।

বার বার মনে পড়ে বাসুকির, তাঁর ভগিনী অস্তিকার কৌলেয় নামও যে জরৎকারু। যা খুঁজছিলেন তারই ইঙ্গিত চিন্তার মধ্যে একটু স্পষ্ট হয়ে উঠতেই আবার বিষণ্ণ হয়ে ওঠেন বাসুকি। বড় কঠিন এই পথ, বড় কঠোর তাঁরও অন্তরের এই পরিকল্পনা। কিন্ত না, শতধিক্, কী নিষ্ঠুর এই কল্পনা! এক তরুণীর জীবনকে উৎকোচরূপে বিলিয়ে দিয়ে জাতিকে বাঁচাতে হবে, এমন চিন্তা মুখ খুলে প্রকাশ করতেও মনের মধ্যে শক্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না বাসুকি। কিন্তু উপায় নেই, বলতেই হবে।

হঠাৎ কক্ষান্তর থেকে বাসুকির সম্মুখে এসে দাঁড়ায় অস্তিকা, বাসুকির

ভগিনী। চমকে উঠলেন বাসুকি। যে নির্মম পরিকল্পনার সঙ্গে মনের গোপনে আলাপ করছিলেন বাসুকি, অস্তিকা কি তাই শুনতে পেয়েছে?

বাসুকির ভগিনী অস্তিকা আজও অনূঢ়া, কিন্তু এই কারণে বাসুকির বা অস্তিকার মনে কোন দুশ্চিন্তা নেই। সে কেমন সুপুরুষ, এমন রূপান্বিতা ও সুযৌবনা তরুণীর বরমাল্য কণ্ঠে ধারণ করতে যার আগ্রহ হবে না? কত কান্তিমান যশস্বী ও গুণাধার কুমার এই অস্তিকার পাণিপ্রার্থনার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছে, কিন্তু কুমারী অস্তিকার মনে তার জন্য কোন উৎসাহ নেই, আনন্দও নেই। দেশান্তরে গিয়ে রাজমহিষী হয়ে জীবন যাপন করবার পথ মুক্ত হয়েই রয়েছে, ইচ্ছা করলে স্বয়ংবরা হয়ে আজই সেই পথে চলে যেতে পারে অস্তিকা। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় অস্তিকার, জনমেজয়ের আক্রমণে তারই ভ্রাতৃসমাজ অচিরে ধ্বংস হয়ে যাবে। শান্তি হারায় সুন্দরী অস্তিকার মন। আসন্ন বিনাশের আশঙ্কায় বেদনাপন্ন জাতি ও সমাজের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের জীবনের জন্য কোন আনন্দের উৎসব কল্পনা করতেও ভাল লাগে না। নাগজাতির সঙ্কট তার পিতৃকুলের সঙ্কট, এর মধ্যে তার কি কোন কর্তব্য নেই?

আজ এতদিন পরে যেন এক কর্তব্যের সন্ধান পেয়েছে অস্তিকা। সেই কথা জানাবার জন্য ভ্রাতা বাসুকির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

অস্তিকা বলে—মহাতপা জরৎকারু পিতৃসমাজের অনুরোধে কুলরক্ষার জন্য পত্নী গ্রহণের সংকল্প করেছেন, একথা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন ভ্রাতা?

বাসুকি—হ্যাঁ শুনেছি।

অস্তিকা—জরৎকারুর পুত্রকে রাজা জনমেজয় ভবিষ্যতে মন্ত্রগুরুরূপে গ্রহণ করবেন, একথা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন।

—হ্যাঁ।

—জরৎকারুকে যদি আমি স্বামিরূপে বরণ করি, তবে?

বাসুকি বিস্ময়ে চিৎকার ক'রে ওঠেন—তবে কি?

—আপনি কূটনীতিক ও বিজ্ঞ, আপনি চিন্তা ক'রে দেখুন, জনমেজয়ের আক্রমণ থেকে নাগজাতিকে রক্ষা করবার উপায় হতে পারে, যদি আমি মহাতপা জরৎকারুকে স্বামিরূপে গ্রহণ করি।

হ্যাঁ, নিশ্চয় উপায় হতে পারে। বাসুকির মন যে এই বিশ্বাসের জন্যই আশা দুরাশা ও হতাশার দ্বন্দ্ব সহ্য করছে। ভবিষ্যতের যে জরৎকারুপুত্রকে জনমেজয় মন্ত্রগুরুরূপে নির্বাচিত ক'রে রেখেছেন, সেই জরৎকারুপুত্র যদি বাসুকির ভাগিনেয় হয়, তবে উপায় হতে পারে। অস্তিকার ক্রোড়ে লালিত সেই জরৎকারুপুত্র তার নিজের মাতৃকুল ধ্বংসের পরিকল্পনায় কখনই

জনমেজয়কে সমর্থন করবে না, বরং, এবং অবশ্য একমাত্র সে-ই জনমেজয়কে নিবৃত্ত করতে পারে। হ্যাঁ, উপায় হতে পারে।

তবু বাসুকির কণ্ঠস্বর বেদনায় উদাস হয়ে ওঠে—আমার চিন্তা অপচিন্তা বা দুশ্চিন্তার কথা ছেড়ে দাও ভগিনী অস্তিকা, তুমি নিজের উপর এতটা নির্মম হয়ো না।

অস্তিকা—কিসের নির্মমতা?

বাসুকি—জরৎকারু নিতান্ত দরিদ্র প্রায়বৃদ্ধ ও সংসারবিমুখ এক তপস্বী। তোমার মত সুযৌবনা রূপান্বিতা ও সুখলালিতা নারীর পক্ষে এহেন ব্যক্তি কখনই বরণীয় হতে পারে না।

অস্তিকা বাধা দিয়ে বলে—জাতিকে সমূহ বিনাশ হতে রক্ষা করবার কোন উপায় যখন আর নেই তখন আমার মত নারীর পক্ষে যা সাধ্য আমি তাই করতে চাই। আপনার সম্মতি আছে কিনা বলুন?

বাসুকি—আছে। এই একটিমাত্র উপায় আছে। এবং এতক্ষণ ধরে অনেক কুণ্ঠা সত্ত্বেও এই উপায়ের কথা চিন্তা করছিলাম ভগিনী অস্তিকা। আশীর্বাদ করি তুমি যেন ।

অস্তিকা—প্রার্থনা করুন নাগজাতি যেন রক্ষা পায়।

বনপথে একা যেতে যেতে হঠাৎ নাগরাজ বাসুকিকে দেখতে পেয়ে আদৌ বিস্মিত হননি জরৎকারু, কিন্তু নাগরাজের উচ্চারিত অভ্যর্থনার বাণী শুনে একটু বিস্মিত হলেন এবং নাগরাজের অনুরোধ শুনে আরও বেশি বিস্মিত হলেন।

জরৎকারু বলেন—শুনে সুখী হলাম আপনার ভগিনী আমারই সমনাম্নী। কিন্তু আমার মত বিষয়সম্পদহীন বয়োবৃদ্ধ পুরুষের জীবনে অযাচিত উপহারের মত এক কুমারী তরুণীর জীবন আত্মসমর্পণ করতে চাইছে, শুনে বিস্ময় হয় নাগরাজ।

বাসুকি—বিস্ময় হলেও বিশ্বাস করুন ঋষি আমার ভগিনী অস্তিকা স্বেচ্ছায় আপনার মত তপস্বীকে পতিরূপে বরণ করবার জন্য প্রতীক্ষায় রয়েছে।

জরৎকারু—আমার কিন্তু ভার্যা পোষণের উপযোগী বিষয়সম্পদ অর্জনের কোন সামর্থ্য নেই।

বাসুকি—জানি সে দায় আমি নিলাম।

জরৎকারু—আমি কিন্তু সম্ভোগসুখের জন্য আদৌ স্পৃহাশীল নই।

বাসুকি—জানি, সে তো আপনার জীবনেরই আদর্শ।

জরৎকারু—মাত্র পিতৃসমাজের কাছে প্রতিশ্রুত সত্য রক্ষার জন্য আমি কুলরক্ষার সংকল্প গ্রহণ করেছি।

বাসুকি—জানি, সে তো আপনারই কর্তব্য।

জরৎকারু—তবু আশঙ্কা হয় নাগরাজ। এভাবে পত্নী গ্রহণ করলে একটা দীনতা স্বীকার করতে হবে। আমার কুলরক্ষার ব্রতে সহায়িকা হয়ে যে-নারী আমার কাছে আসতে চাইছে, সে-নারী আমার প্রতি তার আচরণে প্রিয়তা ও সম্মান রক্ষা করতে পারবে কি?

বাসুকি—আমি আশ্বাস দিতে পারি ঋষি, আমার ভগিনীর আচরণে আপনি কোন অপ্রিয়তার প্রমাণ পাবেন না।

জরৎকারু—আমি নিজেকে জানি বলেই একটি কথা জানিয়ে রাখি। আপনার ভগিনীর আচরণ যেদিন আমার কাছে অপ্রিয় বোধ হবে, সেদিনই আমি চলে যাব, এবং আর ফিরে আসব না।

বাসুকি—আপনার এই অধিকারও স্বীকার করি ঋষি।

বিবাহ হয়ে গেল। তপস্বী জরৎকারু ও রাজকুমারী অস্তিকার বিবাহ। এই বিবাহে বরমাল্য বিনিময়ের সঙ্গে হৃদয় বিনিময়ের কোন প্রশ্ন ছিল না। লগ্ন যতই মধুর হোক, কোন আনন্দ শঙ্খে শঙ্খে ধ্বনিত হবার কথা ছিল না। মাঙ্গলিক বেদিকা আলিম্পনে রঙীন হলেও অন্তরনিলয় অনুরাগে রঞ্জিত ছিল না। একজনের উদ্দেশ্য পিতৃকুল রক্ষা, আর একজনের উদ্দেশ্য ভ্রাতৃকুল রক্ষা, তারই জন্য এই বিবাহ। সমাজনীতির মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য এক তপস্বী তাঁর ব্রহ্মব্রত ক্ষুণ্ণ ক'রে এক সুযৌবনা নারীকে গ্রহণ করলেন। রাজনীতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য এক তরুণী রাজকুমারী এক বয়োবৃদ্ধ তপস্বীকে গ্রহণ করলেন।

নাগপ্রাসাদের অভ্যন্তরে রমণীয় এক পুষ্পাকুল উদ্যান, সৌরভবিধুর বায়ু আর বিহগের কলকূজন। তারই মধ্যে এক সুশোভন নিকেতনে জরৎকারু ও অস্তিকার অভিনব দাম্পত্যের জীবন আশ্রয় লাভ করে।

করতল কঠোর ক'রে অক্ষিসলিলের ধারা আগেই মুছে ফেলে এই ঘটনাকে বরণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল অস্তিকা। জানে অস্তিকা, এই দাম্পত্যে হৃদয়ের স্থান নেই। এক বয়ঃপ্রবীণ তপস্বীর সাহচর্য বরণ ক'রে তাকে শুধু পুত্রবতী হতে হবে। এ ছাড়া এই দাম্পত্যের আর কোন তাৎপর্য নেই।

জরৎকারুও জানেন, তাঁর কর্তব্য কি, সংকল্প কি? যাযাবর পিতৃসমাজের কাছে প্রদত্ত তাঁর প্রতিশ্রুতি শুধু রক্ষা করতে হবে। অস্তিকা নামে এই নাগরাজভগিনী শুধু পুত্রবতী হবে; এক তরুণীর জীবনে মাত্র এইটুকু পরিণতি

সফল করবার প্রয়াস ছাড়া আর কোন অভীপ্সা তাঁর নেই। সংকল্প অনুসারে এই বিবাহিত জীবনকে যেভাবে গ্রহণ করা উচিত, জরৎকারু ঠিক সেইভাবেই গ্রহণ করলেন। কুলরক্ষার আগ্রহ ছাড়া তাঁর মনে আর কোন আগ্রহ নেই।

মমতা এখানে নিষিদ্ধ, অনুরাগ অপ্রার্থিত, হৃদয়ের বিনিময় অবৈধ। স্পৃহাহীন সম্ভোগ, কামনাহীন মিলন। জরৎকারুর প্রয়োজন শুধু অস্তিকার এই নারীশরীর, নারীত্ব নয়। বিবাহের পর জরৎকারু নিরন্তর এবং প্রতি মুহূর্তে অস্তিকাকে বক্ষোলগ্ন করতে চান, বক্ষোলগ্ন ক'রে রাখেন।

অস্তিকার মনে হয়, এক বিরাট পাষাণের বিগ্রহ যেন তাকে বক্ষে ধারণ ক'রে রয়েছে, যে বক্ষে আগ্রহের কোন স্পন্দন নেই। জরৎকারুর এই কঠোর আলিঙ্গনে অস্তিকার অধর শীতাহত কমলপত্রের মত শিহরিত হয়। কিন্তু কোন আবেগের স্পর্শে নয়; দুঃসহ এক দুঃখের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ যেন স্ফুরিত হতে চেষ্টা ক'রেও স্তব্ধ হয়ে যায়।

কি অদ্ভুত মিলন নিরন্তর অন্বেষণ করছেন স্বামী! ঋষির স্পৃহাহীন ও উদাসীন নিঃশ্বাসে যেন শুধু শোণিতের আগ্রহ!

দুঃসহ বোধ হলেও একটি আশা অন্তরে ধ'রে রেখেছে অস্তিকা, একদিন না একদিন জরৎকারুর এই কামনাহীন পৌরুষের অবসান হবে। মাঝে মাঝে আরও সুন্দর সুস্বপ্ন দেখে নিজেকে যেন সান্ত্বনা দান করে অস্তিকা। কামনা নেই ঋষির আচরণে, কিন্তু একদিন কামনা দেখা দেবে এই ঋষির নিঃশ্বাসে; এবং সেই কামনাও মমতায় সুরভিত হয়ে প্রেমে পরিণত হবে। জরৎকারুর জীবনে পতিধর্মের আবির্ভাব হবে। অস্তিকার দেহের স্পর্শকে সহধর্মিণীর স্পর্শ বলে অনুভব করবার মত হৃদয় লাভ করবেন জরৎকারু।

জরৎকারুকে পতির সম্মান দিয়ে আপন ক'রে নেবার আশা রাখে অস্তিকা। সুযোগ পায় না, তবু সুযোগের অন্বেষণ করে। নিতান্ত শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার আহ্বান ছাড়া জরৎকারুর কাছ থেকে আর কোন সহব্রতের আহ্বান আসে না, তবু অস্তিকার অন্তরাত্মা প্রতীক্ষায় থাকে। জরৎকারু যদিও কোনদিন বলেন না, তবু তাঁর পাদ্য-অর্ঘ্যের আয়োজন ক'রে রাখে অস্তিকা।

এই দাম্পত্যে প্রেম নেই, না থাকুক, তার জন্য দুঃখ করতে চায় না অস্তিকা! এই ঋষির নিঃশ্বাসে শুধু যদি একটুকু কামনাময় আগ্রহের উত্তাপ থাকত!

মধ্যনিশীথের তন্দ্রার মধ্যে নীরবে কেঁদে ওঠে অস্তিকার হৃদয়ের প্রার্থনা। —চাই না প্রেম, শুধু চাই এক বিন্দু কামনার স্পর্শ। বল ঋষি, একবার ঐ রবহীন হাস্যহীন ও বিহ্বলতাশূন্য শিলাবৎ অধর স্পন্দিত ক'রে তোমারই বিবাহিতা নারীর কানের কাছে শুধু বলে দাও, ভাল লাগে এই নারীর দেহের স্পর্শ।

নিজের ইচ্ছায় আহৃত শোভাহীন ভাগ্যকে নতুন ক'রে সাজিয়ে তুলতে চেষ্টা করে অস্তিকা। মাত্র কুলরক্ষার জন্য সংস্কারচারিণী নারীর মন বুঝতে পারে, এই জীবন পত্নীর জীবন নয়। তবু ভবিষ্যতের জন্য আশা ধ'রে রাখে অস্তিকা। জরৎকারুর এই উত্তাপহীন তৃষ্ণা, আগ্রহহীন লালসা ও আকুলতা-হীন সম্ভোগের প্রতিজ্ঞা মেঘাবৃত দিনের অন্ধকারের মত একদিন মিথ্যা হয়ে যাবে, কামনায় কমনীয় হবে জরৎকারুর কঠোর পতিত্ব।

সেদিন তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, পশ্চিম আকাশে রক্তিম আলোকের অবশেষটুকুও আর ছিল না। অস্তিকার মনে পড়ে, স্বামী এখন সন্ধ্যা-বন্দনায় বসবেন। কোথায় আসন ক'রে দিতে হবে, কি উপকরণ সংগ্রহ ক'রে রাখতে হবে, সেই কথাই ভাবছিল অস্তিকা।

জরৎকারু হঠাৎ উপস্থিত হয়ে অস্তিকার হাত ধরলেন। অস্তিকার অন্তর এক অস্পষ্ট শঙ্কায় দুরু দুরু ক'রে ওঠে। পরমুহূর্তে আর কোন অস্পষ্টতা রইল না। মূক উন্মাদের মত অকস্মাৎ অস্তিকাকে বাহুবন্ধে আবদ্ধ করলেন জরৎকারু। তৎক্ষণে অবিন্যস্ত কুসুমমাল্য গাত্রও বিস্রস্ত ক'রে অবচিত শয্যায় উপবেশন করলেন।

কোনদিন যা করেনি অস্তিকা আজ বাধা হয়ে তাই করতে হলো। মৃদু প্রত্যাখ্যানে জরৎকারুর বাহুবন্ধন ছিন্ন ক'রে উঠে দাঁড়ায় অস্তিকা। নম্র স্বরে প্রতিবাদ করে অস্থিকা—আপনি ভুল করছেন ঋষি এখন আপনার সন্ধ্যা বন্দনার সময়।

জরৎকারু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখে যেন এক অপমানের জ্বালা দীপ্ত হয়ে ফুটে ওঠে।

জরৎকারু বলেন—একথা স্মরণ করিয়ে দিতে তোমার এত আগ্রহ কেন?

অস্তিকা—আমি আপনার স্ত্রী আপনাকে কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেবার আগ্রহ আমারই তো থাকবে ঋষি।

—তোমাকে সে অধিকার আমি দিইনি।

—তবে আমার অধিকার কি?

—শুধু আমার আচরণের সাহায্য করা, বাধা দিয়ে আমাকে অপমান করা নয়।

—ক্ষমা করবেন ঋষি, অস্তিকার দেহ-মন আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছে। আপনার নিত্যদিনের ধর্মাচরণে সাহায্য করবার জন্যই আপনাকে সন্ধ্যা-বন্দনার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। আপনাকে

অপ্রিয় মনে করি না ঋষি, আপনি প্রিয় বলেই এইটুকু বাধা দিয়ে ফেলেছি। বলুন, কি অন্যায় করেছে আপনার পত্নী অস্তিকা?

—কোন ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নয় অস্তিকা। মহাতপা জরৎকারুকে আজ তোমার কাছ থেকে কর্তব্যের যে উপদেশ শুনতে হলো, সে উপদেশ তার জীবনে তিরস্কারের আঘাত ছাড়া আর কিছু নয়। আমারই ভুলে আমাকে এই তিরস্কার করবার সুযোগ তুমি পেয়েছ। তপস্বী জরৎকারুর জীবনে এই প্রথম তিরস্কারের আঘাত। কিন্তু এই ভুলকে আর প্রশ্রয় দিতে পারি না, আমি যাই।

আর্তনাদ ক'রে ওঠে অস্তিকা—ঋষি!

জরৎকারু—বৃথা আমাকে ডাকছ অস্তিকা।

অস্তিকার দৃষ্টি বেদনায় সজল হয়ে ওঠে—আপনার পত্নী, আপনার সহচরী জীবনসঙ্গিনী, আপনার ধর্মভাগিনী অস্তিকা আপনাকে ডাকছে, আপনি যাবেন না ঋষি।

জরৎকারু—এত বড় সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি আমি তোমাকে দিইনি অস্তিকা, আমার জীবনে এসবের কোন প্রয়োজন নেই। তবু ধন্যবাদ দান করি তোমাকে, তুমি আমাকে আমার এক ভুলের গ্লানি স্মরণ করিয়ে দিয়েছ।

চলে যাচ্ছিলেন জরৎকারু। অস্তিকা কিছুক্ষণ পলকহীন দৃষ্টি তুলে সেই নির্মম অন্তর্ধানের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার নারীত্ব কোন মূল্য পেল না, তার পত্নীত্ব কোন মর্যাদা পেল না। যাক, জেনে শুনে ও স্বেচ্ছায় এই অদ্ভুত এক নিয়তির কাছেই তো আত্মসমর্পণ করেছিল অস্তিকা।

হঠাৎ মনে পড়ে অস্তিকার, তারই জীবনের এক প্রতিজ্ঞা ও পরীক্ষাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে যেন সদর্পে চলে যাচ্ছে এক মমতাহীন পৌরুষ। ইচ্ছাহীন পৌরুষের ঐ ঋষিকে এভাবে চলে যেতে দিলে রক্ষা পাবে না নাগজাতির জীবন, রক্ষা পাবে না অস্তিকার পিতৃকুলের কল্যাণ।

লুণ্ঠিত লতিকার মত অস্তিকার কোমল মূর্তি হঠাৎ অদ্ভুত এক আবেগে আহতা নাগিনীর মত চঞ্চল হয়ে ওঠে। মোহ নয়, মমতা নয় শুধু এক কর্তব্যের অঙ্গীকার যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অস্তিকাও তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করে, তার প্রতিশ্রুতি ও সংকল্পের কথা। ত্বরিতপদে ছুটে এসে অস্তিকা জরৎকারুর পথরোধ ক'রে দাঁড়ায়। জরৎকারুর মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকে—ঋষি।

লজ্জানম্রা নারীর দৃষ্টি নিয়ে নয়, পতিপ্রেমিকা সহজীবনপ্রার্থিনী ভার্যার সেবাকুল দৃষ্টি নিয়ে নয়, যৌবনস্পৃহাও বিবৃত ক'রে নয়, শুধু এক অসংবৃত

নারীদেহ যেন শুধু এক পুরুষদেহের সংসর্গ বরণ করবার জন্য জরৎকারুর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

অস্তিকা বলে—আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়েছেন ঋষি।

জরৎকারু—প্রতিশ্রুতি! কার কাছে?

অস্তিকা—আমার কাছে নয়, আপনার পিতৃসমাজের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে প্রতিশ্রুতি সফল না হওয়া পর্যন্ত অস্তিকার আলিঙ্গনের মধ্যে আপনাকে থাকতে হবে ঋষি।

সন্ধ্যাদীপের আলোকে সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে জরৎকারু তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ ক'রে অস্তিকার হাত ধরলেন।

জরৎকারু কবে চলে গিয়েছেন, কখন চলে গিয়েছেন, কেন চলে গেলেন, নাগরাজ বাসুকি কিছুই জানতে পারেননি। একদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে জাগ্রত নাগপ্রাসাদের এক কক্ষে বসে দূতমুখে যখন সংবাদ শুনলেন, অস্তিকার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে জরৎকারু চলে গিয়েছেন, তখন কিছুক্ষণের মত স্তব্ধ হয়ে রইলেন বাসুকি। মনে হলো, জনমেজয়ের আঘাত আসবার আগেই এই নাগপ্রাসাদ যেন নিজের লজ্জায় অপমানে ও ব্যর্থতায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

অস্তিকা কই? বাসুকি উঠলেন। প্রাসাদের অলিন্দ ও চত্বর পার হয়ে, উপবন-বীথিকার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে এক নিকেতনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন বাসুকি। দগ্ধ ও নির্বাপিত সন্ধ্যাদীপের আধার তখন মসিময় হয়ে পড়েছিল, আর সেই নির্বাপিত ও মসিময় প্রদীপের পাশে নিঃশব্দে বসেছিল অস্তিকা।

বাসুকি ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করেন—জরৎকারু কেন চলে গেলেন অস্তিকা?

অস্তিকা—আমার ভুলে।

হতাশায় আক্ষেপ ক'রে ওঠেন বাসুকি—সব ব্যর্থ ক'রে দিলে ভগিনী অস্তিকা!

অস্তিকা—না ভ্রাতা, সবই সার্থক হয়েছে।

বাসুকির চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—সার্থক? একথার অর্থ?

অস্তিকা—তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন, আমিও আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। জরৎকারুর সন্তানের মাতা হওয়ার দায় আমার জীবনে এসে গিয়েছে, আশীর্বাদ কর।

হর্ষে ও আনন্দে বাসুকির চিত্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অস্তিকাকে আশীর্বাদ ক'রে বাসুকি বলেন—নাগজাতিকে ধ্বংস থেকে তুমিই রক্ষা করলে ভগিনী অস্তিকা, তোমার এই গৌরব অক্ষয় হবে।

আনন্দিতচিত্ত বাসুকি চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অস্তিকাও তার অবসন্ন দেহভার তুলে উঠে দাঁড়ায়। যেন এই সার্থকতা ও গৌরবকে ভাল ক'রে দেখবার জন্যই চারিদিকে তাকায়।

বোধ হয়, তার নিজেরই জীবনের চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখল অস্তিকা। কিন্তু দেখতে পায়, স্বামিহীন এক সংসারের নিকেতনে আজীবন শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তার জীবন। আর, নির্বাপিত সন্ধ্যাদীপের আধারে ঐ যে মসিময় অবলেপ, ঐ তো তার অপমানিত নারীত্বের শ্মশান-ধূমলেখা। শুধু অপমান, শুধু ব্যর্থতা ও অগৌরব।

---

# জনক ও সুলভা

দূরে মিথিলা নগরী, দেখা যায় বিদেহরাজ ধর্মধ্বজ জনকের নিবিড়ধবল প্রাসাদের শিখরকেতন। যেন এই প্রভাতের নবারুণপ্রভা পান করবার জন্য জাগ্রত বিহঙ্গমের মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে পবনাবধূত কেতনের মণিজাল। আর মিথিলার পুরপ্রাকার হতে অনেক দূরে কাননভূভাগের এই নিভৃতে এক কুসুমিত কিংশুকের ছায়ায় অচঞ্চল নেত্রে রক্তলাজানুরঞ্জিত দিগ্‌ললাটের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কাষায়পরিবিহিতা এক সন্ন্যাসিনী, সন্ন্যাসিনী সুলভা।

জানে না সন্ন্যাসিনী সুলভা শেষ নিশীথের শিশিরে অভিষিক্ত কিংশুকের একটি মঞ্জরী কখন বৃন্তচ্যুত হয়ে তারই জটাকীর্ণ রুক্ষ অলকস্তবকের উপর পড়েছে। বুঝতে পারে না সুলভা তার ধ্যাননিস্তিমিত এই দেহের কাষায় আচ্ছাদনের উপর কখন বিন্দু বিন্দু পরাগচিহ্ন অংকিত ক'রে রেখে গিয়েছে কুসুমরজে অন্ধীভূত চপল মধুপের দল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে বনসরসীর তটে এসে দাঁড়ায় সন্ন্যাসিনী সুলভা। তার পরেই অঞ্জলিপুটে সলিল গ্রহণ ক'রে মন্ত্রপাঠের জন্য প্রস্তুত হয়।

উপাসিকা সুলভা মুনিব্রতে দীক্ষিতা সুলভা, সুকঠোর ব্রহ্মচর্যে অভ্যস্তা সুলভা বিগত দশ বৎসর ধরে এইভাবে তার কামনাবিহীন জীবনের প্রতি প্রভাতে মন্ত্রপাঠ ক'রে এসেছে। সংসারনিলয়ের সকল ভোগ স্পৃহা ও অনুরাগের বন্ধন হতে অনেক দূরে সরে গিয়েছে সুলভার জীবন। রাজর্ষি প্রধানের কন্যা সুলভা, ক্ষত্রিয়াণী সুলভা আজ এই পৃথিবীর এক বিষয়রাগ-রহিতা সন্ন্যাসিনী মাত্র। দশ বৎসরের তপঃক্লেশ আর বৈরাগ্যভাবনা রাজতনয়া সুলভার চক্ষুর সম্মুখে এক নূতন জগতের রূপ অপাবৃত ক'রে দিয়েছে। এই জগৎ তৃষ্ণাহীন ও বেদনাহীন এক জগৎ। এখানে সুখবোধ নেই, দুঃখবোধও নেই। উল্লাস নেই, ক্রন্দনও নেই। সর্বত্যাগের আনন্দে অভিমণ্ডিত এই জগতে সুখাসুখ লাভালাভ ও প্রিয়াপ্রিয় জ্ঞানের দ্বন্দ্ব নেই। এই জীবন শুদ্ধ আত্মজ্ঞানের আলোকে ভাস্বরিত জীবন। অখণ্ড প্রশান্তির জীবন। দেহ থাকে, যৌবনও থাকতে পারে, কিন্তু দেহ ও যৌবনের কোন অভিমানের বেদনা এই জীবন্মুক্ত জীবনের প্রশান্তি ক্ষুণ্ণ করতে পারে না।

মোক্ষাভিলাষিণী সুলভার জীবনকে তার এই পরম এষণা অহর্নিশ ব্যাকুল

ক'রে রেখেছে। পরিব্রাজিকা সুলভার জীবনের দশটি বৎসরের প্রতি মুহূর্ত এই আত্মজ্ঞানের সন্ধানে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। অনুভব করেছে সুলভা, এতদিনে যাতনাবিহীন হয়েছে তার এই দেহ, অনেক আকাঙ্ক্ষায় ও অনেক স্পৃহায় একদিন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল যে দেহ ও দেহের কল্লোলিত যৌবন। যেমন নিদাঘ-তপনের খরকিরণের জ্বালা, তেমনি শিশিররজনীর হিমভারপীড়িত বায়ুর দংশন এই দেহে বরণ ক'রে নিয়ে ধ্যানাসনে সুস্থির হয়ে বসে থাকতে পারে সুলভা। তপ্ত রৌদ্র যেন তপ্ত নয়, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাও যেন স্নিগ্ধ নয়। তপ্ততায় আর স্নিগ্ধতায়, রৌদ্রে ও জ্যোৎস্নায় যেন কোন প্রভেদ অনুভব করে না সন্ন্যাসিনী সুলভার দেহ। এই তো সেই দেহ, কিন্তু কল্পনা করতেও বিস্ময় বোধ করে সুলভা, আজ কোথায় গেল রাজপ্রাসাদের স্নেহ ও গর্বে লালিত সেই দেহের বাসনাবিলসিত নিঃশ্বাসগুলি? কে জানে কোথায় চিরকালের মত হারিয়ে গিয়েছে সেই মঞ্জীরিত চরণের চলচঞ্চলতা! এই তো সেই দুই বাহু, কিন্তু কনককেয়ূরে শোভিত হবার জন্য আজ আর এই দুই বাহুতে কোন তৃষ্ণা নেই। শীতল সিতচন্দনের চিত্রকে চিত্রিত হতো যে বক্ষঃফলক, আজ সেই বক্ষঃফলকে তপ্ত বনভূমির ধূলি উড়ে এসে ক্ষতচিহ্ন অঙ্কিত করে। কিন্তু তার জন্য সুলভার মনে কোন ক্লেশ আর কোন দুঃখ জাগে না।

তাই আরও বিস্মিত হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করে সুলভা, তবে সে কি আজ এতদিনে সত্যই এই সংসারের সকল হিমাতপ ক্ষুৎপিপাসা আর কামনাকে পরাজয় করতে পেরেছে? সন্ন্যাসিনীর জীবন কি এতদিনে তার আত্মসম্বোধি খুঁজে পেল? কিন্তু কি আশ্চর্য, নিজেরই মনের এই জিজ্ঞাসার ভাষা শুনে সন্ন্যাসিনী সুলভার মন হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে যায়। যদি সত্যই তৃষ্ণাহীন হয়ে থাকে এই দেহ, তবে শান্ত হয় না কেন এই মন? এই তপঃক্লিষ্ট দেহের দিকে তাকিয়ে আজও কেন হঠাৎ ভয়ে বিহ্বল হয়ে ওঠে উপাসিকার অক্ষিতারকা?

অঞ্জলিপুটে গৃহীত সলিলের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে গিয়ে আজও আর একবার অকস্মাৎ অন্যমনা হয়ে যায় আর মন্ত্র ভুলে যায় সুলভা। অন্যদিনের মত আজও নিজের এই ক্ষণবৈচিত্ত্যের রহস্য বুঝতে না পেরে বিষণ্ণ হয় সুলভা, কিন্তু পরমুহূর্তে চমকে ওঠে।

দেখতে পেয়েছে সুলভা, এইবার বুঝতেও পেরেছে সুলভা, কোথায় আর কেন তার এই দশ বৎসরের কঠোর ব্রহ্মব্রত আর তপশ্চর্যায় গঠিত জীবনে, যাতনাবোধহীন এই বক্ষঃফলকের অন্তরালে একটি বেদনা অভিমানকুণ্ঠিত নিঃশ্বাসের মত লুকিয়ে রয়েছে। সন্ন্যাসিনী সুলভা তার যে হাতে মন্ত্রপূত সলিল ধারণ ক'রে রয়েছে, সেই হাতে অঙ্কিত রয়েছে অতীতের এক ক্ষত-

রেখার চিহ্ন, যেন কমলপত্রের উপর বিগত দিবসের এক করকাশিলার আঘাতের স্মৃতি। দশ বৎসর পূর্বে জীবনের এক আশাভঙ্গের বেদনা সহ্য করতে না পেরে রাজর্ষি প্রধানের কন্যা মানিনী সুলভার অন্তর তার নিজেরই রূপ আর যৌবনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। নিজের হাতের পুষ্পমাল্য নিজেই ছিন্ন ক'রে ভূতলে নিক্ষেপ করেছিল সুলভা! আর, সেই পুষ্পমাল্যও যেন আহত ভূজঙ্গের মত একটি চকিত দংশনে রাজতনয়ার করকমলে রুধিরবিন্দু স্ফুটিত ক'রে ভূতলে লুটিয়ে পড়েছিল। সেই ক্ষত আজ আর নেই, সেই ক্ষতের জ্বালাও কবেই মুছে গিয়েছে, শুধু আছে সেই ক্ষতের একটি স্মৃতিচিহ্নরেখা।

রাজর্ষি প্রধান তাঁর কন্যা সুলভার জন্য বার বার তিনবার স্বয়ংবরসভা আহ্বান করেছিলেন। চন্দ্রোদয়ে বিলোল সমুদ্রোর্মির মত অঙ্গে অঙ্গে যৌবন-কল্লোলিত রূপ আর শোভা নিয়ে কুমারী সুলভা তার জীবনের চিরসঙ্গী আহ্বানের আশায় যে প্রসূনমালিকাকে সাদর চুম্বনে চঞ্চলিত ক'রে রেখেছিল, সেই মালিকা কণ্ঠে ধারণ করতে পারে, এমন কোন যোগ্যজন খুঁজে পেলেন না রাজর্ষি প্রধান। এসেছিল কত শত ক্ষত্রিয়কুমার, রাজর্ষি প্রধানের বিবেচনায় তাদের মধ্যে একজনও কিন্তু তাঁর কন্যা সুলভার স্বয়ংবরসভায় প্রবেশলাভ করারও যোগ্য ছিল না। সুলভার পাণিপ্রার্থী কুমারেরা সুলভার পাণি গ্রহণের অযোগ্য বলে ধিক্কৃত হয়ে স্বয়ংবরসভার প্রবেশপথ হতেই ফিরে গিয়েছিল।

সকলেই অযোগ্য কিন্তু বিদেহরাজ জনক তো অযোগ্য নন। রাজর্ষি প্রধানের কন্যা সুলভার স্বয়ংবরসভার কথা তো তিনিও শুনতে পেয়েছেন। ফুল্লযৌবনা সুলভার সেই রূপের কাহিনী শুনতে পেয়েছেন জনক, যে রূপের প্রভায় রাজর্ষি প্রধানের প্রাসাদের সকল মণিদীপের দ্যুতিও ম্লান হয়ে যায়। সুলভার স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হবার জন্য সাগ্রহ আমন্ত্রণের লিপিও বিদেহ-রাজ জনকের কাছে কতবার প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু আসেননি জনক।

জেনেছে সুলভা, জেনেছেন রাজর্ষি প্রধান, আর যে-ই আসুক, আসতে পারেন না জনক। বিষয়কামনারহিত মোক্ষব্রত নিষ্কাম ও আত্মজ্ঞানী জনক এই জগতের কোন রূপোত্তমা নারীর বরমাল্য লাভের জন্য প্রলুব্ধ হতে পারেন না।

বার বার তিনবার। বৃথাই শুধু প্রতীক্ষা কল্পনা আর হৃদয়চাঞ্চল্য সহ্য করে কুমারী সুলভার হাতের বরণমাল্য। বাষ্পাভিভূত হয় পিতা প্রধানেরও চক্ষু। কিন্তু শুধু বার বার তিনবার, তারপর আর নয়। শেষ স্বয়ংবরসভার শূন্য বক্ষে একাকিনী দাঁড়িয়ে শুধু দেখতে থাকে সুলভা, অপরাহ্ণের আকাশবক্ষ

হতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ক্লান্ত দিবসের সৌরকরপ্রভা; সন্ধ্যার রক্তরাগ ফুটে উঠল শান্ত চিতানলদ্যুতির মত, তার পরেই পৌর্ণমাসী রজনীর পূর্ণ শশধর। কিন্তু মনে হয় সুলভার, তার জীবনের একটি ব্যর্থতার বেদনা যেন পূর্ণকলার রূপ গ্রহণ ক'রে আকাশে ফুটে উঠেছে। বরণমাল্য ছিন্ন ক'রে ভূতলে নিক্ষেপ করে সুলভা। মাল্যসূত্রের খরস্পর্শে ক্ষতাক্ত হয় সুলভার করতল।

রাজর্ষি প্রধান এসে কম্পিতস্বরে প্রশ্ন করেন—এ কি করলে কন্যা?

সুলভা—আর এই বৃথা প্রতীক্ষার জীবন সহ্য করতে ইচ্ছা করে না পিতা।

রাজর্ষি প্রধান অশ্রুসজল চক্ষু তুলে প্রশ্ন করেন—বৃথা প্রতীক্ষা কেন বলছ কন্যা?

সুলভা—বুঝেছি পিতা, আমার অদৃষ্টই চায় যে, আমার হাতের বরণমাল্য যেন আমার হাতেই শুকিয়ে শেষ হয়ে যায়। বার বার তিনবার ব্যর্থ হয়েছে আমার প্রতীক্ষা। আমাকে আর এই উপহাস সহ্য করতে বলবেন না পিতা।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন রাজর্ষি প্রধান। তার পরেই ব্যথিত স্বরে বলেন—তবে তুমি কি চিরকুমারী হয়ে জীবনাতিপাত করতে চাও কন্যা?

সুলভা—হ্যাঁ পিতা।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কি-যেন চিন্তা করতে থাকেন রাজর্ষি প্রধান। পরক্ষণে তার বিষাদমেদুর দুই চক্ষুর দৃষ্টি হঠাৎ দীপ্ত হয়ে ওঠে। রাজর্ষি প্রধান বলেন—আমার কুলযশের কথা তুমি কি জান না কন্যা?

সুলভা—জানি পিতা, আপনি সকল ক্ষত্রিয়ের সম্মান ও শ্রদ্ধার আস্পদ। আপনি রাজর্ষি, আপনার পূর্বপুরুষের অনুষ্ঠিত যজ্ঞকর্মে স্বয়ং সুরপতি ইন্দ্রও উপস্থিত থাকতেন। আমি সেই যজ্ঞনিষ্ঠ ক্ষত্রকুলের কন্যা।

রাজর্ষি প্রধান—কিন্তু সেই বংশের কন্যা যদি চিরকুমারীর জীবন যাপন করে তবে সর্বসমাজে সেই বংশেরই অপযশ প্রচারিত হবে না কি কন্যা?

পিতার প্রশ্ন শুনে অকস্মাৎ সন্ত্রস্তের মত চমকে উঠলেও, ধীর দৃষ্টি তুলে শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করে সুলভা—আপনি কি বলতে চাইছেন পিতা? চিরকুমারী হয়ে বেঁচে থাকার পরিবর্তে আপনার কন্যা যদি এখনি মৃত্যু বরণ করে, তবেই কি আপনার কুলখ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকবে?

রাজর্ষি প্রধান ব্যথাবিব্রত স্বরে বলেন—না কন্যা, তোমার পিতাকে এত নিষ্ঠুর বলে মনে করো না।

অশ্রুপ্লাবিত হয় সুলভার চক্ষু—আমার রূঢ় ভাষণের অপরাধ ক্ষমা করুন

পিতা, এবং আদেশ করুন আমাকে; বলুন, কি করলে আপনার কুলখ্যাতি ক্ষুণ্ণ হবে না।

রাজর্ষি প্রধান বলেন--তুমি আমার কুলখ্যাতি বৃদ্ধি কর কন্যা।

সুলভা—বলুন, তার জন্য কি করতে হবে।

রাজর্ষি প্রধান—তুমি ব্রহ্মব্রত গ্রহণ কর কন্যা। বিষয়সংসর্গ হতে মুক্ত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ কর তুমি। ভবিষ্যতের মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে তোমারই পিতৃকুলের এই সুযশ কীর্তিগাথা হয়ে ধ্বনিত হবে, মোক্ষপথের পথিক হয়েছিল আর আত্মসিদ্ধি লাভ করেছিল ক্ষত্রিয় প্রধানের কুমারী কন্যা ব্রহ্মবাদিনী সুলভা। আমার ইচ্ছা, সাত্ত্বিকা হও তুমি, পরম জ্ঞানে প্রশান্ত হোক তোমার জীবন। সুখাকাঙ্ক্ষারহিত এক জগতের পথে পরিব্রাজিকা হও তুমি।

রাজর্ষি প্রধানের মুখ হতে যেন এক নূতন জীবনের পরিচয়বাণী মন্ত্রধ্বনির মত উৎসারিত হয়ে চলেছে। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে শুনতে প্রসন্ন হয়ে ওঠে সুলভার বিষণ্ণ নয়নের দৃষ্টি। সুলভা বলে—তাই হোক পিতা।

তারপর দীর্ঘ দশটি বৎসর। ব্রহ্মচারিণী সুলভার জীবন তপস্যায় আর পরিব্রজ্যায় অতিবাহিত হয়েছে। তবু আজ বিদেহদেশের এই বনসরসীর জনহীন তটে বসে সুলভা তার অঞ্জলিপুটে গৃহীত সলিলের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখতে পায়, দশ বৎসর পূর্বের সেই ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন ধারণ ক'রে আজও রয়েছে তার করতলের সেই ক্ষতরেখার চিহ্ন, ছিন্ন বরমাল্যের সেই চকিত দংশনের চিহ্ন।

অঞ্জলিপুটে গৃহীত সলিল বনসরসীর বক্ষে নিক্ষেপ ক'রে উঠে দাঁড়ায় সন্ন্যাসিনী সুলভা। কি ভয়ংকর এই চিহ্নের প্রাণ, যে চিহ্ন আজও তার মনের মন্ত্রমালা ছিন্ন ক'রে দেয়! সন্দেহ হয় সুলভার এ কি সত্যই জ্ঞানার্থিকা পরিব্রাজিকার জীবন, অথবা নিজেরই মনের এক অভিমানের বেদনায় সুখের প্রাসাদ হতে পলাতকা এক বনচারিণীর জীবন?

আবার সলিল গ্রহণ করবার জন্য অঞ্জলি প্রসারিত ক'রে বনসরসীর সলিলের দিকে নমিত মস্তকে তাকাতে গিয়েই আর্তনাদ ক'রে ওঠে সুলভা—এ কি?

নিজেরই সুন্দর মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছে সুলভা। কবরীতে কিংশুকমঞ্জরীর গুচ্ছ। সন্ন্যাসিনীর তপঃক্লিষ্ট মুখের প্রতিবিম্ব নয়, যেন এক অভিসারিকার বিহ্বল মুখচ্ছবি বনসরসীর সলিলে ভাসছে। কবরীতে কিংশুকমঞ্জরীর গুচ্ছ পরিয়ে দিয়েছে কে জানে কোন্ ভুলের দেবতা। নিজের দেহের দিকে তাকাতে গিয়ে আরও বিস্মিত হয় সুলভা; সন্ন্যাসিনীর কাষায় বসনের উপর বিন্দু বিন্দু পরাগধূলি চিত্রিত হয়ে রয়েছে।

বিষয়সংসর্গ হতে পলাতকা ও আত্মজ্ঞানসাধিকা এক ব্রহ্মচারিণীর জীবন নিয়ে আজ এই বিদ্রূপের খেলা খেলছে অদৃষ্টের কোন্ অভিশাপ? তাই কি তার জীবন আজও খুঁজে পেল না পরম প্রশান্তি? সত্যই কি, সন্ন্যাসিনী সুলভা আজও কাষায় বসনে আচ্ছাদিত একটি অভিমান মাত্র? জ্ঞানান্বেষিণীর এই দশ বৎসরের পরিব্রজ্যা কি শুধু এক কণ্টকক্ষতবিব্রত অভিসার?

বনসরসীর তট হতে উঠে, ধীরে ধীরে আবার কিংশুকতরুর ছায়ায় এসে দাঁড়ায় সুলভা। বনবিহগের কলকূজনে প্রভাতবায়ু মুখরিত হয়। মনে হয় সুলভার, এই কলকূজন যেন এক আর্তস্বর; যেন এক শমীলতার অন্তরে সুগুপ্ত পাবকশিখার আভাস দেখতে পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে বনভূমি। বুঝতে পারে সুলভা, দশ বৎসর পরে আজ নিজের অন্তরের দিকে তাকাতে গিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে সন্ন্যাসিনীর প্রাণ। পরিব্রাজিকা যেন নিজেরই অজ্ঞাত মনের ইঙ্গিতে অভিসারিকার মত মিথিলা নগরীর উপান্তে এই বনভূভাগের এক কিংশুকের ছায়াতলে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে কেন এসেছে সুলভা? মিথিলা নগরীর নিবিড়ধবল রাজপ্রাসাদের শিখরকেতনের দিকে নিষ্পলক চক্ষু তুলে কেন তাকিয়ে থাকে সুলভা? কেন বার বার অকারণে ধ্যান ভেঙ্গে গিয়েছে? বহু জনপদ, বহু আশ্রম, বহু ঋষিকুটীর, বহু তপোবন আর বহু তীর্থের ভূমি অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হয়েছে যে পরিব্রাজিকার জীবন, তার চরণ কেন বিদেহদেশের এক কিংশুকের ছায়াশ্রয়ে এসে ক্লান্তি বোধ করে?

দুই হাতে অশ্রুসিক্ত নয়ন আবৃত করে সুলভা। বুঝতে পারে সুলভা মিথিলা নগরীর ঐ নিবিড়ধবল প্রাসাদের অন্তর পরীক্ষার জন্য এক অদ্ভুত তৃষ্ণা বক্ষে নিয়ে এই কিংশুকের ছায়ায় সে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ প্রাসাদে বাস করেন বিদেহাধিপতি ধর্মধ্বজ জনক, বেদজ্ঞ ক্ষত্রিয় জনক, মহাত্মা পঞ্চশিখের শিষ্য জনক। সাংখ্যজ্ঞান যোগ ও নিষ্কাম যজ্ঞ, এই ত্রিবিধ মোক্ষতত্ত্ব অবলম্বন ক'রে আর পরব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ ক'রে বিষয়রাগবিহীন নৃপতি জনক বিষয়াদির মধ্যেই বিশুদ্ধ বৈরাগ্য নিয়ে অবস্থান করছেন। তিনি আত্মজ্ঞানী, তিনি বিমুক্ত, তিনি নির্লিপ্ত। ভর্জিত বীজ যেমন সলিলসিক্ত হলেও অঙ্কুর উৎপাদন করে না, জনকও তেমনি বন্ধনের আয়তনস্বরূপ তাঁর এই ধর্মার্থ-কামসঙ্কুল রাজকীয়তার মধ্যেই মুক্তসঙ্গ অবস্থায় জীবনযাপন করছেন।

দেখতে ইচ্ছা করে, এই আত্মজ্ঞানী জনকের বৈরাগ্যভাবনায় অনুলিপ্ত দুটি চক্ষুর রূপ। জানতে ইচ্ছা করে, দিনরজনীর কোন মুহূর্তে কি মনের কোন চিন্তার ভুলে ছিন্ন হয়ে যায় না জ্ঞানী জনকের মন্ত্রমালা? সত্যই কি লোষ্ট্রে ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান লাভ করেছেন বিপুল রত্নের অধিপতি জনক?

কেমন সেই বীতরাগ পুরুষের বক্ষ, যে বক্ষের নিঃশ্বাসে অনুরাগ নেই, ঘৃণাও নেই?

এতদিন বুঝতে পারেনি, আজ বুঝতে পারে সুলভা, আত্মজ্ঞানী জনককে দেখবার জন্য যে দুর্বার কৌতূহল তার তপঃক্লিষ্ট মনের আকাশে সুপ্রভ তারকার মত গোপনে ফুটে উঠেছিল, সে কৌতূহল আজও ফুটে রয়েছে। নৃপতি জনকের জীবনকাহিনী সুলভার কল্পনায় এক অদ্ভুত মোহ সঞ্চারিত করেছে। সিক্ত চক্ষু কাষায় বসনের অঞ্চল দিয়ে মুছে নিয়ে মনে মনে আজ স্বীকার করে সুলভা, জনক নামে একটি জীবনের রূপ দেখবার জন্যই পরিব্রাজিকা সন্ন্যাসিনী আজ অভিসারিকার আগ্রহ নিয়ে বিদেহদেশের এই কিংশুকতরুর আশ্রয়ে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আর দ্বিধা করে না সুলভা। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। পিছনে পড়ে থাকে কিংশুকের ছায়া। নিবিড়ধবল প্রাসাদের শিখরকেতনের দিকে লক্ষ্য রেখে বনপথ অতিক্রম করতে থাকে সুলভা।

যেন দূর কাননের নিভৃত হতে এক স্তবকিত কিংশুকের দ্যুতি মৃদু পবনকম্পনে সঞ্চালিতা হয়ে এই রাজসভাস্থলের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। কাষায় বসনে আবৃতদেহা এক সন্ন্যাসিনী, কিন্তু দেখে মনে হয়, যেন এক কান্তবিয়োগবিধুরা নিশিচক্রবাকীর স্বপ্ন পথ ভুল ক'রে মিথিলাধীশ জনকের এই সভাভবনের অভ্যন্তরে চলে এসেছে।

সন্ন্যাসিনী সুলভা সভাস্থলে প্রবেশ করতেই বিস্ময়াবিষ্ট নেত্রে তাকিয়ে থাকেন নৃপতি জনক। বুঝতে পারেন না, এই নারী সত্যই কি বিষয়রাগ-রহিতা এক সন্ন্যাসিনী, অথবা দয়িতবাহুবিচ্যুতা এক বিরহিণী প্রেমিকা? দীর্ঘকালের তপঃশ্রমের ক্লান্তি অঙ্কিত রয়েছে এই বরযৌবনা নারীর নয়নে, যেন কিরাতধাবিতা কুরঙ্গীর বেদনার্ত নয়ন। জটাকীর্ণ হয়েছে নারীর কুন্তল-কলাপ; কিন্তু এই পরিব্রাজিকার পথক্লেশে অভিভূত দুই চরণের নখমণি হতে যেন জ্যোৎস্না স্ফুরিত হয়। মনে হয় এক আতপতাপিতা কেতকীর দেহ স্নিগ্ধ ছায়ার অনুসন্ধানে এই পৃথিবীর পথে ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে, দিশা হারিয়ে, আর ভুল ক'রে এই সভাস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিনয়নম্র বচনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জনক। স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন ক'রে আগন্তুকার পরিচয় জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।—মনে হয় আপনি সকল ভোগসুখস্পৃহা বর্জন ক'রে আত্মজ্ঞানের সন্ধানে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন। বলুন, বিদেহাধিপতি জনকের এই রাজসভাস্থলে আপনার শুভাগমনের হেতু কি?

সুলভা বলে—আপনাকে দেখবার ইচ্ছা।

বিব্রত বোধ করেন জনক—আপনার এই ইচ্ছারই বা হেতু কি?

সুলভা—আমার মনের একটি আশা সফল হবে, এই বিশ্বাস নিয়ে আপনাকে দেখতে এসেছি মিথিলেশ রাজর্ষি।

জনক বিস্মিত হয়ে বলেন—আমাকে দেখে আপনার মনের একটি আশা সফল হবে, আপনার মনে এ কেমন বিচিত্র ভাবনা সন্ন্যাসিনী!

সুলভা—আত্মজ্ঞানী জনকের, মোক্ষধর্মানুব্রত জনকের বৈরাগ্যভাবিত দীপ্ত নয়নের দৃষ্টি দেখে শুধু বিস্মিত হয়ে আমি ফিরে যেতে চাই। আর কোন ইচ্ছা নিয়ে আপনার সমীপে আসেনি এই পরিব্রাজিকা সন্ন্যাসিনী।

নৃপতি জনক প্রশ্ন করেন—আপনার মনে কি কোন সংশয় আছে যে, মিথিলাপতি জনকের জীবন সত্যই বাসনাবিহীন বিমুক্তের জীবন নয়?

সুলভা—সন্দেহ করতে ইচ্ছা করে না বিদেহরাজ।

নৃপতি জনক বলেন—আপনার এই কথাই প্রমাণিত করছে যে, আপনার মনে সন্দেহ আছে।

ভাববিচলিত সাগ্রহ স্বরে অনুরোধ করে সুলভা।—সন্ন্যাসিনীর সেই সন্দেহ দূর ক'রে দিন নৃপতি জনক।

যেন ক্লান্ত জীবনের ভার নিবেদন করছে সুলভা। কি-এক গূঢ় বেদনায় বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে নৃপতি জনকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সন্ন্যাসিনী সুলভা। যেন জনকের ঐ বিশাল বক্ষঃপটের উপর লুটিয়ে পড়ে শান্ত হতে চায় সুলভার জটাকীর্ণ কুন্তলের বেদনা। কামনাবিহীন ঐ জ্ঞানীর বদনসন্নিধানে গিয়ে আত্মহারা হতে চায় সুলভার অধরসুষমা। দেখে মনে হয়, অকস্মাৎ এক প্রণয়মহোৎসবের উচ্ছ্বাস এসে শিহরিত করেছে সন্ন্যাসিনীর কাষায় বসনের অঞ্চল। দশ বৎসর পূর্বের এক পৌর্ণমাসী সন্ধ্যার একটি তৃষ্ণা যেন অদৃশ্য বরমালোর মত সুলভার হাতে চঞ্চল হয়ে দুলছে। স্বয়ংবরা নায়িকার মত প্রেমবিধুর নেত্রে জনকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুলভা।

মুগ্ধ জনকের বিবশ দৃষ্টি হঠাৎ চমকে ওঠে। সন্ত্রস্তের মত বিচলিত কণ্ঠস্বরে যেন প্রচ্ছন্ন এক ভৎর্সনার ভাষা ধ্বনিত করেন জনক।—এ কি সন্ন্যাসিনী, এ কেমন আচরণ?

সুলভা—আপনি বিচলিত হলেন কেন নৃপতি জনক?

জনক—আমার সন্দেহ হয় সন্ন্যাসিনী, তুমি সন্ন্যাসিনী নও।

নৃপতি জনকের এই ভৎর্সনাকে প্রশান্ত চিত্তে বরণ ক'রে নেবার জন্যই নীরবে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে সুলভা। নিজের হৃদয় সম্বন্ধে সুলভার মনে আর কোন সন্দেহ নেই। উপলব্ধি করেছে সুলভা সন্ন্যাসিনী সুলভার

এই জীবন এক সবাসনা অভিসারিকার জীবন মাত্র। সুলভার এই প্রাণ এক পরমার্থিকার প্রাণ নয়, জগতের এক প্রেমার্থিকা নারীর প্রাণ মাত্র। দীর্ঘ দশ বৎসর ধ'রে কাষায় বসনের বন্ধনের বেদনায় শুধু নীরবে আর্তনাদ করেছে এক ছিন্ন বরমাল্যের অভিমান। ভৎসনা নয়, যেন এক অতি কঠোর সত্যের ঘোষণাকে অন্তরের সকল তৃষ্ণা নিয়ে স্নিগ্ধ আশীর্বাণীর মত গ্রহণ করছে সুলভা। নিজের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে সুলভা ভালই হয়েছে। আরও ভাল লাগে, ঐ কান্তিমান সৌম্য ও সত্তম পুরুষের বিস্মিত দুটি সুন্দর চক্ষুর কাছে নিজেকে ধরা পড়িয়ে দিতে।

সুলভা বলে—আপনার সন্দেহ মিথ্যা নয় নৃপতি জনক। কিন্তু সে সন্দেহে বিচলিত হবে কেন বিমুক্ত মোক্ষধর্মানুব্রত আত্মজ্ঞানী জনকের মন

নীরব হন জনক, তার পর শান্তভাবে সুলভার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন। -আপনি ঠিকই বলেছেন সন্ন্যাসিনী, কিন্তু আমার অনুরোধ, আপনি বিদায় গ্রহণ করুন।

সুলভার অধরে সুন্দর হাস্যরেখা শিহরিত হয়ে ফুটে ওঠে।—আমার সান্নিধ্যকে এত ভয় কেন নৃপতি জনক? লোষ্ট্রে ও কাঞ্চনে যার সমজ্ঞান, সে কেন এক প্রগল্‌ভা নারীর চোখের দৃষ্টিকে এত ভয় করবে? আপনার মনে এই বিকার কেন অবিকারহৃদয় আত্মজ্ঞানী?

কি কঠোর ভর্ৎসনা! সুলভার সুন্দর হাস্যবিভ্রমে শিহরিত এই প্রশ্নের আঘাতে যেন ক্ষণতরে আর্ত হয়ে যায় নৃপতি জনকের বক্ষের স্পন্দন। কে এই নারী যে আজ বিপুল কৌতুকমদে মত্তা হয়ে নৃপতি জনকের বক্ষের নিভৃতে সঞ্চিত আত্মবিশ্বাসের তন্তুগুলি ছিন্ন-ভিন্ন করছে? কে এই নিরপত্রপা, যে আজ প্রেমাভিলাষিণী নায়িকার মত মদাঞ্চিত লাস্যে অধরদ্যুতি বিকশিত ক'রে জনকের অন্তরপটে মনোহারিণী মোহচ্ছবি মুদ্রিত ক'রে দিচ্ছে? এ কি এক মায়াবিনীর মায়াকেলি, অথবা, এক সাত্ত্বিকার যোগবলের লীলা? অনুভব করেন জনক, তাঁর দুই চক্ষুর দৃষ্টিকে মুগ্ধ করেছে, তাঁর কল্পনাকে অভিভূত করেছে, তাঁর বাসনাবর্জিত চিত্তের শূন্য গহনে কামনাময় পরাগধূলির ঝটিকা সঞ্চারিত করেছে এই নারী।

সুলভার নিকটে এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে জনক বলেন—আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর কাষায়পরিহিতা কামিনী।

সুলভা—বলুন নৃপতি জনক।

জনক—তোমার এই ভয়ংকর মায়াকৌতুক প্রত্যাহার ক'রে শান্তচিত্তে বিদায় গ্রহণ কর।

সুলভা—আপনি কি আমাকে শান্তচিত্তে বিদায় দিতে পারবেন নৃপতি জনক?

জনক বলেন—অবশ্যই পারব।

সুলভা—তবে বিদায় নিলাম নৃপতি।

চলে যেতে থাকে সুলভা। হ্যাঁ, বিশ্বাস করে সুলভা, শান্তচিত্তে সুলভাকে বিদায় দিতে পারবেন জনক, কারণ শান্তি আছে জনকের মনে। নিজেকে এখনও চিনতে পারেননি এই আত্মজ্ঞানী, এবং নিজেরই হৃদয়ের এক অন্ধকারের সান্ত্বনায় শান্ত হয়ে রয়েছেন।

জনক বলেন—তুমি বলে যাও, কোন দুঃখ রইল না তোমার মনে?

থমকে দাঁড়ায়, হেসে ফেলে সুলভা—আবার এই প্রশ্ন কেন মিথিলেশ? এ যে প্রেমিকোচিত হৃদয়ের কৌতূহল, এ যে প্রণয়ানুরাগী পুরুষের মুখের ভাষা!

নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন জনক, এবং সন্ন্যাসিনী সুলভা ধীরে ধীরে সভাস্থল হতে অগ্রসর হয়ে ভবনোপবনের বীথিকার নিকটে এসে দাঁড়ায়। নিঃশব্দে শুধু তাকিয়ে দেখতে থাকেন জনক। কাষায় বসনে আবৃতদেহা কে ঐ নারী, কিংশুকমঞ্জরীর দ্যুতি দিয়ে রচিত যার মুখরুচি? বিহ্বল নয়নভঙ্গীর মায়া বিচ্ছুরিত ক'রে চলে গেল নারী, কিন্তু জেনে গেল না, তাকে বিদায় দিতে গিয়ে মহাত্মা পঞ্চশিখের শিষ্য ও তত্ত্বজ্ঞ এই জনকের হৃৎপিণ্ডের নিভৃতে সত্যই অদ্ভুত এক বেদনা বেজে উঠেছে।

—শুনে যাও রহস্যময়ী! সভাস্থল হতে ছুটে বের হয়ে উপবনের বীথিকার দিকে তাকিয়ে আহ্বান করেন জনক। দাঁড়ায় সুলভা। যেন এই ব্যাকুল আহ্বানের অর্থ বুঝবার জন্য মুখ ফিরিয়ে তাকায়। নৃপতি জনক ব্যস্তভাবে নিকটে এসে দাঁড়িয়ে অপরাধীর মত কম্পিতকণ্ঠে বলেন—বিদায় নেবার আগে জেনে যাও নারী, তোমাকে আমি শান্তচিত্তে বিদায় দিতে পারছি না।

চকিতস্মিতা বিদ্যুল্লেখার মত খরহাস্যপ্রভায় দীপ্ত হয়ে ওঠে সুলভার নয়ন কপোল ও চিবুক। অভিসারিকার অন্তর যেন এতদিনে তার অন্বেষণার শেষ খুঁজে পেয়েছে। দশ বৎসর পূর্বের একটি দিবসের ছিন্ন পুষ্পমাল্যের দংশন যে-বেদনার চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে দিয়েছিল কুমারী সুলভার মনে, নৃপতি জনকের বেদনাবিধুর কণ্ঠের এই একটি আবেদনের স্পর্শে সেই চিহ্ন মুছে গেল।

আশা সফল হয়েছে সুলভার। আর কোন দুঃখ নেই সুলভার মনে। নিজের এই দেহের দিকে তাকাতে আর ভয় করে না। এতদিনে পরিব্রাজিকার পথের বাধা দূর হয়ে গেল। আজ এইখানে এই জ্ঞানীর পায়ের কাছে তার অন্তরের তৃষ্ণার বোঝা নামিয়ে দিয়ে মুক্ত হতে পারবে সুলভা। এইবার

একেবারে রিক্ত হয়ে সংসারবাসনার সীমা ছাড়িয়ে চিরকালের মত চলে যেতে পারবে সুলভা।

প্রশ্ন করেন জনক—তোমার পরিচয় জানতে চাই রূপোত্তমা।

সুলভা—আমি রাজর্ষি প্রধানের কন্যা কুমারী সুলভা।

জনকের কণ্ঠস্বরে দুঃসহ বিস্ময় চমকে ওঠে।—তুমি!

সুলভা—হ্যাঁ জনক।

ব্যথার্তস্বরে প্রশ্ন করেন জনক—ক্ষত্রিয়াণী সুলভা, তুমি বৃথা কেন সন্ন্যাসিনীর জীবন গ্রহণ করলে?

সুলভা—সন্ন্যাসিনীর জীবন আজও গ্রহণ করতে পারিনি. কিন্তু পারব যদি আপনি আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করেন ক্ষত্রিয়োত্তম জনক।

অপরাহ্নের সূর্য ধীরে ধীরে অস্তাচলে অদৃশ্য হয়ে যায়। উপবনের লতাপ্রতানের উপর স্নিগ্ধ রশ্মি সম্পাত করে পৌর্ণমাসী সন্ধ্যার চন্দ্রমা। সুলভার মুখের দিকে অপলক চক্ষুর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আহ্বান করেন জনক।—সুলভা! বল. কি তোমার অনুরোধ?

সুলভা—আপনার বক্ষের সান্নিধ্য চাই।

চমকে ওঠেন জনক -আমার বক্ষের সান্নিধ্য?

সুলভা -হ্যাঁ নৃপতি জনক। আপনার বক্ষের স্পর্শ নয়, শুধু সান্নিধ্য।

জনক-- এ কি সন্ন্যাসিনীর জীবনের অভিলাষ?

সুলভা -প্রেমিকার জীবনের অভিলাষ।

জনক--সে অভিলাষ আমার কাছে নিবেদন ক'রে কি লাভ হবে তোমার?

অকস্মাৎ যেন কঠোর হয়ে ওঠে সুলভার কণ্ঠস্বর—শুধু আমার লাভ নয় মিথিলেশ. তোমারও লাভ হবে।

চকিত আঘাতে সন্ত্রস্ত হয়ে এক পদ পিছনে সরে গিয়ে কঠোরভাষিণী সুলভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন জনক। দেখতে পান. সুলভার দুই নয়ন কৌমুদীধারার মত সুতরল জ্যোতিঃসুধা উৎসারিত ক'রে হাসছে।

সুলভা বলে—তোমারও লাভ হবে আত্মজ্ঞানের অভিমানে আবৃত হে পুরুষসুন্দর। বুঝতে পারবে. তোমার ঐ মোক্ষব্রতকঠিন অন্তরের কোনখানে বাসনার অবলেশ আছে কি না-আছে। জানতে পারবে. আত্মপর প্রভেদবুদ্ধি যদি কোন মোহ তোমার জীবনে লুকিয়ে রেখে থাকে।

উত্তর দেন না নৃপতি জনক। এই কুহকিনী নারীর ধিক্কার স্তব্ধ ক'রে দেবার মত যুক্তি আর শক্তি হারিয়ে মূক হয়ে গিয়েছেন জনক।

অকস্মাৎ উচ্ছল অশ্রুর বাষ্পে সিক্ত হয়ে যায় সুলভার নয়নজ্যোৎস্না। সুলভা বলে—শূন্য মন্দির দেখতে পেলে ভিক্ষুক যেমন ভিতরে প্রবেশ ক'রে

নিশিযাপন করে, আমিও তেমনি আপনার ঐ বক্ষোনিলয়ের আশ্রয়ে এই পৌর্ণমাসী রজনী যাপন করব নৃপতি জনক।

এগিয়ে আসে সুলভা। জনকের বক্ষঃসন্নিধানে এসে প্রভাপুলকিত নয়নে অদ্ভুত এক তৃষ্ণা উদ্ভাসিত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে সুলভা, যেন এক সৌম্য মেঘের বক্ষের কাছে সহচরী বিদ্যুল্লেখা এসে দাঁড়িয়েছে।

পৌর্ণমাসী রজনীর আকাশে হিমকর ভাসে। একে একে ক্ষয় হতে থাকে সময়ের পল অনুপল ও বিপল। সুলভার মুখের দিকে নিমেষবিহীন দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন জনক। সন্ন্যাসিনী সুলভা নয়, মোক্ষব্রত জনক নয়, যেন প্রেমিক ও প্রেমিকা এক চন্দ্রিকাস্নাত লতাপ্রতানের নিভৃতে শুভমিলন-বাসর যাপন করছে।

নেই চন্দনের অনুলেপন, নেই কুঙ্কুমের চিত্রক, তবু নববধূর মুখের মতই সুস্মিত হয়ে ফুটে উঠেছে সন্ন্যাসিনী সুলভার তপঃক্লিষ্ট মুখশোভা। সহসা, যেন বিপুল পিপাসাভারে শিহরিত হয়ে নৃপতি জনকের অধর চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সুলভা বলে—না নৃপতি জনক, ভুল করবেন না।

নিরুত্তর জনক ব্যথিতভাবে তাকিয়ে থাকেন। সমব্যথিনীর মত নম্র কণ্ঠস্বরে সুলভা বলে—আমার এই দেহে কোন তৃষ্ণা নেই নৃপতি জনক। তৃষ্ণা ছিল মনে সে তৃষ্ণা আজ মিটে গেল আপনার এই বক্ষের সন্নিধানে এসে, আর আপনারই চক্ষুর প্রেমবিহ্বল দৃষ্টি বরণ ক'রে।

উপবনতরুর পল্লবঘন অন্তরাল হতে কোকিলনাদ উত্থিত হয়ে নিশীথ বায়ুর তন্দ্রা ভেঙ্গে দেয়। নৃপতি জনকের দুই বাহু সহসা যেন অসহ ঔৎসুক্যে অস্থির হয়ে সুলভার কণ্ঠে আলিঙ্গন দানের জন্য উদ্যত হয়।

পিছিয়ে সরে যায় সুলভা—ভুল করবেন না জনক।

জনকের বক্ষের নিঃশ্বাস যেন ক্ষোভিত স্বরে আর্তনাদ করে—সত্যই তোমাকে চিনতে পারলাম না মায়াকুতুকিনী সকঠোরা নারী।

জীবনসহচরীর মত সৌহার্দ্য-ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে শান্তস্বরে প্রশ্ন করে সুলভা—কিন্তু নিজেকে এখনও কি চিনতে পারবেন না নৃপতি জনক?

জনকের দুই বাহুর চাঞ্চল্য সহসা সন্ত্রাসিত হয়। সুলভার প্রশ্নের ধ্বনি যেন এক বজ্রের নির্ঘোষ। স্তব্ধ হয়ে নীরবে শুধু তাকিয়ে থাকেন জনক।

হ্যাঁ, এতক্ষণে জ্ঞানী জনকের ভুল ভেঙ্গেছে। এতক্ষণে নিজেরই দুই চক্ষুর চকিতাহত দৃষ্টি দিয়ে আজ নিজেকে দেখতে পেয়েছেন জনক, শুধু মোক্ষব্রতের এক ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে মিথ্যা সন্তোষের জীবন যাপন করছেন জনক। আত্মজ্ঞানের অহংকারকেই এতদিন আত্মজ্ঞান বলে যে মোহ পোষণ

করেছিলেন জনক, সেই মোহ চূর্ণ ক'রে দিল সুলভা, নৃপতি জনকের কল্যাণকারিণী বান্ধবী সুলভা।

সুলভা বলে—ঐ দেখুন নৃপতি জনক পৌর্ণমাসী রজনীর চন্দ্র অস্তাচলে মিলিয়ে গিয়েছে।

চন্দ্রাস্তবিধুর দিগ্‌বলয়ের দিকে বিষাদালস দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন জনক। কিন্তু সুলভা তার সুন্দর অধরে যেন স্নিগ্ধ এক সান্ত্বনা সুস্মিত ক'রে বলে—এই বিষাদ বর্জন করুন জনক। ভুল ভেঙ্গে গেল আপনার, ভুল ভেঙ্গে গিয়েছে আমার। দু'জনেরই জীবনের পরম অন্বেষণার পথে শুভ্র ধূলির আড়ালে একটি মায়াভীরু বাসনার কাঁটা লুকিয়ে ছিল, সেই কাঁটা [illegible] ভেঙ্গে গেল নৃপতি জনক।

ধীরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জনকের দুই চক্ষু। সুস্মিত ও শান্ত দৃষ্টি নিয়ে সুলভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন জনক। এবং জনকের সেই সুস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে যেন দিব্য এক প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত হয় সুলভারও আননশোভা। হ্যাঁ, এক পরম অন্বেষণার সাধনায় দুটি জীবনের ভুল-ভাঙ্গা মূর্তি এতক্ষণে সত্যই বান্ধব আর বান্ধবীর মত দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সুলভা - এইবার আমাকে শান্তচিত্তে বিদায় দিন জনক।

জনক বলেন—বিদায় দিলাম বান্ধবী।

চলে গেল সুলভা। দেখতে থাকেন জনক, পৌর্ণমাসী রজনীর শেষ যামের চন্দ্রের মত ধীরে ধীরে ছায়াময় কাননের প্রান্তরেখার অন্তরালে মিলিয়ে যাচ্ছে সন্ন্যাসিনী সুলভা।

# দেবশর্মা ও রুচি

পাষাণের প্রাচীর দিয়ে নয়, শুধু পর্ণতরুর ছায়া আর শ্যামলতা দিয়ে বেষ্টিত এক সুন্দর গৃহনীড়। তবু দেবশর্মার এই সুন্দর গৃহনীড়ই ঋষিপত্নী রুচির কাছে কারাগারের মত দুঃসহ মনে হয়। এক বনমৃগীর উদ্দাম স্বপ্নকে যেন এখানে খর কণ্টকশরের প্রাকার দিয়ে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে। রুচি মনে করে, ছায়াময় গৃহনীড় নয়, দেবশর্মার এই সংসার যেন ক্ষুদ্র এক মরুখণ্ড: শুধু জ্বালা আর উত্তাপ। নেই সজল বর্ষণ, নেই গোধূলি, নেই জ্যোৎস্না, নেই কুহেলিকার সুখমন্থর তন্দ্রা। বৃথা এই স্বর্ণবর্ণ কেতকীর সৌরভবিলাস, বৃথা মেঘমেদুর মধ্যাহ্নের এই নীপরজ ও নবজলকণার উৎসব। সন্ধ্যার মল্লিকা ফোটে অকারণে, শালনির্যাসের গন্ধভারে মন্থরিত প্রভাতবায়ু বৃথা ছুটাছুটি করে। ব্যর্থ জীবন, ব্যর্থ যৌবন। প্রতি মুহূর্তের অনাদরে সুন্দরাঙ্গনা রুচির যৌবনের অনঙ্গমাধুরী এখানে যেন অবমানিত হয়। প্রতি মুহূর্তের মরুজ্বালায় এক তরুণী নারীর শত কামনার পুষ্পদল শুকিয়ে আর পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। দুঃসহ এই নিষ্ঠুর বন্ধন। মুক্তি খোঁজে রুচি।

স্বামীকে ভালবাসতে পারেনি রুচি। কেন ভালবাসবে, তার কারণও খুঁজে পায় না। দেবশর্মার এই ক্ষুদ্র গৃহনিকেতনের বাইরে কত তরুণের মুগ্ধচক্ষুর দৃষ্টি তাকে যে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, সেকথা জানে রুচি। রূপোত্তমা নামে এত বড় লোকখ্যাতি লাভ করেছে যে নারী, শ্রেষ্ঠ রূপবানের পাশেই তার জীবনের স্থান হওয়া উচিত। এই ধারণা শুধু রূপস্তাবক লোকসমাজের ধারণা নয়। রুচি নিজেও মর্মে মর্মে বিশ্বাস করে এই সত্য। এরই নাম বুঝি ইন্দ্রমায়া।

হ্যাঁ, রুচির হৃদয় ইন্দ্রমায়ায় অভিভূত হয়েছে। জীবনের কামনাকে ক্রীতদাসীর মত দেবশর্মা নামে ঐ রূপযৌবনহীন এক অকিঞ্চন পুরুষের পদপ্রান্তে অবনত ক'রে রাখতে চায় না রুচি। এই জীবন হবে চির অভিসারের এক অবারিত উল্লাসের বীথিকা, যার প্রতি ছায়াকুঞ্জের অভ্যর্থনায় তরুণী নারীর সত্তা নিত্য নবতর মিলন অন্বেষণ ক'রে ফিরবে! প্রেমের জীবন হবে অবিরল উৎসবের মত। প্রেমের জীবনে বন্ধন বলে যদি কিছু থাকে, সে বন্ধন হবে কুসুম-মালিকার সূত্রের মত; এবং কুসুম হবে সেই কুসুম, পুষ্পধন্বার

তূণীর হতে বিহ্বল কামনার পরাগ নিয়ে ছুটে যায় আর লুটিয়ে পড়ে যে কুসুম, এই জগতের যৌবনান্বিত সকল প্রাণের উপর।

তাই, মুক্তি খোঁজে রুচি। উটজদ্বারের কাছে এক সপ্তপর্ণীর অঙ্গে অঙ্গভার সঁপে দিয়ে যেন কারও প্রতীক্ষায় দূর পথপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে থাকে রুচি।

এই প্রতীক্ষার অর্থ জানেন দেবশর্মা। পরপ্রণয়িনী রুচির অন্তরাত্মা কেন এই পথের ধ্যানে ডুবে রয়েছে, তার রহস্য দেবশর্মার কাছে অজানা নয়। প্রভাতের কুহেলিকার অন্তরালে এই পথে এক সুন্দরদর্শন প্রণয়ী ক্ষণকালের মত দেখা দিয়ে সরে যায়। স্মিত জ্যোৎস্নার ধারাস্নাত রজনীর প্রতি প্রহরে এই পথেই তার পদধ্বনি শোনা যায়; কিন্তু তাকে দেখা যায় না। এক অশরীরী প্রলোভ যেন অস্থির হয়ে কা'কে অন্বেষণ ক'রে ফিরছে। কত ছদ্মরূপে সে মায়াবী আসে আর যায়। ঐ নবকাশ বনে তাকে দেখা যায়, শ্বেতবাসে সজ্জিত তার অঙ্গ, দূরে সপ্তপর্ণীতলে যেন সুচিত্রিত এক নারীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেবশর্মা তাকে চেনেন, তার নাম পুরন্দর। তারই অনুরাগে প্রতিমুহূর্ত উন্মনা হয়ে আছে রুচি।

ক্ষমা করতে পারেননি দেবশর্মা। ইন্দ্রমায়ায় চঞ্চল এই প্রগল্‌ভ-যৌবনা নারীকে সতর্কতার এক পাষাণপ্রাচীর দিয়ে কঠোরভাবে বন্দী ক'রে রাখতে চান। প্রত্যেক মুহূর্তের উপর যেন শাসন স্থাপিত ক'রে রেখেছেন দেবশর্মা। সুযোগ পায় না মায়াবী পুরন্দর, সুযোগ পায় না রুচি।

বনমৃগীর এই উদ্দাম স্বপ্নকে এত সতর্কতা দিয়ে বেঁধে রাখবার প্রয়োজন কি? মুক্ত ক'রে দিলেই তো পারেন দেবশর্মা। কিন্তু পারেন না মন চায় না। তাঁর স্বামিত্বের অধিকারকেই চরম ঘৃণায় তুচ্ছ ক'রে দিয়েছে রুচি, কিন্তু হেরে গিয়েও যেন হার মানতে চান না দেবশর্মা। পুরন্দরের লালসার অভিসন্ধি প্রতিরোধ করবার জন্য যেন এক কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছেন।

সপ্তপর্ণীর ছায়াতলে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না রুচি। দেবশর্মার কঠোর আহ্বানে কুটীরের অভ্যন্তরে চলে যেতে হয়। কখনও বা সরোবরের সোপানের উপর বসে হিল্লোলিত রক্তকোকনদের দিকে তাকিয়ে থাকে রুচি। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, দেবশর্মা এসে বাধা দেন আর ডেকে নিয়ে যান। মধ্য-নিশীথে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় সুপ্তোত্থিত রুচি মুক্তকপাট বাতায়নের নিকট এসে দাঁড়ায়। দেবশর্মা উঠে এসে বাতায়ন রুদ্ধ ক'রে দিয়ে চলে যান।

রুচির অন্তরাত্মায় বিদ্রোহ জাগে। মুছে ফেলে অঙ্গরাগ, কবরীমাল্য দূরে নিক্ষেপ করে। যেন নির্মম আক্রোশের বশে এক রূপের লতিকা নিজ দেহেরই উপর কণ্টকক্ষত বর্ষণ করে। তবু বিচলিত হন না দেবশর্মা।

কিন্তু মাঝে মাঝে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েন দেবশর্মা। বড় অর্থহীন এই

সংগ্রাম। রুচি তাঁকে ভালবাসে না, ভালবাসবে না, ভালবাসতে পারে না; কারণ প্রেমকে রূপযৌবনের উৎসব বলে মনে করেছে রুচি। তৃপ্ত কামনার সুখময় বন্ধন ছাড়া পুরুষের কাছে আর কোন বন্ধন স্বীকার করতে চায় না এই নারী।

গর্ব করবার মত রূপ নেই, যৌবনও নেই দেবশর্মার; তবু রুচি নামে এই বিপুলযৌবনা নারীকে কেন যেন ভাল লাগে। আশ্চর্য হন দেবশর্মা, তাঁর নিজেরই মনের এই রহস্য বুঝে উঠতে পারেন না। তাই বোধহয় হেরে গিয়েও হার মানতে চান না। রুচি মুক্তি খুঁজলেও তিনি মুক্তি দিতে পারেন না।

যজ্ঞের নিমন্ত্রণে একটি দিনের মত বাইরে যেতে হবে, বিমর্ষ হয়ে বসেছিলেন আর ভাবছিলেন দেবশর্মা। প্রতি মুহূর্তে শুধু এক পরপ্রেমিকা নারীর প্রতিটি আকুলতাকে বাধা দিয়ে দিয়ে অর্থহীন জীবনের অনেকগুলি দিন কেটে গিয়েছে। বড় জ্বালা ও বড় বেশি অপমানে ভরা অনেকগুলি দিন। তবু আজ প্রবাসে যাবার সময় বুঝতে পেরে বিস্মিত হন দেবশর্মা, তাঁর সমস্ত অন্তর বেদনায় ভরে উঠেছে। দেবশর্মা জানেন, ফিরে এসে এই জ্বালাভরা দিনগুলিকেও আর ফিরে পাবেন না। মুক্তির সুযোগ পেয়ে যাবে রুচি। বনমৃগীর উদ্দাম স্বপ্ন অবাধ আনন্দে এই আশ্রমের শান্ত ও শ্যামল ছায়ার সব দুর্বল বাধা ছিন্ন ক'রে চলে যাবে। সার্থক হবে রুচির ইন্দ্রমায়া, সফল হবে পুরন্দরের অভিসার।

অনেকক্ষণ ধ'রে নিবিড় চিন্তার মধ্যে যেন একটি পথ খুঁজতে থাকেন দেবশর্মা। চলে যাবার সময়ও নিকট হয়ে আসছে। দেবশর্মা ব্যস্তভাবে ডাকলেন- বিপুল।

উপাধ্যায়ের এই ব্যস্ত আহ্বান শুনতে পেয়ে পাঠগৃহ থেকে অধ্যয়নরত শিষ্য বিপুল সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

দেবশর্মা বলেন—মাত্র একটি দিনের জন্য যজ্ঞের নিমন্ত্রণে আমাকে বাইরে যেতে হবে বিপুল। কিন্তু যেতে মন চাইছে না।

দেবশর্মার কণ্ঠস্বরে বড় বেশি বেদনার সুর ছিল। বিপুলও সমবেদনার সুরে প্রশ্ন করে—কেন গুরু?

চুপ ক'রে থাকেন দেবশর্মা। যেন বহু দ্বিধা ও লজ্জার মধ্যে তাঁর মুখের ভাষা পথ হারিয়ে ফেলেছে। বিপুলেরই সাগ্রহ এবং বারংবার অনুনয়ে মনের ভার যেন একটু লঘু হয়ে ওঠে। দেবশর্মা বলেন—তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে বিপুল।

- অনুরোধ নয় গুরু, বলুন নির্দেশ।

—প্রতিশ্রুতি দিতে হবে বিপুল, আমার সেই নির্দেশ তুমি পালন করবে।

—সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েও পালন করব গুরু।

দেবশর্মা শান্তভাবে বলেন—তুমি জান বিপুল, রুচি আমাকে ভালবাসে না?

চমকে ওঠে বিপুল—না গুরু, এই প্রথম শুনলাম।

দেবশর্মা—তুমি জান, ইন্দ্রমায়ায় পড়েছে রুচি, পুরন্দরকে সে ভালবাসে?

ব্যথিতভাবে তাকিয়ে থাকে বিপুল, গুরুর এই অপমানের জ্বালা শিষ্যের অন্তরেও যেন বেদনা সৃষ্টি করে।—এই প্রথম জানলাম গুরু।

দেবশর্মা—পুরন্দরের প্রতীক্ষায় পথের দিকে তাকিয়ে আছে রুচির মনের সর্বক্ষণের ভাবনা। আমি সেই পথে পাষাণপ্রাচীরের মত শুধু বাধা তুলে দিয়ে বসে আছি। জানি না, কেন তাকে এত বাধা দিই, কেন এত কঠোর বন্ধনে তাকে রুদ্ধ ক'রে রাখি।

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থেকে দেবশর্মা আবার ধীর স্বরে বলতে থাকেন—কিন্তু, আজ আমাকে প্রবাসে যেতে হবে। ফিরে এসে এই গৃহে আর যে রুচিকে দেখতে পাব, বিশ্বাস হয় না বিপুল।

বিপুল—আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম গুরু, আপনি যতদিন না ফিরে আসেন, কোন পুরন্দরের ইন্দ্রমায়া আমার গুরুপত্নীর দেহ স্পর্শ করতে পারবে না।

দেবশর্মাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ায় বিপুল। দেবশর্মা চলে যান।

রুদ্ধ হলো বিপুলের পাঠগৃহের দ্বার। ক্ষান্ত হলো অধ্যয়ন। দেবশর্মা চলে যেতেই অপূর্ব অদ্ভুত এক দায় স্মরণ ক'রে শঙ্কিত হয়ে ওঠে তরুণ ব্রহ্মচারী বিপুল।, পৃথিবীর কোন গুরুভক্ত শিষ্যকে এমন গুরুভার দায় নিতে হয়েছে, এমন কাহিনী কোন পুরাণে পাঠ করেনি বিপুল।

পরপ্রণয়িনী এক নারীর কামনাকে প্রহরীর মত সদাজাগ্রত ও সতর্ক দুই চক্ষুর শাসন দিয়ে অচঞ্চল ক'রে রাখবার দায় গ্রহণ করেছে বিপুল। পারদারিক পুরন্দরের গোপন অভিসার ব্যর্থ ক'রে দেবার দায় নিয়েছে বিপুল। তরুণ ব্রহ্মচারী বিপুল, জীবনে কোনদিন কোন নারীর যৌবনশোভার দিকে মুখ তুলে যে তাকায়নি, অনুরাগের লীলাকলা আর রীতি-নীতি যার কাছে এক অবিদিত কল্পলোকের রহস্য মাত্র, তাকেই আজ থেকে গ্রন্থ ফেলে রেখে এক ক্ষমাহীন ও কঠোর স্বামীর মত কৌতূহল সংশয় আর আগ্রহ নিয়ে এক অপতিব্রতিনী নারীর জীবনে শাসন রচনা ক'রে রাখতে হবে।

পর্ণতরুর ছায়া আর শ্যামলতায় বলয়িত এই গৃহনিকেতন আজ আর কারাগার বলে মনে হয় না, রুচির অবরুদ্ধ জীবনের আকাঙ্ক্ষা অবারিত পথের আশ্বাস দেখতে পেয়েছে। যে মুক্তির লগ্নকে এতদিন ধ'রে প্রতিমুহূর্তের

চিন্তায় কামনা ক'রে এসেছে রুচি, আজ আসন্ন হয়ে উঠেছে সেই মুক্তি। প্রতি কুঞ্জের নিকটে গিয়ে পুষ্প চয়ন করে রুচি।

কিন্তু অন্তরাল হতে এক তরুণ ব্রহ্মচারীর সতর্ক দৃষ্টি কুঞ্জচারিণী সেই নারীর মদপুলকিত অঙ্গশোভা অনুসরণ ক'রে ফিরতে থাকে, যেন মুহূর্তের মতও দৃষ্টির বাইরে না চলে যায়। গুরুর নির্দেশ।

সরোবরসলিলে স্নান করে রুচি। যেন অনুপম এক রক্তকোকনদের অঙ্গে সলিলের হিল্লোল লাগে। অন্তরাল থেকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে সেই সুন্দর দৃশ্যকে নয়নে ধারণ ক'রে রাখে বিপুল। যেন ডুবে না যায় সেই রূপের কোকনদ। গুরুর নির্দেশ।

সন্ধ্যা হয়। দীপ জ্বলে রুচির ঘরে। গোপন একান্তে দাঁড়িয়ে অতি সন্তর্পণে দীপালোকে পুলকিত সেই কুটীরের অভ্যন্তরে প্রসাধনরতা এক যৌবনময়ীর মূর্তির দিকে বিস্ময়াহত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে বিপুল। সে মূর্তির যবাঙ্কুরের কর্ণপূরে মন্দানিলের লুব্ধ পরশ ক্ষণে ক্ষণে লাগে। কেতকীরজে সুবাসিত তনু, ওষ্ঠাধরে বন্ধুক পুষ্পের অরুণতা, সায়ন্তন মল্লিকার গুচ্ছ তার বেণীপ্রান্তে দোলে। নিরঙ্ক কুঙ্কুমপঙ্কে আলিম্পিত বাহু, অলক্তে সেবিত চরণ, মৃদুচ্ছন্দে স্পন্দিত বক্ষঃপটে শ্বেতচন্দনের পত্রাবলী, ইন্দ্রমায়ার এক পরমরমণীয় অর্ঘ্যরূপে প্রস্তুত হয়েছে রুচি। সতর্ক হয়, প্রস্তুত হয় দেবশর্মার তরুণ শিষ্য বিপুল।

নিবিড়তর হয় সন্ধ্যা। গন্ধধূমে আচ্ছন্ন উটজ-প্রাঙ্গণের অলস বাতাস সৌরভে মূর্ছিত হয়। গগনপটে আঁকা রাকা হিমকর নিখিল মহীতলের রূপ আলোকাপ্লুত ক'রে শুধু সপ্তপর্ণীতলে একখণ্ড ছায়াময় অন্ধকারের নিবিড়তা রচনা করেছে। দেখতে পায় বিপুল, তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক অভিসারচারী পুরুষের ঘনঘোর ছায়াদেহ।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে বিপুল। বিপুলের প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ করবার জন্য সকল শক্তি নিয়ে আজ প্রস্তুত হয়ে এসেছে মায়াধর পুরন্দর। এই মুহূর্তে দেবশর্মার গৃহনিকেতনের সকল পুণ্য গ্রাস ক'রে আর দীপ নিভিয়ে দিয়ে চলে যাবে ঐ ছায়াদেহ।

কোন্ শক্তি দিয়ে আজ ইন্দ্রমায়ার এই অভিসন্ধিকে ব্যর্থ করবে বিপুল? অস্ত্রবলে? না, সম্ভব নয়। আবেদন ক'রে? না, বিশ্বাস হয় না। ঐ বনমৃগীর উদ্দাম স্বপ্নকে আজ কোন লৌহ শৃঙ্খলেও বেঁধে রাখতে পারা যাবে না।

সপ্তপর্ণী তরুতলে সেই ভয়ংকর ছায়াদেহ অস্থির হয়ে উঠেছে দেখা যায়। দেখতে পায় বিপুল, দীপ নিভিয়ে দিয়ে প্রাঙ্গণের জ্যোৎস্নালোকে এসে

দাঁড়িয়েছেন গুরুপত্নী রুচি। সপ্তপর্ণীর ছায়ার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেছে প্রণয়ব্যাকুলা রুচির নয়নদ্যুতি।

অন্তরাল হতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে প্রাঙ্গণের জ্যোৎস্নালোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় বিপুল।

চমকে ওঠে রুচি—একি? তুমি এখানে কেন বিপুল?

পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে বিপুল। ইন্দ্রমায়ার ছলনাকে সে আজ জীবনের এক চরম দুঃসাহসের বলে পরাভূত করতে চায়। গুরুর নির্দেশ ব্যর্থ হতে দেবে না বিপুল। তার প্রতিশ্রুতির সত্যকে সর্বস্ব দিয়েও রক্ষা করবে তরুণ ব্রহ্মচারী বিপুল।

ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি তুলে কঠিন ধিক্কারের সুরে রুচি বলে—বুঝেছি বিপুল। গুরুভক্ত তুমি, গুরুর নির্দেশে আমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছ। কিন্তু ভুল করো না বিপুল, আমার অভিশাপ থেকে যদি বাঁচতে চাও, তবে দূরে সরে যাও।

মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে বিপুল। দূরে সরে যেতে পাবে না বিপুল। গুরুভক্ত শিষ্য বিপুল আজ যে-কোন ভৎর্সনা আর অভিশাপ নিজ জীবনে গ্রহণ ক'রেও গুরুপত্নী রুচিকে পুরন্দরের প্রণয়ের আকর্ষণ হতে ছিন্ন ক'রে এই কুটীরের প্রাঙ্গণে ধ'রে রাখবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু বিপুলের সকল আশা যেন হঠাৎ ভীত হয়ে বুকের ভিতরে কেঁপে ওঠে। শিষ্যের এই নত মস্তকের আবেদনে এমন কোন শক্তি নেই যে পরপ্রণয়িনী ঐ প্রগলভাব অভিসার স্তব্ধ ক'রে দিতে পারে।

অকস্মাৎ শিহরিত হয় শিষ্য বিপুলের অচঞ্চল মূর্তি; যেন অন্তরের প্রতিজ্ঞাকে সুন্দর এক ছলনায় সাজিয়ে নেবার জন্য প্রাণপণে এক দুঃসাহস আহ্বান করছে বিপুল।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকায় বিপুল, যেন প্রণয়ানুরাগে বিহ্বল এক প্রেমিকের মুখ। বিস্ময়ে চমকে ওঠে রুচির দুই কজ্জলিত নয়নের মদিরতাময় কৌতূহল। মনে হয় রুচির, যেন তারই রূপগরীয়সী মূর্তির কাছে ভক্ত পূজকের মত বুকভরা আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিপুল।

রুচি শান্ত স্বরে প্রশ্ন করে—কি বলতে চাও বিপুল?

বিপুল বলে—গুরুভক্ত নই আমি, তোমারই ভক্ত রুচি।

বিস্ময়ে অভিভূত দৃষ্টি তুলে বিপুলের সেই সম্মোহিত তরুণ মুখচ্ছবির দিকে তাকায় রুচি—আমার ভক্ত তুমি? কোন দিন শুনিনি একথা!

বিপুল—আজ শোন রুচি। তুমিই আমার জীবনের প্রথম বিস্ময়। আমার আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন অবরুদ্ধ হয়ে ছিল এই পাঠগৃহের কারাগারে সে-স্বপ্নের

মুক্তি এনেছ তুমি। তুমিই আমার সেই স্বপ্নলোকের প্রথম মাধুরী প্রথম কামনার দীপ। তুমি ছাড়া আমার সব ধ্যান আর সব তপস্যা বৃথা।

প্রাঙ্গণের মৃত্তিকা যেন অদ্ভুত এক প্রণয়মন্ত্রপূত বেদিকার মত হয়ে উঠেছে। তার উপর দাঁড়িয়ে আছে এক যৌবনগর্বিতা রূপসীর প্রসাধিত মূর্তি, এবং তারই সম্মুখে প্রসন্নতাপ্রার্থী এক তরুণ পূজক।

রুচিব দুই নয়নের প্রান্তে যেন এক মোহময় হর্ষের বিদ্যুৎ স্ফুরিত হতে থাকে। এক মরুস্থলীর মধ্যে রুচির নির্বাসিত জীবনের কাছে যেন এতদিন ধ'রে এক স্নিগ্ধ উপবন লুকিয়ে ছিল। আজ হঠাৎ সেই উপবন আপনি প্রকট হয়ে বসন্ত সমীরের উচ্ছ্বাস ডেকে এনেছে। রুচির নিঃশ্বাস চঞ্চল হয়, দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিবিড় হয়ে ওঠে।

রুচি বলে--কি চাও বিপুল?

বিপুল—অনন্তকাল আমার এই জীবনকে তোমারই মন্দির ক'রে রাখতে চাই রুচি।

বিপুলের আলিঙ্গনে লুটিয়ে পড়ে রুচি।

সপ্তপর্ণী তরুতলেব সেই প্রতীক্ষার পুরন্দর কেঁপে ওঠেন, যেন হঠাৎ এক আঘাত পেয়েছে তাঁর ছায়াদেহ। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন পুরন্দর। দেখতে পান, দেবশর্মার কুটীরের প্রাঙ্গণে এক নূতন ছলনার মোহে ইন্দ্রমায়ার ছলনা পরাভূত হয়ে গিয়েছে। এক তরুণ প্রেমিকের ব্যগ্র দুই বাহুর আকুল আগ্রহের নীড়ে যেন বিলীন হয়ে রয়েছে এক প্রেমের পারাবতী।

অপমানিত হয়েছে পুরন্দরের প্রতীক্ষা। একান্তে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে সেই দুঃসহ দৃশ্য দেখতে থাকেন পুরন্দর। পরমুহূর্তে জ্বালালিপ্ত চক্ষু নিয়ে ঝঞ্ঝাতাড়িত মেঘখণ্ডের মত ছুটে চলে যান।

বাহুবন্ধনে যেন এতক্ষণ রুচিকে শুধু অবরুদ্ধ ক'রে রেখেছিল বিপুল। পুরন্দরের রথচক্রের শব্দ দূরান্তে মিলিয়ে যেতেই রুচিকে সেই নিবিড় ছলনার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত ক'রে দেয় বিপুল।—ক্ষমা কর।

বিস্মিত রুচি প্রশ্ন করে—কেন বিপুল?

বিপুল—আমার অভিলাষ সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

রুচি—এ কেমন অভিলাষ বিপুল? তোমার এই সুন্দর দুই বাহু কি দৃঢ় শৃঙ্খলের মত শুধু বন্ধনে আবদ্ধ করবার জন্য নির্মিত দু'টি শুষ্ক ও কঠিন স্পৃহা?

উত্তর দেয় না বিপুল।

রুচি বলে—বল বিপুল ভীরু কেন তোমার অধর? কুণ্ঠিত কেন তোমার বক্ষের নিঃশ্বাস?

প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় আর ছিল না, সুযোগও ছিল না। দেবশর্মা এসে কুটীরে প্রবেশ করেন। বিপুল এগিয়ে যায়; এবং গুরুকে প্রণাম করে।

পর্ণতরুর ছায়া আর শ্যামলতায় বেষ্টিত দেবশর্মার গৃহনিকেতনে আবার প্রভাত হয়। বিপুল তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে, ইন্দ্রমায়া ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে, সবই শুনতে পেয়েছেন দেবশর্মা। শুনে শান্ত হয়েছেন। যেখানে যা ছিল. আর যেমন ছিল, সবই তেমনি ফিরে পেয়েছেন দেবশর্মা। রুচি আছে. বিপুল আছে. আছে সেই সপ্তপর্ণী।

কিন্তু সেই পুরাতন দিনগুলিকে আর ফিবে পেলেন না দেবশর্মা। সেই প্রত্যহের সংশয় আর অপমানের জ্বালায় ভরা দিনগুলি. বনমৃগীর উদ্দাম স্বপ্নকে কণ্টকমেখলা দিয়ে রুদ্ধ ক'রে রাখবার জন্য সেই কঠোর প্রয়াসেব দিনগুলি।

বনমৃগী যেন এই গৃহপ্রাঙ্গণেই তার স্বপ্নরাজ্য লাভ করেছে। সপ্তপর্ণীর ছায়ায় দাঁড়িয়ে দূর পথের ধ্যানে রুচিকে আর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না। এই গৃহপ্রাঙ্গণেরই বক্ষে ধ্বনিত এক তরুণের পদশব্দ রুচির উৎকর্ণ আগ্রহেব নূতন স্বপ্ন হয়ে উঠেছে। প্রতীক্ষার মুহূর্ত যাপন করে রুচি। কবে আসবে সেই সন্ধ্যা, যে সন্ধ্যায় রুচির দীপান্বিত কক্ষের দ্বারে ধ্বনিত হবে তারই যৌবনের ভক্ত ঐ তরুণ বিপুলের অভিসারোৎসুক চরণধ্বনির হর্ষ?

অনুভব করেন দেবশর্মা, তাঁর অন্তর যেন এক শূন্যতার গভীরে ডুবে রয়েছে। বুঝতে পারেন না, কেন। তাঁর জীবনের সকল আগ্রহ স্তব্ধ হয়ে গেল কেন? রুচি আছে, কিন্তু মনে হয় দেবশর্মার. তাঁর দুই নয়নের সম্মুখে থেকেও রুচি যেন হারিয়ে গিয়েছে।

রুচিকে প্রতিমুহূর্ত শুধু কঠোর শাসনে রুদ্ধ ক'রে রাখবার দিনগুলি আর ফিরে পেলেন না, সুখী হবারই কথা. কিন্তু যেন উদাস ও অসহায় হয়ে গিয়েছেন দেবশর্মা। শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন দেবশর্মা।

রুচি এসে স্মিতমুখে সম্মুখে দাঁড়ায়—আমার একটি অনুরোধ আছে।

দেবশর্মা—আমার কাছে?

রুচি—হ্যাঁ।

দেবশর্মা—বল।

রুচি—একটি বস্তু উপহার চাই।

দেবশর্মা—কি?

রুচি—গন্ধর্ববধূ যে দিব্যগন্ধ চম্পক কবরীতে ধারণ করে. সেই চম্পক আমি চাই।

অনুরোধ জ্ঞাপন ক'রে কক্ষান্তরে চলে যায় রুচি। অনুরোধ শুনে দেবশর্মার আননে অতি বিষণ্ণ ও বেদনার্ত এক শঙ্কার ছায়া ছড়িয়ে পড়ে. যেন আরও অসহায় হয়ে গেল তাঁর জীবন, এবং মনে হয়. তাঁর শিষ্য বিপুলও হারিয়ে গিয়েছে।

দেবশর্মা ডাকেন—বিপুল।

পাঠগৃহের নিভৃতে বসে গুরুর আহ্বান শুনে চমকে ওঠে বিপুল. যেন তার বক্ষের গভীর গোপনে সঞ্চিত এক মধুর অনুভব হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে।

কেন চমকে ওঠে বিপুল? পরপ্রণয়িনী এক অভিসারিকা নারীকে কপট আলিঙ্গনে রুদ্ধ করতে গিয়ে বিপুলের অভিলাষহীন দেহের কঠোর শুচিতা কি হঠাৎ এক মোহময় কোমলতার আঘাতে চমকে উঠেছিল? সে-নারীর অঙ্গরাগের কেতকীরেণু কি তরুণ ব্রহ্মচারীর অন্তরে ক্ষণমধুরতার কুহক সৃষ্টি করেছিল?

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছে বিপুল। গুরুপত্নী রুচিকে ইন্দ্রমায়ার গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু কেমন ক'রে এক মোহ থেকে মুক্ত হয়েও আর এক ছলনার কাছে রুচির তৃষ্ণা নতুন ক'রে হারিয়ে গিয়েছে, সেই কাহিনীর কিছু জানেন না গুরু। সেই কাহিনী গুরুর কাছে প্রকাশ করেনি গুরুভক্ত ও সত্যনিষ্ঠ শিষ্য বিপুল। কিন্তু কেন এই গোপনতা?

গ্রন্থ ফেলে রেখে গাত্রোত্থান ক'রে পাঠগৃহ হতে ধীরপদে অগ্রসর হয়ে দেবশর্মার সম্মুখে এসে দাঁড়ায় বিপুল। কেন ডাকছেন গুরু? কি বলতে চাইছেন গুরু? দেবশর্মার শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে অনুমান করতে পারে না শিষ্য বিপুলের অশান্ত মন। বক্ষের গভীর গোপনে সঞ্চিত এক মধুর অনুভবের স্মৃতি শুধু উদ্বিগ্ন নিঃশ্বাসের আঘাত সহ্য করতে থাকে।

দেবশর্মা বলেন—রুচি উপহার চেয়েছে বিপুল। দিব্যগন্ধ চম্পক কোথায় আছে জানি না। তুমি নিয়ে এস।

শঙ্কা দূর হয়; শান্ত হয় বিপুলের মন।

চলে যায় বিপুল। প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে. সপ্তপর্ণীর ছায়া পার হয়ে. উটজদ্বার অতিক্রম ক'রে দূর পথের রেখার দিকে চলে যেতে থাকে বিপুল। দেখতে পান দেবশর্মা, সেই পথের দিকে নিষ্পলক নয়নের দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে রুচির দুই সাগ্রহ ও সস্পৃহ নয়ন।

আবার দীপ জ্বলে রুচির ঘরে। নূতন পথের ধ্যানে ডুবে আছে রুচির মন, যে পথে এই সন্ধ্যায় আকুল হয়ে দেখা দেবে দিব্যগন্ধ চম্পকের অভিসার।

বুঝতে পারবে না কি বিপুল, কার কাছ থেকে আর কেন এই দিব্যগন্ধ চম্পক উপহার নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে রুচির অন্তর? কল্পনা কি করতে পারবে না তরুণতরুর মত যৌবনান্বিত ঐ প্রণয়ী বিপুল, সেদিনের অসমাপ্ত উৎসবের পিপাসা তৃপ্ত করবার জন্য বিপুলকে ইঙ্গিতে আহ্বান করেছে বিপুলেরই স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষিতা নারী?

প্রতীক্ষার মুহূর্ত গণনা করে রুচি, দিব্যগন্ধ চম্পকের উপহার নিয়ে আর কতক্ষণ পরে ফিরে আসবে বিপুল? এই কক্ষের দ্বারে কতক্ষণে দেখা দেবে প্রেমাভিলাষী বিপুলের স্মিতপুলকিত তনুচ্ছায়া?

কিন্তু সেই দিব্যগন্ধ চম্পক তখন দেবশর্মার পায়ের কাছে পড়েছিল। ফিরে এসে গুরুরই সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিল বিপুল। পরিশ্রান্ত ও বিষণ্ণ স্বরে বিপুল বলে—আপনার অভীপ্সিত বস্তু এনেছি গুরু। গ্রহণ করুন এই দিব্যগন্ধ চম্পক।

দেবশর্মা বলেন- এই দিব্যগন্ধ চম্পকের উপহার আমার জন্য চাইনি বিপুল। যে চেয়েছে তাকে দিয়ে এস।

বিপুল—কে চেয়েছে?

দেবশর্মা - রুচি।

বিপুল—কিন্তু এই উপহার গুরুপত্নীর কাছে আমি নিয়ে যাব কেন গুরু? সে কাজ আমার কাজ নয়।

দেবশর্মা—আমি জানি রুচি তোমারই হাত থেকে এই উপহার নিতে চায়।

আর্তনাদ করে বিপুল—আমাকে ভুল বুঝবেন না গুরু।

দেবশর্মা - তোমাকে ভুল বুঝিনি বিপুল। তোমাকে মুক্তি দিতে চাই। তুমি আর আমার শিষ্য নও।

বিপুল—কেন গুরু?

দেবশর্মা—নিজের মনের কাছে এই প্রশ্ন কর বিপুল।

চমকে ওঠে বিপুলের মনের গভীরে লুক্কায়িত এক মধুর অনুভবের অপরাধ। আর্তস্বরে চিৎকার করে বিপুল—আমার একটি গোপনতার অপরাধ ক্ষমা করুন গুরু।

দেবশর্মা—কিসের গোপনতা?

বিপুলের চক্ষু বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে। পুরন্দরের প্রণয়ের মোহ হতে গুরুপত্নী রুচিকে রক্ষা করবার সেই বিচিত্র দুঃসাহসের কাহিনী গুরুর কাছে ব্যক্ত করে বিপুল। বিচলিত স্বরে বিপুল বলে—বিশ্বাস করুন গুরু, আমি ছলনা মাত্র, তার বেশি কিছু নই। শুধু গুরুপত্নীকে রক্ষা করেছি। শুধু

প্রণয়ের অভিনয় করেছি। নিতান্তই হৃদয়হীন সেই প্রণয়, তার মধ্যে আর কোন অভিলাষ ছিল না গুরু।

দেবশর্মার শান্ত মুখে অদ্ভুত এক ক্ষমাময় প্রসন্নতা দেখা দেয়।—ভালই করেছ বিপুল। বিশ্বাস করি আমি, তোমার সেই ছলপ্রণয়ের অভিনয় নিতান্তই অভিনয়। গুরুপত্নীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোন অভিলাষ তোমার ছিল না। কিন্তু.

বিপুল—বলুন গুরু।

দেবশর্মা—তোমার ছলনা হৃদয়হীন বটে, কিন্তু তুমি তো হৃদয়হীন নও!

কি ভয়ংকর সত্য ঘোষণা করেছেন গুরু! বিপুলের বক্ষের পঞ্জর বজ্রনাদে আতঙ্কিত বল্মীকধূলির মত কেঁপে ওঠে। সেই বক্ষঃপঞ্জরের অন্তরালে, গভীর গোপনে সঞ্চিত এক মধুর অনুভব যেন ক্রন্দন ক'রে উঠেছে—তুমি তো হৃদয়হীন নও বিপুল। আমি যে তোমার সেই ছলনারই দান। আমি যে তোমারই আলিঙ্গনে লুণ্ঠিত এক বিপুলযৌবনার ললিতকোমল ও মোহময় স্পর্শের সৌরভ।

ক্ষমা করেছেন গুরু। কিন্তু অনুভব করে বিপুল, এই আশ্রমে গুরু-সন্নিধানে থাকবার অধিকার সত্যই হারিয়েছে শিষ্য বিপুলের জীবন। চলে যেতে হবে চিরকালেরই মত। কিন্তু স্মরণ করে বিপুল, গুরুপত্নী রুচিকে সত্যই রক্ষা করতে পারেনি গুরুভক্ত বিপুল। ইন্দ্রমায়ার মোহ হতে রুচিকে রক্ষা করতে গিয়ে স্বয়ং বিপুলই রুচির জীবনে নূতন এক মোহ হয়ে উঠেছে।

অকস্মাৎ যেন নূতন এক প্রতিজ্ঞার আবেগ বিপুলের নয়নে শিহরিত হতে থাকে। গুরুভক্ত শিষ্য অবশ্য তার প্রতিশ্রুতির সত্য রক্ষা করবে। গুরুপত্নী রুচিকে গুরুপ্রিয়ার গৌরবে বিভূষিত ক'রে চলে যাবে বিপুল। জয়ী হবে গুরুভক্ত শিষ্যের জীবনের অভিলাষ।

এই গুরুগৃহে শিষ্য বিপুলের জীবনে পালনীয় আর কোন ব্রত নেই। আছে শুধু একটি পরীক্ষা। শুধু একবার হৃদয়হীন হতে হবে, বক্ষের গভীর গোপনে সঞ্চিত একটি মধুর অনুভবের উপর জ্বালাময় ভস্ম নিক্ষেপ ক'রে মুক্ত হয়ে যেতে হবে। দিব্যগন্ধ চম্পক হাতে তুলে নেয় বিপুল।

দেবশর্মার শান্ত চক্ষুর কৌতূহল হঠাৎ চমকে দিয়ে দৃপ্ত স্বরে নিবেদন করে বিপুল—আমি আপনারই শিষ্য, আমি চিরকালের গুরুভক্ত শিষ্য।

দেবশর্মাকে প্রণাম ক'রে ত্বরিত পদে চলে যায় বিপুল।

রুচির ঘরে দীপশিখা কেঁপে ওঠে। দিব্যগন্ধ চম্পকের উপহার নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বিপুল।—এনেছি আপনার দিব্যগন্ধ চম্পক।

বিপুলের ভাষণ যেন বিচিত্র এক রূঢ়তার ধিক্কার। বিস্মিত হয় রুচি। —এই কি উপহার অর্পণের রীতি?

বিপুল—আমি আপনাকে উপহার অর্পণ করছি না গুরুপত্নী রুচি. আমি গুরুর আদেশ পালন করছি।

রুচির প্রতীক্ষার আনন্দ নির্মম আঘাতে ব্যথিত হয়ে চমকে ওঠে—গুরুর আদেশ?

বিপুল—হ্যাঁ।

রুচি—কিন্তু তুমি সত্যই কি বুঝতে পারনি বিপুল, তোমারই হাত থেকে ঐ দিব্যগন্ধ চম্পক গ্রহণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে আমার অন্তর?

বিপুল—বুঝতে পারি। কিন্তু বুঝতে পারি না, গুরুপত্নী কেন তাঁর স্বামীর এক শিষ্যের কাছ থেকে এমন উপহার আশা করেন।

রুচির সুন্দর চক্ষু প্রখর সন্দেহের স্পর্শে যেন বহ্নিময় হয়ে ওঠে—ভুলে যাও কেন বিপুল. গুরুপত্নীর অন্তরে সে আশা যে তুমিই সঞ্চারিত করেছ, জ্যোৎস্নারমিত এক সন্ধ্যার পরমক্ষণে, তোমার প্রেমবিধুর সম্ভাষণে, আর ব্যগ্র আলিঙ্গনে?

বিপুল—সেই সম্ভাষণ আর সেই আলিঙ্গন নিতান্তই এক অভিনয়। পরানুরাগিণী অভিসারিকার পথরোধের কৌশল।

রুচির ভ্রূকুটিকুটিল চক্ষুর দৃষ্টিতে যেন অসহ দাবদাহের জ্বালা ঝলক দিয়ে ওঠে—তোমার যে ব্যাকুল আহ্বানের মায়ার কাছে ইন্দ্রমায়াও হার মেনে চলে গিয়েছে, সেই আহ্বান কি সকলই ছলনা?

বিপুল—হ্যাঁ।

বজ্রাহতা হরিণীর মত আর্তস্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে রুচি—যাও।

চলে যায় বিপুল।

দীপ নিভে যায়। দিব্যগন্ধ চম্পকের উপহার ভূতলে লুটিয়ে পড়ে থাকে। আর লুটিয়ে পড়ে থাকে রুচি। ছলনা, সকলই ছলনা। এই রূপ আর যৌবন জীবনের কয়েকটি প্রমত্ত বসন্তের ছলনা। একটি ধিক্কারে যেন আজ রুচির স্বপ্নরাজ্য চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তার নিরাশ্রয় প্রাণ আজ এই অন্ধকারের সমাধিতে একটুকু হৃদয়ের আশ্রয় খুঁজছে।

উষ্ণ সলিলধারায় আপ্লুত হয় নয়ন এবং সেই নয়নে যেন এক শান্ত স্বপ্নচ্ছবি ফুটে উঠতে থাকে। সন্ধ্যামেঘের রক্তিমার মত এই রূপ আর যৌবন জীবনের আকাশপট হতে মুছে গিয়েছে. তবু প্রেম আছে সে প্রেম হৃদয়ের ডোরে বাঁধা। কামনার মায়া ফুরিয়ে যায়, তবু হৃদয় ফুরিয়ে যায় না। যে ভালবাসে হৃদয় দিয়ে, সে-ই তো ভালবাসতে পারে চিরকাল। হৃদয়েরই বন্ধনে

ভালবাসা চিরন্তন হয়। তটশিলার কঠিন বন্ধন সত্য, তাই সত্য তটিনীর রূপ। আর সবই গোপনের ইন্দ্রমায়া, ক্ষণিকের ছলনা, মরীচিকার মত সুন্দর ও মিথ্যা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় রুচি। দিব্যগন্ধ চম্পকের উপহার হাতে তুলে নেয়। আজিকার এই দীপহীন অন্ধকারে সত্যই যেন এক চিরকালের প্রেমিকের সন্ধানে নূতন অভিসারে যাত্রা করে রুচি। কক্ষদ্বার পার হয়ে প্রাঙ্গণের উপব এসে দাঁড়ায়। এগিয়ে যায়, এবং আর একটি দীপহীন কক্ষের অভ্যন্তবে প্রবেশ করে।

দীপহীন অন্ধকারের মধ্যে সমাহিত মূর্তির মত স্তব্ধ ও নিঃশব্দ ঋষি দেবশর্মা হঠাৎ চমকে ওঠেন। জানেন না, কল্পনাও করতে পারেন না এবং বুঝতেও পারেন না দেবশর্মা, তাঁর পায়ের উপর শুধু দিব্যগন্ধ চম্পকের অর্ঘ্য নয়, পুষ্পের চেয়েও কোমল অলকস্তবকের অর্ঘ্য নিয়ে রুচির মাথাও লুটিয়ে পড়ে রয়েছে।

কিসের অর্ঘ্য? দেবশর্মা বিচলিত হয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে অর্ঘ্য স্পর্শ করতে গিয়েই রুচির মাথা স্পর্শ করেন। দুই হাত দিয়ে সাগ্রহে দেবশর্মার হাত চেপে ধবে রুচি।

দেবশর্মা বিস্মিত হন—এ কি? কে তুমি?

রুচি—আমি, তোমারই রুচি।

দেবশর্মা—এত ব্যথিত হলে কেন রুচি? যে মুক্তি তুমি চাও, সেই মুক্তি আমি তোমাকে দিয়েছি।

রুচি—চাই না মুক্তি।

দেবশর্মা—কি চাও বল।

রুচি—চাই তোমার বন্ধন, চাই তোমার দেওয়া শাস্তি, চাই তোমার বাধা, চাই তোমার শাসন।

দেবশর্মা—কোন দিন যা চাওনি, আজ তাই কেন চাইছ রুচি?

রুচি—কোন দিন যা বুঝিনি, আজ তাই বুঝতে পেরেছি ঋষি।

দেবশর্মা—কি?

রুচি—তুমি সহৃদয়, আর সবই ছলনা।

কয়েকটি মুহূর্ত শুধু স্তব্ধ হয়ে থাকেন দেবশর্মা। তারপর সান্ত্বনার সুরে বলে ওঠেন—ওঠ রুচি।

রুচি ওঠে। দীপ জ্বালে। সে দীপের আলোকে দেখা যায়, দেবশর্মার পদস্পর্শে পূত দিব্যগন্ধ চম্পক রুচির অলকস্তবকে গাঁথা রয়েছে।

---

# অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা

বনভূমির নিভৃতে কলস্বনা এক স্রোতস্বিনীর নিকটে রক্তপাষাণের বুকের উপর কুহেলিকালীনা প্রতি সন্ধ্যায় পল্লবিত দ্রুমবাহু হতে পুরটকর্ণিকার মত পীতমঞ্জরীর পুঞ্জে লুটিয়ে পড়ে। নিবিড় অধরবন্ধ রচনা ক'রে কেলি-শ্রমালস মৃগদম্পতি সেই পুঞ্জীভূত কোমলতার ক্রোড়ে নিশীথের প্রহর যাপন করে। আর, প্রভাত হতেই মৃগদম্পতি যখন নবতৃণের গন্ধামোদে চঞ্চল হয়ে স্রোতস্বিনীর কূলে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়, তখন বনপথের দুই দিক হতে উৎসুক নয়ন নিয়ে কীর্ণ মঞ্জরীর কোমলতায় আবৃত সেই রক্তপাষাণের নিকটে দেখা দেয় বরযৌবনা এক ঋষিকুমারী, কণ্ঠে তার গন্ধে আকুল স্ফুটকেতকীর মালিকা, এবং মদাপ্রিততনু এক তরুণ ঋষি, বক্ষে তার মৃগমদবাসিত কুঙ্কুমের অঙ্কন। মহর্ষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভা ও ঋষি অষ্টাবক্র।

যেন দুর্বহ এক তৃষ্ণার বেদনা উৎসুক নয়নে বহন ক'রে ছুটে আসে, মিলনোন্মুখ দুই জীবনের যৌবনান্বিত দুই স্বপ্নভার। কিন্তু ছুটেই আসে শুধু; আর এসেই সেই ক্ষুদ্র অথচ কঠোর রক্তপাষাণের বাধায় হঠাৎ আহত হয়। নিকটে এসেও যেন এক দুরূহ সুদূরতার শাসনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভুলতে পারে না অষ্টাবক্র, সুপ্রভাও ভোলে না, দু'জনেরই জীবনের একটি কঠিন অঙ্গীকার দু'জনের মাঝখানে এই ব্যবধান আজও রচনা ক'রে রেখেছে।

দরোৎফুল্ল সরোরুহের মত সুপ্রভার বিকচ আননশোভার দিকে ঋষি অষ্টাবক্র সস্পৃহ নয়নে তাকিয়ে থাকে। আর, বিমুগ্ধা বনকুরঙ্গীর মত সমুত্তান নয়নভঙ্গীর নিবিড়সান্দ্র বিহ্বলতা নিয়ে অষ্টাবক্রের কুঙ্কুমপিঞ্জরিত বক্ষঃপটের দিকে তাকিয়ে থাকে সুপ্রভা। তরুণ ঋষির সেই মৃদুশ্বাসকম্পিত বক্ষের তরঙ্গিত আবেদনের উপর মাথা লুটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে সুপ্রভা। এবং সুপ্রভার ফুল্ল আননের রক্তিম সুষমা অধরাশ্লেষে পান ক'রে নিয়ে তৃপ্ত হতে ইচ্ছা করে অষ্টাবক্র, বনবিটপীর কিশলয় যেমন প্রভাতের অরুণিত মিহির-লেখার রাগসুষমা পান ক'রে তৃপ্ত হতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু এই ইচ্ছা নিতান্তই ইচ্ছা। বাসকতল্পের মত সুন্দর ঐ পুঞ্জায়িত মঞ্জরীর মদাকুল ইঙ্গিতে এই ইচ্ছা ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চলিত হয়, কিন্তু এই চঞ্চলতা কোনক্ষণে জীবনের সেই অঙ্গীকারকে বিচলিত করতে পারে না।

অঙ্গীকার ক'রে কঠোর এক পরীক্ষাকে জীবনে স্বীকার ক'রে নিয়েছে প্রেমিক অষ্টাবক্র ও তার প্রেমিকা সুপ্রভা। কে জানে কোন্ বিশ্বাসের দুঃসাহসে মহর্ষি বদান্যের কাছে এই অঙ্গীকার নিবেদন করেছে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা, শুধু স্বেচ্ছার অধিকারে কখনই পরিণয় বরণ করবে না ওদের দু'জনের জীবন। যদি কোন শুভ লগ্নে স্বয়ং মহর্ষি বদান্য সাগ্রহে সানন্দে ও সমন্ত্রসংস্কারে সুপ্রভাকে অষ্টাবক্রের কাছে সম্প্রদান করেন, তবেই সেই লগ্নে জগতের স্বীকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাল্যবিনিময় ক'রে মিলিত হবে ঐ কুঙ্কুম আর কেতকীর সুরভিত ইচ্ছা। তার আগে নয়, এবং জগতের কোন গোপন নিভৃতেও নয়।

তাই সুপ্রভা আর অষ্টাবক্র, দুই উৎসুক আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতা যেন প্রতি প্রভাতের জাগ্রত আলোকের পথে এক স্বপ্নাভিসারে আসে, বননিভৃতের এই কলস্বনা স্রোতস্বিনীর নিকটে এক সুরভিত সান্নিধ্যের ছায়াটুকু মাত্র অনুভব ক'রে চলে যায়।

ঋষি অষ্টাবক্র ও কন্যা সুপ্রভার প্রণয়কলাপে বিস্মিত বিরক্ত ও ব্যথিত হয়েছেন মহর্ষি বদান্য। তিনি মনে করেন, এই প্রণয় প্রণয়ই নয়। বনেচর মৃগ ও মৃগীর মত নিতান্তই এক আসক্তির তাড়নাকে জীবনের প্রেম বলে বিশ্বাস করেছে এক ঋষিকুমার ও এক ঋষিকুমারী। ঐ আগ্রহ আকালিক ঝটিকার মত বিচলিত যৌবনের উদ্‌ভ্রান্তি মাত্র; দক্ষিণমলয়ের মৃদুবিধৃত নিঃশ্বাসের মত স্নিগ্ধ স্থিরসৌহার্দ্যের সঞ্চার নয়। ঐ চাঞ্চল্য লোষ্ট্রাহত সরসীসলিলের ছন্দোহীন উচ্ছলতা মাত্র; সুতরঙ্গিত ভঙ্গিমার মঞ্জুল বিল্লোলী নয়। ওদের মুখের ভাষা আসঙ্গকামনার মুখরতা মাত্র; প্রেমমহিমার কল্লোল নয়। দুই জনের দুই মুগ্ধ মুখচ্ছবি ও অধরবিসর্পিত রক্তোচ্ছ্বাস দু'টি দাবানলদ্যুতি মাত্র; সুশান্ত জ্যোৎস্নারাগ নয়। আসক্তি সত্য হলেই পরিণয় লাভের অধিকার সত্য হয় না। এই আসক্তি প্রেম নয়, অনুরাগ নয়, দাম্পত্যের মিলনসূত্রও নয়।

স্মরণ করেন মহর্ষি বদান্য, অঙ্গীকার করেছে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা। কিন্তু ঐ অঙ্গীকারে কোন সত্য নেই। মনে করেন বদান্য, ঐ অঙ্গীকার হঠামোদে উদ্ধত দুই যৌবনের কৌতুকরঙ্গ মাত্র, মহর্ষি বদান্যের রোষ প্রশমিত করবার জন্য যৌবনচটুল দুই অভিসন্ধির চাটুভাষিত স্তুতি। বিশ্বাস হয় না, যে দুই আকাঙ্ক্ষা প্রতি প্রভাতে বননিভৃতের ক্রোড়ে গোপনাভিসারে এসে সান্নিধ্য লাভ করে, সেই দুই আকাঙ্ক্ষা কখনও কোন সংযমের অঙ্গীকারকে শ্রদ্ধা করতে পারে। আসক্তি কেমন ক'রে পাবে এই শক্তি? সন্দেহ করেন মহর্ষি বদান্য, কপট অঙ্গীকারের অন্তরালে কৌতুকমদে মদায়িত এক ঋষিকুমারী

এবং এক তরুণ ঋষির দেহ ক্ষণপুলকিত উদ্‌ভ্রান্তির অনাচারকলুষে ক্লিন্ন হয়েছে। লোকসমাজের আশীর্বাদের জন্য সেই দুই অবিধিপ্রগল্‌ভ আসক্তির প্রাণে কোন মোহ আর কোন শ্রদ্ধা নেই।

যেন অভিশাপ বর্ষণের জন্য মহর্ষি বদান্যের কোপপীড়িত দুই চক্ষু খর দৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেয়ে বিস্মিত হন বদান্য, তাঁর আশ্রমভবনের দ্বারোপান্তে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ ঋষি অষ্টাবক্র।

মহর্ষি বদান্য বলেন।—আমি জানি, তুমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ অষ্টাবক্র। কিন্তু শুনে যাও, সুপ্রভার পাণি প্রার্থনা করবারও অধিকার তোমার নেই।

অষ্টাবক্র—কেন মহর্ষি?

বদান্য—কেতকীগন্ধবাসিত একটি কণ্ঠের আর কুঙ্কুমাঙ্কিত একটি বক্ষের আসক্তিময় প্রগল্‌ভতা আমার আশীর্বাদ পেতে পারে না।

অষ্টাবক্র—প্রগল্‌ভতা বলে ধারণা করছেন কেন মহর্ষি?

অষ্টাবক্রের প্রশ্নে আরও কুপিত হয়ে শ্লেষাক্ত স্বরে উত্তর দেন মহর্ষি বদান্য।—শিলাখণ্ড যেমন তরল হতে পারে না, শিশিরবিন্দু যেমন কঠিন হতে পারে না, আসক্তিও তেমনি কখনই অপ্রগল্‌ভ হতে পারে না।

অষ্টাবক্র—কিন্তু আপনারই ইচ্ছাকে সম্মানিত ক'রে আমরা দু'জনে যে অঙ্গীকার জীবনে গ্রহণ করেছি, সেই অঙ্গীকার কোন মুহূর্তেও আমাদের আচরণে অসম্মানিত হয়নি।

চমকে ওঠেন মহর্ষি বদান্য, তাঁর সন্দেহ ও বিশ্বাসের কঠিন হৃৎপিণ্ডের উপর যেন এক উদ্ধতের হঠভাষিত গর্বের আঘাত পড়েছে।

বদান্য বলেন—কিন্তু আমি জানি, একদিন না একদিন তোমাদেরই উদ্‌ভ্রান্ত আসক্তির কাছে তোমাদের অঙ্গীকার মিথ্যা হয়ে যাবে।

অষ্টাবক্র—কখনই হবে না মহর্ষি।

তীব্রতর উষ্মায় তপ্ত হয়ে ওঠে বদান্যের কণ্ঠস্বর।—তবে শোন অষ্টাবক্র, বৎসরকাল পূর্ণ হবার পর আজিকার মত এমনই এক প্রভাতে আমার কাছে এসে যদি এই সত্য ঘোষণা করতে পার যে, তোমাদের অঙ্গীকার ঐ বনানিভৃতের ভৃঙ্গগীতগুঞ্জরিত কোন মুহূর্তেও বিচলিত হয়নি, তবেই আমি বিশ্বাস করব, সুপ্রভার পাণি প্রার্থনা করবার অধিকার তুমি পেয়েছ।

অষ্টাবক্র—তারপর?

মহর্ষি—তারপর, আমি বিচার করব, সুপ্রভার পাণি গ্রহণের অধিকার তোমার আছে কি না।

অষ্টাবক্র—আপনার ইচ্ছাকেই সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার ক'রে নিলাম মহর্ষি।

হ্যাঁ, সত্যই আসক্তি। মনে মনে স্বীকার করে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা, মহর্ষি বদান্যের অনুমানে কোন ভুল নেই। কুমারী সুপ্রভা তার উষ্ণ নিঃশ্বাস-বায়ুর চঞ্চলতার মধ্যে বক্ষের গভীর হতে উৎসারিত এক তৃষ্ণার মর্মরোল শুনতে পায়। যেন তার শোণিতে সঞ্চারিত এক স্বপ্নের প্রাণ দোহদবেদনা বরণের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে। বিশ্বাস করে সুপ্রভা, পিতা বদান্যের অভিযোগ মিথ্যা নয়। স্ফুট প্রসূনের নবপরাগের মত এক সুরভিত মোহ যেন তার সকলক্ষণের ভাবনাকে অবশ ক'রে রেখেছে। উন্দলকুসুমসুরভির মত কি-এক বাসনার শিহর তার অধরপুটে ক্ষণে ক্ষণে দুরন্ত প্রলোভ সঞ্চারিত ক'রে যায়। বিশ্বাস করে সুপ্রভা, এই তৃষ্ণার পরম তৃপ্তি দাঁড়িয়ে আছে তারই সম্মুখে, নাম যার অষ্টাবক্র, তরুণতরুর মত স্নিগ্ধদর্শন যে ঋষির কণ্ঠে কেতকীমালিকা অর্পণের জন্য সুপ্রভার মন তার স্বপ্ন জাগর ও সুষুপ্তিরও প্রতিক্ষণে উৎসুক হয়ে রয়েছে।

অষ্টাবক্রও সুপ্রভার কাছে অকপট ভাষায় নিবেদন করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না।—হ্যাঁ ঋষিনন্দিনী, ঐ বনমৃগদম্পতির জীবনের প্রতি সন্ধ্যার উৎসবের মত অধরবন্ধ রচনার জন্য আমার ধমনীধারায় এক স্বপ্নাতুর আকাঙ্ক্ষা ছুটাছুটি করে। আমি জানি, আমার সেই আকাঙ্ক্ষার সকল তৃপ্তির আধার তোমারই ঐ সুন্দর অধর। পরিমলগ্রাহিণী সমীরিকা তুমি, আমার যৌবনোত্থ বাসনার সৌরভভার তোমারই সমাদরে ধন্য হতে চায়। এই ক্ষিতিতলের এক নিভৃতের স্নেহে লালিত স্নিগ্ধ কেকা তুমি, আমার প্রাণের সকল তৃষ্ণার নীলাঞ্জন তোমারই আহ্বান অন্বেষণ ক'রে বেড়ায়। নিবিড়সলিল নিকুঞ্জসরিৎ তুমি, আমার সকল আনন্দের হিল্লোল তোমারই কান্তিসুধারসের অভিষেক নিতে চায়। স্বীকার করি সুপ্রভা, আমার বক্ষের কুঙ্কুমে আমার আসক্তিরই প্রাণ ছড়িয়ে রয়েছে।

কুণ্ঠাহত স্বরে প্রশ্ন করে সুপ্রভা।—কিন্তু এই কি প্রেম?

বিস্মিত হয় অষ্টাবক্র।—জানি না, প্রেম নামে কোন আকাশসম্ভব আকাঙ্ক্ষার কথা বলছ ঋষিতনয়া।

সুপ্রভা—ক্ষমা করবেন ঋষি, আমি পিতা বদান্যের দুর্বহ এক চিন্তার প্রশ্ন আপনাকে নিবেদন করছি। শুধু তাই নয়, এই প্রশ্ন আমার নিজেরই জীবনের প্রতি আমার সংশয়কাতর মনের প্রশ্ন। বলাকার প্রাণ যে আকাঙ্ক্ষায় বিদ্যুন্ময় জীমূতের ধ্বনিত শিহর নিজ দেহের শোণিতধারায় বরণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, আমার প্রাণ সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপনার দীপ্ত যৌবনের হর্ষ বরণ করতে চায়। কোন সন্দেহ করি না ঋষি, আমার কণ্ঠ-

মালিকার কেতকীতে আমার আসক্তিই সুরভিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই আসক্তি কি জীবনের কোন সুন্দর আকাঙ্ক্ষা?

অষ্টাবক্র—সুন্দর আসক্তি জীবনের সুন্দর আকাঙ্ক্ষা।

সুপ্রভা বিস্মিত হয়—সুন্দর আসক্তি?

অষ্টাবক্র- হ্যাঁ, সে আসক্তি দেহজ বাসনারই প্রসূত প্রসূন কিন্তু দেহজ বাসনার নিঃশ্রীক উল্লাস নয়। সে আসক্তি কখনও প্রগল্‌ভ হয় না। মহর্ষি বদান্য বৃথাই বিশ্বাস করেছেন আমাদের কামনা শৌণোদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আমাদের অঙ্গীকারের গৌরব নাশ ক'রে দেবে।

বুঝতে না পেরে প্রশ্নাকুল দৃষ্টি তুলে নীরবে শুধু তাকিয়ে থাকে সুপ্রভা।

অষ্টাবক্র বলে-ভুলে যাও কেন কুমারী, তোমাকে আজও আমি স্পর্শ করিনি? এইখানে কতবার ক্ষণে ক্ষণে বনসমীরণ উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তোমার চিরঘনসঙ্কাশ চিকুরের সুচারু স্তবক আর নিবিড় নীবিতটের নবীনাংশুক মেখলা কখনও উদ্‌ভ্রান্ত হয়নি। যেন শতকুম্ভের কান্তি দিয়ে রচিত দুটি কুম্ভ, পরিহারের সলাজ শাসন তুচ্ছ করে ললিত লাবণ্যভঙ্গে স্তবকিত হয়ে রয়েছে তোমার অভিরাম উরসের ভার বিহ্বলতা। তবু আমার লুব্ধ বক্ষ ও বাহু দস্যু হয়ে উঠতে পারে না সুপ্রভা। এই সংযম বরণ ক'রেই তোমার ও আমার আসক্তি সুন্দর হতে পেরেছে ঋষিকুমারী।

সুপ্রভা—আপনি এই যুক্তি দিয়ে কোন্ সত্য প্রমাণ করতে চাইছেন ঋষি?

অষ্টাবক্র—তুমি আমার এবং আমি তোমার আমার ও তোমার জীবন পরিণয়ে মিলিত হবার অধিকার পেয়েছে।

অষ্টাবক্রের ভাষণে সুপ্রভা যেন তার জীবনের এক মধুর বিশ্বাসের জয়ধ্বনি শুনতে পায়। তবু, এই বিশ্বাসের আনন্দ অনুভব করতে গিয়েও যেন হঠাৎ আর-এক ক্ষীণ সংশয়ের বেদনা সুপ্রভার আয়ত নয়নের কোণে বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে। সুপ্রভা ব্যথিত স্বরে বলে তবু সংশয় হয় ঋষি।

অষ্টাবক্র -বল, কিসের সংশয়?

সুপ্রভা—বদান্যতনয়া সুপ্রভার চেয়ে সুন্দরতর অধরের নারী এই জগতে কতই তো আছে।

অষ্টাবক্র—আছে, অস্বীকার করি না সুপ্রভা।

সুপ্রভা—ভয় হয় ঋষি, আপনার এই সুন্দর আসক্তি, আপনার বাসনাবিহ্বল দুই চক্ষু যে কোন ক্ষণে যে-কোন বিম্বাধরার মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ ও লুব্ধ হয়ে উঠতে পারে।

অষ্টাবক্র—পারে, অস্বীকার করি না প্রিয়া।

সুপ্রভা—সব চেয়ে বড় ভয় ঋষি, আপনারই প্রিয়াতিপ্রিয়া এই সুপ্রভার মনও ঠিক এই ভুল ক'রে ফেলতে পারে।

অষ্টাবক্র—অসম্ভব নয়।

সুপ্রভা—এত ভঙ্গুরতা দিয়ে রচিত যে আসক্তির প্রাণ, সেই আসক্তি সুন্দর হলেই বা কি আসে যায় ঋষি? স্থিরতাবিহীন সেই আসক্তি আমাদের জীবনে পরিণয়ের বন্ধন হতে পারে না।

অষ্টাবক্র—সুন্দর আসক্তির প্রাণ তৃণশীর্ষের শিশিরের মত ভঙ্গুর নয় সুন্দরাননা। সেই আসক্তি নিষ্ঠায় কঠিন। পৃথিবীর কোন বিম্বাধরার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার নয়ন মুগ্ধ হলেও আমার সেই মুগ্ধ নয়ন যে তোমাকেই অন্বেষণ করবে সুপ্রভা।

সুপ্রভা—তা হলে এই কথা বলুন ঋষি আমি আপনার আকাঙ্ক্ষার উৎসবে প্রয়োজনের এক প্রেয়সী মাত্র।

অষ্টাবক্র—তুমি শ্রেয়সী, আমি বিশ্বাস করি তুমিই আমার আকাঙ্ক্ষার মহত্তমা তৃপ্তি। আমার এই বিশ্বাস মিথ্যা নয় বলেই আমার জীবনে তোমাকে আপন ক'রে নেবার অধিকার আমি পেয়েছি।

পূর্ণশশিপ্রভার মত পূর্ণ এক বিশ্বাসের জ্যোৎস্না সুপ্রভার প্রীত নয়নের নীলিমায় উদ্ভাসিত হয়। সুপ্রভা বলে—আর কোন সন্দেহ নেই ঋষি। আমার প্রশ্নের সকল কুটিলতা ক্ষমা করুন। আমার মনে আর কোন প্রশ্ন নেই।

অষ্টাবক্র হাসে—কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন আছে সুপ্রভা।

সুপ্রভা—বলুন।

অষ্টাবক্র—তুমিও কি বিশ্বাস কর যে, এই জগতীতলের সকল যৌবনাঢ্য সুন্দরতার মধ্যে আমার কুঙ্কুমাঙ্কিত বক্ষ তোমারও বক্ষের ঐ বিপুলপীবর অভিলাষের শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি? যদি জানি তোমার মন এই ধরণীর যে-কোন রমণীয়চ্ছবি মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলেও শুধু আমারই আলিঙ্গনে তৃপ্ত হতে চায়, তবেই আমি তোমাকে আমার জীবনে আহ্বান করতে পারি সুপ্রভা।

চকিত জ্যোৎস্নার মত হেসে ওঠে সুপ্রভার নয়ন—চন্দ্রকিরণে বিমুগ্ধা হয়েও চক্রবাকী কখনও চন্দ্রমার বক্ষ অন্বেষণ করে না ঋষি, অন্বেষণ করে তার একান্তের সহচর সেই প্রিয়কান্ত চক্রবাকেরই কণ্ঠ। বিশ্বাস করুন ঋষি, আমিও এই সত্যে বিশ্বাস করি যে, আমার কেতকীমালিকার আরাধ্য আপনি, স্বপ্ন আপনি, শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি আপনি। কিন্তু...।

সুপ্রভার কেতকীবাসিত জীবনের স্বপ্ন যেন এক অন্তহীন প্রতীক্ষার

শঙ্কায় হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কবে সমাপ্ত হবে এই ব্যাকুলতার অভিসার? কেতকীমালিকার তৃষ্ণা কি চিরকাল এই ভাবে এক রক্তপাষাণের বাধায় স্তব্ধ হয়ে থাকবে? কবে শেষ হবে কঠোর অঙ্গীকারে শাসিত এই বেদনাবহনের ব্রত?

—কিন্তু আর কতদিন ঋষি? প্রশ্ন ক'রেই সুপ্রভার অভিমানভীরু যৌবনের বেদনা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে দুই নয়নের প্রান্তে দুটি জললবমায়া রচনা করে।

—আজই শেষ দিন সুপ্রভা। অষ্টাবক্রের কণ্ঠস্বরে উচ্ছল এক আশ্বাসের ভাষা হর্ষায়িত হয়। মনে পড়ে সুপ্রভার, পূর্ণ হয়েছে বৎসরকাল। এবং মনে পড়তেই দুই নয়নপয়োবিন্দুর বেদনা জ্যোতিরুদ্ভাসিত রত্নকর্ণিকার মত সুস্মিত হয়ে ওঠে। আজ এই প্রভাতে পিতা বদান্যের কাছে গিয়ে সুপ্রভার পাণি প্রার্থনা করবে সুপ্রভারই কেতকীমালিকার বাঞ্ছিত অষ্টাবক্র।

বদান্য বলেন সুপ্রভার পাণি গ্রহণের অধিকার তোমার নেই।

অষ্টাবক্রের কণ্ঠস্বর হঠাৎ দুঃসহ বিস্ময়ে ব্যথিত হয়ে ওঠে —অঙ্গীকার পালন করেছি, এই সত্য জেনেও আমার প্রার্থনা কেন প্রত্যাখ্যান করছেন মহর্ষি?

বদান্য—নিতান্তই দেহসুখ লাভের অভিলাষে ব্যাকুল হয়েছে তোমাদের উভয়েরই মন, তাই তোমরা বিবাহিত হবার সংকল্প গ্রহণ করেছ।

অষ্টাবক্র—আপনার ধারণা মিথ্যা নয় মহর্ষি।

ঈষৎ শিহরিত ভ্রূকুটি সংযত ক'রে বদান্য বলেন- এই অভিলাষকেই আসক্তি বলে ঋষি।

অষ্টাবক্র—স্বীকার করি মহর্ষি।

বদান্য- আসক্তি সত্য হলেই পরিণয় লাভের অধিকার সত্য হয় না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরীক্ষা সহ্য করতে পারলেও আসক্তিকে কখনও প্রেম বলে স্বীকার করতে পারি না। মানব ও মানবীর জীবন বনেচর মৃগ ও মৃগীর জীবন নয়। আসক্তি দম্পতির মিলিত জীবনের প্রকৃত বন্ধনও নয়।

অষ্টাবক্র—প্রকৃত বন্ধনেরই প্রথম গ্রন্থি।

বদান্য- সে গ্রন্থি নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর।

অষ্টাবক্র—স্বীকার করি না মহর্ষি।

বদান্য—আসক্তির নিষ্ঠা কয়েকটি মুহূর্তের পরীক্ষায় মিথ্যা হয়ে যায়, খর নিদাঘের কয়েকটি মুহূর্তে যেমন শুষ্ক হয়ে যায় ক্ষুদ্রজল গোষ্পদ।

অষ্টাবক্র—সুন্দর আসক্তি কখনও মিথ্যা হয় না মহর্ষি।

বদান্য—কি বললে অষ্টাবক্র?

অষ্টাবক্র—ঠিকই বলেছি মহর্ষি। সুন্দর আসক্তি তপস্বীর সংকল্পের মত নিষ্ঠায় অবিচল। সে আসক্তি সদানীরা তটিনীর বক্ষের মত চিররসে উচ্ছল, নীলাকাশের ক্রোড়ের মত বিপুল মায়ায় অভিভূত। সে আসক্তি পরিচুম্বনচতুর বাসন্ত দ্বিরেফের মনোবাসনার মত পুষ্পে পুষ্পে অবিরল তৃপ্তির উৎসব সন্ধান করে না। সে আসক্তি শুধু তার শ্রেয়সীকে, তার মহত্তমা তৃপ্তিকে সন্ধান করে। সূর্যসুখিনী জলনলিনীর কামনা কোনক্ষণেই দিক্‌ভ্রান্ত হয় না মহর্ষি।

অষ্টাবক্রের মুখের দিকে জ্বালালিপ্ত দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন বদান্য। সহ্য করতে পারেন না অষ্টাবক্রের এই অবিরল হঠভাষণ। দেহজ কামনার চাঞ্চল্যে উদ্‌ভ্রান্ত এক যৌবনবানের আসক্তি যেন গর্বে আত্মহারা হয়েছে, এবং প্রলাপ বর্ষণ ক'রে ঋষি-জীবনের এক পরম নীতিকে বিদ্রূপ করছে!

নীরব হয়ে বসে থাকেন এবং ভ্রূকুটিখিন্ন ললাটের রুক্ষতাকে নিজেরই হস্তের রূঢ় স্পর্শে পিষ্ট ক'রে চিন্তা করতে থাকেন বদান্য, যেন তাঁর মনের গোপনের এক প্রতিজ্ঞার কঠিনতা স্পর্শ ক'রে দেখছেন। না, এই তরুণ ঋষির চিন্তার ভয়ংকর ভুল এবং সেই ভুলের দর্পকে আর এক পরীক্ষায় চূর্ণ ক'রে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কী রূঢ় বিশ্বাস! মানব ও মানবীর জীবনে পতি-পত্নী সম্বন্ধের প্রকৃত বন্ধনের প্রথম গ্রন্থি হলো আসক্তি! হঠবিশ্বাসের দুঃসাহসে মুখর হয়ে উঠেছে চটুলচিন্তক এক ঋষিযুব, এবং সেই দুঃসাহসকেই প্রেমাভিলাষের চেয়েও পরতর আকাঙ্ক্ষা বলে বিশ্বাস করেছে তাঁরই কন্যা সুপ্রভা। এই মিথ্যা বিশ্বাসে উদ্‌ভাসিত মোহ ধূলিসাৎ না ক'রে দিলে জীবনে প্রকৃত প্রেমের পথ ওরা কখনই চিনে নিতে পারবে না।

আর এক পরীক্ষা, কিরাতরচিত লতাজালের মত নয়নরম্য ও মায়াবিকরাল এক পরীক্ষা। সে পরীক্ষাকে স্বয়ং মহর্ষি বদান্যই বহুদিন আগে আয়োজিত ক'রে রেখেছেন। অষ্টাবক্রের সুন্দর আসক্তির উদ্ধত নিষ্ঠা চূর্ণ করবার জন্য দূরান্তরের এক নিভৃতে রচিত প্রবল ও প্রগল্‌ভ এক ছলনা। কেলি-কুতুকিনী প্রমদার কটাক্ষে শিহরিত, অবিধিবশা অবধূর লোল প্রলোভে লসিত, অনধীনা স্বৈরিণীর শীৎকারে শ্বসিত এক জগৎ, যে জগতের একটি মুহূর্তের উদ্দামতার কাছে নতশির হয়ে লুটিয়ে পড়বে যে-কোন মানবের আসক্তির নিষ্ঠা।

এখান হতে অনেক দূরে, নগাধিপ হিমবানের তুহিনধবল শৈলপ্রদেশ ও রত্নাধিপ কুবেরের অলকাপুরীর অলকাবলিমোহিত মহীধরমালারও উত্তরে, মেঘসন্নিভ এক রমণীয় নীলবনে বাস করে প্রবীণা উদীচী। শুক্লাম্বরা,

বিবিধ রত্নাভরণে ভূষিতা, এবং অপাররঙ্গপারঙ্গমা সেই বর্ষীয়সী নিবিড় ভ্রূভঙ্গে যেন মদনমনোন্মদ বিভ্রম ধারণ ক'রে রয়েছে। উত্তর দিগ্‌ভূমির অনল অনিল ও সলিল হতে উদ্ভূত সকল মোহ প্রতিপালনের জন্য এই নীলবনে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছে স্বতন্ত্রা স্ববশা ও চিরকন্যকা উদীচী। সেই নীলবনের পল্লবমর্মরে আসক্তির সঙ্গীত, বিহঙ্গের কলরবে আসঙ্গবাসনার আহ্বান; যেন অবিরল লিপ্সার নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বসিত দ্বিতীয় এক অনঙ্গনিকেতন পথিকনয়নে মোহ সঞ্চারের জন্য মেঘসন্নিভ নীলবনের রূপ ধারণ ক'রে রয়েছে।

প্রবীণা উদীচী মহর্ষি বদান্যের অনুরোধ সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেছে। শুনেছে উদীচী তরুণ ঋষি অষ্টাবক্র বদান্যতনয়া সুপ্রভাকে তার আকাঙ্ক্ষার শ্রেয়সী বলে বিশ্বাস করে। আসক্তির একনিষ্ঠা সগর্বকণ্ঠে ঘোষণা করেছে তরুণ এক ঋষি, শুনে হাস্য সংবরণ করতে পারেনি উদীচী। সেই ঋষির কামনাকে একটি মদবিভ্রমের আঘাতে নিষ্ঠাহীন ক'রে দিতে কতক্ষণ? বহুদিন থেকে প্রস্তুত হয়েই আছে এবং প্রতীক্ষায় দিন যাপন করছে নীলবনচারিণী উদীচী। কবে আসবে অষ্টাবক্র? সেই ভুল স্বপ্নের স্তাবক অষ্টাবক্র?

দূর উত্তরের গগনবলয়ের দিকে দৃক্‌পাত ক'রে মহর্ষি বদান্য যেন তাঁর সংকল্পিত পরীক্ষার ভয়ংকরতাকেই দেখছিলেন। একবার সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আর ফিরে আসবে না অষ্টাবক্র। উদীচীর নীলবনঘন বিভ্রম-নিলয়ের মত্তসুখের অবিরল আলিঙ্গনে চিরকালের নির্বাসন লাভ করবে এই গর্বিত ঋষিযুবার আসক্তি। এবং মূঢ়া কন্যা সুপ্রভাও এই সত্য উপলব্ধি করবে যে, আসক্তি খলাশিখ অনলের মত নিজের নিষ্ঠা নিজেই দগ্ধ করে। আসক্তিকে জীবনের এক দিব্য প্রেমাভরণ বলে মনে ক'রে যে ভুল করেছে সুপ্রভা ভেঙ্গে যাবে সেই ভুল।

দূরান্তরের নভঃপটে কুবেরগিরির ধবলিত শিখর আপন শোভায় উদ্ধত হয়ে রয়েছে, কিন্তু তারও চেয়ে যেন বেশি উদ্ধত তরুণ অষ্টাবক্রের মস্তকে ফুল্লমল্লিকামোদে পুলকিত ধম্মিল্লের শোভা। অষ্টাবক্রের দিকে একবার সহেল ভ্রূকুটি নিক্ষেপ ক'রে যেন এক উদ্ধত আসক্তির প্রতি নীরবে ধিক্কার বর্ষণ করলেন বদান্য।

বদান্য বলেন—আমার একটি প্রস্তাব আছে অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্র—আদেশ করুন মহর্ষি।

বদান্য—কুবেরগিরির উত্তরে রমণীয় এক নীলবনে বাস করেন প্রবীণা উদীচী, চিরকন্যকা উদীচী। আমার ইচ্ছা, তুমি সেই নীলবনে উদীচীর নিলয়ে কয়েকটি দিবস ও রাত্রি যাপন ক'রে ফিরে এস।

অষ্টাবক্র—তারপর মহর্ষি?

বদান্য—যে-দিনের যে-ক্ষণে তুমি ফিরে আসবে, সে-দিনেরই সে-ক্ষণে আমি কন্যা সুপ্রভাকে তোমার কাছে সম্প্রদান করব।

অষ্টাবক্রের নয়ন চকিত হর্ষে উজ্জ্বল হয়—আশীর্বাদ করুন মহর্ষি।

বদান্য—এখনি আশীর্বাদ আশা কর কেন অষ্টাবক্র? সম্প্রদত্তা সুপ্রভার পরিণয়মাল্য গ্রহণ ক'রে তোমরা দু'জনে যে-ক্ষণে আমার সম্মুখে দাঁড়াবে, সেই ক্ষণে তোমাদের মিলিত জীবনকে আমি আশীর্বাদ করব, তার আগে নয়।

অষ্টাবক্র শ্রদ্ধাভিভূতস্বরে নিবেদন করে।—স্বীকার করি মহর্ষি, আপনার আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রে সেই ক্ষণে ধন্য হবে আমাদের জীবনের পরিণয়। একটি অনুরোধ, এখনি আপনার আশীর্বাদ দান না করুন, একটি প্রার্থিত বর দান করুন মহর্ষি।

বদান্য—আমার কাছ থেকে এই মুহূর্তে কোন শুভেচ্ছা আশা করো না অষ্টাবক্র, সেই অধিকার এখনও তুমি পাওনি। যে-ক্ষণে আমার আশীর্বাদ লাভ করবে তোমাদের পরিণীত জীবন, সেই ক্ষণে আমি তোমাদেরই মিলিত জীবনের প্রার্থিত বর দান করব তার আগে নয় অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্র—তথাস্তু মহর্ষি, আপনার এই প্রতিশ্রুতিই আমার আজিকার যাত্রাপথের মাঙ্গল্য।

উত্তর দিগ্‌দেশের অভিমুখে চলে গেল হৃষ্টমানস অষ্টাবক্র। মহর্ষি বদান্যের মনে হয়, এক যৌবনবানের গর্বান্ধ আসক্তি নূতন এক মূঢ়তার আনন্দে চঞ্চলিত হয়ে চলে যাচ্ছে। এক মূর্খ শিশু সর্পের অহংকার নিজ বিষের জ্বালায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নকুল-বিবরের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। আর ফিরে আসবে না অষ্টাবক্র। আশ্বস্ত হয়েছেন বদান্য।

কিন্তু তারপর? আশ্রমের প্রাঙ্গণের উপর অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন বদান্য, যেন তাঁর তাপিত চিন্তার ক্লেশগুলি আর একটি আশ্বাসময় ছায়া খুঁজছে। মূঢ়া কন্যা সুপ্রভারই পরিণামের কথা চিন্তা করেন বদান্য। নয়নমোহে উদ্‌ভ্রান্তা ঐ কেতকীরেণুকুতূকিনী কুমারীও যে তার আকাঙ্ক্ষার ভুল বুঝতে পারে না। কি হবে ওর জীবনের পরিণাম?

দেখতে পেলেন বদান্য, লতাগৃহের দ্বারোপান্তে দাঁড়িয়ে নববসন্তাগমে পুলকিত বনস্থলীর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে সুপ্রভা। শাল রসাল ও শাল্মলীর কান্তিসমারোহের দিকে তাকিয়ে একটি তৃষ্ণা যেন সুস্মিত হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, উপায় আছে, মহর্ষি বদান্য দুঃখিতচিত্তে তাঁর চিন্তার মধ্যে

আর এক পরিকল্পনা আবিষ্কার করেন। তৃষ্ণাচারিণী নারীর সম্মুখে এমনই এক শোভাময় নয়নোৎসব এনে দিতে হবে। অন্য কোন উপায় নেই।

চলেছে অষ্টাবক্র। সিদ্ধচারণসেবিত হিমালয়ে উপস্থিত হয়ে ধর্মদায়িনী বাহুদা নদীর পূতসলিলে স্নান করে অষ্টাবক্র। তারপর ধনপতি কুবেরের কাঞ্চনময় পুরদ্বারে এসে দাঁড়ায়। গন্ধর্বের বাদিত্রনিঃস্বন আর নৃত্যপরা অপ্সরার অবিরল মঞ্জীরশিঞ্জনে মুখরিত যক্ষভবনের সমাদর গ্রহণ করে। তারপর কৈলাস মন্দর ও সুমেরু, একের পর এক সমুদয় পর্বতপ্রদেশ অতিক্রম ক'রে উত্তর দিগ্‌ভূমির প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। বিস্মিত হয়ে দেখতে পায় অষ্টাবক্র, অদূরে এক নীলচ্ছায়াঘন কাননে স্ফুট কুসুমের উৎসব যেন মত্ত হয়ে বিচিত্র বর্ণরাগচ্ছটা উৎসারিত করছে। বিহগকূজনে কম্পিত হয়েও বায়ু যেন এক যৌবনময় বনলোকের নাভিসুরভির ভার ধারণ ক'রে মন্থর হয়ে রয়েছে।

কাননের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে এবং অরণ্যক্রোড়ের নিভৃতে কুবেরনিলয়ের চেয়েও দীপ্ততর রত্নপ্রভায় ভাস্বর এক নিকেতন দেখতে পেয়ে আরও বিস্মিত হয় অষ্টাবক্র। নিকেতনের সম্মুখে মণিভূমিনিখাত সরোবর। পার্শ্বদেশে মন্দাকিনীর কলনিনাদিত প্রবাহের তটরেখা মন্দারকুসুমে অলংকৃত। স্তব্ধ নিকেতনের প্রবেশপথে মুক্তাজালময় তোরণের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত অষ্টাবক্র ডাক দেয়—আমি অতিথি।

অষ্টাবক্রের সেই আহ্বানে যেন উদ্দীপ্ত ফণিমণিরাগের মত চমকে ওঠে সেই অদ্ভুত নিকেতনের প্রভাময় শোভা। শুনতে পায় অষ্টাবক্র, নিকেতনের নীরবতা হতে যেন হঠাৎ ঝংকার দিয়ে জেগে উঠেছে সুপ্তিবিবশ কাঞ্চী কেয়ূর আর মঞ্জীরের উল্লাস। অকস্মাৎ তন্বী তড়িল্লতার চেয়েও চকিতলাস্যচপলা, মন্দাকিনীর জলমালাভঙ্গিমার চেয়েও তরলতর তনুভঙ্গে ছন্দায়িতা, সান্দ্র-সিন্দুররেণুময়ী নবোষার চেয়েও সুনিবিড়স্মিতা সাতটি যৌবনবতী দেহিনী যেন অলক্ষ্য এক স্মরতূণীরের ভিতর হতে হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত হয়ে সাতটি পুষ্প-বিশিখের মত অষ্টাবক্রের বুকের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে।

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ অষ্টাবক্রের দুই নেত্রে যেন বিচিত্র এক সুখের বর্ণালী নর্তিত হতে থাকে। মায়ানিকেতনবাসিনী সাতটি সুযৌবনা যেন সাতটি অঙ্গমাধুরীর অধীশ্বরীর মত অষ্টাবক্রের বিস্ময়কে ধন্য করবার জন্য সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অপলক নয়নে দেখতে থাকে অষ্টাবক্র।

ক্ষামকটিতটে ক্ষীণনিনাদিনী কিঙ্কিণী যেন মণিত রণিত করে, নিধুবনোৎসুকা কে এই বনিতা?

প্রিয় প্রাগল্‌ভ্যে অভীরু ভ্রূলতা বিলোল লালসা হানে; পীনপয়োধরভারে অলসা, কে এই ললনা?

বদন যেন সুষমাসদন, মদায়িত স্মরামোদানিদান, বিবশ বাসনা হাসে, রাকাশশিমুখী রুচিরময়ী কে এই নারী?

অপাঙ্গে ভঙ্গিমা ঝরে, অনঙ্গে উন্মাদ করে, আসঙ্গ আহবে উন্মুখিনী, রভসরঙ্গিনী কে এই অঙ্গনা?

কিবা গ্রীবাগৌরিমা সিতমলয়জে অভিরামা অনুপ রূপের অনল গোপন করে, কে এই রামা?

ক্ষণ ঈক্ষণে বহ্নি শিহরে, রাতুল অধরে তনুশোণিমার স্ফার জ্যোৎস্না স্ফুরে, মুনিমনোবনে প্রালেয়কারিণী কে এই কামিনী?

শ্বশাসিত যৌবন অশেষ উল্লাসে লসিত করে নিঃশ্বাস, নীবিবন্ধবিহীনা বিশ্লথবেণী ব্রীড়াবিবর্হিতা তন্বঙ্কা, কে এই ভামিনী?

তরুণ ঋষির নয়নে বিস্ময়। যেন বিগলিত ইন্দ্রধনুর মায়ানুরাগে রঞ্জিত কাদম্বিনীর সুষমা ভূতলে লুটিয়ে পড়েছে, এবং সেই সঙ্গে সাতটি খরবাসনার বিদ্যুৎ। লীলাভঙ্গে চঞ্চল সেই সাত রূপসীর অবয়বশোভার দিকে তাকিয়ে অষ্টাবক্রের বিচলিত বক্ষের সমীর মুগ্ধ হয়ে যায়।

মণিবলয়ের চকিত ঝংকারে তরুণ ঋষির দুই উৎসুক শ্রবণ নন্দিত ক'রে সাত সুন্দরী অভিবাদন জানায়।—উত্তর দিগ্‌ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী উদীচীর এই নিকেতনে প্রবেশ করুন বরেণ্য।

বংশীনিনাদে মোহিত তরুণ কুরঙ্গের মত দুর্নিবার কৌতূহলে অভিভূত অষ্টাবক্র সাত সুন্দরীর মঞ্জীরিত চরণের ধ্বনি অনুসরণ ক'রে নিকেতনের ভিতরে প্রবেশ করে, এবং দেখতে পায়, রত্নপর্যঙ্কের উপরে সমাসীন হয়ে রয়েছেন শুক্লাম্বরা এক বর্ষীয়সী। সীমন্তে সিন্দুরের রেখা নেই, কিন্তু দেহ বিবিধ হেমময় আভরণে বিভূষিত। দেখে মনে হয় প্রবীণার আভরণের মধ্যে জগতের সকল কলধ্বনির মুখরতা যেন এক উৎসবের প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে।

বর্ষীয়সী বলে—আমি চিরকুমারী উদীচী।

অষ্টাবক্র—আমি ঋষি অষ্টাবক্র, মহর্ষি বদান্যের আদেশে আপনার ভবনের অতিথি হতে চাই।

উদীচী—আমার সৌভাগ্য। আমি ধন্য হব ঋষি, যদি এই ভবনের অতিথি হয়ে আপনি আমার সমাদর গ্রহণ করেন।

অষ্টাবক্র—গ্রহণ করতে চাই চিরকুমারী।

উদীচী—আমি প্রীত হব ঋষি যদি আমার সমাদরে আপনি প্রীতি লাভ করেন।

অষ্টাবক্র—প্রীতি লাভ করতে ইচ্ছা করি উত্তরদিগ্‌দেবী।

গ্রীবাভঙ্গে ঝংকৃত হয়ে, স্মিতায়ত অধরের স্পন্দন মুক্তাপংক্তিরও চেয়ে খরোজ্জ্বল দশনরেখার মৃদু দংশনে আহত ক'রে উদীচী বলে। আদেশ করুন ঋষি। বলুন, কি চায় আপনার ঐ সুন্দর নয়নের বিস্ময়? আপনার প্রীতি সম্পাদনের জন্য উত্তরদিগ্‌ভূমির সকল প্রীতির সুধাসাররসিতা উদীচী আপনারই কণ্ঠস্বরের একটি নির্দেশ শুধু শুনতে চায়।

অষ্টাবক্রের নিমেষবিহীন দুই নেত্রের নিবিড় বিস্ময় অকস্মাৎ চঞ্চল হয়। নারীর দুই ভ্রূবল্লী যেন দুটি বিলোল অলস, আসক্তিরই এক অভিনব ভঙ্গিমনোহর রূপচ্ছবি। বর্ষীয়সীর সেই ভ্রূভঙ্গীর মধ্যে যেন কোটি মদিরাক্ষীর কটাক্ষপীযূষ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে।

নীরব অষ্টাবক্রের দুই নেত্রের কৌতূহল চমকে দিয়ে প্রশ্ন করে উদীচী। বলুন ঋষি, কি চায় আপনার বক্ষের ঐ ঝঞ্ঝায়িত নিঃশ্বাস, পুলকাঞ্চিত কপোল আর অধীর অধরসীধু?

অষ্টাবক্র বলে—ক্ষণকালের মত আপনার সান্নিধ্য চাই।

বিভ্রমসঞ্চারিণী বর্ষীয়সীর ভ্রূকৌতুকে যেন সকল স্বপ্নের আনন্দ বিপুল হয়ে উৎসারিত হয়। উচ্চকিত স্বরে প্রশ্ন করে উদীচী—শুধু আমারই সান্নিধ্য?

অষ্টাবক্র—হ্যাঁ চিরকুমারী।

সেই মুহূর্তে সাত সুন্দরীর চরণমঞ্জীরের ঝংকারিত ধ্বনিও যেন ব্যাধবর্ধিতচিত্তের উল্লাসের মত হর্ষায়িত হয়। অষ্টাবক্রের অভিভূত মুখচ্ছবির দিকে, যেন এক পাশবদ্ধ বনকুরঙ্গের অসহায় মূর্তির দিকে সহেলচ্ছুরিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে হেসে ওঠে উদীচীর অনুচারিণী সাত সুন্দরী, পর মুহূর্তে কাছ হতেই চলে যায়।

মণিজ্যোতিবিহ্বল মায়াভবনের একটি একান্ত, যেন জগতের সকল লোকলোচনের শাসন হতে মুক্ত একটি নিভৃত এবং সেই নিভৃতের অন্তরে মীনকেতুর নূতন কেতনের মত বিজয়াবহ আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে লীলাসঙ্গচতুরা এক বর্ষীয়সীর মসীনিবিড় ভ্রূপতাকা। উদ্‌ভ্রান্তির বন্ধনে রচিত একটি সান্নিধ্য। শুধু অষ্টাবক্র ও উদীচী, আর কেউ নয়। এই নিভৃতের আকাঙ্ক্ষাকে কোন প্রশ্নের স্পর্শে ব্যথিত করতে পাবে, এমন কোন ছায়াও এখানে নেই।

উদীচী বলে—আমার সান্নিধ্য পেয়েছেন ঋষি, এইবার বলুন, কি অভিলাষে বিহ্বল হয়েছে আপনার কুঙ্কুমপিঞ্জরিত বক্ষের স্বপ্নভার?

অকস্মাৎ যেন নিজেরই বক্ষের তপ্ত নিঃশ্বাসের আঘাতে চঞ্চল হয়ে, পাবকতাপে উত্তাপিত শিশুভুজঙ্গের মত ব্যথিত হয়ে নিবেদন করে অষ্টাবক্র।—স্নানোদক চাই কুমারী।

কল্লোচ্ছলা স্রোতস্বতীর মত তরলহাস্যে শিহরিত হয় উদীচীর কণ্ঠস্বর। —স্নানোদকে শীতল হতে পারবেন না ঋষি। বলুন, কি চায় আপনার জ্বালা-নিঃসারী নিঃশ্বাসের ঝঞ্ঝা, স্ফুর অধরের সুশোণ রৌদ্র, আর বহু কেতকীর গন্ধে পীড়িত ভুজভুজঙ্গের হিল্লোল?

নীলবনের ছায়াঘন রহস্যের কুহরে লুক্কায়িত সেই মণিময় মায়াভবনের বাহিরে নীড়াগত বিহগের ক্লান্ত কূজনস্বর শোনা যায়। সন্ধ্যা হয়েছে। অষ্টাবক্রের কণ্ঠস্বর যেন শিহরিত হয়ে আবেদন করে।—সন্ধ্যা পূজার জন্য আসন চাই কুমারী।

হেসে ওঠে ঝংকারময়ী উদীচী—এই রত্নপর্যঙ্কে উপবেশন করুন ঋষি।

চমকে ওঠে অষ্টাবক্র, এবং অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে। উদীচী বলে।—এই তো যথার্থ আসন। উত্তর দিগ্‌ভূমির নীলবনের ছায়ায় আবৃত এই সুখময় জগতে সন্ধ্যাবন্দনার জন্য কর্কশ কুশতৃণে রচিত আসনের প্রয়োজন হয় না ঋষি। এই জগতের সন্ধ্যাও মন্ত্র স্তব আর জপমালায় বন্দিত হতে চায় না।

রত্নপর্যঙ্কের উপর উপবেশন করে অষ্টাবক্র। আরও সুন্দর হয়ে ওঠে উদীচীর দুই ভ্রূবল্লীর বিলোল ভঙ্গিমা। বর্ষীয়সী উদীচীর কজ্জলমসিমদির দৃষ্টিও যেন নিবিড় সমাদর বর্ষণ ক'রে অষ্টাবক্রের বিচলিত চিত্তের তৃষ্ণাকে আশ্বাস দান করতে থাকে।

বিমুগ্ধ অষ্টাবক্র। নীলবনঘন অভিনব লালসার জগতে এক মায়াভবনের মণিপ্রদীপের প্রখর দ্যুতিনখরের স্পর্শে যেন উচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে অষ্টাবক্রের সকল স্মৃতির সৌরভ। মনেও পড়ে না অষ্টাবক্রের, ত্রিলোকের কোন উপবনের লতাচ্ছায়ে সুযৌবনা এক অনুরাগিণী নারীর অভিলাষ অষ্টাবক্রের জন্য নয়নে অমেয় মায়া সঞ্চিত ক'রে প্রতীক্ষায় রয়েছে। ভুলেই গিয়েছে অষ্টাবক্র, জীবনের কোন প্রভাতবেলায় কোন বননিভৃতের একান্তে তরুণ তপনের আলোকে শ্রেয়সীর যৌবনগরীয়সী কান্তির কল্লোলিত সুষমাকে মহত্তমা তৃপ্তি বলে চিনতে পেরেছিল অষ্টাবক্র। অষ্টাবক্রের দুই চক্ষু হতে কেতকীরেণুবাসিত এক ভঙ্গুর স্বপ্ন যেন বর্ষীয়সী লালসাময়ীর মদির ভ্রূলাস্যের একটি কঠোর আঘাতে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

আর একবার চমকে ওঠে অষ্টাবক্র। উল্লাসচপল অথচ নিবিড়কোমল এবং হর্ষায়িত এক স্পর্শের উৎসব যেন হঠাৎ এসে অষ্টাবক্রের বুকের উপর লুটিয়ে পড়েছে। উদীচীর উদ্যত দুই বাহু অকস্মাৎ মত্ত হয়ে আভরণমুখর মাল্যের মত ঝংকার দিয়ে কঠিন আলিঙ্গনে গ্রহণ করেছে অষ্টাবক্রের কুঙ্কুমবাসিত কণ্ঠ, যেন গরলপ্রগল্‌ভা ব্যালবধূর সন্তাপিত দেহ চন্দনতরুর দেহ জড়িয়ে

ধরেছে। অষ্টাবক্রের দুই চক্ষুর বিবশ বিস্ময়ের সম্মুখে শুধু ভাসতে থাকে প্রবীণা কেলিকলানিপুণার মসিমদির ভ্রূভঙ্গীর বিলোল অলজ্জা।

উদীচী বলে—বল ঋষি সকল কুণ্ঠা অপহৃত ক'রে মুক্তকণ্ঠে বল, উত্তর দিগ্‌ভূমির সুন্দর সন্ধ্যার এই মধুরক্ষণে কি চায় তোমার যৌবনাঞ্চিত জীবনের আকাঙ্ক্ষা?

অষ্টাবক্র—তৃপ্তি চায় কুমারী।

উদীচী—সে তৃপ্তি এখানেই আছে ঋষি। এই রত্নপর্যঙ্কের পুষ্পশয্যায় কোন নিশীথবিহ্বলতার বক্ষে সে তৃপ্তিকে অবশ্যই দেখতে পাবে. প্রতীক্ষায় থাক ঋষি।

অষ্টাবক্র—প্রতীক্ষায় থাকতে পারি, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দাও চিরকুমারী, আমার আজিকার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিকে আমার চক্ষুর সম্মুখে এনে দেবে তুমি।

কুটিল হাস্য বিচ্ছুরিত ক'রে উদীচীর অধরপুট শিহরিত হতে থাকে। —প্রতিশ্রুতি দিলাম ঋষি। কিন্তু শপথ কর ঋষি তোমার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিকে সম্মুখে পেলে তাকে জীবনের চিরসহচরী ক'রে নেবে।

অষ্টাবক্র-নেব, শপথ করলাম চিরকুমারী।

দূর উত্তরের দিগ্‌বলয়ে অলক বলাহকে বিভ্রাজিত আকাশপটের দিকে তাকিয়ে মহর্ষি বদান্যের দুই চক্ষুর আক্ষেপ হঠাৎ হাস্যায়িত হয়ে ওঠে। সুন্দর আসক্তির গর্বে উদ্ধত সেই অষ্টাবক্র আর ফিরে এল না। অনুমান করতে পারেন বদান্য, এতদিনে সেই হঠভাষী ঋষির সুখকামুক অভিলাষের একনিষ্ঠা এক কজ্জলমসিমদিরার ভ্রূভঙ্গের গরলে প্রলিপ্ত হয়ে নীলবনের একান্তে নির্বাসন লাভ করেছে।

দিবসের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিবস, একের পর এক বহু দিবস-রাত্রি অতীত হয়েছে। বহু কুহেলিকালসা সন্ধ্যায় পুলকবন্ধুর বনদ্রুমদেহ হতে শিথিল মঞ্জরীর ভার ভূতলে লুটিয়ে পড়েছে। যেমন রাকেন্দুবন্দিত রজনীর, তেমনি তরুণ তপনে নন্দিত প্রভাতের রশ্মিরাশি কলস্বনা স্রোতস্বিনীর দুই তটের শিশিরসিক্ত তৃণভূমির বক্ষে হেসেছে। কিন্তু সেই সুন্দর আসক্তির মানুষ, সুপ্রভার কেতকীমালিকার স্বপ্ন সেই অষ্টাবক্র সেই বনপথে আর আসে না। শুধু আসে আর ফিরে যায় সুপ্রভা। বৃথা প্রতীক্ষায় ব্যথিত হয় কেতকীমালিকার সুরভি। কোথায় গেল কেন গেল, এবং কবে ফিরে আসবে সুপ্রভার কামনার বাঞ্ছিত সেই কুঙ্কুমিততনু ঋষি সুকুমার? কল্পনাও করতে পারে না সুপ্রভা, এবং বুঝতেও পারে না, সেই একনিষ্ঠ অভিলাষ

কেমন ক'রে তারই শ্রেয়সীর অধরসুষমা না দেখতে পেয়েও শান্তচিত্তে দূরে সরে থাকতে পারে?

বদান্যের তপোবনস্থলীর উপান্তে এক লতাবৃত কুটীরের নিভৃতে মৃদু-দীপশিখার দিকে তাকিয়ে বিহঙ্গের সান্ধ্য কূজন শোনে সুপ্রভা। কেতকী-মালিকার সুরভি সুপ্রভার চিন্তাপীড়িত নয়নের মত জাগরণে যামিনী যাপন করে। প্রিয়বিচ্ছেদভীরু চক্রবাকীর মত চকিতশ্বসিত বক্ষের সন্দেহ শান্ত করবার জন্য কুটীরের দ্বারোপান্তে দাঁড়িয়ে সুপ্রভার সমগ্র অন্তর যেন উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু বৃথা; কোন প্রিয় পদধ্বনি কোন গুঞ্জন, মৃদুতম কোন মর্মরও শোনা যায় না। কুঙ্কুমাঙ্কিত কোন বক্ষের বিহ্বল নিঃশ্বাস বদান্য-তনয়ার কবরীসৌরভ অন্বেষণের জন্য মৃদুল নিঃস্বন সঞ্চারিত ক'রে লতাগৃহের দিকে আসে না।

অষ্টাবক্রের রহস্যময় অন্তর্ধান সুপ্রভার সকলক্ষণের ভাবনার আকাশে যেন এক মেঘমেদুরতা ঘনিয়ে রেখেছে। সবই সহ্য করতে পারে সুপ্রভা, শুধু সহ্য করতে পারে না একটি সংশয়। তীক্ষ্মমুখ কুশসায়কের মত সেই সংশয় যখন সুপ্রভার কল্পনাকে বিদ্ধ করে, তখনই সবচেয়ে বেশি বিচলিত হয় সুপ্রভার অন্তরের প্রশান্তি। মনে হয় সুন্দর অথচ কপট এক আসক্তির হঠভাষিত প্রতিশ্রুতি নিষ্ঠুর বিদ্রূপে সুপ্রভার কণ্ঠের কেতকীকে তুচ্ছ ক'রে চলে গিয়েছে। নয়নোপান্তে অদ্ভুত এক জ্বালাময় সিক্ততা অনুভব করে সুপ্রভা। মনে হয়, অশ্রু নয়, তারই যৌবনের প্রথম অনুরাগে উদ্দীপ্ত বিশ্বাস যেন নিষ্ঠাহীন এক পৌরুষের চটুল কৌতুকলীলার আঘাতে মথিত হয়ে রুধিরবিন্দুর মত ফুটে উঠেছে।

এইভাবে প্রতিক্ষণ সংশয়খিন্ন ভাবনার ভার নীরবে সহ্য ক'রে, আর সুপ্তিহীন নয়নের কৌতূহল নিয়ে প্রতি নিশান্তের আকাশে ও বনতরুশিরে নবোষার অরুণিত সঞ্চার লক্ষ্য করে সুপ্রভা। দীপ নিভিয়ে দেয়, স্নান সমাপন করে। পুষ্পে ও পরাগে প্রসাধিত তনুতে যেন এক নূতন আশার আবেশ ভরে ওঠে। বনানিভৃতের এক রক্তপাষাণের নিকটে এসে দাঁড়ায় সুপ্রভা। দেখতে পায়, রক্তপাষাণের বক্ষের উপর কোমল দ্রুমমঞ্জরীর পুঞ্জ ছিন্নভিন্ন হয়ে রয়েছে, যেন পদাঘাতে পীড়িত এক বাসকশয্যা। আসেনি অষ্টাবক্র, কে জানে ত্রিজগতের কোন্ বনলোকের নিভৃতে কোন্ স্রোতস্বিনীর কাছে এখন তৃষ্ণার্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই আসক্তির পুরুষ অষ্টাবক্র?

চলে যায় সুপ্রভা, এবং এক নিশান্তে লতাগৃহের দীপ নিভিয়ে দিয়েও চুপ ক'রে বসে থাকে। ব্যর্থ অভিসারে শুধু চরণ ক্লান্ত ক'রে আর লাভ কি? অতনুতাপিত তনুর দুর্ধর তৃষ্ণা অধরে ধারণ ক'রে ঐ রক্তপাষাণের কাছে ছুটে

যাবার আর কিবা প্রয়োজন? সুপ্রভা যেন কল্পনায় তার হতমান আকাঙ্ক্ষার শোণিম বেদনার দিকে অমেয় মায়ায় অভিভূত নয়নের করুণা নিয়ে তাকিয়ে থাকে। মনে হয়, ব্যর্থ অভিসারে আহত তার যৌবনময় জীবন যেন অধঃপতিত জ্যোৎস্নার মত ধূলিপুঞ্জের উপর পড়ে রয়েছে।

এই অবহেলার ধূলিময় মালিন্য হতে মুক্ত হবার জন্য হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে সুপ্রভার মন। আকাশের শেষ তারকা নিভেছে, বনতরুশিরে প্রভাময় ঊষাভাস দেখা দিয়েছে। স্নিগ্ধ স্নানোদকের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে সুপ্রভার তাপিত দেহের তৃষ্ণাগুলি। লতাগৃহ হতে বের হয়ে আশ্রমতড়াগের নিকটে এসে দাঁড়ায় সুপ্রভা।

তড়াগসলিলে দেহ নিমজ্জিত ক'রে স্নান করে সুপ্রভা। সুতনুকা সুপ্রভার অনাবরণ অঙ্গশোভা যেন মৃণালবন্ধনচ্যুত স্ফুট কোকনদের মত সলিলের শীতল সিক্ততায় লিপ্ত হয়ে তড়াগের বক্ষে হিল্লোলিত হতে থাকে। অকস্মাৎ চমকে ওঠে সুপ্রভা, দুই নেত্রে যেন নূতন এক বিস্ময়ে বিকশিত কৌতূহল অপলক হয়ে তড়াগতটের পুষ্পময় বীথিকার দিকে তাকিয়ে থাকে।

নবপ্রভাতের আলোকে তারুণিত তটবীথিকায় অপরিচিত পথিকের মূর্তি দেখা যায়। একজন নয়, দুই জনও নয়, অনেক জন। একে একে আসে, আর আশ্রমস্থলীর প্রাঙ্গণের দিকে চলে যায়। সুন্দরদর্শন এক এক জন ঋষিযুবা। দেখতে পায় সুপ্রভা, কোন আগন্তুকের কপোলমণ্ডল যেন ঊষালোকে লিপ্ত ঐ পূর্বাকাশের মত নবীনযৌবনরাগে উদ্ভাসিত। কোন জনের বিশাল বক্ষঃপটে রক্তচন্দনের আলিম্পন যেন পুষ্পহাস শাল্মলীর কান্তিচ্ছটা রম্যতর আশ্রয় লাভের লোভে সেই উন্নতকায় ঋষিযুবার বক্ষের উপর এসে লুটিয়ে পড়েছে। ইন্দীবর-বিনিন্দিত দুই নীলনিবিড় নয়নে কম্র কামনার কল্লোল, কে ঐ তরুণ ঋষি? কুসুমস্রগাসক্ত কণ্ঠ আর স্মিত দশনদ্যুতি নিয়ে চলে যায়, কে ঐ পুরুষপ্রবর, ঋতুরাজশ্রীরাজিত রতিরাজোপম সুকান্ত?

সলিললীন দেহের স্নানোৎসুক চাঞ্চল্য সংযত ক'রে তড়াগকমলের মণ্ডল আলিঙ্গন করে সুপ্রভা, যেন হিল্লোলিত কোকনদের প্রাণ এক আকস্মিক বিস্ময়ে বিবশ হয়ে গিয়েছে। কমলবনের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কমলাননা ঋষিকুমারী যেন সূর্যালোকিত এক স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে আছে। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে এক তৃষ্ণার কুসুম। কিংবা, সুপ্রভার সিক্তোজ্জ্বল ঐ দুই আভগ্ন নয়ন যেন যামিনীচারিণী এক চক্রবাকীর চক্ষু, চন্দ্রালোকে লিপ্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে তার নিজেরই বক্ষের উষ্ণশ্বাসময় অথচ মধুরায়িত এক বেদনার উৎসব লক্ষ্য করছে। দুঃসহ এই বেদনা, যেন স্ফুট কোকনদের সৌরভময় আকাঙ্ক্ষার বক্ষে এক তৃষ্ণাকুল ঝঞ্ঝানিলের নিঃস্বন সঞ্চারিত হয়েছে।

অনেকক্ষণ সুপ্রভার দেহ-মন যেন এক অভিনব স্বপ্নের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ দেখতে পায় সুপ্রভা, তটবীথিকা জনহীন হয়ে গিয়েছে। নূতন এক বিস্ময় ও বিমুগ্ধতার ভার বক্ষে বহন ক'রে লতাগৃহের দিকে ফিরে যায় সুপ্রভা।

—প্রস্তুত হও কন্যা।

লতাগৃহের দ্বারোপান্তে এসে আর-এক আকস্মিক রহস্যের আহ্বান শুনে চমকে ওঠে সুপ্রভা। প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন মহর্ষি বদান্য।

বদান্য বলেন—প্রস্তুত হও সুপ্রভা, তুমি আজ পতি বরণ ক'রে ধন্য হবে। এই প্রভাতের শুভক্ষণে তোমার জন্য স্বয়ংবরসভা আহূত হয়েছে। জ্ঞানী গুণী ও প্রিয়দর্শন বহু ঋষিযুবা আমার আহ্বানে আশ্রমোপবনে সমবেত হয়েছেন।

সুপ্রভার বিস্মিত ও বিমুগ্ধ নয়নের তৃষ্ণালস দৃষ্টি চকিত তড়িল্লেখার মত ক্ষণলাস্যে দীপ্ত হয়ে পরক্ষণে সলজ্জ ঘনপক্ষ্মভারে অবনত হয়। মহর্ষি বদান্যের নেত্রে বিচিত্র এক শ্লেষের ছায়া ফুটে ওঠে। সুপ্রভার উৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে এই সত্যই দেখতে থাকেন বদান্য, আসক্তির কেতকীও কেমন ক'রে আর কত সহজে নিষ্ঠা হারায়। জয়ী হয়েছে মহর্ষির চিন্তার সেই রক্তপাষাণসদৃশ কঠিন তত্ত্ব আসক্তি কখনই একনিষ্ঠা স্বীকার করে না।

কেতকীমালিকা হাতে তুলে নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে সুপ্রভা। বনস্পতিময় উপবনের কাছে গিয়ে প্রিয়দেহ সন্ধানের জন্য আগ্রহের শিহর সহ্য করছে এক যৌবনবতীর দেহলতিকা। বনমৃগীর মত শুধু দেহজ অভিলাষের আবেশে জীবনসঙ্গী বরণ করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে এক ঋষিতনয়ার চিত্ত। দুঃখিত হন বদান্য। ঋষির আশ্রমের শিক্ষায় লালিত হয়েও প্রেম ও অপ্রেমের প্রভেদ অনুভব করবার মত মনের অধিকারিণী হতে পারেনি তাঁর কন্যা। মনোময়ী নয়, নিতান্তই এক নয়নময়ী। যার মুখ দেখে মুগ্ধ হয় নয়ন, তারই কণ্ঠে জীবনের বরমাল্য দান করে।

দুঃখিত হয়েও চিন্তার গভীরে একটি হর্ষের সঞ্চার অনুভব করছিলেন বদান্য। আসক্তি কখনও একনিষ্ঠা স্বীকার করে না, এই সত্য আজ স্বীকার করবে সুপ্রভা। সুপ্রভার জীবনের একটি মিথ্যা বিশ্বাসের মোহ সুপ্রভা আজ নিজের হাতেই চূর্ণ ক'রে দিতে চলেছে। আর সময় নেই, শুভলগ্ন উপস্থিত।

বদান্য বলেন—এস কন্যা।

মরালীর মত মৃদুলগতি, অথচ নয়নে খঞ্জনবধূর চঞ্চলতা, সুপ্রভা ধীর-সঞ্চারিত চরণে মহর্ষি বদান্যের ছায়া অনুসরণ ক'রে স্বয়ংবরসভার দিকে

এগিয়ে যেতে থাকে। কেতকীমালিকার সুরভিত ও বিমুগ্ধ তৃষ্ণা তৃপ্তি লাভের জন্য নূতন এক জগতের দিকে চলেছে।

নীলবনের মায়াভবনের মণিদীপিত কক্ষে রত্নপর্যঙ্কের উপর নিদ্রাভিভূত ঋষি অষ্টাবক্র। বাহিরে নিবিড় সন্তামসী রাত্রির অন্ধকার। পিকরবের শেষ ঝংকারও ক্লান্ত হয়ে নীলবনের অন্ধকারে সুপ্তিময় স্তব্ধতার মধ্যে নীরব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সুপ্ত অষ্টাবক্র যেন এক জ্যোৎস্নাময় উপবনের শোভা দেখছে, আর শুনছে মধুর পিকধ্বনির সঙ্গীত। বক্ষঃপুটে সঞ্চিত সকল কামনার পরাগ, ধমনীধারায় উচ্ছলিত সকল অনুরাগের শোণিমা এবং নিঃশ্বাসে আকুলিত সকল সুধার সমী যেন তৃপ্তিরসবহুল এক অধরশোভাকে নিকটে পেয়েছে। দেখছে অষ্টাবক্র, চঞ্চল দক্ষিণসমীরের প্রবল কৌতুকে শিথিলিত হয়েছে এক নিবিড় নীবিতটের নীলাংশুক মেখলা। বহুলচিকুরচ্ছায়া ও বিপুলনয়ন-মায়ার এক উচ্ছ্বাসময়ী ছবি। সে নারীর পুষ্পহারের সলজ্জ শাসন দীর্ণ হয়ে গিয়েছে, এক অশান্তা অভিসারচারিণীর বক্ষোজ বাসনা যেন সুপীন বিহ্বলতা উৎসারিত ক'রে উৎসবের উৎসর্গ হবার জন্য উৎসুক হয়ে অষ্টাবক্রের বুকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অষ্টাবক্রের স্বপ্নই সুরভিত হয়ে গিয়েছে। কি আশ্চর্য, সেই সুরভি যে এক কেতকীমালিকার সুরভি! অষ্টাবক্রের আকাঙ্ক্ষার মহত্তমা তৃপ্তি! সেই তৃপ্তিকে বক্ষোলগ্ন করবার জন্য সাগ্রহে বাহু প্রসারিত করে অষ্টাবক্র। ভেঙ্গে যায় স্বপ্নের আবেশ, চমকে জেগে ওঠে অষ্টাবক্র।

সেই মুহূর্তে এক হাস্যাধরার সুস্বর ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে।—আমি এসেছি ঋষি।

কে তুমি? বিস্ময়ে কম্পিতকণ্ঠ অষ্টাবক্র প্রশ্ন ক'রেই দেখতে পায়, রত্নপর্যঙ্কের উপর তারই বক্ষের সন্নিধানে এসে বসে রয়েছে উদীচী। বর্ষীয়সীর মূর্তি নয়, যৌবনরুচিরা ও সুচারুদেহিনী এক নবীনার নয়নমনোহারিণী মূর্তি। সেই ঝংকারমুখর মণিময় আভরণের ভার যেন ঝরে পড়ে গিয়েছে। তড়িল্লতার মত নিরাভরণা সুন্দর এক বহ্নির লতিকা অনাবরণ তনুতনুর লাস্য স্ফুরিত ক'রে অষ্টাবক্রের বুকের কাছে এসে লুটিয়ে পড়েছে। যেন খরকামনার সুবর্ণকশা।

—তুমি উদীচী? অষ্টাবক্রের কণ্ঠস্বরে আহত স্বপ্নের বেদনা কম্পিত হতে থাকে।

—হ্যাঁ ঋষি, আমিই তোমার তৃপ্তি। অষ্টাবক্রের মুখের দিকে নয়নকিরণ বর্ষণ করে নীলবনের মায়া দিয়ে রচিত কামনাময়ী তরুণী।

অষ্টাবক্র বলে—মিথ্যা বিশ্বাসে উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছ উদীচী। তুমি আমার তৃপ্তি হতে পার না।

উদীচীর খরনয়নের হর্ষ হঠাৎ আহত হয়।--সত্য স্বীকার কর ঋষি। তোমার ঐ তৃষ্ণাকাতর দুই চক্ষুর দৃষ্টি আমার এই দেহচ্ছবির দিকে নিবদ্ধ ক'রে বল দেখি ঋষি, বিচলিত হয় না কি তোমার আসক্তিময় বক্ষের নিঃশ্বাস?

অষ্টাবক্র—বিচলিত হয়, অস্বীকার করি না উদীচী।

উদীচী—মুগ্ধ হয় না কি ঋষি?

অষ্টাবক্র—মুগ্ধ হয়, স্বীকার করি উদীচী। কিন্তু আমার এই বিচলিত নিঃশ্বাসের শান্তি তুমি নও। আমার এই বিমুগ্ধ চিত্তের তৃপ্তি তুমি নও। আমার তৃপ্তি কেতকীবেণুপবিমলে সুরভিত হয়ে আমারই প্রতীক্ষায় এই জগতের এক আশ্রমস্থলীর লতান্ত কুটীরের নিভৃতে রয়েছে।

উদীচী—কে সে?

অষ্টাবক্র—মহর্ষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভা।

উদীচী—সে কি এই উদীচীর চেয়েও সুন্দরতর অধরের, মদিরতর ভ্রূভঙ্গের আর খরতর নয়নপ্রভার নারী?

অষ্টাবক্র—না উদীচী, তবু এই সত্য তোমারই নীলবনবন মধ্যালোকের এই মণিদীপ্ত ভবনের কক্ষে, তোমারই সমাদরে কোমলীকৃত এই বরপর্যঙ্কে সুশয়ান এক স্বপ্নময় অনুভবের মধ্যে উপলব্ধি করেছি, সেই বদান্যকন্যা সুপ্রভাই আমার আকাঙ্ক্ষার মহত্তমা তৃপ্তি।

উদীচীর দৃষ্টি যেন বহ্নি উৎসারিত করে। আমি অতৃপ্তি?

অষ্টাবক্র—তুমি বান্ধবী।

অভাবিত বিস্ময়ে নম্র হয়ে যায় উদীচীর দৃষ্টি।—কি বললে ঋষি?

অষ্টাবক্র—তৃষ্ণাকে তৃষ্ণায়িত কর বাসনাকে দাও বহ্নি, অয়ি কেলিকটাক্ষ লক্ষ্মী তন্বী, তুমি মনোভবভবনের খরদ্যুতিময়ী দীপ্তি। কামিজনচিত্ত কর পুলকিত বিপুল মধুর হর্ষে, তুমি ভ্রূভঙ্গময়ী প্রীতি। অভিলাষে কর উল্লসিত নিঃশ্বাসে দাও ঝঞ্ঝা, তুমি মদবিলসিত উৎসব। তোমারই সমাদরে মদিরায়িত আমার স্বপ্ন কেতকীরেণুর সুরভি বক্ষে ধারণ করবার জন্য বাহু প্রসারিত করেছে। ব্যাকুল করেছ বিহ্বল করেছ, আমার তৃষিত নয়নপথে তুমিই তাকে ডেকে এনে চিনিয়ে দিয়েছ, যে আমার আসক্তির উপাসনা, মহত্তমা তৃপ্তি, শ্রেয়সী। তুমি আমার বান্ধবী, অষ্টাবক্রের কৃতজ্ঞ অন্তরের শ্রদ্ধা গ্রহণ কর উদীচী।

উদীচীর দুই নয়নের পক্ষ্মপল্লবে যেন কুহেলিকাপীড়িত এক শীতসন্ধ্যার বেদনা শিশির সঞ্চারিত করে। উদীচী বলে—নীলবনলোকের এই চিরকুমারীকে

যদি বান্ধবী বলে মনে ক'রে থাক ঋষি, তবে তাকে জীবনের চিরসঙ্গিনী ক'রে নাও। তোমাকে পতিরূপে বরণ করুক উদীচী।

অষ্টাবক্র—তা হয় না, ক্ষমা কর উদীচী।

উদীচীর কণ্ঠস্বর তীব্র আর্তনাদের মত বেজে ওঠে।—তোমার আসক্তিময় বক্ষের কঠিন নিষ্ঠার নিষ্ঠুরতা অন্তত এই মুহূর্তে বর্জন কর ঋষি। আমাকে ক্ষণকালের প্রেয়সীরূপে গ্রহণ কর। তার পরে চলে যেও যেথা যেতে চায় তোমার আকাঙ্ক্ষা, দূরের আশ্রমবাসিনী সেই সুপ্রভাময়ী এক অমেয় মায়ার পূর্ণিমার কাছে।

অষ্টাবক্র—অসম্ভব, ক্ষমা কর বিদায় দাও বান্ধবী।

—যাও! জ্বালাধ্বনির মত তীব্রস্বরে যেন ধিক্কার দিয়ে সরে যায় খরকামনার সুবর্ণকশা।

নীরবে এবং মাথা নত ক'রে চলেই যাচ্ছিল অষ্টাবক্র। কক্ষের অবারিত দ্বারের প্রান্তে এসে দাঁড়াতেই, পিছন হতে যেন চমকে ওঠে একটি অনুরোধ।—একবার থাম ঋষি।

দেখে বিস্ময় অনুভব করে অষ্টাবক্র, দাঁড়িয়ে আছে উদীচী, এক শান্তা স্নিগ্ধা স্মিতরুদিতার মূর্তি। প্রখর-প্রগল্‌ভা অলজ্জার মূর্তি নয়, যেন হিমবায়ুলাঞ্ছিতা এক বনলতিকা। নতমুখিনী উদীচীর কপোলে অশ্রুসলিলের রেখা। যেন অমল ধারাসলিলে গলে গিয়েছে সেই কজ্জলমসিমদির ভ্রূভঙ্গী।

অষ্টাবক্রের বিস্ময়কেই বিস্মিত ক'রে হেসে ওঠে উদীচী।—ব্যথিত হয়ো না ঋষি, উদীচীর এই নয়নবারি বেদনার অশ্রু নয়, আনন্দের অশ্রু।

অষ্টাবক্র—আনন্দ?

উদীচী—হ্যাঁ ঋষি, নিষ্ঠায় সুন্দর এক আসক্তির কাছে জীবনে এই প্রথম পরাভূত হয়েছে নীলবনলোকের এক লালসাময়ীর অনিষ্ঠা। আমি তোমার পরীক্ষা।

অষ্টাবক্র—তুমি আমার শিক্ষা।

উদীচী—জয়ী তুমি।

অষ্টাবক্র—জয়দাত্রী তুমি।

জাগ্রত বিহগের ক্ষীণস্ফুট কলরব শোনা যায়। শেষ হয়েছে সন্তামসী রাত্রি। কক্ষের অবারিত দ্বারপথ অতিক্রম ক'রে বনপথের উপরে এসে দাঁড়ায় অষ্টাবক্র; এবং দূর দক্ষিণের গগনবলয়ের দিকে নেত্র সম্পাত ক'রে পথ অতিক্রম করতে থাকে।

কার কণ্ঠে মাল্য দান করবে সুপ্রভা? শত প্রিয়দর্শনের মধ্যে প্রিয়তম

বলে মনে হয় কার মুখ? কার কণ্ঠলগ্ন হলে তৃপ্ত হবে সুপ্রভার কেতকী-মালিকার সুরভিত স্পৃহা?

শুভক্ষণ উপস্থিত। স্বয়ংবরসভায় পাণিপ্রার্থী বহু ঋষিযুবার সমাবেশ। যেন শত তরুণ তরুবরের বরতনুশোভায় বিনোদিত বাসন্ত প্রভাতের এক উপবন। সুপ্রভার কেতকীমালিকার সুরভিত স্পর্শ কণ্ঠসক্ত করবার জন্য বিচলিত চিত্তের আগ্রহ সহ্য করছে প্রবল পৌরুষে পেশল শত অভিলাষ। সেই শোভার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় বদান্যকন্যা সুপ্রভার নেত্রোদ্ভিন্ন হর্ষ।

তবু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুপ্রভা। তার মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টি যেন হঠাৎ এক স্বপ্নের আবেশে অন্য জগতে চলে গিয়েছে। সুপ্রভার কবরী কপোল তার অধরের উপর যেন কুংকুমবাসিত একটি বক্ষ হতে তরঙ্গিত বাসনার নিঃশ্বাস এসে লুটিয়ে পড়ছে, সুপ্রভার স্বপ্নের বক্ষে মৃগমদামোদিত কুংকুমের উৎসব ঝরে পড়ছে; কেতকীমালিকার উৎসারিত পিপাসার সুরভি তার পরমা তৃপ্তির আধার এক বক্ষের পৌরুষোচ্ছল স্পর্শ নিকটে পেয়েছে। অষ্টাবক্র, আর কেউ নয়, মল্লিকাপুলকিত ধম্মিল্লের গুরুগৌরবে গরীয়ান্ সেই অষ্টাবক্রের মূর্তি যেন ঋজুকান্ত বনস্পতির মত কামনাবিধুরা এক মাধবীলতিকার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এই তো সুপ্রভার যৌবনের সকল আকাঙ্ক্ষার উপাস্য, শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি। সেই তৃপ্তির কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণের জন্য সাগ্রহে বাহু প্রসারিত করে সুপ্রভা। ভেঙ্গে যায় স্বপ্নময় আবেশ। স্বয়ংবরসভা হতে ছুটে চলে যায় সুপ্রভা, দাবানলভীতা মৃগবধূ যেমন কাননের লতাজাল ছিন্ন ক'রে ছুটে যায়।

লতাগৃহের নিভৃতে ফিরে এসে কেতকীমালিকার উপর অশ্রুসিক্ত নয়নের চুম্বন অঙ্কিত ক'রে ক্ষোভোদ্‌ভ্রান্ত নয়নের জ্বালা শান্ত করতে চেষ্টা করে সুপ্রভা। কিন্তু হঠাৎ বাধায় ব্যথিতভাবে চমকে ওঠে। শান্ত লতাগৃহের নীরবতা চূর্ণ ক'রে দিয়ে মহর্ষি বদান্যের ভর্ৎসনা গর্জিত হয়।—এ কেমন আচরণ সুপ্রভা? আমারই ইচ্ছায় আহূত স্বয়ংবরসভাকে কেন তুমি এইভাবে অপমানিত করলে রীতিদ্রোহিণী কন্যা?

সুপ্রভা—ক্ষমা করুন পিতা, আমার জীবনে স্বয়ংবরসভার কোন প্রয়োজন নেই।

বদান্য—কেন?

সুপ্রভা—আমার কেতকীমালিকা জানে, কে আমার জীবনের সহচর হলে সবচেয়ে বেশি সুখী হবে আমার জীবন।

বদান্য—কে সে?

সুপ্রভা—আপনি জানেন পিতা, তার নাম অষ্টাবক্র।

তবু তারই নাম! বিস্মিত বদান্যের চিরকালের বিশ্বাসে কঠিন সেই তত্ত্বের গর্ব যেন কুলিশকঠোর একটি আঘাতে শিহরিত হতে থাকে। সেই অষ্টাবক্রের নাম উচ্চারণ করছে সুপ্রভা। নিতান্তই দেহজ অভিলাষে ব্যাকুল এক কেতকীমালিকার সৌরভে কি এত নিষ্ঠার গৌরব থাকতে পারে?

বদান্যের ভর্ৎসনাময় ভ্রূকুটি হঠাৎ যেন হেসে ওঠে। জানে না সুপ্রভা, তার কেতকীমালিকার কামনার আস্পদ সেই অষ্টাবক্রের আসক্তির নিষ্ঠা যে এতক্ষণে নীলবিহারিণী এক লালসাময়ীর ঘনমসিময় ভ্রূভঙ্গের আঘাতে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কল্পনাও করতে পারে না সুপ্রভা, কেতকীমালিকার আশা মিথ্যা হয়ে এক দুঃস্বপ্নের জগতে মিলিয়ে গিয়েছে। সুপ্রভার কামনার এই নিষ্ঠা নিষ্ঠাই নয়, কঠিন মোহ মাত্র। সত্য অবহিত হলে এই কঠিন মোহ এখনি আর্তনাদ ক'রে ভেঙ্গে যাবে।

বদান্য বলেন—শোন কন্যা, তোমার মোহবিমূঢ় নয়নতৃষ্ণার বাঞ্ছিত সেই অষ্টাবক্র এক বয়ীয়সী স্বৈরিণীর বিলাসলীলার বান্ধব হয়ে উত্তরদিগ্‌ভূমির নীলবনের নিভৃতে এক মায়াভবনের কক্ষে দিবস ও রাত্রি যাপন করছে। সে আর ফিরে আসবে না, ফিরে আসবার সাধ্য তার নেই।

—পিতা! সুপ্রভার কণ্ঠ ভেদ ক'রে করুণ আর্তনাদ উৎসারিত হয়, যেন অকস্মাৎ এক কিরাতের বিষসায়ক ছুটে এসে বনমৃগীর হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করেছে।

পর মুহূর্তে বনমৃগীর বাষ্পমেদুরিত করুণ নয়নের দৃষ্টি স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হয় এবং মহর্ষি বদান্যের ভ্রূকুটি অকস্মাৎ এক বিস্ময়ের আঘাতে যেন নীরবে আর্তনাদ ক'রে ওঠে। লতাগৃহের দ্বারোপান্তে এসে দাঁড়িয়েছে এক আগন্তুক, মস্তকে মল্লিকামোদিত ধম্মিল্লের সেই উদ্ধত শোভা অনাহত, তরুণ ঋষি অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্রের স্মিতোৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় দুই অপলক চক্ষু তুলে শুধু দেখতে থাকেন বদান্য, তাঁর এতদিনের বিশ্বাসের কঠিন তত্ত্ব মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। সত্যই জয়ী হয়ে ফিরে আসতে পেরেছে এক আসক্তির গর্ব। সত্যই পরাভূত হয়েছে নীলবনের ঘনতামসী রাত্রির মসি। সত্যই তপস্বীর তপস্যার মত অবিচল নিষ্ঠায় কঠিন এই আসক্তি। সত্যই সুন্দর এই আসক্তি। কিন্তু...।

কিন্তু এই আসক্তি কি সত্যই প্রণয়ের প্রথম সংকেত, পতি-পত্নী সম্বন্ধের প্রথম হেতু, মিলনের প্রথম গ্রন্থি? মহর্ষি বদান্যের নেত্রে আর একটি কঠিন প্রতিজ্ঞার ছায়া দেখা যায়। যেন শেষবারের মত নির্মমতম এক পরীক্ষায় তাঁর এতদিনের বিশ্বাসের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে দেখতে ইচ্ছা করছেন বদান্য, সে বিশ্বাস

সত্য না মিথ্যা। জানতে ইচ্ছা করছে, দেহজ অভিলাষের সৌরভের মত ঐ আসক্তির বক্ষে কোন সত্যের গৌরব আছে কি না আছে।

মহর্ষি বদান্য বলেন—স্বীকার করি অষ্টাবক্র, সুপ্রভার পাণি গ্রহণের অধিকার তুমি পেয়েছ। এবং আমার প্রতিশ্রুতিও স্মরণ করি। সুপ্রভাকে তোমারই কাছে এই ক্ষণে সম্প্রদান করতে চাই।

সুপ্রভা ও অষ্টাবক্রের নয়নে স্নিগ্ধ এক হর্ষের জ্যোৎস্না ফুটে ওঠে। মহর্ষি বদান্যের সম্মুখে এগিয়ে আসে প্রীতিভারে বিনত দুটি মু. ।

মহর্ষি বদান্য বলেন—কিন্তু তোমারই আর একটি প্রতিশ্রুতির কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্র—বলুন মহর্ষি।

বদান্য—তোমরা আমার মন্ত্রসংস্কারে পরিণীত হবার পর আমার আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রে ধন্য হবে।

অষ্টাবক্র—অবশ্যই গ্রহণ করব, এবং ধন্য হব মহর্ষি।

বদান্য—কল্পনা করতে পার কি আশীর্বাদ আমি দান করতে চাই

অষ্টাবক্র—পারি না মহর্ষি।

বদান্য—আমি এই আশীর্বাদ দিতে চাই, তোমাদের দেহ মন ও প্রাণ হতে আসক্তির শেষ লেশও লুপ্ত হয়ে যাবে। বল, প্রস্তুত আছ গ্রহণ করবে এই আশীর্বাদ?

—মহর্ষি! অষ্টাবক্রের কণ্ঠে অভিশাপভীরু শঙ্কিতের সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর শিহরিত হয়। শিহরিত হয় সুপ্রভার শান্ত কবরীভার, যেন তার সীমন্তেরই উপর দংশন দানের জন্য ফণা উদ্যত করেছে এক দুর্ভাগ্যের ভুজঙ্গ।

বদান্য বলেন—প্রতিশ্রুতির অবমাননা করতে চাও অষ্টাবক্র?

অষ্টাবক্র—চাই না মহর্ষি, কিন্তু এ কেমন আশীর্বাদ? আপনি ভুল ক'রে আশীর্বাদের নামে অভিশাপ দান করতে চাইছেন। আপনার কাছ থেকে অভিশাপ গ্রহণ করব, এমন প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে দান করিনি মহর্ষি।

বদান্য—তুমি বুঝতে ভুল করছ অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্র—আমার ভুল বুঝতে পারছি না মহর্ষি। আমি জানি অপরের জীবনে সুখ ও কল্যাণ আহ্বান করে যে বাণী, সেই বাণীই হলো আশীর্বাণী। কারও জীবনকে অসুখী করবার জন্য যে বাণী উচ্চারিত হয়, সে বাণী আশীর্বাণী নয়।

বদান্য—আমার এই আশীর্বাণীও তোমাদের জীবনকে সুখী করবার জন্য শুভ ইচ্ছার বাণী। তোমাদের জীবনে আসক্তি থাকবে না, তার জন্য অসুখী হবে না তোমাদের জীবন। তৃষ্ণা না থাকলে তৃষ্ণাহীনতার জন্য কেউ দুঃখ

অনুভব করে না অষ্টাবক্র। ইচ্ছা না থাকলে অক্ষমতার ব্যথা কেউ বোধ করে না। অননুভূত অভিলাষ কখনও অতৃপ্তির ক্লেশ সৃষ্টি করে না। আসক্তিহীন জীবন সুখেরই জীবন।

অষ্টাবক্র—কল্পনা করতে পারি না মহর্ষি, সে কেমন সুখের জীবন।

বদান্য—জলমীনের মনে মহাকাশের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, যেহেতু মহাকাশের নীলিমা তার অনুভবে নেই। বনমধুকরের প্রাণে সুরলোকের পারিজাতের জন্য কোন তৃষ্ণার গুঞ্জরণ নেই, যেহেতু সে পারিজাত তার অনুভবে নেই। অরণ্যমৃগের মনে সমুদ্রস্নানের জন্য কোন ক্রন্দন নেই, যেহেতু সলিলোচ্ছল সমুদ্রের রূপ তার স্বপ্নে অনুভবে ও কল্পনায় নেই। যার জন্য আসক্তি নেই, তার অভাবের জন্য অতৃপ্তিও নেই। আসক্তিহীন এই জীবন এক বেদনাহীন সুখের জীবন। বিশ্বাস করতে পারছ কি অষ্টাবক্র?

অষ্টাবক্র—বিশ্বাস করছি মহর্ষি।

বদান্য—তবে আমার আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও অষ্টাবক্র, দেহ মন ও প্রাণ হতে আসক্তিকে চিরজীবনের মত বিদায় দান করবার জন্য প্রস্তুত হও।

অষ্টাবক্র—কেন মহর্ষি? আপনি তো আজ এই সত্যেরই প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছেন যে, আসক্তিও নিষ্ঠায় সুন্দর হতে পারে।

বদান্য—আসক্তি সুন্দর হলেই বা কি আসে যায় অষ্টাবক্র? বিষসলিল স্নিগ্ধ হলেই বা কি? সে সলিল প্রাণের পানীয় হতে পারে না। খলপাবক হেমবর্ণ হলেই বা কি? সে পাবক গৃহদীপের আলোক হতে পারে না। মরুসমীর উচ্ছ্বসিত হলেই বা কি? সে সমীর নিকুঞ্জের হরিণ্ময় আনন্দের বান্ধব হতে পারে না।

অষ্টাবক্র ও সুপ্রভার জীবন পরিণয়োৎসুক দুই সুন্দর বাসনা যেন আসন্ন এক শুভ বাসকোৎসবের দিকে তাকিয়ে চিতানলের উৎসব দেখতে থাকে। দুর্বহ অঙ্গীকারের বন্ধনে আবদ্ধ দুই অসহায়ের মূর্তি। বদান্য প্রশ্ন করেন। —নিরুত্তর কেন অষ্টাবক্র? বল, কি তোমাদের ইচ্ছা?

অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা পরস্পরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, অপলক স্নেহে অভিষিক্ত দুটি দৃষ্টি। অষ্টাবক্র যেন তার জীবনের আলিঙ্গন হতে স্খলিত এক কেতকীরেণুবাসিত স্বর্গের দিকে মায়াময় নেত্রে তাকিয়ে আছে। সুপ্রভার নয়নের শিশিরেও সেই অমেয় মায়ার সুষমা অভিনব এক মদিরতায় আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। অষ্টাবক্রের কুঙ্কুমপিঞ্জরিত বক্ষের উপর অলক্ষ্য চুম্বনধারার মত ঝরে পড়ে সুপ্রভার সিক্ত নয়নের দৃষ্টি। আসন্ন এক

মৃত্যুর বজ্রনাদ শুনতে পেয়েছে, তাই যেন শেষবারের মত ভালবেসে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হয় এক কুঙ্কুম আর কেতকীর আসক্তি।

মৃত্যু হবে আসক্তির, সত্য হবে শুধু মিলন, অদ্ভুত এই আশীর্বাদ সহ্য করবার জন্য হৃদয় কঠিন করতে চেষ্টা করে নবীন রসালসম যৌবনধর অষ্টাবক্র; চেষ্টা করে উপবনের সমীরপ্রিয়া লতিকার মত সরসতনুকা সুপ্রভা। কিন্তু পারে না।

বদান্যের আশীর্বাদ যেন দক্ষিণ পবনের বক্ষ হতে চন্দনগন্ধভার কেড়ে নিতে চায়। প্রজাপতির পক্ষ্মপতাকায় বর্ণায়িত আলিম্পন থাকবে না, আর গোধূলি হারাবে আভা? আকাশ হারাবে নীলিমা, পুষ্প হারাবে সৌরভ, সমুদ্র হারাবে তরঙ্গ, এবং যৌবন হারাবে আসক্তি? আসক্তিহীন সেই মিলন যে দুই নিঃস্ব রিক্ত চলকঙ্কালের বেদনাহীন সুখের মিলন। সে মিলন মিলনই নয়, সে জীবন জীবনই নয়। আসক্তিহীন সেই মিলনের বেদনাহীন সুখ এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করা যাবে না। তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

সুপ্রভার সেই দৃষ্টির ভাষা বুঝতে পারে অষ্টাবক্র, এবং অষ্টাবক্রের সেই দৃষ্টির ভাষা বুঝতে পারে সুপ্রভা। সুস্মিত হয়ে ওঠে উভয়েরই ক্ষণবিষাদ-মেদুর নয়নের দৃষ্টি, সে দৃষ্টি নূতন এক সংকল্পের আলোকে উদ্ভাসিত।

অষ্টাবক্র বলে—আপনিও একটি প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করুন মহর্ষি। বলুন, আপনার মন্ত্রসংস্কারের পুণ্যে পরিণীত আমাদের জীবনে আপনার ঐ আশীর্বাদ দানের পর আপনি আমাদের প্রার্থিত বর প্রদান করবেন।

বদান্য—হ্যাঁ, মনে আছে। বল কি বর প্রার্থনা করতে চাও তোমরা?

অষ্টাবক্র—আপনার আশীর্বাণী ধ্বনিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের মৃত্যু হয়, এই বর পেতে চাই মহর্ষি।

চিৎকার ক'রে ওঠেন মহর্ষি বদান্য।—মৃত্যু চাও তোমরা?

অষ্টাবক্র—হ্যাঁ, মহর্ষি।

নীরব, স্তব্ধ, শিলীভূত বৃক্ষের মত সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বদান্য, যেন এইবার তাঁর সেই বিশ্বাসের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আর, আসক্তির গৌরব ঘোষণা ক'রে তাঁরই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে মিলনোৎসুক কেতকী আর কুঙ্কুমের অপরাভূত দুই সংকল্প।

মহর্ষি বদান্যের দুই চক্ষুর কঠিন দৃষ্টি হঠাৎ বাষ্পাসারে প্লাবিত হয়। সুপ্রভার কণ্ঠস্বর ব্যথিতভাবে চমকে ওঠে।—পিতা?

বিস্মিত অষ্টাবক্র ডাকে।—এ কি মহর্ষি?

মহর্ষি বদান্য বলেন—নির্মম পরীক্ষার প্রাণ আনন্দে গলে গিয়েছে অষ্টাবক্র, এই অশ্রু আনন্দেরই অশ্রু। স্বীকার করি সুপ্রভা, তোমাদের সুন্দর আসক্তিই

সত্য। স্বীকার করি অষ্টাবক্র. আসক্তিই এই মর্ত্যের মানব ও মানবীর মিলিত জীবনের মালিকা, প্রকৃত বন্ধনের প্রথম গ্রন্থি।

সস্নেহ আগ্রহে সুপ্রভা ও অষ্টাবক্রের দুই পাণি সমন্বিত ক'রে মন্ত্র পাঠ করেন মহর্ষি বদান্য। তার পরেই আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন।—সুন্দর আসক্তির কুঙ্কুম ও কেতকীর জীবন চিরসুখী হোক।

অষ্টাবক্র—আমাদের প্রার্থিত বর প্রদান করুন মহর্ষি।

বদান্য—বল কি বর চাও?

অষ্টাবক্র—চাই আপনার পদধূলির স্পর্শ।

মহর্ষি বদান্যের চরণ স্পর্শ ক'রে প্রণাম করে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা। অষ্টাবক্র ও সুপ্রভার শির চুম্বন করেন মহর্ষি বদান্য।

---

# ইন্দ্র ও শ্রুবাবতী

আশ্রমবাসিনী এক তপস্বিনী নারীর ধ্যাননিমীলিত নেত্র বার বার চমকে জেগে ওঠে। ঐ তপস্বিনীর নাম শ্রুবাবতী।

আশ্রমের সম্মুখে বনবীথিকা, সেই বনবীথিকার ছায়াময় শান্তিকে যেন চমকে দিয়ে ঘুরে বেড়ায় কোন্ এক রহস্যের কুণ্ডলদ্যুতি। শ্রুবাবতীর মনে হয়, অন্তরীক্ষের বক্ষ হতে একটি জ্যোতির্ময় কৌতূহল ভূতলে এসে বন-বীথিকার নীপ চম্পক ও নীলাশোকের ছায়ানিবিড় স্নিগ্ধতার বক্ষ অন্বেষণ ক'রে বেড়ায়।

ঋষি ভারদ্বাজ দুশ্চর এক তপশ্চর্যা গ্রহণ করবেন বলে হিমালয়ে চলে গিয়েছেন। আশ্রমকুটীরে একাকিনী বাস করে তাঁর তপস্বিনী কন্যা শ্রুবাবতী। পীতকৌশেয়বসনা ও একবেণীধরা শ্রুবাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গিয়েছেন পিতা ভারদ্বাজ। কঠোর ব্রহ্মব্রত যাপন ক'রে কুমারী শ্রুবাবতী তার কামনাময় মনোলোকের সকল কল্পনাকে ক্লিষ্ট করছে দেখে সুখী হয়েছেন ভারদ্বাজ। দেখে গিয়েছেন ভারদ্বাজ, প্রভাতকল্পা শর্বরীর মত সুন্দর যে-কুমারীর অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের উদ্ভাস ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সেই কুমারী স্বেচ্ছায় পাংশুলিপ্তা স্বর্ণরেখার মত নিষ্প্রভ হয়ে আশ্রমের ছায়াতরু-তলে পড়ে থাকে।

চলে গিয়েছেন ঋষি ভারদ্বাজ। অতন্দ্রিত সবিতা কালচক্রে ধাবিত হয়ে অনেক দিবা রাত্রি কলা ও কাষ্ঠা রচনা করেছেন। এবং তপস্বিনী শ্রুবাবতীও অনেক তপস্যা করেছে। ষড়ঋতুর রঙ্গে লীলায়িত বনস্থলীর বক্ষে অনেক বর্ণচ্ছটা ও অনেক সৌরভ এসেছে আর চলে গিয়েছে। তপস্বিনী শ্রুবাবতীর দুই চক্ষুর ধ্যান কোনও মুহূর্তেও বিচলিত হয়নি।

কিন্তু কে জানে, কি ছিল সেদিনের সেই আলোকে অনিলে ও সলিলে? এক প্রভাতে তপস্বিনী শ্রুবাবতীর জাগ্রত চক্ষুর দৃষ্টিকে যেন ক্ষণবিহ্বলতায় নিবিড় ক'রে দিয়ে এবং সেই বিহ্বল দুই চক্ষুতে নূতন এক ধ্যানের আবেশ সঞ্চারিত ক'রে চলে গেল নয়নমোহন এক রহস্যের কুণ্ডলদ্যুতি। এই প্রভাতের মত কত প্রভাতে বনস্থলীর বক্ষের নিভৃতে কলনাদিনী তটিনীর সলিলে স্নান করেছে শ্রুবাবতী, এবং মুক্তাময় সিকতার অজস্র দ্যুতিচ্ছবি দুই পায়ের উপেক্ষায় পিষ্ট ক'রে আশ্রমের কুটীরে ফিরে এসেছে। সিকতার সেই মুক্তার

দ্যুতি কোনদিন যার দুই চক্ষুর কৌতূহল চমকিত করতে পারেনি, তারই দুই চক্ষু দুটি কুণ্ডলের দ্যুতি দেখে বিস্মিত হয়। কে ঐ পথিক, চমকিত চামীকরকিরণে রচিত কলেবর যেন যৌবনায়িত লাবণ্যের চলোচ্ছল ছবি বিচ্ছুরিত ক'রে চলে যায়? কোথা থেকে এল আর কোথায় চলে গেল সেই দীপ্তকান্ত রূপমান? মণিময় কুণ্ডলের দ্যুতির চেয়ে কত নয়নাভিরাম তার নয়নদীধিতি!

তপস্বিনী শ্রুবাবতী যেন তার হৃদয়ের বিচলিত নিঃশ্বাস-মধ্যে ঐ প্রশ্ন আর বিস্ময়ের ধ্বনি শুনতে পায়। নিজ করকঙ্কণের শব্দে শঙ্কিতা অভিসারিকার মত চমকে ওঠে আর লজ্জিত হয় শ্রুবাবতী। তপস্বিনীর জটায়িত বেণীভার যেন চূর্ণ হবার জন্য শিউরে উঠছে। দ্রুত ছুটে চলে যায় শ্রুবাবতী। আশ্রমকুটীরের ছায়াচ্ছন্ন নিভৃতের ভিতরে এসেও কি-যেন অন্বেষণ করে শ্রুবাবতী। তপস্বিনী যেন তার ক্ষণবিহ্বল নেত্রের এক ভয়ংকর উদ্‌ভ্রান্তিকে লুকিয়ে ফেলবার জন্য গভীরতর এক অন্ধকারের আশ্রয় চায়।

সুস্থির হয়ে ধ্যানাসনে উপবেশন করে তপস্বিনী শ্রুবাবতী। কিন্তু বুঝতে পারে, আজিকার প্রভাতের আলোক তপস্বিনীর দুই চক্ষুর উপর অতি কঠোর এক নিষ্ঠুরতার সাধ সফল ক'রে নিয়েছে। শ্রুবাবতীর নয়নপ্রান্ত হতে তপ্ত মুক্তাফলের মত দুটি অশ্রুবিন্দু স্খলিত হয়, ধ্যানহারা তপস্বিনীর কৌশেয় বসনের প্রান্ত সিক্ত ক'রে তোলে।

সত্যই তপস্বিনীর নেত্রে নূতন এক স্বপ্নের আবেশ সঞ্চারিত হয়। সেই স্বপ্ন হলো দুটি কুণ্ডলদ্যুতির স্বপ্ন। ভুলতে পারে না শ্রুবাবতী, এবং নিজের হৃদয়ের বিরুদ্ধেও আর বৃথা সংগ্রাম করে না। কে সে? কেন এল, কোথা হতে এল, আর কোথায় চলে গেল? সে পুরুষের দুই নেত্রে যেন অন্তরীক্ষের সকল নীলিমার পীযূষ নিবিড় হয়ে রয়েছে। কে জানে, ধূলিমা এই মর্ত্যলোকের কোন্ শ্যামলতার জন্য পিপাসা নিয়ে বনবীথিকার ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়ায় সেই বিপুল রূপের পুরুষ!

পীতকৌশেয় বসনে আবৃতা এক প্রেমিকার কামনা যেন প্রতিক্ষণ তপস্যা করে। বিশ্বাস করে শ্রুবাবতী, তার এই নূতন তপস্যা ব্যর্থ হবে না। আশ্রমের তরুলতা ও পুষ্পের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় শ্রুবাবতী, মর্ত্যলোকের কামনাগুলি যেন এক সুন্দর দয়িতকে জীবনে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রতিক্ষণ তপস্যা করছে। মনে হয়, তৃষ্ণার্ত ধূলিকণিকা অন্তরের সকল কামনা দিয়ে আহ্বান করছে বলেই আকাশচর জলদ ধারা-বিগলিত আবেগে ভূতলে এসে স্নেহ লুটিয়ে দেয়। লতিকার আহ্বান শোনে দক্ষিণসমীর, কিশলয়ের আহ্বান শোনে প্রভাতমিহির। মর্ত্যের পুষ্প লতিকা আর কিশলয়ের মত নীরব

তপস্যায় এক মর্ত্যনারীর কামনা যদি অহরহ তার জীবনপ্রিয় দয়িতকে আহ্বান করে, তবে সে কি না এসে থাকতে পারে? নিমীলিত নেত্রে নিবিড় স্বপ্নের আবেশ ভরে দিয়ে সে হৃদয়দয়িতের কুণ্ডলদ্যুতিকে হৃদয়ের মধ্যে দেখতে পায় শ্রুবাবতী।

বুঝি সফল হবে আশ্রমবাসিনী এক মর্ত্যনারীর কামনার তপস্যা। ধ্যান-নিমীলিত চক্ষু হঠাৎ চমকে জেগে ওঠে এবং মনে হয় শ্রুবাবতীর সেই কুণ্ডলদ্যুতি যেন নিকটে এসে দাঁড়িয়েছিল। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে শ্রুবাবতী, যেন আশ্রমপ্রাঙ্গণের প্রান্ত পার হয়ে ছায়াচ্ছন্ন বনবীথিকার নীরব পবনের বক্ষে মৃদুপুলকিত পদধ্বনির সঙ্গীত উপহার দিয়ে চলে গেল এক অধ্বনীন। শ্রুবাবতী তার স্বপ্নভারালস দুই নিমীলিত চক্ষুর দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে আশ্রমপ্রাঙ্গণের বাহিরে এসে দাঁড়ায়। বনবীথিকার দিকে দুই জাগ্রত চক্ষুর তৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

ষড়ঋতুর রঙ্গে লীলায়িত বনস্থলীর মত পীতকৌশেয়বসনা প্রেমিকা শ্রুবাবতীরও অন্তরলোকে বিচিত্র বাসনার উৎসব লীলায়িত হয়। পাটল কুসুমের গন্ধভার তপ্ত ক'রে নিয়ে গ্রীষ্মের সঞ্চার দেখা দেয়। পরুষ পবন-বেগে বনস্থলীর শুষ্ক পত্ররাশি উৎক্ষিপ্ত হয়ে কাতর উচ্ছ্বাস ছড়ায়। শুষ্ক বেণুবনে যেন জ্বালাবিমথিত পঞ্জরের ক্রন্দন বাজে। মধ্যাহ্নের নিদাঘাতে বন-বীথিকার বক্ষ হতে উৎসারিত ক্ষিপ্ত ধূলির মত্ততার দিকে দুই অপলক নয়নের উত্তপ্ত আগ্রহ প্রসারিত ক'রে তাকিয়ে থাকে শ্রুবাবতী। দেখতে পায় শ্রুবাবতী, সেই রূপমানের কুণ্ডলের দ্যুতি অদূরের এক উদ্দালকের ছায়ার স্নেহ আহরণ করছে। শ্রুবাবতীর মন বলে, কাছে এস পথিক, তপস্বিনীর জটায়িত বেণীভার এখনি বিগলিত হয়ে বিপুল চিকুরচ্ছায়া ছড়িয়ে দেবে। সে ছায়ার সব শীতলতা আর স্নেহ গ্রহণ ক'রে সুখী হও তুমি।

প্রাবৃষার মেঘারাবে চাতকীর হর্ষ ধ্বনিত হয় আকাশে, আর শ্রুবাবতী তেমনি আশ্রমপ্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, পুলকাঙ্কুরে সিক্ত তনু ভূকদম্বের কাছে দাঁড়িয়ে আছে শ্রুবাবতীর তপস্যার আকাঙ্ক্ষিত সেই পথিক। নববারিস্নানে বনভূমির বক্ষের তৃণাঙ্কুর বৈদূর্যমণির মত ফুটে ওঠে; জেগে ওঠে মদকলকণ্ঠ ময়ূরের কেকা। শ্রুবাবতীর জটায়িত বেণীভারের উপর ঝরে পড়ে সিক্ত স্নিগ্ধ অর্জুনের মঞ্জরী। দ্বিধা করে না, বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করে না, তপস্বিনী অবাধ আগ্রহে বাহু প্রসারিত ক'রে তুলে নেয় সেই মঞ্জরী। ইচ্ছা করে, স্নিগ্ধ অর্জুনের এই মঞ্জরীকে কর্ণভূষণ ক'রে নিয়ে এই মুহূর্তে এই তপস্বিনীর বেশ মিথ্যা ক'রে দিতে এবং ছুটে চলে যেতে তারই কাছে, যে প্রিয়দর্শনের কুণ্ডলদ্যুতি এখন ঐ ভূকদম্বের ছায়ার নিবিড়তার মধ্যে ফুটে

রয়েছে। কিন্তু পারে না শ্রুবাবতী, আশ্রমের পুষ্পে লতিকা ও কিশলয়ের মত মর্ত্যনারীর কামনাও যেন শুধু নীরবে তাকিয়ে বাঞ্ছিতকে আহবান করে তুমি কাছে এসে এই সিক্ত অর্জুনের মঞ্জরী নিজ হাতে তুলে নিয়ে তাপসিকার দুই কানে দুলিয়ে দিয়ে যাও পথিক।

শারদ নভঃপটের অভ্রমালায় ও ভূতলের নবকাশবনের বক্ষে অমলধবল উৎসবের হর্ষ জাগে। অনিলপ্রকম্পিত বনান্তের সপ্তবর্ণ, কাননের কোবিদার ও উপবনের কুরুবকের যৌবন উল্লসিত হয়। নিবিড়তর হ্রদে স্ফুট ওঠে নীলোৎপলের নীলিমা আর বন্ধুজীবের রক্তিমা। সরোবরতটের হংসরুতানুনাদ আর শালিধান্যের সৌরভে বিচলিত ক্ষিতিরসরভস বায়ু প্রেমতাপসিকা শ্রুবাবতীর অন্তরে যেন সুধ্বনিময় সঙ্গীতের মুখরতা ও নিবিড় সৌগন্ধ্যের আবেশ বর্ষণ করে। দেখতে পায় শ্রুবাবতী, সেই পথিকের কুণ্ডলদ্যুতি নিকটতর হয়েছে। কোবিদার তরুর কম্পিত পল্লবের চঞ্চল ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পথিক। শ্রুবাবতীর মন বলে, কাছে এসে অনুভব ক'রে যাও পথিক, তোমারই জন্য কী দুঃসহ চঞ্চলতা সহ্য করছে ধ্যানহারা ধ্যানিনীর বক্ষের অনিল!

তপস্বিনীর কোমল কপোলে নবস্ফুট লোধ্রের রেণু ছড়িয়ে দেয় হেমন্তের কৌতুকসমীর। শিশিরস্নেহে শিহরিত অঙ্গ নিয়ে মৃগাঙ্গনা বনপথে ছুটে চলে যায়। প্রিয়ঙ্গুলতিকার দেহে পাণ্ডুর অভিমান শিহরিত হয়। ক্রৌঞ্চনাদে হৃদয় চমকিত হলেও তপস্বিনী শ্রুবাবতীর অপলক নয়নের দৃষ্টি তেমনি অবিচলিত আগ্রহ নিয়ে বনবীথিকার দিকে তাকিয়ে থাকে। এসেছে, আরও নিকট হয়ে এসেছে শ্রুবাবতীর সকল ক্ষণের আশার বাঞ্ছিত সেই পথিকের মূর্তি। বনবীথিকার যে কিংশুকের রক্তিমা শিখা হয়ে জ্বলছে, সেই কিংশুকের কাছে জ্বলছে সেই কুণ্ডলদ্যুতি। তপস্বিনীর কোমল কপোলে লোধ্ররেণুর চুম্বন লিপ্ত হয়ে থাকে। রেণুময় সে চুম্বনের চিহ্ন মুছে ফেলতে চায় না, পারেও না শ্রুবাবতী। শ্রুবাবতীর মন বলে, কাছে এসে জেনে যাও পথিক, তপশ্চারিণীর কপোলের এই রেণুময় চিহ্ন চকিত চুম্বনে মুছে দেবার অধিকার শুধু তোমারই অধরের আছে।

হিমকণ্টকিত শীতবায়ুর নখরে আহত বনবীথিকার শাখী শ্যামপল্লবের সমারোহ হারিয়ে রিক্ত হয়, কিন্তু রিক্ত হয় না তপস্বিনীর নয়নের কৌতূহল। ইক্ষুবনের সৌরভ বক্ষে ধারণ ক'রে অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে অলস শীতানিল, আর তপস্বিনী শ্রুবাবতীর নয়নও চঞ্চল হয়ে শুধু লক্ষ্য করে, সেই পথিকের কুণ্ডলদ্যুতি আশ্রমপ্রান্তের সন্নিকটে নক্তমালকুঞ্জের ছায়াবিরল নিভৃতের কাছে এসে স্থির হয়ে রয়েছে। তপস্বিনীর পীতকৌশেয় বসনের অঞ্চল যেন নিজেরই শিথিলিত লজ্জার শিহর সহ্য করতে গিয়ে আরও বিবশ ও বিচলিত হয়।

শ্রুবাবতীর মন বলে, কাছে এসে সুখী হও পথিক। ছিন্ন কর তপস্বিনীর এই পীতকৌশেয় আবরণের শাসন। রিক্ত হিমবায়ুর স্পৃহা মিথ্যা ক'রে দিয়ে, তোমার তপ্ত ও মত্ত দুই বাহুর কামনা খরায়িত ক'রে নখবিলিখনে আলিম্পিত কর তোমারই প্রণয়কামিনী এই তাপসিকার বিবশ তনু।

আশ্রমপ্রাঙ্গণের নীলাশোকের আশা পল্লবিত ক'রে দেখা দিল পিকরব-মুখর বসন্তের দিন। তাম্রপ্রবালের ভারে বিনম্র আম্রদ্রুমবাহু যেন আগ্রহভরে নিখিলের ভৃঙ্গগুঞ্জরণ আর বিহঙ্গরবের মধুরতাকে আপন ক'রে নেবার জন্য বুকের কাছে পেতে চাইছে। দেখতে পায় শ্রুবাবতী, তার জাগ্রত নয়নের তপস্যার বাঞ্ছিত সেই পথিক সত্যই স্মিতহাস্যের সুষমায় বসন্তদিনের সব সুন্দরতাকে মধুর ক'রে দিয়ে চক্ষুর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

আগন্তুকের কুণ্ডলদ্যুতির হাস্য আরও প্রখর হয়ে ওঠে।—ঐ পীতকৌশেয় বসন আর জটায়িত বেণীভারের বন্ধনে জীবন ও যৌবন খণ্ডিত ক'রে কোন্ সুখের জন্য তপস্যা করছ ভারদ্বাজতনয়া?

শ্রুবাবতী বলে- এই পীতকৌশেয় বসন আর জটায়িত বেণীভার আপনারই প্রেমাভিলাষিণী এক নারীর দেহ মন ও প্রাণের কামনাকে গোপন ক'রে রেখেছে. মিথ্যা তপস্বিনীর মিথ্যা ক্লেশ বেশ ও কৃচ্ছ্র ক্ষমা করুন অনঘ।

আগন্তুকের নয়নের বিস্ময় যেন দুঃসহ কৌতুকে দীপ্ত হয়ে ওঠে।—তুমি আমার প্রেমাভিলাষিণী?

শ্রুবাবতী—হ্যাঁ, প্রিয় অতিথি।

আগন্তুক—তুমি জান আমার পরিচয়?

শ্রুবাবতী—জানি না, জানবার সৌভাগ্য হয়নি কখনও, জানতে ইচ্ছাও করি না ধীমান। শুধু জানি, তপস্বিনী শ্রুবাবতীর নয়ন হতে তার সকল ধ্যান কেড়ে নিয়ে সে-নয়নে এক বিপুলমধুর স্বপ্নের আবেশ সঞ্চার করেছে যে প্রিয় মূর্তি, সে-মূর্তি আপনারই মূর্তি। ব্রহ্মব্রতিনীর ভুল তপস্যায় তামসিত হৃদয়ের মিথ্যাকে মিথ্যা ক'রে দিয়ে আপনারই কুণ্ডলদ্যুতি আশ্রমবাসিনী শ্রুবাবতীর নয়নের স্বপ্নকে জ্যোৎস্নায়িত করেছে। তপস্বিনীকে করেছে প্রেমিকা।

আগন্তুক—ভুল বুঝেছ আশ্রমবাসিনী নারী, তোমার সাত্ত্বিক বা তামসিক, সত্য অথবা মিথ্যা, কোন তপস্যাকেই মিথ্যা ক'রে দেবার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না।

শ্রুবাবতী—আমার ভুল বুঝতে পারছি না মহাভাগ। আপনি বলুন, আপনার মণিময় কুণ্ডলের দ্যুতি এই বনবীথিকার ছায়ায় ছায়ায় এতদিন ধ'রে কোন্ লতিকার শ্যামলতা আর স্নিগ্ধতা সন্ধান ক'রে ফিরেছে?

আগন্তুক—এই মর্ত্যের কোন শ্যামলতা আর স্নিগ্ধতার জন্য আমার বক্ষে ও নয়নে কোন তৃষ্ণা নেই ঋষিকুমারী। শুধু আছে কৌতূহল।

শ্রুবাবতী—এ কেমন কৌতূহল?

আগন্তুক—শুধুই কৌতূহল। মর্ত্যের এক আশ্রমবাসিনী নারী কার জন্য অথবা কিসের জন্য তপস্যা করে, শুধু এই একটি কৌতূহলের তৃপ্তির জন্য ঋষি ভারদ্বাজের আশ্রমের দিকে তাকিয়ে দেখেছে সুরপতি ইন্দ্রের চক্ষু।

চমকে ওঠে শ্রুবাবতীর দুই চক্ষুর বিস্ময়।—আপনি সুরপতি ইন্দ্র?

হেসে ওঠেন ইন্দ্র।—হ্যাঁ শ্রুবাবতী, স্বর্গাধীশ বাসবের নয়ন শুধু এইটুকু জানতে চায়, এই মর্ত্যের কোন্ তপস্বী আর কোন্ তপস্বিনীর ধ্যানে স্বর্গ-বাসনা আছে।

শ্রুবাবতী—তপস্বিনীরূপিণী শ্রুবাবতীর নয়নে আর কোন ধ্যান নেই, শুধু আছে একটি স্বপ্ন এবং সে-স্বপ্নে বিন্দুমাত্র স্বর্গবাসনা নেই বাসব।

ইন্দ্রের দুই নয়নের কৌতূহল যেন ক্ষীণ বিদ্রূপের বিদ্যুতের মত শিহরিত হয়ে মর্ত্যনারীর এই মধুরভণিত অহংকারের ভুল ধরিয়ে দিতে চায়। ইন্দ্র বলেন।—স্বর্গ চাও না, কিন্তু স্বর্গপতি বাসবের প্রণয় লাভের বাসনায় স্বপ্নায়িত ক'রে রেখেছ জীবন ও যৌবনের কামনা, কী অদ্ভুত তোমার স্বপ্ন শ্রুবাবতী!

শ্রুবাবতী—আশ্রমবাসিনী মর্ত্যনারীর স্বপ্নকে আপনি ভুল বুঝেছেন স্বর্গাধীশ। স্বর্গকে নয়, স্বর্গাধীশ ইন্দ্রকেও নয়, এই মর্ত্যেরই বনবীথিকাচারী এক সুন্দর পথিকের যৌবনবিমোহিত তনুশোভাকে ভালবেসেছে শ্রুবাবতী, উপবনের মাধবী যেমন তার নয়ন-নিকটের সহকারতরুর তরুণতনুর শোভাকে ভালবাসে। স্বর্গকে চাইনি, স্বর্গপতিকেও চাইনি। কোন দিনের কোন মুহূর্তে মনে হয়নি, বনতরুর ছায়ায় ছায়ায় যার কুণ্ডলদ্যুতি অপার্থিব এক জ্যোৎস্নাময় হর্ষ সঞ্চার ক'রে ঘুরে বেড়ায়, সে হলো অমরলোকের বৃন্দারক-বন্দিত বাসব। আমার নয়নের প্রতীক্ষা শুধু তাকেই চেয়েছে, যে আমার নয়নে এনে দিয়েছে প্রথম বিস্ময়, প্রথম মুগ্ধতা, অনুরাগে রঞ্জিত প্রথম ক্ষণ-বিহ্বলতা। বনবীথিকার এক পথিক আমার নয়নবীথির পথিক হয়েছে। সে পথিকেরই জন্য আশ্রমবাসিনী নারী এতদিন প্রতীক্ষার তপস্যা করেছে।

ইন্দ্র—এমন প্রতীক্ষার কোন অর্থ হয় না শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—আমার প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে বাসব।

ইন্দ্র—কি বলতে চাও শ্রুবাবতী?

শ্রুবাবতী—মর্ত্যনারী আমি, ষড়ঋতুর রঙ্গে লীলায়িত এই মর্ত্যের সকল পুষ্প ও কিশলয়ের কামনার মত আমারও কামনা প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষার তপস্যা

করেছে। এবং সে প্রতীক্ষা সফলও হয়েছে। আমার জীবনের নিদাঘের নিঃশ্বাস আজ মধুময় বসন্তের সৌরভকে কাছে পেয়েছে। এসেছেন আপনি, মর্ত্যনারীর প্রতীক্ষাকে আপনি তুচ্ছ করতে পারেননি স্বর্গাধীশ।

ইন্দ্র—স্বর্গাধীশ বাসবের চক্ষু কোন মুগ্ধতা নিয়ে তোমার সম্মুখে আসেনি শ্রুবাবতী। তোমার প্রতীক্ষার টানে নয়; আমি এসেছি আমার কৌতূহলের তৃপ্তির জন্য।

নিদাঘতাপিত বনলতিকার মত ব্যথিতভাবে শুধু নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে শ্রুবাবতী। ইন্দ্র বলেন—মর্ত্যের প্রতীক্ষার টানে স্বর্গ কাছে নেমে আসে না ঋষিকুমারী। এমন দুরাশার ভুল বর্জন কর ভারদ্বাজতনয়া।

তেমনই নীরব হয়ে, যেন এই মিথ্যা দুরাশার লজ্জা সহ্য করবার জন্য নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে শ্রুবাবতী।

ইন্দ্র বলেন—স্বর্গপতি ইন্দ্রের কাছে প্রেম আশা করো না মর্ত্যবাসিনী নন্দিনী মানবী। যদি ইচ্ছা থাকে, তবে আশা করো ইন্দ্রের অনুগ্রহ।

শ্রুবাবতী মুখ তুলে তাকায়—অনুগ্রহ?

ইন্দ্র—হ্যাঁ ঋষিতনয়া, স্বর্গ শুধু এই মর্ত্যকে করুণা করতে পারে, অনুগ্রহ করতে পারে, বর দান করতে পারে। তার বেশি কিছু পারে না। তার বেশি কিছু চাইবার অধিকারও এই মর্ত্যের কোন প্রেম প্রণয় ও কামনার নেই।

শ্রুবাবতী—আশ্রমবাসিনী এই মর্ত্যনারীর জীবনকে কিসের অনুগ্রহ করতে চান বাসব?

ইন্দ্র—যদি স্বর্গলোকে স্থিতি লাভের বাসনা থাকে, তবে তারই জন্য তপস্যা কর ভারদ্বাজতনয়া। যথাকালে এবং তপস্যার অন্তে তুমি স্বর্গলোকে স্থিতিলাভ করবে, দেবরাজ ইন্দ্রের এই অনুগ্রহের বাণী শুনে এখন প্রীত হও শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—আপনার অনুগ্রহের বাণী শুনে প্রীত হয়েছি বাসব, কিন্তু আমার জীবনের কামনা আপনার এই অনুগ্রহ চায় না।

ইন্দ্রের সুন্দর বিস্ময় ভ্রূকুটি হয়ে ফুটে ওঠে কি তোমার জীবনের কামনা?

শ্রুবাবতী - আশ্রমবাসিনী এই মর্ত্যনারীর দুই নয়নের সকল আগ্রহ ধন্য ক'রে দিয়ে এই নীলাশোকের ছায়ার কাছে আপনি আর একবার এসে দাঁড়াবেন, আর ভারদ্বাজতনয়া শ্রুবাবতী এই মিথ্যা তপস্বিনীর মূর্তি মুছে দিয়ে মধু-বাসরিকা বধূর মত দয়িতের বক্ষ বরণ করবার জন্য আপনার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে।

ইন্দ্র—ধন্য তোমার কামনার দুঃসাহস। কিন্তু শুনে রাখ দুরাশার নারী, মর্ত্যের আদেশ পালন করবার জন্য স্বর্গের মনে কোন আগ্রহ নেই।

অশ্রুসজল হয়ে ওঠে শ্রুবাবতীর চক্ষু—আদেশ নয় বাসব, মর্ত্যের প্রেম আশ্রমবাসিনী এই নারীর হৃদয়ে পূজা হয়ে ফুটে উঠেছে; এই ইচ্ছা পূজাচারিণীর হৃদয়ের ইচ্ছা।

ইন্দ্র—স্বর্গের কাছে যেতে চাও না, অথচ স্বর্গকে কাছে আনতে চাও, বিচিত্র এই পূজা পূজা নয় শ্রুবাবতী। স্বর্গের অপমান।

শ্রুবাবতী—স্বর্গের অপমান নয় বাসব, এই পূজা হলো পরাপূজা।

ইন্দ্র—সে কেমন পূজা?

শ্রুবাবতী—অমৃতত্ববিহীনা মর্ত্যনারী আমি, ক্ষণকালের মধুরতাকে অনন্ত ক'রে রাখি, চিরবিরহের বেদনাতে চিরমিলনের স্বাদ পাই, ক্ষণিক শুভদর্শনের জন্য মরজীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করি। আমার পরাপূজা বিরাজমানকে সতত আহ্বান করে, স্বচ্ছকে পাদ্য অর্ঘ্য দান করে, নির্মলকে স্নান করায় রম্যকে আভরণ দেয়, নিত্যতৃপ্তকে নৈবেদ্য দেয়, অনন্তকে প্রদক্ষিণ করে, বেদাধারকে স্তোত্রে বন্দনা করে, আর স্বপ্রকাশকে নীরাজন ক'রে সুখী হয়। বুকের কাছে পাওয়ার জন্যই মর্ত্যের প্রাণ স্বর্গকে মাটি মাখিয়ে একটু ছোট ক'রে নেয় স্বর্গপতি। শ্রুবাবতীর প্রেমও স্বর্গপতি বাসবকে এই ধূলিময় ভূতলের তরুচ্ছায়ার কাছে প্রিয় অতিথির মত নয়নের সম্মুখে দেখতে চায়।

ইন্দ্র—তা হয় না শ্রুবাবতী। তুমি তোমার এই প্রেমাভিলাষ বর্জন কর। স্বর্গপতির জীবনের কোনক্ষণের কৌতূহল ভুলেও প্রেমাভিলাষ হয়ে তোমার আশ্রমের নীলাশোকের ছায়ার কাছে কোনদিন ফিরে এসে দাঁড়াবে না।

শ্রুবাবতী—কিন্তু আমি প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকব বাসব।

কপট তপস্বিনীর জটায়িত বেণীভার যেন নূতন এক প্রতিজ্ঞার আবেগে শিউরে উঠেছে। দেখে বিস্মিত ও বিরক্ত হন ইন্দ্র। স্বর্গপতির অধরে অবিশ্বাসের মৃদু বিদ্রূপের রেখা হেসে ওঠে।—কতকাল প্রতীক্ষা করবে মরজীবনের নারী?

শ্রুবাবতী বলে—এই মরজীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

চলে গেলেন বাসব, নীলাশোকের ছায়া তেমনি সুস্থির হয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়ে থাকে।

কালচক্রে ধাবিত হয়ে অতন্দ্রিত সবিতা দিবা রাত্রি কলা ও কাষ্ঠা রচনা করেন এবং স্বর্গাধীশ বাসব একদিন তাঁর নিজেরই অন্তরের ভিতরে এক কৌতূহলের ধ্বনি শুনে চমকে ওঠেন ও বিস্মিত হন। মর্ত্যের এক আশ্রম-

বাসিনী নারী নীলাশোকের ছায়ার কাছে এখনও কি স্বর্গাধীশ বাসবের পদধ্বনি শুনবার জন্য প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? অসম্ভব, বিশ্বাস হয় না বাসবের, এবং এই মিথ্যা কৌতূহলের বিরুদ্ধে ভ্রূকুটি হেনে আশ্বস্ত হতে চেষ্টা করেন বাসব। মনে হয়, মৃত্তিকাময় জগতের সে-নারীর প্রেম ও প্রতীক্ষা বন-ব্রততীর ক্ষণপুষ্পিত শোভার মত সেই বসন্তেরই চৈত্রশেষের সমীরিত হাহাকারে শেষ হয়ে গিয়েছে। শুধু প্রতীক্ষার জন্য প্রতীক্ষা, আশ্রমবাসিনী নারীর এত বড় অহংকারের ঘোষণা নিজেরই মিথ্যায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

শুধু জানতে ইচ্ছা করে বাসবের, মধুরপ্রলাপিনী পরভৃতার মত কলভাষিণী সেই মানবীর প্রেম নূতন সঙ্গীত হয়ে আজিকার এই নববসন্তের প্রভাতে সেই নীলাশোকের ছায়ার কাছে কোন্ নূতন অতিথিকে বন্দনা করে? বনস্থলীর নিভৃতে পদ্মরাগে অরুণিত তটিনীতটের সরণিতে সে যৌবনবতীর অভিসার আজ অলক্তের চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে কোন্ নূতন দয়িতের আলিঙ্গন লাভের জন্য ছুটে চলে যায়? বনসরসীর মুকুরায়িত সলিলের দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে, লোধ্ররেণুলিপ্ত কোমল কপোলের উপর কোন্ প্রেমিকের দশনদানে রচিত চুম্বন-ক্ষতচ্ছবি দেখে হেসে ওঠে নারী? কৌতূহল, বড় তীব্র কৌতূহল, স্বর্গাধীশ বাসবের নয়ন যেন দূর মর্ত্যলোকের এক বনবীথিকার দিকে তাকাবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আর বিলম্ব করেন না বাসব। স্বর্গপতির স্যন্দননেমীর মত মত্ত আবেগে ছুটে চলে এবং সেই বনবীথিকার নিকটে এসে শান্ত হয়। দেখতে পান বাসব, দূরান্তের সেই আশ্রমের প্রাঙ্গণে সেই নীলাশোকেরই কাছে ছায়াময়ী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক অচঞ্চলা তপস্বিনীর রিক্তা ও নিরাভরণা মূর্তি।

বিস্মিত হন বাসব। সত্যই যে জীবনের প্রথম নয়নবিহ্বলতায় বন্দিত বনবীথিকাচারী এক পথিকের প্রেমের জন্য অফুরান প্রতীক্ষা সহ্য করছে শ্রুবাবতী! সত্যই কি স্বর্গের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নেই শ্রুবাবতীর মনে?

সুরপতি ইন্দ্রের কৌতূহল তাঁর এই চঞ্চলিত চিত্তের সব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। ভারদ্বাজতনয়া শ্রুবাবতীর প্রেম ও প্রতীক্ষার নিষ্ঠাকে একটি সুন্দর ছলনা দিয়ে পরীক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হন ইন্দ্র। লুকিয়ে ফেলেন দ্যুতিময় কুণ্ডলের মণি। বনবাসী ঋষিযুবার ছদ্মবেশ ধারণ করেন ইন্দ্র।

ধীরে ধীরে ছায়াচ্ছন্ন বনবীথিকার স্নিগ্ধতার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন ইন্দ্র। সুন্দরদর্শন এক ঋষিযুবা। তার কণ্ঠে যজ্ঞো-পবীত, ললাটে ভস্মত্রিপুণ্ড্রক, মস্তকে জটাভার, কর্ণে স্ফটিকমালা, হস্তে আষাঢ়দণ্ড ও স্কন্ধে কৃষ্ণাজিন। যেন এই বনলোকের এক পিপাসিত তপস্যার

মূর্তি দুরান্তের আশ্রম-প্রাঙ্গণের এক নীলাশোকের ছায়ার দিকে তৃষ্ণার্ত দুই চক্ষুর কৌতূহল উৎসারিত ক'রে এগিয়ে যেতে থাকে।

কিন্তু চমকে ওঠে না নীলাশোকের ছায়া। পীতকৌশেয়বসনা তপস্বিনীর জটায়িত বেণীভারে কোন বিস্ময়ের শিহরণ জাগে না। আগন্তুক ঋষিযুবার মুখের দিকে নিষ্কম্প শান্ত দৃষ্টি তুলে নীরবে সম্মান জ্ঞাপন করে শ্রুবাবতী।

ঋষিযুবা বলে—আমি তপস্বী বশিষ্ঠ।

শ্রুবাবতী- আমি ভারদ্বাজতনয়া শ্রুবাবতী।

বশিষ্ঠ—আমি তোমার আশ্রমের অতিথি শ্রুবাবতী; অতিথির প্রাপ্য সকল সমাদর আমি তোমার কাছে আশা করি আশ্রমবাসিনী।

শ্রুবাবতী—অতিথির প্রাপ্য সকল সমাদর অবশ্যই পাবেন ঋষি।

তরুণ বশিষ্ঠের নয়নের হর্ষ অকস্মাৎ এক নিবিড়মদির আবেদনে মন্থর হয়ে ওঠে। তাপিত বনমৃগের মত ব্যাকুল হয়ে নীলাশোকের ছায়ার আরও নিকটে এগিয়ে আসেন বশিষ্ঠ। প্রণয়োচ্ছল স্বরে আহ্বান করেন বশিষ্ঠ—শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—আদেশ করুন ঋষি।

বশিষ্ঠ—শুধু অতিথির প্রাপ্য সমাদর নয়, আশ্বাস দাও শ্রুবাবতী, তোমার সমাদরে অতিথির সকল আশা তৃপ্ত হবে।

শ্রুবাবতী—ক্ষমা করুন ঋষি, ভারদ্বাজতনয়ার কাছে এমন আশ্বাস আশা করবেন না।

বশিষ্ঠ—আমার সকল পুণ্য তুমি গ্রহণ কর শ্রুবাবতী, বিনিময়ে শুধু আশ্বাস দাও, তুমি আমার জীবনের সকল আনন্দের সহচরী হবে।

শ্রুবাবতী—ক্ষমা করুন পুণ্যবান, বৃথা এমন ভয়ংকর অনুরোধ ক'রে আশ্রমবাসিনী নারীর হৃদয়ের শান্তি ব্যথিত করবেন না।

বশিষ্ঠ—অকারণে ব্যথিত হয়ো না শ্রুবাবতী। বশিষ্ঠের প্রিয়া হয়ে, বশিষ্ঠের পুণ্যে পুণ্যবতী হয়ে স্বর্গলোকে গিয়ে চিরসুখের জীবনে স্থিতি লাভ কর। আমার তৃপ্তি তোমারই মুক্তি হয়ে উঠবে শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—আমার মনে স্বর্গের জন্য কোন লোভ, কোন উল্লাস আর কোন ক্রন্দন নেই।

বশিষ্ঠ—স্বর্গের জন্য লোভ না হোক, মুক্তকণ্ঠে বল দেখি সুধাহীনা এই বসুধার নারী, তোমার হৃদয়ে আর প্রদোষমুদিতা কুমুদ্বতীর মত তোমার ঐ কুণ্ঠাসুন্দর যৌবনকলিকার শোণিতে প্রণয়বিহ্বল পুরুষের প্রেমের জন্য কোন লোভ নেই?

শ্রুবাবতী—আছে ঋষি, পীতকৌশেয়বসনা তপস্বিনী শ্রুবাবতীর নয়ন

হতে সব ধ্যান কেড়ে নিয়ে সে-নয়নে প্রণয়স্মিত স্বপ্ন ভরে দিয়েছে যে পুরুষ, শুধু তারই প্রেমের জন্য লুব্ধ হয়ে আছি।

বশিষ্ঠ—কে সে?

শ্রুবাবতী—বাসব।

কপট বশিষ্ঠের নয়নে যেন অস্ফুট অথচ দুঃসহ এক বিশ্বাসের বিস্ময় চমকে ওঠে এবং ধীরে ধীরে প্রখর নয়নের কৌতূহল শান্ত ও নম্র হয়ে যায়। প্রশ্ন করেন বশিষ্ঠ—বাসবকে ভালবেসেছে মর্ত্যনারী?

শ্রুবাবতী—হ্যাঁ ঋষি।

বশিষ্ঠ—কিসের জন্য?

শ্রুবাবতী—ভালবাসার জন্য।

বশিষ্ঠ—কিন্তু তুমি কি সত্যই বিশ্বাস কর শ্রুবাবতী, স্বর্গাধীশ বাসব কখনও ধূলিময় মর্ত্যের কুটীরে এসে এক ঋষিতনয়ার পেমের প্রতিদানে প্রেম নিবেদন করবেন?

শ্রুবাবতী—মর্ত্যনারীর জীবনে এত বড় বিশ্বাসের কিবা প্রয়োজন ঋষি? মর্ত্যের প্রাণ শুধু ভালবাসার জন্যই ভালবাসতে জানে। জানি না, স্বর্গের প্রাণ কেন আর কেমন ক'রে ভালবাসে।

বশিষ্ঠ—স্বর্গের প্রাণ ভালবেসে শুধু সুখী হয়, আর সুখের জন্য ভালবাসে।

শ্রুবাবতী— আশ্রমবাসিনী মর্ত্যনারীর প্রাণ বাসবকে ভালবেসে বেদনা পায়, তবু ভালবাসে।

কপট বশিষ্ঠের দুই চক্ষু যেন আবার এই মর্ত্যপ্রেমের অহংকারের আঘাতে কঠোর হয়ে ওঠে। আরও কঠোর এক পরীক্ষার ইচ্ছা কপট বশিষ্ঠের দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। মর্ত্যনারীর এই প্রেমের অহংকারকে আর একটি কঠিন ছলনার আঘাতে চূর্ণ ক'রে দিয়ে, তারপর সহাস্য করুণা আর সান্ত্বনা দিয়ে প্রেমিকা মর্ত্যনারীকে প্রীত ক'রে আর ধন্য ক'রে স্বর্গধামে চলে যাবেন স্বর্গাধীশ।

ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত ফেনিলোচ্ছল স্বরে আদেশ করেন বশিষ্ঠ—শুধু অতিথির প্রাপ্য সমাদর তোমার কাছ থেকে আশা করি শ্রুবাবতী। তার বেশি কিছু আশা করি না।

শ্রুবাবতী—বলুন, কোন্ সমাদরে আপনি প্রীত হবেন ঋষি?

বশিষ্ঠ তাঁর কমণ্ডলু হতে পাঁচটি ক্ষুদ্র বদরিকা বের ক'রে শ্রুবাবতীকে বলেন—এই পাঁচটি বদরিকা রন্ধন কর শ্রুবাবতী। সুরন্ধিত এই পাঁচটি বদরিকাই আমার দিনান্তের ভোজ্য। সূর্য অস্তমিত হবার পূর্বেই আমি আমার ভোজ্য গ্রহণ ক'রে তৃপ্ত হতে চাই ঋষিকুমারী।

শ্রুবাবতী—তথাস্তু ঋষি।

বশিষ্ঠ—কিন্তু একটি প্রশ্ন আছে শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—বলুন।

বশিষ্ঠ—যদি অতিথিকে এই সামান্য সমাদরেও তৃপ্ত করতে তুমি অক্ষম হও শ্রুবাবতী, তবে ক্ষুণ্ণ ও অপমানিত অতিথির অভিশাপও তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে শ্রুবাবতী—অভিশাপ?

বশিষ্ঠ—হ্যাঁ। কল্পনা করতে পার, কি অভিশাপ দেব আমি?

শ্রুবাবতী—না। আপনি বলুন।

বশিষ্ঠ—তোমার প্রেমের আস্পদ সেই বাসবকে তুমি চিরকালের মত ভুলে যাবে।

- অকরুণ ঋষি! শ্রুবাবতীর শিহরিত কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত ধ্বনিত হয়। পরক্ষণে, যেন নীলাশোকের চঞ্চলিত পল্লবের স্নিগ্ধ নিঃশ্বাসের স্পর্শে শান্ত হয়ে যায় শ্রুবাবতীর ত্রস্ত হৃদয়ের আর্ততা। দূরের বনবীথিকার ছায়াচ্ছন্ন অন্তরের দিকে তাকিয়ে কি-যেন চিন্তা করে শ্রুবাবতী। ধীরে ধীরে শান্ত ও কঠিন এক সংকল্পের আনন্দ যেন অধররেখায় সুস্মিত হয়ে ওঠে।

শ্রুবাবতী বলে—অপেক্ষা করুন ঋষি। সূর্য অস্তমিত হবার পূর্বেই আপনি আপনার আকাঙ্ক্ষিত ভোজ্য পাবেন।

কুটীরে প্রবেশ করে শ্রুবাবতী এবং একাকী নীলাশোকের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে কপট বশিষ্ঠের নয়নে সেই কঠোর কৌতুক আরও প্রখর হয়ে জ্বলে ওঠে। ইন্দ্রজালের মায়া আশ্রমবাসিনী মর্ত্যনারীর প্রেমের অহংকারকে আর একবার আক্রমণ করেছে। পাঁচটি মায়াবদরিকা নিয়ে কুটীরের ভিতর চলে গিয়েছে শ্রুবাবতী, কোন অগ্নিতাপে সে মায়াবদরিকা পক্ক হবার নয়।

মধ্যাহ্নের সূর্য পশ্চিম দিগ্‌বলয়ের দিকে এগিয়ে চলে। ধীরে ধীরে অপরাহ্নের আলোক নিষ্প্রভ হয়ে আসে। অস্তাচলের শিখরে আসন্ন সন্ধ্যার রক্তিম সঞ্চার জাগে। ইন্দ্রমায়ার কৌতুকে আশ্রমকুটীর হতে সকল ইন্ধনকাষ্ঠ সেই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। অপলক নয়নের কৌতুক নিয়ে কুটীরদ্বারের দিকে তাকিয়ে থাকেন কপট বশিষ্ঠ। মায়াবদরিকা রন্ধনে ব্যর্থ হয়ে, ইন্দ্রের মায়াভিশাপে অভিভূত প্রেমিকা শ্রুবাবতীর হৃদয় তার প্রেমের আস্পদ বাসবকে বিস্মৃত হয়ে ঐ কুটীরের ভিতর হতে ধীরে ধীরে এসে এইখানে এই কপট বশিষ্ঠের সুন্দর মুখের দিকে তাকাবে। আর কতক্ষণ? অস্তাচলচূড়ার অন্তরালে ক্লান্ত তপনের শেষ রশ্মি বিদায় নেবার জন্য থরথর ক'রে কাঁপছে।

কিন্তু কই, ঐ নীরব কুটীরের বক্ষে কোন উন্মাদ এখনও কেন জাগে না? কিংবা, স্মৃতিহারা শূন্য হৃদয়ের নূতন কৌতূহল নিয়ে ধীরে ধীরে এখনও কেন শীলাশোকের ছায়ার দিকে এগিয়ে আসে না সেই নারী?

কপট বশিষ্ঠ তার অন্তরের এই বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে কুটীরের দ্বারের কাছে এসে দাঁড়ান।

অকস্মাৎ দারুমূর্তির মত স্তব্ধীভূত হয়ে যায় বিস্ময়চঞ্চল কপট বশিষ্ঠের শরীর। অগ্নিশিখালাময় আর এক বিস্ময়ের স্পর্শে কপট বশিষ্ঠের দুই চক্ষু হতে সকল কৌতুক ঝরে পড়ে যায়।

দেখতে থাকেন কপট বশিষ্ঠ, সুস্মিত হয়ে উঠেছে প্রেমিকা শ্রুবাবতীর নয়ন ও অধর। ইন্ধন নেই, কিন্তু পীতকৌশেয়বসনা নারী যেন তার নিজ তনুকেই ইন্ধনরূপে উৎসর্গ করবার জন্য অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। মর্ত্যভূমির প্রাণের এক ব্রতী তার জীবনের এত প্রিয় ঐ কোমলপিণ্ড দেহের এক মুহূর্তের মদকৌতুকে ভস্ম ও অসার ক'রে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কপট বশিষ্ঠের অভিশাপকে চরম উপহাসের জ্বালায় ভস্মীভূত করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে শ্রুবাবতী। কী কঠিন এই মর্ত্যের মৃত্তিকা অহংকার!

শিউরে ওঠে কপট বশিষ্ঠের দৃষ্টি। দেখতে পান সুস্মিত নয়ন ও অধরে এক অনন্ত সংকল্পের অহংকার নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে শ্রুবাবতী। ত্বরিতপদে কুটীরের ভিতরে প্রবেশ করেন কপট বশিষ্ঠ এবং শ্রুবাবতীর গতি রোধ করবার জন্য বাধা দিয়ে বলেন: থাম শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—থামতে পারি না ঋষি। বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না।

বশিষ্ঠ—মর্ত্যের ক্ষণায়ুশাসিত জীবনের নারী জীবনের মূল্য বিস্মৃত হও কেন?

শ্রুবাবতী—মর্ত্যের আশ্রমবাসিনী শ্রুবাবতী নামে এই নারীর জীবনের কোন মূল্য নেই, যদি সে জীবন তারই প্রেমের উপাস্য বাসবের কথা ভুলে গিয়ে বেঁচে থাকে। সেই জীবন এক মুহূর্তের জন্য সহ্য করতে চাই না ঋষি।

কপট বশিষ্ঠের নয়নের প্রখর কৌতূহল যেন অকস্মাৎ স্নিগ্ধ এক বিশ্বাসের হর্ষ হয়ে ফুটে ওঠে। স্নিগ্ধ স্বরে বলেন।—শান্ত হও, হৃদয়ের সব আক্ষেপ বর্জন কর শ্রুবাবতী। স্বর্গাধীশ বাসব আজ বিশ্বাস করে, মর্ত্যের আশ্রম-বাসিনী এক পীতকৌশেয়বসনা ঋষিকুমারী তার জীবনের প্রতিক্ষণের কাম্য সেই পথিক বাসবকে ভালবেসেছে। প্রতিদান চায় না, উপকার উপহার ও উপঢৌকন আশা করে না, মর্ত্যনারীর এই বেদনাভরা প্রেমের মূল্য বেদনাহীন স্বর্গের মন্ত তুচ্ছ করতে পারে না।

শ্রুবাবতী—স্বর্গের মনের কথা আর বাসবের বিশ্বাসের কথা আপনি কেন ঘোষণা করছেন ঋষি?

কপট বশিষ্ঠের নয়নে স্নেহসিক্ত কৌতুকের এক সুন্দর হাস্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—আমি ঋষি নই, বশিষ্ঠও নই, আমি স্বর্গাধীশ বাসব।

—প্রিয় বাসব! প্রেমতাপসিকার সফল প্রতীক্ষার আনন্দ প্রণয়সান্দ্র স্বরে উচ্ছ্বসিত হয়। স্মিত নয়নের সকল বাসনা উৎসারিত ক'রে বাসবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শ্রুবাবতী। আর কোন দ্বিধা নেই, এই মুহূর্তে অনায়াসে বরমাল্য হাতে তুলে নিয়ে প্রেমিকের কণ্ঠ স্পর্শ করতে পারে শ্রুবাবতী। যেন এক পৌর্ণমাসীর চন্দ্রিকার আশ্বাস দেখতে পেয়েছে শ্রুবাবতীর নয়ন। পীতকৌশেয় বসন আর জটায়িত বেণীভারের বন্ধনে ব্যথিতা এক সাধ্বয়ন্তী প্রেমিকার সলজ্জ সাধ্বস এই মুহূর্তে প্রেমিকের কণ্ঠ হতে উৎসারিত একটি প্রিয় সম্বোধনের স্পর্শে লুপ্ত হয়ে যাবে। শুধু একটি আহ্বান। শুধু দয়িতকণ্ঠের একটি প্রিয়সম্ভাষণ শোনবার জন্য শ্রুবাবতীর হৃদয়ের সকল পিপাসা উৎসুক হয়ে ওঠে। সেই আহ্বান ধ্বনিত হলেই সকল কুণ্ঠা হারিয়ে পীতকৌশেয়বসনা এক আশ্রমবাসিনী মর্ত্যনারী এই মুহূর্তে স্বর্গাধীশ বাসবের বক্ষে জটায়িত বেণীভার লুটিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হবে।

শ্রুবাবতী, পৃথিবীর এক পুষ্পিতযৌবনা ঋষিকুমারী যেন এক ক্ষণ স্বপ্নের মধুরতার মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখছে, তার কোমল কপোলে গোধূরেণু ঝরে পড়েছে, কপালে পরিপীত পটীর রসের তিলক ফুটে উঠেছে। গলে গিয়েছে জটায়িত বেণীভারের ভার; নূতন কুন্তলে কুরুবকের শোভা উত্তরংসিত হয়ে প্রেমিকাকে মধুবাসরিকার সাজে সাজিয়ে দিয়েছে।

বাসব ডাকেন—শ্রুবাবতী!

শ্রুবাবতীর ক্ষণস্বপ্নের মধুরতা হঠাৎ ব্যথিত হয়। এ কেমন আহ্বান? শ্রুবাবতী, শুধুই শ্রুবাবতী যেন মর্ত্যবাসিনী শত কোটী নারীর মধ্যে একটি নারীর নাম উচ্চারণ করছেন বাসব। সে আহ্বানে প্রেমিকের ব্যাকুলতা মদিরস্বরে মন্দ্রিত হয় না।

আবার বলেন বাসব আশ্বস্ত হও ভারদ্বাজতনয়া, স্বর্গাধীশ বাসবের কাছ থেকে একটি বরবাণী শুনে প্রীত হও।

আর্তস্বরে প্রশ্ন করে শ্রুবাবতী। বরবাণী?

বাসব—হ্যাঁ শ্রুবাবতী। আমি বিশ্বাস করি তুমি আমাকে ভালবাস। তাই এই বর দান করি, তুমি তোমার মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গিয়ে আমার পরিণীতা পত্নী হবে।

করুণা করছে স্বর্গের মন। মর্ত্যের প্রেমকে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে

প্রীত ক'রে চলে যেতে চায় স্বর্গধামের অধীশ্বর। প্রিয়া শ্রুবাবতী, স্বর্গের মুখে এই স্বীকৃতি আর ধ্বনিত হলো না। শ্রুবাবতী তার ইহজীবনের কোন ক্ষণে এমন সম্বোধন শুনতে পাবে না।

মৃত্যুর পর! যেন উচ্চভাষিত এক কঠোর বিদ্রূপের প্রতিশ্রুতি। শ্রুবাবতীর আহত মনের বেদনাগুলি তার মনের ভিতরে নীরবে হেসে ওঠে। স্বর্গের পুরুষ মুক্তিকাময় এই ভূতলের কুটীরবাসিনী নারীর প্রেমবিহ্বল নয়নের প্রার্থনায় বন্দিত হয়েও এখনও এ-কথা বলতে পারছে না আমি ভালবাসি। স্বর্গের সুধা কি এতই হিমাক্ত? বেদনাহীন স্বর্গের সবই কি শুধু শিলা?

শ্রুবাবতী বলে আপনার বরবাণী আমার প্রতীক্ষার মৃত্যুবাণী বাসব।

বাসব—কি বলতে চাও ঋষিকুমারী?

শ্রুবাবতী—আপনি আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকতে বলছেন বাসব, কিন্তু এমন প্রতীক্ষার আর কোন অর্থ হয় না।

বাসব—কেন?

শ্রুবাবতী বলে আমার মৃত্যুর পর এই মর্ত্যনারীর ইহজীবনের অন্তে স্বর্গাধীশ যে বাসব আমার বরমাল্য গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দান করছেন, সে বাসব আমার বাসব নয়।

অমরপুরের অধীশ্বর, দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসন্ন অন্তরের শান্তি আবার এক মর্ত্যনারীর কুটিল প্রেমের অহংকারের আঘাতে ক্ষুব্ধ হয়।

বাসব বলেন এক শুভক্ষণে স্বর্গলোকের নন্দনবনবীথিকায় পারিজাতের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে স্বর্গাধীশ বাসবের কণ্ঠে পরিণয়মাল্য অর্পণ করবে তুমি শ্রুবাবতী, মর্ত্যের বেদনাধূলিমলিন ইহজীবনের অন্তে এই পরমবরণীয় পরিণয় লাভের জন্য সশ্রদ্ধচিত্তে তপস্বিনীর মত প্রতীক্ষায় থাক।

শ্রুবাবতীর নয়নে অদ্ভুত এক সজল হাস্যদ্যুতি স্পন্দিত হতে থাকে।—আমার জীবন হতে প্রতীক্ষার সবেদন আনন্দটুকুও আপনি ছিন্ন ক'রে দিলেন বাসব। পারিজাতের ছায়া স্বর্গের নন্দনবনবীথিকাকে স্নিগ্ধ ও সুরভিত ক'রে রাখুক, মর্ত্যের প্রেমিকা নারী তার প্রতীক্ষাহীন ইহজীবনের শূন্যতা নিয়ে এই নীলাশোকের ছায়ার কাছে বিলীন হয়ে যাবে। মর্ত্যের বক্ষে শেষ নিঃশ্বাস সঁপে দেবার আগে শুধু বলে যাব, চাই না স্বর্গ, স্বর্গাধীশকেও চাই না, আমি আমার মর্ত্যের বনবীথিকাচারী বাসবকে ভালবাসি।

বাসব—বড় উদ্ধত তোমার প্রতীক্ষাময় প্রেমের অহংকার, তার চেয়ে বেশি উদ্ধত তোমার প্রতীক্ষাহীন প্রেমের অহংকার। স্বর্গের প্রতিশ্রুতিকে তুচ্ছ

ক'রে মৃত্তিকালিপ্ত মলিন মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করেছ মর্ত্যনারী, স্বর্গাধীশের কাছে আর কোন করুণা আশা করো না। বিদায় দাও শ্রুবাবতী।

চলে গেলেন বাসব।

অতন্দ্রিত সবিতা কালচক্রে ধাবিত হয়ে দিবা রাত্রি কলা ও কাষ্ঠা রচনা করেন। আর মর্ত্যের এক আশ্রমপ্রাঙ্গণে নীলাশোকের ছায়ার কাছে অমাহতা কৃশ চন্দ্রলেখার মত প্রতিদিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয় অনশনব্রতিনী এক ব্রততীর দেহ। নীলাশোকের ছায়াস্নিগ্ধ মৃত্তিকার শয্যায় মৃত্যুবরণ করবার আগে যেন দুই নয়নের প্রিয় এক স্বপ্নের সঙ্গে বাসকোৎসব যাপন করছে প্রেমিকা শ্রুবাবতী। যে ইহজীবনের কুটীরদ্বারে দয়িতের পদধ্বনি কোনদিন শ্রুত হবে না, প্রতীক্ষাহীন সে ইহজীবনের একটি মুহূর্তও সহ্য করা যায় না।

তপস্বিনীর মূর্তি নয়। শ্রুবাবতী যেন তার শেষ স্বপ্নের সুষমায় নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে মর্ত্য অভিলাষের নৈবেদ্যের মত মাটিরই উপর বর্ণ ও সৌরভের পুষ্প হয়ে পড়ে আছে। পীতকৌশের বসন নয়; জটায়িত বেণীভারও নয়। এক প্রেমিকা নারী যেন শেষ অভিসারে এই নীলাশোকের ছায়াতলে এসে দয়িতের সাথে মিলন লাভ করেছে। কবরীতে কুরুবক আর কপোলে লোধ্ররেণু নিয়ে রক্তাংশুকে শোভিতা এক মধুবাসরিকা যেন ক্লান্ত হয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়ে আছে।

প্রজাপতির পক্ষপরাগ মৃত্যুমুখিনী সে নারীর কবরী সুরভিত ক'রে দিয়ে যায়। রক্তাংশুকের লুণ্ঠিত অঞ্চলে রাজীব রেণু ছড়িয়ে দিয়ে যায় ভৃঙ্গ। মৃত্যুমুখিনী নারীর আননে কখনও প্রাভাতিকী আভা আর কখনও বা শারদা শর্বরীর জ্যোৎস্না হাসে।

আর, স্বর্গলোকের নন্দনবনবীথিকার পারিজাতের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে বজ্রায়ুধ বাসবের হৃদয়ে দুঃসহ এক কৌতূহল চঞ্চল হয়ে ওঠে। মর্ত্যের এক নীলাশোকের ছায়ায় লিপ্ত এক আশ্রমের প্রাঙ্গণ যেন স্বর্গাধীশের বক্ষে এক মুষ্টি ধূলির জ্বালা নিক্ষেপ করেছে। তাই বার বার মনে পড়ে, এবং বার বার তাঁর অন্তরের দুঃসহ কৌতূহল শান্ত করতে চেষ্টা করেন বাসব। স্বর্গের প্রতিশ্রুতিকে তুচ্ছ ক'রে, স্বর্গাধীশ বাসবের বামাঙ্কশোভা হবার গৌরব তুচ্ছ ক'রে জীবনের প্রথম প্রণয়ে বিস্মিত নয়নের ক্ষণবিহ্বলতাকে চিরক্ষণময় স্বপ্নের মত নয়নে ধারণ ক'রে সত্যই কি মৃত্তিকার ক্রোড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মৃত্যুব্রতিনী নারী?

মর্ত্যের জন্য স্বর্গের কৌতূহল! বড় দুঃসহ এই জ্বালাবিচলিত কৌতূহল। স্বর্গাধীশ বাসবের মনে হয়, সুধাহীনা বসুধার নারী যেন

হেলাবহসিত লীলাভঙ্গে মৃত্যুর বেদনা বরণ ক'রে সুধানিষিক্ত স্বর্গের সকল সুখের অমরতাকে অসুখী ক'রে দিতে চাইছে। দেখতে ইচ্ছা করে, মর্ত্যপ্রেমের সুন্দর অহংকারের সেই বিচিত্র গৌরবচ্ছবি। কৃপা করুণা ও মহত্ত্বের দুটি স্বর্গীয় নয়ন লুব্ধ হয়ে ওঠে। মর্ত্যলোকের এক নীলাশোকের ছায়ার জন্য তৃষ্ণার্ত হয় স্বর্গাধীশের তাপিত মনের কৌতূহল।

অন্তরীক্ষের অন্তর মথিত ক'রে ধ্বনিত হয় স্বর্গাধীশ বাসবের স্যন্দননেমির শিহরিত আর্তস্বর। মর্ত্যের বনস্থলীর শিরে সন্ধ্যার চন্দ্রলেখা কিরণ সম্পাত করে, যেন বিচলিত দ্যুলোকের অন্তর স্নেহ লাভের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে ভূতলের শ্যামলতার বক্ষ অন্বেষণ করছে। স্বর্গাধীশ বাসবের রথ দুরন্ত কৌতূহলের মত ছুটে এসে বনবীথিকার ধূলির উপর দাঁড়ায়। নীরব ও নিশুব্ধ আশ্রম-প্রাঙ্গণের পুষ্পিত নীলাশোকের দিকে তাকান বাসব। বাসবের কুণ্ডলদ্যুতি যেন ব্যথিত জ্যোৎস্নার মত বনবীথিকার ছায়ার বক্ষে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে থাকে। শ্রুবাবতী, পীতকৌশেয়বসনা সেই প্রেমিকা নারী কি সত্যই মৃত্যু বরণ ক'রে এই মর্ত্যের ধূলিতে বিলীন হয়ে গিয়েছে? তবে এই সন্ধ্যার জ্যোৎস্নায় এখনও কেন দগ্ধ হয়ে অঙ্গার হয়ে যায়নি ঐ নীলাশোকের কুসুম?

শ্রুবাবতী! প্রিয়া শ্রুবাবতী! বজ্রায়ুধ স্বর্গাধীশের সুধাসিক্ত কণ্ঠ সুধাহীনা বসুধার এক নারীকে আহ্বান করতে গিয়ে আর্তস্বর উৎসারিত করে। জ্যোৎস্নায়িত সন্ধ্যার মর্ত্যভূমি দ্যুলোকের ক্রন্দন শুনতে পেয়েও কী কঠিন নিষ্ঠুরতায় নীরব হয়ে আছে! স্বর্গের আশাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে এই মর্ত্যের মৃত্তিকা?

ধীরে ধীরে নীলাশোকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন বাসব। স্বর্গের মন এতদিনে বেদনার স্বাদ পেয়েছে। স্বর্গের গর্বিত কামনা আজ নত হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে যেন তার স্তোত্রের পাত্রীকে দেখতে পেয়েছে। বনবীথিকাচারী সেই পথিক তার জীবনের বাঞ্ছিতাকে আর একবার নয়নসম্মুখে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

সেই নীলাশোক। মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন বাসব, নীলাশোকের ছায়ায় ভূতলে লুটিয়ে রয়েছে মর্ত্যপ্রেমের এক চন্দ্রলেখা। রক্তাংশুকে শোভিতা এক মধুবাসরিকা তার কবরীর কুরুবক সুকোমল কপোলের লোধ্ররেণু, কপালের পটীররসতিলক আর বক্ষের পত্রলিখা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আছে। সত্যই, মরে গিয়েছে জটায়িত বেণীভারের বেদনায় বন্দিনী সেই তপস্বিনীর মূর্তি। আজ নীলাশোকের ছায়ায় শুধু এক ভূতললীনা প্রেমিকার মূর্তি তার নয়নের স্বপ্নের সঙ্গে বাসকোৎসব যাপন করছে।

ভূতললীনা শ্রুবাবতীর আরও কাছে এগিয়ে আসেন বাসব, এবং প্রেমিকা

মর্ত্যনারীর মঞ্জরীবলয়িত একটি বাহু সাগ্রহে বক্ষে গ্রহণ করেন। প্রেমিকার কণ্ঠসক্ত পুষ্পমাল্য আর মৃদু নিঃশ্বাসের সৌরভ স্বর্গাধীশ বাসবের বক্ষের সকল অনুভব সুরভিত ক'রে দেয়। মর্ত্যের প্রেমিকা নারী প্রতীক্ষাহীন জীবনের শূন্যতা হতে চিরকালের মত মুক্ত হবার জন্য মৃত্যু আহ্বান করেছে, এবং কী অদ্ভুত এই সুধাহীনা বসুধার মৃত্তিকা, মৃত্যুরই বেদনা সুস্মিত জ্যোৎস্নারেখার মত শ্রুবাবতীর অধরে ফুটে রয়েছে।

—প্রিয়া শ্রুবাবতী! আহ্বান করেন বাসব।

শ্রুবাবতীর নিমীলিত নয়নের স্বপ্ন যেন সেই আহ্বানের মধুর মন্ত্রে চমকিত হয়। মৃত্যুমুখিনী নারীর হৃদয়ের কাছে প্রেমিকের ব্যাকুলতা মধুপ-গুঞ্জনের মত ধ্বনিত হয়েছে, শ্রুবাবতীর নিমীলিত নয়ন কমলকলিকার মত ধীরে ধীরে বিকশিত হয়।

—এসেছ প্রিয় বাসব! শ্রুবাবতীর সফল বাসনার আনন্দ দুরান্তের কলবেণুক্বণিত গীতধ্বনির মত সুস্বরিত হয়।

—এসেছি প্রিয়া শ্রুবাবতী।

—মর্ত্যনারীর ধূলিলীন হৃদয়ের কাছে কেন এসেছেন স্বর্গাধীশ বাসব?

আবার প্রশ্ন করেছে মর্ত্যের মৃত্তিকা? এই প্রশ্ন যেন সুধাময় স্বর্গলোকের একটি রিক্ততার দিকে সন্দেহের ব্যথা নিয়ে এখনও তাকিয়ে আছে। কিন্তু আর ভুল করবেন না স্বর্গের বাসব। যে-কথা শুনতে পেলে স্বর্গকে বিশ্বাস করতে পারবে এই মর্ত্যের প্রাণ, সেই কথা মর্ত্যেরই ধূলি আর তৃণের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা ক'রে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন বাসব।

বাসব বলেন—একটি কথা বলতে এসেছি শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—কি?

বাসব—আমি ভালবাসি।

বনস্থলীর সমীর হঠাৎ হর্ষে অশান্ত হয়, চঞ্চল হয় পুষ্পিত নীলাশোক। ভূতললীনা চন্দ্রলেখাও যেন চঞ্চলিত এক উৎসবের আনন্দে লীন হয়ে যাবার জন্য বাসবের আলিঙ্গনে আত্মদান করে।

বাসব বলেন—চল প্রিয়া শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—কোথায়?

বাসব—স্বর্গলোকে চল।

শ্রুবাবতী—আমি তো স্বর্গ চাইনি বাসব।

বাসব—কিন্তু স্বর্গ যে তোমাকে চায়।

---

# প রি শি ষ্ট

ব্যাসকৃত মহাভারতের যে পর্বের যে অধ্যায়ে উপাখ্যানগুলির মূল পরিচয় উল্লিখিত আছে

| উপাখ্যান | | অধ্যায় সংখ্যা |
|---|---|---|
| পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা | বনপর্ব | ১৯২ |
| সুমুখ ও গুণকেশী | উদ্যোগপর্ব | ১০৪ |
| অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা | বনপর্ব | ৯৬ |
| অতিরথ ও পিঙ্গলা | শান্তিপর্ব | ১৭৪ |
| মন্দপাল ও লপিতা | আদিপর্ব | ২২৯ |
| উতথ্য ও চান্দেয়ী | অনুশাসনপর্ব | ১৫৪ |
| সংবরণ ও তপতী | আদিপর্ব | ১৭১ |
| ভাস্কর ও পৃথা | বনপর্ব | ৩০৫ |
| অগ্নি ও স্বাহা | বনপর্ব | ২২৪ |
| বসুরাজ ও গিরিকা | আদিপর্ব | ৬৩ |
| গালব ও মাধবী | উদ্যোগপর্ব | ১১৫ |
| রুরু ও প্রমদ্বরা | আদিপর্ব | ৯ |
| অনল ও ভাস্বতী | সভাপর্ব | ৩১ |
| ভৃগু ও পুলোমা | আদিপর্ব | ৫ |
| চ্যবন ও সুকন্যা | বনপর্ব | ১২২ |
| জরৎকারু ও অস্তিকা | আদিপর্ব | ১৩ |
| জনক ও সুলভা | শান্তিপর্ব | ৩২১ |
| দেবশর্মা ও রুচি | অনুশাসনপর্ব | ৪০ |
| অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা | অনুশাসনপর্ব | ১৯ |
| ইন্দ্র ও শ্রুবাবতী | শল্যপর্ব | ৪৮ |